বংশ পরিচয়।

তৃতীয় খণ্ড।

"প্রজাপতি" "মজলিস্" "শ্রীরামপুর" সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত।

আশ্বিন ১৩৩০।

মূল্য—১০্

কলিকাতা ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গোবৰ্দ্ধন প্রেস হইতে
শ্রীরসিকলাল পান দ্বারা মুদ্রিত ও
২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক
প্রকাশিত।

উৎসর্গ-পত্র ।

বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ উপাসক, বঙ্গীয় শাসন-পরিষদের সুযোগ্য সদস্য

বঙ্গের অন্যতম বদান্যবর প্রজারঞ্জন, দরিদ্রবৎসল

ভূম্যধিকারী, সুকবি, সুবক্তা

বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ

স্যার শ্রীবিজয়চন্দ মহতাব

কে-সি-এস-আই, কে-সি-আই-ই, আই-এম-ও বাহাদুরের

করকমলে

বংশ-পরিচয়ের

তৃতীয় খণ্ড

অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ

অর্পিত হইল।

সূচিপত্র।

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশ	...	১—৭
২।	বরোদার গুই কুমার	...	৮—১৭
৩।	মহীশূর রাজবংশ	...	১৮—২২
৪।	গণ্ডালের ঠাকুরবংশ	...	২৩—২৬
৫।	সারমুর রাজবংশ	...	২৭—৩২
৬।	রেওয়া রাজ্যের ইতিহাস	...	৩৩—৩৪
৭।	দেওয়াস রাজবংশ (ছোটতরফ)	...	৩৫—৩৬
৮।	শোনপুর রাজবংশ	...	৩৭—৪১
৯।	গিধোড় রাজবংশ	...	৪২—৪৯
১০।	লালগোলা রাজবংশ	...	৫০—৫৭
১১।	ডিমলা রাজবংশ	...	৫৮—৯৩
১২।	ভাওয়ালের রাজবংশ	...	৯৪—১২৯
১৩।	রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর	...	১৩০—১৩৪
১৪।	রাজা বনবিহারী কপূরবাহাদুর সি এস্ আই	...	১৩৫—১৪২
১৫।	চকদীঘির সিংহ রায়বংশ	...	১৪৩—১৫০
১৬।	আন্দুল রাজবংশ	...	১৫১—১৬৮
১৭।	উত্তরপাড়া জমিদারবংশ	...	১৬৯—১৮৯
১৮।	তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়বংশ	...	১৯০—২২০
১৯।	আম্বাড়িয়ার জমিদারবংশ	...	২২১—২৩৫ (এ)
২০।	রামচন্দ্রপুর গুহ পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস		২৩৬—২৪৯
২১।	ধানকোড়া জমিদারবংশ	...	২৫০—২৫৪
২২।	কুণ্ডীর জমিদারবংশ	...	২৫৫—২৭৫ (চ)

বিষয় পৃষ্ঠা

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর

বংশ পরিচয়।

হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশ।

হায়দ্রাবাদ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। এই রাজ্যের পরিধি ৮২৬৯৮ বর্গমাইল ও লোক সংখ্যা ১৩৩৭৪৬৭৬।১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বেরারের সমস্ত জেলা সমূহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংযুক্ত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মহামান্য নিজাম বাহাদুর বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা কর দিবার বন্দোবস্ত করিয়া বেরার প্রদেশের স্বত্ব চিরকালের জন্য গ্রহণ করেন।

নিজামবংশ ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের বংশের মধ্যে অতি প্রাচীন। মহম্মদের বংশধর খালিফ আবু বকর হইতে এই বংশের উৎপত্তি। মহামান্য হিজ হাইনেস স্যার মীর ওসমান আলি খাঁ বাহাদুর হায়দ্রাবাদের সপ্তম নিজাম। প্রথম নিজাম-উল-মুলক আসফ খাঁ মোগল সম্রাট্ আওরেঙ্গজেবের দরবারে একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বা রাজপ্রতিনিধি এবং পরে মোগল সম্রাটের প্রধান উজির বা মন্ত্রীর পদেও কার্য্য করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান নিজাম ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে

তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পিতা স্যার মীর মহাবুব আলি খাঁ একজন জ্ঞানী ও সুশাসক ছিলেন। তিনি প্রজা-বর্গের উন্নতির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক সৌহার্দ্দ্য ছিল।

বর্ত্তমান নিজাম যখন যুবরাজ তখন স্যার ব্রায়াণ ইগার্টন, নবাব ইমাদ-উল-মুলক সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী তাঁহাকে শিক্ষাদান করেন। এই দুইজন শিক্ষিত গৃহ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া এবং সর্ব্বদা ইঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া নিজাম বাহাদুর অতি অল্প বয়স হইতেই ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান লাভ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা করেন। প্রাচ্য-শাস্ত্রেও নিজাম বাহাদুর বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি উর্দ্দু ভাষায় অনেক কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থের দ্বারা উর্দ্দু সাহিত্যের যে অনেক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। উর্দ্দু সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত কবি নিজাম বাহাদুরের কবিতাসমূহ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম বাহাদুর দুলন পাশা নাম্নী নবাব জাহাঙ্গীর জঙ্গের কন্যাকে বিবাহ করেন। নবাব জাহাঙ্গীর জঙ্গ নিজাম বংশেরই এক শাখা। এই পত্নীর গর্ভে নিজাম বাহাদুরের দুইটী পুত্র-রত্ন জন্ম-গ্রহণ করেন। পুত্র দুইটির নাম—(১) নবাব মীর হিমায়ত আলি খাঁ বাহাদুর আজম খাঁ; ইনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। (২) নবাব মীর সুজাত আলি খাঁ বাহাদুর, মোয়াজাম খাঁ; ইনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মহামান্য নিজাম বাহাদুর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যশাসনের ক্ষমতা লাভ করেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল বন্যা হওয়ায় হায়দ্রাবাদ সহরের বিস্তর ক্ষতি

হয়। নিজাম বাহাদুর তৎক্ষণাৎ হায়দ্রাবাদ যে মুসী নদীর উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মুসী নদীর উপর একটি বাঁধ তৈয়ারী করেন। উদ্দেশ্য, তাহা হইলে আর ভবিষ্যতে বন্যা হইতে পারিবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা স্থাপন করিয়া নাগরিকগণের জন্য সুপেয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এই বাঁধ ভারতের মধ্যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন। ইনি সহরের দশ মাইল দূরে একটি জলের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই কল হইতে সহরের সর্ব্বত্র জল সরবরাহ হয়।

দেশহিতকর কার্য্য

মহামান্য নিজাম বাহাদুর কেবলমাত্র সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি সমগ্র সহরে পয়ঃনালীর (Drainage) প্রস্তুত করিয়াছেন।

সহরের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিবার পর নিজাম বাহাদুর সহরটীকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করিবার জন্য মন দেন। সহরে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। সহরে নূতন টাউনহল নির্ম্মিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিটার গঞ্জ রেলওয়ে নামক সেণ্ট্রাল রেলওয়ে এবং সুন্দর সুপ্রশস্ত হাইকোর্ট নিজাম বাহাদুরের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য কীর্ত্তির জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কুড়িলক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি হাঁসপাতাল ও সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। যে সমস্ত স্থান বন্যা প্রপীড়িত হইয়াছিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মহামান্য নিজাম বাহাদুরের ইচ্ছায় সেই স্থানগুলি একটী সুন্দর ভ্রমনোদ্যানে পরিণত হইয়াছে। সহরের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলি পরিসর হইয়াছে এবং সহরতলীতে দরিদ্রগণের জন্য সুন্দর আবাসপল্লী নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজধানী হইতে

দূরে প্রাদেশিক সহর ও জেলা সমূহে জলের কল, হাঁসপাতাল ও জেল-সমূহ তৈয়ার হইয়াছে। নিজাম বাহাদুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী স্থাপন করিয়া দরিদ্র কৃষকদিগকে ব্যবসায়ী সুদখোর উত্তমর্ণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। হায়দ্রাবাদ রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে তৈলের বীজের উৎপাদন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। তুলাও প্রচুর পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান নিজাম বাহাদুরের রাজত্ব কালেই মিটার গজ রেলওয়ের একশত মাইল ব্যাপী রেল রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। আরও অনেক রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের অনুকরণে একটি শাসন পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের একজন সভাপতি ও আটজন সদস্য আছেন। সদস্যগণের এক একজনের উপর এক একটি দায়ীত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার অর্পিত আছে। বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও বেহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্যার আলি ইমাম এই পরিষদের প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। নিজাম বাহাদুর কেবল শাসন পরিষদ গঠন করিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি একটী ব্যবস্থা পরিষদও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রজাবর্গের দ্বারা মনোনীত সভ্যেরা এই ব্যবস্থা পরিষদে রাজ্যের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব-অভিযোগের আলোচনা করেন।

শাসন সংস্কার

গত যুদ্ধের সময় তিনি ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবার জন্য অর্থ, ধন, লোক জন, যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতের মুসলমান সমাজের নেতা বলিয়া তিনি দেশের মুসলমানগণের মধ্যে পাছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মে এই জন্য বলেন—

In view of the present aspect of the war in Europe, let it be generally known that at this critical juncture it is the bounden duty of the Muhammadans of India to adhere firmly to their old and tried loyalty to the British Government, espicially when there is no Muslim or non-Muslim Power in the world under which they enjoy such personal and religious liberty as they do in India, and when more-over they are assured by the British Government that, as it has in the past always stood the best friend of Islam, so will it continue to be Islam's best friend and will always protect and cherish its Muslim subjects. * * * * finally I give expression to the hope that as I, following the tradition of my ancestors hold myself ever ready to devote my own person and all resources of my state and all that I possess to the service of Great Britain, so will all the Muhammadans of India, especially my own beloved subjects hold themselves wholeheartedly ready in the same way."

অর্থাৎ "বর্ত্তমানে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে তাহাদের পিতৃ-পিতামহগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ব্রিটিশরাজের প্রতি রাজভক্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মুসলমানেরা ভারতে থাকিয়া যেরূপ ব্যক্তিগত ও ধর্ম্মগত স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে সেরূপ কখনও ভোগ করে নাই এবং পৃথিবীতে কোন জাতি সেরূপ

স্বাধীনতা ভোগ করিতেও পারিতেছে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আশা দিয়াছিলেন যে তাঁহারা মুসলমান প্রজাদিগকে বরাবর রক্ষা ও রঞ্জন করিতে থাকিবেন। পরিশেষে আমি প্রকাশ করিতেছি যে আমি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকল্পে আমার যাহা কিছু সমস্তই অর্পণ ও উৎসর্গ করিতেছি, আমি আশা করি আমার প্রজাবর্গও সেইরূপ করিবে।"

নিজাম বাহাদুর সৈন্য, ধন ও অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি "ইম্পিরিয়াল সার্ভিস্ কোর" নামক যে সৈন্যদল বারমাস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করিবার জন্য প্রতিপালন করেন যুদ্ধ বাধামাত্র তাহা প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবার উক্ত "ইম্পিরিয়াল সার্ভিস কোরের" সৈন্যদল যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা গেলে তাহাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য তিনি হায়দ্রাবাদে আর একটি সৈন্য-দলকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল সৈন্য দল গঠন করিয়া কিংবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। আপন রাজ্যের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্রিটিশ সৈন্য সংখ্যা বাড়াইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যভুক্ত দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণ অধিক সংখ্যায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়াছিল।

নিজাম বাহাদুর যুদ্ধের সময় বহু অর্থ এককালে দান করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ ঋণ ভাণ্ডারে অনেক টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। তিনি সব্-মেরিনের বিরুদ্ধ ভাণ্ডারে (Anti-Submarine Campaign) পনর লক্ষ টাকা, যুদ্ধের সাহায্য কল্পে পনর লক্ষ টাকা, ইম্পিরিয়াল রিলিফ ফণ্ডে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার, সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর রৌপ্য বিবাহে (Silver-wedding) তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ও হাঁস-পাতালে দুই লক্ষ এবং বিবিধ সাহায্যকল্পে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬ শত টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। বিংশ দাক্ষিণাত্য অশ্বারোহী

সৈন্য দলের তিনি অনারারি কর্ণেল। এই অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রতিপালন করিতে মাসে তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। যুদ্ধের সময় এই সৈন্য দল প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে এক কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য নিজাম বাহাদুরের মোট দান ১৯৪৪৪৬০০। যুদ্ধ ঋণ ভাণ্ডারে শত করা চারি টাকা পাঁচ টাকা ও ৫½ টাকা সুদে তিনি যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ, ৭৫ লক্ষ এবং ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি মোট এক ক্রোর চৌষট্টি হাজার টাকা দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সন্ধি ব্যাপারকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিজাম বাহাদুর এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে পথিকদিগের সুবিধার জন্য একটি "সরাই" প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। যুদ্ধের সময় মহামান্য নিজামের স্বরাজ্য হইতে রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ দ্রব্য সম্ভার লইয়া মেসোপটেমিয়া রেলওয়ে বিভাগে প্রভূত কার্য্য করিয়াছিল।

মহামান্য নিজাম বাহাদুর শিক্ষা ব্যাপারেও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন। তিনি যে সময় রাজত্ব আরম্ভ করেন তখন বজেটে বার লক্ষ টাকা শিক্ষা ব্যাপারে ব্যয় করিবার কথা ছিল, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই এই ব্যয় সাইত্রিশ লক্ষ টাকায় বর্দ্ধিত করেন। নিজামের রাজ্যে এমন কোন গ্রাম নাই যেখানে স্কুল নাই; নিজাম বাহাদুর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক (Free Compulsory education) শিক্ষা প্রচলনের জন্যও চিন্তা করিতেছেন। হায়দ্রাবাদের ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিন নিজাম বাহাদুরের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দুই প্রধান ভাষা, এবং উর্দ্দুর সাহায্যেই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়; ইংরাজী কেবল ভাষা শিখিবার উদ্দেশ্যে শিখান হয়।

বরোদার গুইকুমার

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহামান্য মহারাজা গুইকুমার সিংহাসনারোহণ করেন। তখন তিনি নাবালক। কাজেই মহারাজের মন্ত্রী রাজা স্যার টি মাধব রাও রাজ্যের অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত ভার প্রাপ্ত হইয়া বরোদা রাজ্যের চারিটি প্রধানতম বিভাগে ভ্রমণ করেন এবং প্রজাগণের কি কি অভাব ও অভিযোগ তাহা সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অবগত হন। তদবধি বরোদা রাজ্যে যে সমস্ত সংস্কার হইয়াছে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এস্থানে সম্ভব নহে। মহারাজের সচিবগণ সমস্ত অতিযোগ্য ও কর্ম্মচারীরা সমস্তই শিক্ষিত। নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া মহারাজ এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে অজ্ঞতাই দারিদ্র্যের কারণ এবং দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে গেলে প্রজাগণকে শিল্প, বাণিজ্য ও সাধারণ শিক্ষা দেওয়া দরকার। মহারাজার রাজত্বকালে যে সমস্ত সংস্কার হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) রেভিনিউ বিভাগীয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমি সমূহের জরিপ করা হয়। এই জরীপের ফলে জমির কর সমতা প্রাপ্ত হয়। রপ্তানীশুল্ক তুলিয়া দেওয়া হয়, মাশুল ট্যাকস কমাইয়া দেওয়া হয়। সামান্য ও একই প্রকারের ইন্‌কাম ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়।

(২) বিচার সম্বন্ধীয়—

সমগ্র বিচার বিভাগের সংস্কার করা হইয়াছে। বরোদা রাজ্যে তালুক, মুন্সেফ কোর্ট, জেলা কোর্ট ও সর্ব্বোপরি বরিশত কোর্ট আছে। বরিশত কোর্টের আপীল হজুর নয়া সভায় শুনানী হয়। আইনের চক্ষে

বরোদাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত সয়াজী রাও গায়কোয়াড়

সকলই সমান। হিন্দু আইনানুসারে হিন্দুগণের বিচার হয়। জুরী ও এসেসরের দ্বারা বিচার হয়। বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য রহিয়াছে। সমস্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা মুন্সেফের দ্বারা বিচার হয় এবং সাধারণতঃ রেভিনিউ কর্ম্মচারী কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করেন না। এই সমস্ত আদালত ছাড়া গ্রাম্য মুন্সেফের কোর্টও আছে। সেখানে গ্রাম্য মুন্সেফেরা কয়েকটি ধারা পর্য্যন্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে পারেন। ইহা ছাড়া গ্রাম্য পঞ্চায়েত আছে, পঞ্চায়েতেরাও দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে পারে। যে কেহ বরোদা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও ডিগ্রী হয়। গবর্ণমেণ্ট বিনা বাক্য ব্যয়ে ডিগ্রীর টাকা দিয়া থাকেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারিশ কোর্টের তিন জন জজ ও নায়েব দেওয়ানকে লইয়া একটি আইন কমিটি গঠিত হয়। পরে সময়ে সময়ে এই কার্য্যের ভার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত হয়। তাহাদের দ্বারা বিলসমূহ গঠিত হয় এবং তাহা ষ্টেট গেজেটে প্রকাশিত হয়। জনসাধারণে যখন এই বিল সম্বন্ধে মতামত ও সমালোচনা প্রকাশ করে, তখন বিলটীর পরিবর্ত্তন করিয়া জনসাধারণের মতের মত বিলটী গঠন করিয়া মহারাজার আদেশানুসারে বিলটী আইনে পরিণত করা হয়।

কয়েক বৎসর হইল, বরোদায় একটি শাসন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শাসন পরিষদে মনোনীত সদস্যেরা দেশের শাসন কার্য্যে পরামর্শ দান করেন। বে-সরকারী সভ্যেরাও পরিষদের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও প্রযত্ন দেখাইতেছেন শাসন পরিষদে কোন বিল উপস্থাপিত করিতে গেলে অনেক বাদানুবাদ করিতে হয়। সমাজ সম্বন্ধীয় কয়েকটি আইন পাশ হইয়াছে। যথা—অসবর্ণ বিবাহ আইন, হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন, বাল্য বিবাহ রদ আইন ও শিশু রক্ষা আইন।

শিক্ষা।

শিক্ষা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বরোদা আর্ট কলেজ ও মহিলা কলেজ খোলা হয়। তদবধি স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ দৃষ্টি প্রদর্শিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বরোদা রাজ্যে মোট ৪১৪টী বালিকা বিদ্যালয়। প্রায় ৪০ হাজার বালিকা এই সমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ইহা ছাড়া যে সমস্ত বালিকা বালকদিগের সহিত একত্রে অধ্যয়ন করিতেছে,যদি তাহাদিগকে ধরা হয় তবে শিক্ষার্থিনী বালিকাগণের সংখ্যা হইবে ৯০ হাজার।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুন্নত জাতিসমূহের জন্য বিশেষ স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদিগকে সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত করিবার জন্য এবং তাহাদের নৈতিক চরিত্র ভাল করিবার জন্যও চেষ্টা হইতেছে। এখন ২৭৫টী অন্ত্যজ বিদ্যালয় আছে এবং অন্ত্যজ জাতীয় ১৮ হাজার বালক-বালিকা এখন শিক্ষালাভ করিতেছে। অর্থাৎ অন্ত্যজ জাতীয় শতকরা দশজন বালক বালিকা এখন শিক্ষালাভ করিতেছে। বন্য জাতীয় বালক বালিকাগণের শিক্ষার জন্যও বনের ভিতর স্কুল আছে। তাহাদিগকে সূত্রধারের কাজ ও কৃষি বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন কোন বন্য জাতীয় বালক আবার ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মেল ট্রেনীং কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলা ভবন (টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট্) স্থাপিত হয়। এখানে হাতে কলমে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান করা হয়। এই বিদ্যালয়ে চিত্র শিল্প, স্থাপত্য, মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারীং, রংকরণ, বস্ত্রবয়ন এবং বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। বৎসরে টেক্‌নিকাল শিক্ষার জন্য ৭৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয় এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রথমে আমরেলি তালুক

তাহার পর রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃত করা হয়। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকলকেই বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা হয়। ছাত্রগণের সুবিধার জন্য ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্য ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও আরও নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ক গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা হইয়া থাকে। একটি সুন্দর মিউজিয়েম নির্ম্মিত হইয়াছে. সেখানে ছাত্রেরা যাইয়া প্রাকৃতিক ইতিহাসের নানবিধ সংগৃহীত উপাদান দেখিয়া নানা বিষয় শিখিতে পারে। মোট স্কুল কলেজের সংখ্যা ৩১৯৯ এবং মোট ছাত্র সংখ্যা ২৪২০০০। উপরোক্ত স্কুল কলেজের মধ্যে এই ৬৪টী স্কুল কলেজে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ছাত্র সংখ্যা ১০৮০০। স্ত্রীলোকদিগের ট্রেনীং কলেজ ছাড়াও বরোদায় বালিকা-দিগের জন্য একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; আর্টস্ কলেজের প্রাঙ্গণে তিনটী হোষ্টেলের অট্টালিকা আছে এবং সমস্ত গবর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী স্কুলেরই হোষ্টেল আছে।

২৪৬৪টী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ব্যয় হয় প্রায় ১১ লক্ষ টাকা।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যুবক আসামীদিগের জন্য একটি সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদিগকে লিখন, পঠন, সূত্রধারের কার্য্য, কৃষিকার্য্য ও ক্ষেত্রের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। বৎসরে বরোদা রাজ-সরকার হইতে শিক্ষা ব্যাপারে কুড়ি লক্ষেরও উপর টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সাধারণ পাঠাগার

জনসাধারণের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৯১০—১১ সালে সাধারণ পাঠাগার সমূহ স্থাপিত হয়। দুই বৎসর যাবৎ সাধারণ পাঠাগার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন আমেরিকাবাসীকে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কার্য্যে নিয়োগ

করিয়া রাখা হইয়াছিল। সহরে ও গ্রামে—সর্ব্বত্রই সাধারণ পাঠাগার সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। ১৯১২ সালে আর এক রকম লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। এই লাইব্রেরীকে পর্য্যটক লাইব্রেরী বলে। এই লাইব্রেরীর লোক ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোকের প্রয়োজন মত পুস্তক দিয়া বেড়ায়। সহরের লাইব্রেরীতে অনেক রকমের বিস্তর পুস্তক আছে এবং তাহা একটি সুপ্রশস্ত অট্টালিকায় অবস্থিত। বরোদায় একটি মহিলা লাইব্রেরীও আছে। সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সংলগ্ন মহিলাদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাঠাগার আছে। তাহা ছাড়া সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সংলগ্ন বালক বালিকাদিগের জন্যও একটি স্বতন্ত্র পাঠ কক্ষ আছে। সেখানে প্রত্যহ ৭৫ জন বালক বালিকা গড়পড়তায় অধ্যয়ণ করে। বৎসরে প্রায় ২৫০ খানা সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর জন্য চাঁদা দিয়া লওয়া হয়। গড়পড়তায় প্রায় পাঁচ শতজন লোক প্রত্যহ পাঠাগারে অধ্যয়ন করে।

স্বায়ত্ব শাসন

রাজ্যে জরীপ কার্য্য আরম্ভ হইবার সময় হইতেই গ্রাম সমূহে প্রাচীন প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বায়ত্ব শাসন বজায় রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রামসমূহের একতা রাখা হইয়াছে, প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

১৯০৪ সালে মহামান্য গুইকুমার গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন এবং গ্রাম্য শাসনের ক্ষমতা তাহাদের উপর ন্যস্ত করেন। গ্রামের রাস্তা, কূপ, পুষ্করিণী, স্কুল, ধর্ম্মশালা এবং দেবস্থানের

তত্ত্বাবধান করার ভার পঞ্চায়েৎদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে। পঞ্চায়েতেরা গ্রাম্য মুন্সেফদিগের সহিত একত্রিত হইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা সমূহ নিষ্পত্তি করেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় তাঁহারা রোগক্লিষ্ট লোকদিগকে ঔষধ ও পথ্য দান করেন এবং ক্ষুধাকাতর লোকদিগকে অন্নপ্রদান করেন। কোন কোন পঞ্চায়েৎকে এক্ষণে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ বিচারের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে এবং তাঁহারা খুব সন্তোষের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন।

১৯০৪ সালে তালুক বোর্ড এবং জেলা বোর্ডসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, তড়াগ, পুষ্করিণী ও কূপখনন, ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা, দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য পর্য্যালোচনা, হাটবাজারের সুব্যবস্থা, সকলকে টীকা দেওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে সাহায্য প্রদান করাই জেলাবোর্ডের কার্য্য। স্থানীয় আয়ের সমস্ত টাকাই তালুক বোর্ড ও জেলাবোর্ডের কার্য্যে ব্যয় হয়। জেলা ও তালুক বোর্ডের বে-সরকারী সভাপতি করা হইতেছে। সমগ্র জেলাতে প্রায় ৩১ জন বিশিষ্ট পঞ্চায়েৎ আছেন। তাঁহারা সমস্ত ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সমূহ বিচার করেন এবং তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতেছেন।

প্রত্যেক সহরেই একটি করিয়া মিউনিসিপালিটী আছে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় মিউনিসিপালিটী স্বায়ত্ব শাসন লাভ করিয়াছে এবং সেই সমস্ত মিউসিপালিটীর ব্যয়ভার বহনের জন্য যথাসম্ভব আয়করের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

চিকিৎসা সম্বন্ধীয়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বরোদাতে একমাত্র রাজকীয় হাসপাতাল ভিন্ন অন্য কোনো চিকিৎসালয় ছিল না। কিন্তু দেশের অভাব অভিযোগ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, তালুক সমূহে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। মহারাজ যেই এই অভাব দেখিলেন, অমনি তিনি ডাক্তারখানা স্থাপনের জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ত্তমানে প্রত্যেক তালুকে একজন করিয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক আছেন এবং প্রত্যেক হাসপাতালে রোগীদিগের চিকিৎসা ও সেবা সুশ্রুষার সুব্যবস্থা আছে। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল একটি বিরাট অট্টালিকা শ্রেণীতে অবস্থিত, তন্মধ্যে রোগীদিগের চিকিৎসা ও সেবা সুশ্রুষার সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়া সহরের মধ্যে আরো দুইটি ডাক্তারখানা আছে। এই চিকিৎসা বিভাগের জন্য প্রতি বৎসর তিন লক্ষাধিক টাকা রাজকোষ হইতে ব্যয় হয়।

কৃষি বিভাগ।

কৃষি বিদ্যা সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য নানাস্থানে কৃষি-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। জমীতে কি প্রকার সার দিলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হইতে পারে এই সমিতি তাহা স্থির করিয়া থাকে। প্রত্যেক কেন্দ্রে দুইজন করিয়া কৃষি তত্ত্ববিদ্ পরিদর্শক থাকেন। তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান এবং প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট কৃষিকার্য্যের কি করিলে উন্নতি হয় সে বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। প্রত্যেক তালুকে এবং প্রত্যেক জেলাসমিতিতে অল্পাধিক পরিমাণে বীজ থাকে, তাহা প্রজাবর্গের মধ্যে

বিতরণ করা হয়। বরোদা মডেল ফার্মের সংলগ্ন একটি কৃষি বিদ্যালয় আছে। সেখানে কৃষকগণের পুত্রগণ শিক্ষালাভ করে। বরোদায় ছয়টী পশু চিকিৎসাগার আছে এবং মহারাজ প্রত্যেক বৎসর তিনটী করিয়া পশু চিকিৎসালয় স্থাপনের সম্মতি দিয়াছেন, অবশ্য সেই সেই স্থানের লোকাল বোর্ডকে ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ বহন করিতে হয়; কৃষকদিগের উপকারের জন্য রাজ্যের কৃষি তত্ত্ববিৎগণ সর্ব্বদাই কি কারণে শস্যের হানি হয় তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন, এবং প্রজাবর্গকে তত্ত্বৎ অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করেন।

শিল্প ও বাণিজ্য।

১৯০৭ সালে মহামান্য মহারাজাধিরাজ একজন আমেরিকাবাসী অর্থনীতিবিদের পরামর্শমত দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে একটি নূতন বিভাগ খুলিয়াছেন। ঐ বৎসরেই বরোদা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানা সমূহ রাজকোষ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাইয়া থাকে, শিল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি কারখানা ও শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্প সম্বন্ধীয় একটি পরামর্শ সভা গঠিত হইয়াছে। বরোদা রাজ্যে চারিটী কৃষি-ব্যাঙ্ক ও ৩২৫টি কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি আছে।

সাধারণ কার্য্য বিভাগ।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে যখন রাজা শিব মাধবরাও রাজ্যের শাসন-সংস্কার করিবার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সাধারণ কার্য্য করিবার যে পুরাতন প্রথা আছে সে প্রথা অতি মন্দ, এবং ঐ প্রথাকে একেবারে পরিবর্ত্তন করা উচিত। রাজা মাধবরাও

এই সাধারণ হিতকর বিভাগের (Public Works Department) নামটী মাত্র রাখিয়া আর সমস্তেরই আমূল পরিবর্ত্তন করিতে সংকল্প করিলেন। রাজা সাহেবের যেই সংকল্প সেই কাজ। তিনি অমনি এই বিভাগের নানা পরিবর্ত্তন সাধন করেন। এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সবিস্তার উল্লেখ অসম্ভব। কি রাজপ্রাসাদ, কি স্কুল-কলেজের অট্টালিকা, কি হাসপাতাল, কি বিশ্রামাগার এবং কি জল সরবরাহের ব্যবস্থা - যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই রাজা সাহেবের অসাধারণ কার্য্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাধারণ হিতকর বিভাগের জন্য প্রতি বৎসর রাজকোষ হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

রেলওয়ে।

সমগ্র রাজ্যের পরিধি ৮১০২ বর্গ-মাইল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে মাত্র ৬০ মাইল স্থান পর্য্যন্ত রেল-লাইন ছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে রাজ্যের প্রত্যেক তালুকে পর্য্যন্ত রেল-লাইন বিস্তৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বরোদা রাজ্যে ৫২৪টী ষ্টেট্ রেলওয়ে আছে এবং আজ পর্য্যন্ত এই রেললাইনের জন্য রাজকোষ হইতে ২,১,৮,৫৫৮৪৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১২০ মাইল ব্যাপী রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ধর্ম্ম বিভাগ।

মন্দিরাদি রক্ষা, সাধারণ দান, সংস্কৃত পাঠশালা প্রতিপালন, পুরোহিত শ্রেণীকে শিক্ষাদান এবং সাধারণতঃ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ হইতে সংস্কৃত মৌলিক

পাণ্ডুলিপি সমূহের পাঠোদ্ধার এবং প্রশ্ন উত্তর কার্য্য সম্পন্ন হয়। ধর্ম্ম-বিভাগ হইতে প্রচারকগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া গ্রামবাসিগণের নিকট সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করেন।

উপরে যে সমস্ত শাসন সংস্কারের কথা বলা হইল তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। বরোদা রাজ্যের পুলিশ অতি সুন্দর, সৈন্য দল সুগঠিত এবং আয় ব্যয়ের উপর বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। বরোদা রাজ্য ভারত-বর্ষের মধ্যে শাসন ব্যাপারে এবং প্রজাবর্গের সুখ ও সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য সাধনে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন—একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্বদা প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল সাধনের জন্য বরোদার মহামান্য গুইকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এজন্য তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের নিকট আদর্শ রাজারূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

মহীশূর রাজবংশ।

মহীশূরের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তাদের প্রাচীন ইতিহাস অবগত হওয়া যায় না। যদু রাম ওরফে বিজয় রায় এবং কৃষ্ণ রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দ্বারকা হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসেন। ইঁহারাই মহীশূর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। মহীশূর বংশের প্রকৃত পূর্ব্বপুরুষ যদুরায়। মহীশূরের পরবর্ত্তী রাজা ওয়াদিয়ার অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন। তিনিই সেরিঙ্গাপটমে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। সেরিঙ্গাপটমে প্রথমে বিজয়নগর রাজবংশের অংশ ছিল। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রভূত বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন এবং ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। পরবর্ত্তী রাজা চমরাজ কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর ইম্মাদি রাজা ওয়াদিয়ার সিংহাসনারোহণ করেন। তাহার পর কান্তিরব নরসা রাজা হন। তিনি তাঁহার সময়ের একজন অতি সাহসী সেনা পুরুষ ছিলেন। তিনিও রাজ্যের বহু বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ওয়াদিয়ার পরিবারের গৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পর দোদ্দা দেবরাজ সিংহাসনারোহণ করেন। দোদ্দা দেবরাজ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন ; এই সময়ে মহারাষ্ট্র রাজা শিবাজী উত্তর ভারতে রাজ্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ফরাসীরা দক্ষিণ ভারতে সূচ্যগ্র ভূমি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। তদনন্তর চিক দেবরাজ সিংহাসনারোহণ করেন এবং রাজ্যের শাসন সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি দক্ষিণ ভারতের কতিপয় বিদ্রোহীকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে অধীনস্থ জমিদার করিয়া রাখেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহীশূর রাজবংশ মোগলদিগের সহিত

মহিশূরাধিপতি

যোগদান করেন এবং মহারাষ্ট্রাদিগের রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিয়া প্রথমেই মহারাষ্ট্রাদিগের সহিত সংঘর্ষ বাধান। এই সাহায্যের জন্য মহীশূরের শাসন কর্ত্তাগণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে উপাধি ও আরও নানারূপ সুবিধা প্রাপ্ত হন। মোগল দরবার তাঁহাদিগকে মহীশূরের "রাজা" বলিয়া স্বীকার করেন।

সে যাহা হৌক মহীশূরের রাজপরিবারের শক্তি ও মর্য্যাদা চিক-দেব রাজের মৃত্যুর পর নষ্ট হয়। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রী নানজা রাজের সময়ে রাজবংশের মধ্যে পারিবারিক কলহ হেতু হায়দার আলি যশস্বী হইয়া উঠেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার মহীশূরের প্রতিনিধি শাসক হইয়া উঠেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য হায়দার আলির সহিত সন্ধি স্থাপিত করেন। হায়দার প্রথমে মহারাষ্ট্রা এবং তাহার পর নিজাম বাহাদুরের সঙ্গে সান্ধি স্থাপিত করেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই তিনটী শক্তির সহিত লড়াই করিতে হয়। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন, তাঁহার সৈন্যদল নষ্ট করেন। কিন্তু হায়দার ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রনষ্ট গৌরব ও খ্যাতি লাভ করেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার পরলোক গমন করেন, তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ও তেজস্বী ছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া ও নিজাম টিপুর বিরুদ্ধে উভয়ে একত্রে দণ্ডায়মান হইলে টিপু প্রভূত টাকা দিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত টিপু ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন. এ যুদ্ধে নিজাম ও মহারাষ্ট্রারা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে সেরিঙ্গপটমের যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধে অবরোধকারীদের জয় হয় এবং টিপুর মৃত্যু হয়।

এই কয়েক বৎসর ধরিয়া মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজার বংশধর অতি শোচনীয় অবস্থায় কাটাইতেছিলেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর। টিপুর মৃত্যুর পর ইংরেজেরা তাঁহাকে প্রতিপালন করেন এবং মহীশূরের গদীতে স্থাপন করেন। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ পূর্ণইয়া প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন এবং দশবৎসর সময়ের মধ্যে এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর শাসনগুণে মহীশূর পুনরায় সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। নূতন রাজা রাজ্য শাসনের সমস্ত প্রকার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তর হওয়ায় মন্ত্রীবর তাঁহার পদ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর মহীশূর রাজ্যে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হওয়ায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মহীশূর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি চামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার নামক একটি বালককে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই বালককে মহীশূরের সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই বালক সাবালকত্বে উপনীত হইলে রাজ্য শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পুত্র মহারাজা কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার পিতার মৃত্যুর সময়ে মাত্র একাদশবর্ষীয় বালক। কৃষ্ণরাজ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার মাতা রাজ প্রতিনিধির কার্য্য করেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় মহারাণী দেওয়ান স্যার কে সেসাদ্রি আয়ারের সহায়তায় অতি সুন্দররূপে রাজ্য পরিচালনা করেন।

মহারাজার বাল্যশিক্ষা কুপার হিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের মিঃ প-রাঘবেন্দ্র রাও ও জে-জে হোয়াইটলীর নিকট হয়। মহারাজা চাম্রিমরে ওয়াদিয়ারের মৃত্যুর পর মিঃ এস্ এম্ ফ্রেজার আই-সি-এস্

তাঁহার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। লর্ড কার্জ্জন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট মহীশূরের সিংহাসনে মহারাজকে অভিষিক্ত করেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন কাঠিবাড়ের রাজপুত রাজার কন্যা প্রতাপ কুমারী বাঈয়ের সহিত মহারাজার বিবাহ হয়।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী দরবারে মহারাজ বহুসংখ্যক পরিষদ লইয়া উপস্থিত হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি মহীশূর দরবারে যুবরাজ ও যুবরাজ পত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেশন দরবারে মহারাজ রাজপরিবারের সমস্ত লোকদিগকে ও বড়বড় কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তিনবৎসরের জন্য বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ঐ পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে মহারাজ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত হন।

মহারাজ প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা যাবত রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনার জন্য অতিবাহিত করেন। তিনি প্রত্যহ নানাবিধ পুস্তকাদিও অধ্যয়ন করেন। মহারাজ ঘোড়ায় চড়িতে, পোলো খেলিতে, র‍্যাকেট ও টেনিস খেলিতে বড়ই পটু। মহারাজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীত শাস্ত্রে বড়ই নিপুণ। মোটর চালাইতে মহারাজ বিশেষ দক্ষ।

১৯০৭ সালে মহারাজ জি-সি-এস্-আই উপাধি পান। ১৯১০ সালে মহারাজ রাজা জর্জ্জের ২৬শ সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের সম্মানিত কর্ণেল হন। তিনি ইংলণ্ডের "সেণ্টজন জেরু জেলাম" উপাধিধারী।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মহারাজ জি-বি ই উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজাই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার শাসন পরিষদে তিন জন সভ্য আছেন, রাজ্যের দেওয়ান এই তিনজন সভ্যের সহায়তায় রাজ্য শাসন করেন। মহারাজ রাজ্যমধ্যে কয়েকটি সংস্কার সাধন করিয়াছেন; যথা - কোন কোন স্থলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও টেক্নিকাল শিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহীশূর রাজ্যে—স্ত্রী শিক্ষা অতি সন্তোষজনক। প্রতিনিধি সভা দেওয়ানের সভাপতিত্বে একবার দশরা এবং অন্যবার মহারাজের জন্মোৎসবের সময় হয়। সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য সমন্বিত একটি ব্যবস্থাপক সভাও আছে।

মহীশূর ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বিস্তৃত রাজ্য। ইহার পরিধি ২৯৪৩৩ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা—৬০ লক্ষ। বৎসরে রাজস্ব আদায় হয় তিন ক্রোর টাকা। মহীশূরেই ভারতের সর্ব্ব-প্রধান সোনার খনি আছে, তাহার নাম কোলার স্বর্ণের খনি।

মহীশূর দরবার ২৭২২ জন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্রতিপালন করেন।

মহারাজ ২১টী তোপ পাইয়া থাকেন। মহারাজের ঠিকানা (১) দি প্যালেস্ মহীশূর (২) দি প্যালেস্ বাঙ্গালোর (৩) দি ফার্ণহিল, প্যালেস, ফার্ণহিল, নীলগিরি।

———

গণ্ডালের ঠাকুর বংশ

গণ্ডাল রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কুম্ভজীর (১) ২০টী গ্রাম লইয়া একটি ছোটখাট জমীদারী ছিল। কুম্ভজী (২) এই বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি নানাস্থান জয় করিয়া রাজ্যের অনেক বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড রিয়ে এই রাজ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, এই রাজ্য শাসন বিষয়ে ভারতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। মহারাজা শ্রীভগবৎসিংহজী যাদেজা রাজপুতবংশীয়। যে চন্দ্রবংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশ হইতে এই বংশ উৎপন্ন। এই রাজ্যের বর্ত্তমান ঠাকুর সাহেব কম্বোজী (১) হইতে দ্বাদশ বংশধর কুম্ভজী ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে রাজধানী গণ্ডালে স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমান ঠাকুর সাহেব ১৮৬৫ খৃঃ অব্দের ২৪শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র চারিবৎসর বয়সে পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। তাঁহার পিতা ১৮৬৯ খৃঃ ১৪ই ডিসেম্বর বোম্বাই সহরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেখানে তিনি বোম্বাই লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুর সাহেব ৯ বৎসর যাবৎ রাজকুমার কলেজে অধ্যয়ন করেন। ঠাকুর সাহেব ১৮৮৩খৃঃ অব্দে ইউরোপ গমন করেন এবং ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে প্রায় ৪ মাস কাল যাপন করেন। ইংলণ্ড ভ্রমণ করার পর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া The journal of a visit to England in 1883 এই নাম দিয়া একখানা মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করতঃ তিনি তাহাতে তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত সবিস্তারে লিখেন। ১৮৮৪ খৃঃঅব্দে

২৫শে আগষ্ট তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সভ্য মনোনীত হন। ১৮৮৬ খৃঃঅব্দে পুনরায় তিনি স্কটলণ্ডে গমন করেন এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল, এল, ডি, এই উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসবে তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাণী স্বহস্তে তাঁহাকে কে, সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৭ খৃঃঅঃ ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার রাজ্য প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্যরূপে পরিগণিত হয় এবং তিনি ১১টী তোপ লাভের অধিকারী হন।

১৮৯০ খৃঃঅব্দে রাণী সাহেবার পীড়া হয়, চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে ঠাকুর সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ইংলণ্ডে লইয়া যান। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ঠাকুর সাহেব এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় প্রবেশ করেন এবং এম, বি, সি, এম, পরীক্ষায় পাশ করেন ও এম, ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। এডিনবার্গ রয়েল কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ানের সভ্য পদে নিযুক্ত হইবার যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২খৃঃঅব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, সি, এল, উপাধি প্রদান করেন। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাণী সাহেবাকে Imperial order of the Crown of India. সভ্য পদে নিযুক্ত করেন।

গণ্ডালের প্রজাবর্গ ঠাকুরের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে ঠাকুর সাহেব ও রাণী সাহেবা আমেরিকা জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহলের পথে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। এডিনবার্গে রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কংগ্রেসে ঠাকুর সাহেবকে প্রতিনিধিপদে নির্ব্বাচিত করেন। বুডাপেষ্টে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়

আন্তর্জাতিক যে অষ্টম অধিবেশন হয়, ঠাকুর সাহেব সেই অধিবেশনের কার্য্যকরী কমিটীর অবৈতনিক সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি এডিনবার্গে রয়েল সোসাইটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃঅব্দে ঠাকুর সাহেব আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করেন। লণ্ডনের টাইমস্ পত্র সেই পুস্তকের প্রশংসাপ্রসঙ্গে বলেন India must have marched both fast and far during late year to produce feudatary ruler who could write such a book, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জর্নাল বলেন যে বইখানি Fxcellent, concise, correct, clear, and well-balanced.

১৮৯৭খৃঃ অব্দে ঠাকুর সাহেব মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক্ জুবিলিতে যোগদান করিবার জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করেন, এবং এই উপলক্ষে তিনি জি, সি, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ঠাকুর সাহেব নিয়মিতভাবে রাজকার্য্যে যোগদান করেন এবং যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। তাঁহার রাজ্যে খাস বৃটীশ রাজ্যের ন্যায় আদালত সমূহ আছে। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে ঠাকুর সাহেব নিজরাজ্যে একটী পরিবর্ত্তন সাধন করেন। পূর্ব্বে প্রজারা নগদ টাকা দিত না, ফসল প্রভৃতি দিয়া রাজস্ব পরিশোধ করিত, কিন্তু ঠাকুরসাহেব নিয়ম করেন যে প্রত্যেক প্রজাকেই নগদ টাকা রাজস্ব স্বরূপ দিতে হইবে। কূপ খনন করিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঠাকুরসাহেব সাধারণের জন্য ১৫০০০০০০৲ টাকা ব্যয়ে রেলরাস্তা, টেলিফো, রাস্তা, সেতু, চৌবাচ্চা প্রভৃতি নির্ম্মান করিয়াছেন। গণ্ডালরাজ্য হইতে বার্ষিক ৭৫৭০০০৲ টাকা ব্যয়ে ১০৮টী স্কুল প্রতিপালন করা হয়, ইহা ছাড়া হাঁসপাতাল ও ডাক্তারখানা প্রভৃতি ত

আছেই। তিনি ৫টী প্রধান সহরের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মঞ্জুর করিয়াছেন এবং শাসন বিষয়ে অনেক সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

লণ্ডনের Times পত্র ঠাকুর সাহেব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে সেই মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া জীবনী উপসংহার করিলাম :—

"If the British Government had one such a state to show as the result of its efforts to encourage good Government in the Feudatary state of India, its labours could not have been in vain."

সারমুর রাজবংশ

সারমুর রাজবংশ সূর্য্যবংশীয় রাজপুত জাতির বংশধর। রাজা মদনসিংহের সময় হইতে এই বংশের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। রাজা মদন সিংহ যখন সারমুর রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখন গিরি নদীতে বন্যা হইয়া সমস্ত সারমুর সহরবাসী এমন কি রাজা ও রাজপরিবারের সকলেই বন্যার জলে ডুবিয়া যান। টডের রাজস্থানে এই রাজাকে প্রথম শালি বাহনের বংশোদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শালি বাহন যশল্মীরের রাওয়াল ছিলেন। তিনি জাতিতে যদু চন্দ্র বংশীয় ছিলেন। বন্যায় রাজপ্রসাদ ও সহর-নগর সমস্ত ডুবিয়া যাওয়ায় সারমুরে কিছুদিন যাবত কোন রাজাই ছিল না। দ্বিতীয় শালিবাহন ঘটনাক্রমে বন্যা প্রপীড়নের পরে সারমুরের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। একজন চারণ যাইয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন যেন তিনি নিজে অথবা কোন রাজকুমার পাঠাইয়া দিয়া শূন্য গদী পূর্ণ করেন। রাওয়াল চারণের কথায় সম্মত হন এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে শূন্য গদীতে বসিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু পুত্রটী পথিমধ্যে সরন্দ নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। তিনি শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া না গিয়া সারমুরের দিকে গমন করিতে থাকেন। তিনি সারমুরের নিকট "পোকা" নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হয়। তখন সারমুরের অধিবাসিগণ সেই নবজাত কুমারকে তাহাদের ভবিষ্যত রাজা বলিয়া স্বীকার করে এবং যুবরাজ-পত্নী তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সেই দেশেই বাস করিতে স্বীকার

করেন। এই মৃত যুবরাজের বংশধরই বর্ত্তমান মহারাজ। ইঁহার পূর্ব্বে এইবংশে ৪৬ জন শাসনকর্ত্তা শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন; এরূপ ক্ষুদ্র সন্দর্ভে তাঁহাদের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবুও পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্য এস্থলে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে।

রাজা মালয় প্রকাশ একজন সাহসী ও অকুতোভয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ১২৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতা শুভ বংশ প্রকাশের পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সমস্ত জেলাসমূহকে আপন শাসনাধীনে আনয়ন করেন। রাজা মদন সিংহ ও তাঁহার পরিবারবর্গ বন্যায় ডুবিয়া গেলে যে সমস্ত জেলা অন্য হস্তে গিয়াছিল তিনি সেই সমস্ত জেলাকে আপন শাসনাধীনে আনেন। তাঁহার ন্যায় রাজা কোল প্রকাশ, সোমার প্রকাশ ও সূর্য্য প্রকাশও জমিদারীর অনেক বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রাজা জগত প্রকাশ অতি দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া কয়েকজন ঠাকুর ও করদ রাজা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, কিন্তু তাঁহার পুত্র বীর প্রকাশ খুব সবল ছিলেন বলিয়া ঠাকুরদিগকে বশীভূত এবং প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করেন। প্রায় ২৫০ আড়াই শত বৎসর যাবত সারমুর রাজবংশের দপ্তর খানা নানাস্থানে অবস্থিত ছিল, কিন্তু ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম করম প্রকাশ রাজদপ্তর নাহাম নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেইখানে এখনও রাজ দপ্তর প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা মান্ধাতা প্রকাশ বিশেষ নির্ভীক শাসক ছিলেন, মোগল সম্রাট সাজাহানের দরবারে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাট তাঁহাকে গারওয়ালের মধ্যে জোনপুর রাজ্য এবং সেরগ্রাম ও বেড়ালের দুর্গ অর্পণ করেন। তাঁহার পর

সুভগ প্রকাশ গদীতে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্যের শাসন ব্যাপারের অনেক সংস্কার সাধন করেন এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বুদ্ধ প্রকাশ মোগল সম্রাটের বিশেষ বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিলেন, মোগল দরবারেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র মৃত্ত প্রকাশ তদনন্তর গদীতে উপবেশন করেন। তাঁহার সময়ে ভগানীর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কেলোরের রাজার পরাজয় হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী বিখ্যাত শাসন কর্ত্তা কিরাত প্রকাশ একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন এবং একজন উদার রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সারমুর রাজ্য বহুল পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র জগৎপ্রকাশ উনিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোয়াদার কুহালা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া সন্ধি করেন। তাহার পর তাঁহার ভ্রাতা ধর্ম্ম প্রকাশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সিংহাসনারোহনের কিছু দিন পরেই তাঁহাকে নলগড়ের রাজা রাম সিংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। তাহার কিছুদিন পরে তিনি কেল্লুরের রাজা কর্ত্তৃক সংসার চাঁদের আক্রমণ দমন করিবার জন্য আহূত হন। সংসার চাঁদ যুদ্ধে ধৃত এবং নিহত হন।

তাঁহার বংশধর করম প্রকাশ একজন দুর্ব্বল রাজা ছিলেন। তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা কথর রতন সিংকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া সপরিবারে পলায়ন করেন এবং রতন সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা করম প্রকাশ সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য গুর্খাদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন।

গুর্খারা আসিয়া কণ্বর রতন সিংকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং রাজ্যের শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করে। কাজেই রাজা করম প্রকাশের অশেষ দুর্গতি হয়। ইত্যবসরে ভারত সরকার গুর্খাদিগকে তাড়াইবার জন্য ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিস্ অক্টরলনিকে প্রেরণ করিলেন। রাজা করম প্রকাশের রাণী তাঁহার নিকট রাজসিংহাসনের দাবী জানাইলেন। ইংরেজেরা জয়লাভ করিল এবং গুর্খারা পলায়ন করিল। ঐ বৎসরেই করম প্রকাশ ইচ্ছাপূর্ব্বক সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র ফতে প্রকাশ ভারত সরকার কর্ত্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শাসন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ্যের অর্থ নৈতিক সংস্কার সাধন করেন তিনি প্রথম আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেন এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শিকিম যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সমশের প্রকাশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পুলিস বিভাগ, দেওয়ানী ও রাজস্ব, আদালত, জেলা বোর্ড, জলবিভাগ, স্কুল, চিকিৎসালয় এবং ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাস্তাদি খনন করেন, জমি প্রভৃতি জরীপ করেন এবং কিয়ারদা নামক যে স্থান পূর্ব্বে জঙ্গলাবৃত ছিল তাহার চাষাবাদ করিয়া সেই স্থান মনুষ্যের বাসোপযোগী করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি সরকারকে যথোচিত সাহায্য করেন। লর্ড লিটন যে সময় ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাট তখন তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কে-সি-এস্ আই উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জি-সি-এস্ আই উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। ৪২ বৎসর যাবত তিনি রাজ্য শাসন করেন, এই দীর্ঘ ৪২ বৎসর তিনি রাজ্যের ও প্রজাবর্গের কল্যাণ কামনায় অনেক

কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সৌরীন্দ্র বিক্রম প্রকাশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা সৌরীন্দ্র বিক্রম অতি শিক্ষিত রাজা ছিলেন; তিনিও অতি রাজভক্ত ছিলেন। গুণ-গ্রাহী ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কে-সি-এস্ আই উপাধি প্রদান করেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র মহারাজা স্যার অমর প্রকাশ বাহাদুর কে-সি-এস্ আই, কে-সি-আই-ই সিংহাসনারোহণ করেন। মহারাজ স্যার অমর প্রকাশ বাহাদুরই সারমুর রাজ্যের বর্ত্তমান নৃপতি।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ কর্ণেল হিজ হাইনেস মহারাজা স্যার অমর প্রকাশ বাহাদুর কে-সি-এস্-আই, কে-সি-আই-ই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পিতা রাজা স্যার সৌরীন্দ্র বিক্রম প্রকাশ বাহাদুরের সিংহাসনে অধিরোহন করেন। মহারাজা ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদাই যত্নশীল। যুবরাজ অবস্থাতেই তিনি ফার্সী ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার সমূহে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মহারাজা বড় বড় ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহিত স্বচ্ছন্দে মিশেন। সিংহাসনে আরোহনাবধি তিনি অক্লান্তভাবে নিজে রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও গুরুতর কার্য্যসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছেন। সিংহাসনে আরোহন করিয়াই তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন। বহু টাকা ব্যয় করিয়া তিনি ছাত্রগণের জন্য একটি প্রকাণ্ড ছাত্রাবাস (Hostel) স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা

নাহান রাজধানীতে জলের কল স্থাপনের কল্পনা করিয়া গিয়াছিলেন, মহারাজা সেই কল্পনা বহু টাকা ব্যয়ে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও ব্রিটিশ সরকারের শাসন প্রণালীর অনুসরণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে সর্ব্বদাই যত্নশীল। কি করিলে প্রজার শ্রীবৃদ্ধি হয় তিনি সর্ব্বদাই তাহা চিন্তা করেন। প্রজারাও এজন্য তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। মহারাজের সুশাসন-গুণে সারমুরের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা অতি সন্তোষ ও শান্তিপ্রদ। ভারত গবর্ণমেণ্ট মহারাজের প্রজারঞ্জনগুণে পরিতুষ্ট হইয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কে-সি-এস্-আই উপাধি প্রদান করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেফ্‌টন্যাণ্ট্‌ কর্ণেল ও উত্তরাধিকারসূত্রে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। যুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ সরকারকে যে সাহায্য করেন সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ কে-সি-আই-ই উপাধি পান।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে মহারাজের সহিত নেপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মহারাজা সমশের জঙ্গ বাহাদুরের কন্যার সহিত শুভ বিবাহ হয়। চারি বৎসর পরে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মহারাজা এই কুমারের নাম রাজা রাজেন্দ্র সিং রাখিয়াছেন। মহারাণীও ইংরেজী শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে সম্রাজ্ঞী মেরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত ও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

রেওয়া রাজ্যের ইতিহাস।

বাঘেলখন্দ রাজ্যের নাম অত্রত্য শাসনকর্ত্তাদিগের বাঘেল এই নামানুসারে হইয়াছে। বাঘেলখন্দ ও রেওয়া নাম একই অর্থ বাচক। বাঘেলরা খোলাঙ্কি বংশীয় চালুক্যদের একটি শাখা। বন্ধোগড় বাঘেল-দিগের প্রাচীন রাজধানী।

রেওয়া রাজ্যের পরিধি প্রায় ১৩০০০ হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১৫১৩২৯৯। রেওয়া ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্য। ১৮১২ ও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত এই রাজ্যের শাসকগণের সন্ধি হয়। এই রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কোন রাজস্ব দেয় না, কিংবা এই রাজ্য হইতে মোগলশাসকগণও কোনও রাজস্ব পাইতেন না। এই রাজ্যের শাসনকর্ত্তার উপাধি "হিজ্ হাইনেস মহারাজা বাহাদুর"। মহারাজ উত্তরাধিকার সূত্রে সতেরটী তোপ পাইয়া থাকেন।

রেওয়া রাজ্যের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা অধিকারী মহারাজ গুলাব সিংজী বাহাদুর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে জন্মগ্রহন করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে লালন পালন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তাঁহার পিতা ১৯১৮ সালে অতি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৯০৮ সালে বর্ত্তমান মহারাজ ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি তাঁহার মাতৃভাষা হিন্দী, তাহার পর ইংরাজী ও শেষে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। মহারাজ সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। যাহাতে তিনি

তাঁহার রাজ্যের গুরু দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্যভার পরিচালনা করিতে পারেন, সেইজন্য এক্ষণে তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। মহারাজ প্রথমে একজন দেশীয় গৃহ শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১২ সালে একজন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হন, ১৯১৩ সালে আর একজন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক নিযুক্ত হন। মহারাজ ১৯১৬ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ইন্দোরের ডালি কলেজে অধ্যয়ন করেন। এক্ষণে তাঁহার একজন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী এবং দেশীয় শিক্ষক আছেন।

মহারাজের বয়স নিতান্ত কম হইলেও তিনি একজন উত্তম শিকারী। এই বয়সেই তিনি সতেরটী বাঘ শীকার করিয়াছেন। তিনি পোলো এবং অন্যান্য খেলাতেও সুনিপুণ। ১৯১৯ সালে মহারাজের সহিত যোধপুরাধিপতির ভগ্নীর শুভ বিবাহ হয়।

দেওয়াস রাজবংশ।

(ছোট তরফ)

দেওয়াস রাজ্য মধ্য ভারতে বড় তরফ ও ছোট তরফ বলিয়াই পরিচিত। এই দুই তরফে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা স্বতন্ত্রভাবে শাসন করেন। এই রাজ্যের রাজগণ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির ফলে দেওয়াস রাজ্যের ছোট তরফ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে ১৫২৩৭।৭ পাই কর প্রদান করেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্য সাহায্য করেন। এই রাজ্য ভারত সরকারকে অথবা অন্য কোন দেশীয় রাজ্যকে কর প্রদান করে না। এই রাজ্যের রাজা আপন রাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালনা করেন এবং বিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্মানস্বরূপে পনরটী তোপ পান।

দেওয়াসের বর্ত্তমান অধিপতি হিজ্ হাইনেস শ্রীর মলহার রাও বাবা সাহেব পাওয়ার কে-সি-এস্-আই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হিজ হাইনেস মহারাজা ইন্দোরের ডালি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি রাজ্য শাসনে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাওয়া অবধি শাসন বিষয়ে উদার ও উন্নতিদায়ক নীতি অবলম্বন করেন। একথা অকপটে বলা যাইতে পারে যে মহারাজাই দেশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রাজ্য শাসন ব্যাপারে প্রজাগণের সাহায্য যে দরকার তাহা উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্যে মহারাজ স্বরাজ্যে

গ্রাম্য পরিষদ, পরগণা পরিষদ, রাজসভা এবং আরও নানাবিধ দেওয়ানী ও শাসন ব্যাপারে প্রজাবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত পরিষদে প্রজাবর্গের প্রতিনিধি সমূহ থাকেন। মহারাজ সহরের মিউনিসিপালিটীরও হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। দেওয়াস রাজ্যে বহুদিন হইতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে। তিনি চিকিৎসা, কৃষি এবং শিল্প শিক্ষা প্রচারেও যথেষ্ট মনোযোগ প্রদর্শন করিতেছেন। ফৌজদারী মোকদ্দমাসমূহও বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত বিচার করা হইতেছে। যুদ্ধের সময় পাছে প্রজাবর্গের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় তিনি শস্য সমূহ রাজ্যের বাহিরে রপ্তানী হইতে দেন নাই। বিগত যুদ্ধের সময় মহারাজ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তিনি ১৩০০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার যুদ্ধ ঋণ দলিল (war-bonds) ক্রয় করিয়াছিলেন। আম্বুলেন্স সৈন্যদলে সৈন্যও তিনি পাঠাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ইম্পিরিয়াল রিলিফ ফণ্ড (Imperial Relief fund) ও অন্যান্য ফণ্ডে তিনি প্রভূত টাকা দান করিয়াছিলেন।

মহারাজা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কৈসর-ই-হিন্দ্ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কে সি-এস্-আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তরাধিকারীসূত্রে "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন।

মহারাজা শ্রীস্যার বীরমিত্রোদয় সিংহ দেও

ধর্ম্মনিধি, জ্ঞানগুণাকর, কে-সি-আই, ই-এম্-আর-এ-এস্

শোনপুর রাজবংশ।

মহারাজা শ্রী স্যার বীর মিত্রোদয় সিং দেব ধর্ম্মনিধি, জ্ঞানগুণাকর কে-সি-আই-ই, এম্-আর-এ-এস্ উড়িষ্যার শোনপুরের করদ রাজা। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা চৌহান রাজপুত বংশীয়, তাঁহারা ভারতে মোগল শাসনের প্রারম্ভে সম্বলপুর বিভাগের সমস্ত প্রদেশের উপর আপন আধিপত্য প্রকাশ করেন। মহারাজা স্যার বীর মিত্রোদয় যে চৌহান বংশীয় সেই বংশ ভারতের শেষ হিন্দু স্বাধীন রাজা পৃথ্বীরাজের বংশধর।

মহারাজা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ৮ই তারিখে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। মহারাজা প্রজাবর্গের উন্নতি বিধানের জন্য যে সমস্ত অশেষ কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন তাহার সবিস্তার উল্লেখ এতাদৃশ ক্ষুদ্র জীবনীতে সম্ভবপর নহে। মহারাজা সাহেব অনেক দাতব্য ঔষধালয়, রাস্তা, ঘাট, স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। মহারাজা শোনপুরে কিরূপ সুন্দর শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা Shonepur in the Shambalpur tract নামক গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত আছে, সেজন্য এ ক্ষেত্রে আর তাহার উল্লেখ করা গেল না। মহারাজার সুশাসন ও বিজ্ঞজনোচিত শাসনের উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের খুব বিশ্বাস আছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার মহারাজের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—

সিংহাসনারোহণ

It was thirty years ago that I first visited Shonepur, and ever since I have been on terms of friendship and

intimacy with your house. It has been a great pleasure to me to see the excellent example which you have set to all the chiefs of Orissa. You enjoy the character of a good ruler, shrewed, economical, just and reasonably progressive. Since your state was attached to Orissa in 1905 you have been under the government of Bengal, and I, as the head of the Government, to thank you not only for the generally good administration of your state, but also for the help you have given me in making arrangements connected with the reconstruction of Orissa." অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রথমে শোনপুর দর্শন করিয়াছিলাম এবং তদবধি আমি আপনাদের পরিবারের সহিত বন্ধুত্ব ও সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ। আপনি উড়িষ্যার দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যে মহৎ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমার বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আপনার রাজ্য উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, এবং তদবধি আপনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়াছেন, এবং আমি গবর্ণমেণ্টের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীরূপে আপনাকে কেবল যে সুশাসনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি তাহা নহে, পরন্তু উড়িষ্যার গঠন কার্য্যে আপনি আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন সে জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

১৯১৪ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহারাজা ভারত সরকারের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া বিনাসর্ত্তে সরকারের সাহায্য করিবেন এবং নিজের ধন দৌলত সমস্তই সরকারের নিকট অর্পণ করিবেন বলিয়া জ্ঞাপন করেন। যুদ্ধের সময় মহারাণী স্বয়ং সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাগণকে আহ্বান করিয়া আপন প্রাসাদে যুদ্ধের বিবরণ

বর্ণনা করিয়া অচিরাৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে জয়ী হইবেন তাহা প্রচার করিতেন।

মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসোনা ভূষণ সিং দেব ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি যুদ্ধের সময় দেশীয় সৈন্য সংগ্রহে মহারাজার যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! করাল কালের নিষ্ঠুর আহ্বানে তিনি তাঁহার পরিশ্রমের সুফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

মহারাজার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসুধাংশু শেখর সিং দেব এক্ষণে যুবরাজ। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসমাপ্ত কার্য্য গ্রহণ করিয়া ১৯১৯ সালে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুবরাজ কলেজে বেশ রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া এক্ষণে রাজ্যশাসন বিষয়ে পিতাকে সাহায্য করিতেছেন।

শোনপুরের মহারাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টও কিরূপ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহা বেহার ও উড়িষ্যার তদানীন্তন ছোটলাটের চিঠি খানি হইতে বুঝা যাইবে। চিঠি খানির সার মর্ম্ম এখানে দেওয়া হইল :—

On behalf of his Majesty the king Emperor and myself I thank you mast warmly for the staunch support and generous assistance rendered by the Sonpur state during the whole period of war. By liberal contributions amounting to Rs. 54735/-, to the Orissa Chief's Aeroplane fund, to the expenses of the war, and to the various funds for the relief of those who have suffered in it, by your gifts of machine guns, cloth and rice, by substantial investments amounting to

Rs. 553265 in the Indian war loans and by the valuable assistance rendered to Government in recruiting for the Indian labour corps, you have proved the depth of your loyalty and devotion to His Imperial Majesty the king and the British Empire, and have shared in the great struggle for justice and freedom in which India has so nobly borne her part.

Your sincere friend

Sd. E. A. GAIT.

Lieutenant Governor of Bihar & Orissa.

অর্থাৎ সম্রাট ও আমার নিজের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে গত যুদ্ধের সময় সহানুভূতি ও সাহচর্য্য প্রকাশ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনি ৫৪৭৩৬৲ টাকা উড়িষ্যার দেশীয় রাজাদের এরোপ্লেন ফণ্ডে দিয়াছেন এবং যুদ্ধে যাহারা কষ্টভোগ করিয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্যও নানা ফণ্ডে টাকা দিয়াছেন, আপনি মেসিন কামান দিয়াছেন, চাউল, কাপড়ও যুদ্ধ ঋণ ভাণ্ডারে ৫৫৩২৬৫, টাকা দিয়াছেন। তাহা ছাড়া সৈন্যসংগ্রহ ব্যাপারেও আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আপনি যে একজন অকপট রাজভক্ত তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

আপনার অকৃত্রিম বন্ধু

ই, এ, গেইট্।

বিহার ও উড়িষ্যার ছোটলাট।

শোনপুরের রাজবংশ সম্বলপুর ও উড়িষ্যা বিভাগের সমস্ত দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে এই রাজ্য যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল ইহা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শোনপুরাধিপতি আপন রাজ্যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার

করিতে পারেন। সম্বলপুর বিভাগে যে পাঁচজন দেশীয় রাজা আছেন, তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া সরকার দেখিতে পাইলেন অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দেশীয় রাজা পাঁচটী প্রজাবর্গের উপর সমস্ত ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া ভারত সরকার তাঁহাদের সেই অতীত ও প্রাচীন ক্ষমতা রাখিয়া দেন।

মহারাজার আগমনে ও বিদায়ে তোপধ্বনি হইয়া থাকে। এই তোপধ্বনি ও "মহারাজা" উপাধি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন এবং উত্তরাধিকার অনুসারে বংশপরম্পরাক্রমে তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। মহারাজা দেশের লোকের নিকট কিরূপ সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং দেশের লোক তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তির চোখে দেখে তাহা এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে পুরীর মুক্তি-মণ্ডপ সভার ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে "ধর্ম্মনিধি" এবং কলিকাতার ধর্ম্ম মহামণ্ডল সভা তাঁহাকে "জ্ঞান গুণাকর" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন।

গিধোড় রাজবংশ।

মহারাজা বাহাদুর স্যার রাবণেশ্বর প্রসাদ সিং ধর্ম্মসুধাকর কে-সি-আই-ই, এম্-এল্ সি।

বেহারের যত সম্ভ্রান্ত বংশ আছে, তন্মধ্যে গিধোড় চন্দ্রবংশীয় রাজবংশ অতি প্রাচীন বংশ। এই রাজবংশের রাজত্ব বঙ্গদেশ ও ছোট নাগপুরের মধ্যে অবস্থিত, এই রাজ্যের আয়তন ৪৫০ বর্গ মাইল। বর্ত্তমান সহরটি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান লাইনের উপর অবস্থিত। মহারাজ বাহাদুরের প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র সহরটি প্রতিষ্ঠিত। সহরের আট মাইল দূরে গিধোড় পর্ব্বতের পাদদেশে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। এই দুর্গ প্রাচীরের বিস্তৃতি এতদূর প্রশস্ত যে পাঁচটী অশ্ব পাশাপাশি ইহার উপর দিয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে এই দুর্গটী হিন্দুদের ছিল, পরে মুসলমানেরা হস্তগত করে।

গিধোড়েব বর্ত্তমান বংশ চন্দ্রবংশীয় রাজপুত। ইহারা চান্দ্রেল জাতীয় রাজপুত। চান্দ্রেলীরা যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বুন্দেলখণ্ডের অধীন মহোবা নামক স্থানে ছিল। পৃথ্বীরাজ চৌহান তাঁহাদিগকে বুন্দেলখণ্ড হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন চান্দ্রেল নায়কগণ প্রত্যেকে এক এক দল অনুচর লইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া মধ্য প্রদেশের আগোরি, বারহার, বিজয়গড় ও বুন্দী নামক স্থানে অধিকার স্থাপন করেন। বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বীর বিক্রম সিং অতি বিক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন। পরগণে গিধোড়, রোহিণী, বিঠাউর, চান্দন ভুকা এবং বিস্তহাজারি এই কয়েকটি পরগণা ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরী তাঁহাকে দিয়াছিলেন। নয় শতাব্দী পূর্ব্বে বীর বিক্রম সিং বেহারে

মহারাজা স্যার রাবণেশ্বর প্রসাদ সিংহ বাহাদুর

কে, সি, আই, ই।

যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, আজ সেই রাজ্য বেহারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজপুত রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত।

এই বংশের আদি নিবাস পর্ব্বতের পাদদেশে ঘন অরণ্যে আবৃত ছিল, কালক্রমে সেই নিবাসভূমি ক্রমে ক্রমে উর্ব্বরা দেশে বিস্তৃত হয়। বিহারের যে তিনটি প্রধান রাজবংশের নাম মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে খড়্গপুর ও হাজিপুর রাজ্য এখন বিলুপ্ত হইয়াছে—কেবলমাত্র গিধোড় এখন বিরাজমান রহিয়াছে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে গিধোড়ের রাজপুতগণ পূর্ব্বে মোগল বাদশাহকে প্রয়োজন হইলেই ২৫৯টী অশ্ব ও ১০০০০ পদাতিক সৈন্য যোগাইতেন। এই বংশের অষ্টম বংশধর রাজা পুরণমল বেহারের অতি শক্তিশালী রাজা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রসিদ্ধ বৈদ্যনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির গাত্রে এখনও খোদিত আছে যে ১৫১৭ শকে পুরণমল নৃপতি কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্ব পুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান মহারাজা দেবী রাজরাজেশ্বরীর নামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখনও দেওঘরের অনেক পুরোহিত ও অন্যান্য আরও মন্দিরের সেবাইতগণ তাঁহার দান উপস্বত্ব উপভোগ করিতেছেন। বর্ত্তমান মহারাজার পূর্ব্ব পুরুষগণ রাস্তার জন্য, রেলওয়ের জন্য ও ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য প্রভূত অর্থ ও জমি দান করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মহারাজাও সে বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শ সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

এই বংশের চতুর্দ্দশ রাজা দলন সিং মুসলমান বাদশাহগণের নিকট উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ শাজাহান তাঁহাকে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। এখনও রাজপরিবারে যুবরাজ দারার স্বহস্তে লিখিত ফার্ম্মাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পাঁচ পুরুষের পরে আমরা দেখিতে পাই যে গিধোড়ের রাজগণ ব্রিটিশ রাজশক্তির

বিশেষ প্রিয় ও অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা অমর সিং যখন নাবালক ছিলেন, তখন ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আপন রাজত্বের অনেক অংশ হারাইয়াছিলেন, এমন কি দেওঘরের মন্দির পর্যান্ত বীরভূমের মুসলমান রাজাদের হস্তগত হয়। ইংরেজরাজ রাজা অমর সিংহের নাবালকত্বকালে তাঁহার জমিদারী স্থানে স্থানে অন্যায়পূর্ব্বক অধিকার করিলেও ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি এই বংশের ভক্তি একটুও শিথিল হয় নাই। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজবংশ জঙ্গল তেরাই বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে ইংরাজ রাজশক্তি বদ্ধমূল হইয়া পড়িলে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নবম বংশধর রাজা গোপাল সিংকে ব্রিটিশ সরকার সামন্ত নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহাদিগকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই জানুয়ারী স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে এই উপাধি দেন। রাজা গোপাল সিংয়ের পৌত্র জয়মঙ্গল সিং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করায় ব্রিটিশরাজ জয়মঙ্গল সিংকে "মহারাজা" ও "কে-সি এস-আই" উপাধি প্রদান করেন। শুধু তাহাই নহে, স্যর জয়মঙ্গল সিং একটি বিস্তৃত জায়গীরও লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজবংশ উত্তরাধিকার সূত্রে মহারাজা বাহাদুর উপাধি ব্যবহার করিবার অধিকার লাভ করেন। মহারাজা স্যার জয়মঙ্গল সিংয়ের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজা শিবপ্রসাদ সিং বাহাদুর সিংহাসনারোহণ করেন।

এই রাজবংশের বর্ত্তমান অধীশ্বর মহারাজা স্যার রাবণেশ্বর প্রসাদ সিং বাহাদুরের একটি পুত্র ও একটি পৌত্র হইয়াছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান মহারাজের জন্ম হয়। পিতামহের নিকট লালিত, পালিত বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হওয়ায় বর্ত্তমান মহারাজা প্রজাবর্গের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এবং রাজত্বের কার্য্যাবলী পরিচালনা করিতেও বিশেষ

দক্ষ ও সুনিপুণ। রাজ্যের অতি সামান্য ঘটনাটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত হয় না, সরকারের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু, পারিবারিক জীবনে তিনি একজন আদর্শ পুরুষ। পিতৃ পিতামহের ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে তিনি বিন্দুমাত্র স্খলিতপদ হন নাই। হিন্দুর প্রত্যেক আচার অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় বিধিমতে তিনি করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে উচ্চ বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় আছে, আবার আদিম নিবাসী সাঁওতালও আছে। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান প্রজাও তাঁহার বহু আছে; এই সমস্ত নানা জাতীয় প্রজাকে শাসনে রাখা কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজারই তাঁহার ন্যায় বিচারে ও সহৃদয়তায় দৃঢ় বিশ্বাস আছে। মহারাজের বর্ত্তমান বয়স ৬১ ষাইট বৎসর হইলেও তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারেন সেরূপ অনেক যুবকেও পারে কি না সন্দেহ। হিন্দু ধর্ম্ম ও শাস্ত্রীয় যত প্রকারের পুস্তক আছে তাহা তিনি আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। উদ্যান রচনাতেও মহারাজের আগ্রহ নিতান্ত কম নহে। এতদ্ব্যতীত মহারাজ একজন বহু ভাষাবিৎ সুপণ্ডিত। সংস্কৃত, উর্দ্দু, ফার্সী, হিন্দী, বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই কয়েকটী ভাষাতেও মহারাজের গভীর জ্ঞান আছে, বেদান্ত শাস্ত্রেও মহারাজ সুপণ্ডিত। রাজনীতি শাস্ত্রে তাঁহার এরূপ সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি আছে যে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে অনেক পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে তিনি দক্ষতার সহিত স্বকীয় রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট কে-সি-আই-ই উপাধি প্রদান করেন। ১৯০২ সালে লণ্ডনে যে রাজ্যাভিষেক উৎসব হয় সেই উৎসবে তিনিই শুধু সমগ্র প্রেসিডেন্সী হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান মহারাজ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

তদবধি তিনি যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত নিরপেক্ষভাবে আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া আসিতেছেন তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। জামুই লোকাল বোর্ড ও মুঙ্গের জেলা বোর্ডের তিনি সভ্যরূপে অনেক সাধারণ হিতকর কাজ করিয়াছিলেন, তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, আর নিজের জমিদারীর কার্য্য পরিচালনায় তিনি যে কিরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষদর্শীরাই দেখিতে পাইতেছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিণ তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং গিধোড়ে যাইয়া মহারাজ ও রাজবংশীয় অন্যান্য সর্দ্দারদিগের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। লর্ড এলগিন, লর্ড কার্জ্জন, লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড মিণ্টো সকলেই এক একবার যাইয়া মহারাজার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইয়াছেন। ১৯০৭ সালে লর্ড মিণ্টোর গিধোড় পরিদর্শনের স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য মহারাজ "মিণ্টো টাওয়ার" নামে যে উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাহা আজিও লর্ড মিণ্টোর স্মৃতি প্রকাশ করিতেছে। বর্ত্তমান মহারাজ এক্ষণে পুত্রের উপর জমিদারী পরিচালনার সমস্ত ভার দিয়া একটু নির্জ্জন ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। তেত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের প্রতিনিধিরূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছেন। ক্রমাগতঃ ৩৫ বৎসর কাল মহারাজা রাজ্যের কল্যাণের জন্য ও জনসাধারণের উপকারার্থে শ্রম ও যত্ন করিয়া আসিয়াছেন। নিজ রাজ্য মধ্যে তিনি শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক সংস্কার করিয়াছেন। রাজপুত মহাসভার সভাপতিত্ব কালে তিনি ক্ষত্রিয় জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তীব্র বক্তৃতা করিয়া প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রাদেশিক রাজপুত সভার তিনি স্থায়ী সভাপতি।

কাশীধামস্থ ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের তিনি সভাপতি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের তিনি একজন পুরাতন সদস্য এবং বিহার জমিদার সভার তিনি আজীবন সহকারী সভাপতি। এই সভায় সহকারী সভাপতিরূপে তিনি বেঙ্গল টেনান্সি এক্টের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা পাঠে দেখা যায় যে তিনি প্রজাদিগের স্বত্ব নির্দ্ধারণে কিরূপ যত্নশীল ও আগ্রহ-পরায়ণ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তখন দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট প্রজাবর্গের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তিনি যেরূপ অকাতরে অর্থদান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রজা হিতৈষণা গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, প্রজাবর্গ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি জল সরবরাহের জন্য পয়ঃপ্রণালী ও খনন করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্য করের তিনি ২৫ হাজার টাকা রেহাই দিয়াছিলেন এবং ভারতীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডারে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন।

বিগত যুদ্ধের সময় মহারাজ স্বয়ং নানাস্থানে যাইয়া সভা করিয়া প্রজাবর্গকে যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পাটনায় যে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল তিনি সেই কন্‌ফারেন্সের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং যুদ্ধ ঋণ সম্বন্ধীয় যত কিছু ঋণ পত্র প্রচারিত হইয়াছিল তিনি তৎসমস্তই অল্পবিস্তর ক্রয় করিয়াছিলেন। ফ্লাণ্ডার্স যুদ্ধে যখন মিত্রশক্তির সৈন্যপুঞ্জ যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন তিনি একখানি মোটর আম্বুলেনস্ ও সৈন্যদিগকে সিসিরিণ পাঠাইয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর যুদ্ধের সময় নিম্নলিখিত দানগুলি করিয়াছিলেন।

(১) প্রজাবর্গের মধ্যে যাহারা সৈন্য হইয়াছিল তাহাদিগকে বোনাস দিয়াছিলেন।

(২) অধ্যাপক সমাদ্দারকে ম্যাজিক লণ্ঠনের বক্তৃতা দিবার জন্য ব্যয়ভার দিয়াছিলেন।

(৩) মোটর আম্বুলেন্স্:—ঘোড়া কিনিতে ২০০০৲ হাজার, গ্রিসিরণ কিনিতে ১২৬৲, আরও অনেক দাতব্য অনুষ্ঠানে ১০৩৫০৲, যুদ্ধঋণ পত্র ক্রয় ৮৩০০০৲।

যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন বাৎসরিক হারে মহারাজ ব্রিটিশ সরকারকে সঙ্গতি অনুযায়ী যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দিতে হয় নাই। স্থানীয় সংস্কৃত পাঠশালায় বিনাবেতনে আহার বাসস্থান দিয়া শিক্ষার্থীদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয়, মহারাজই সে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর চিকিৎসা ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শীতার জন্য বেহারী ছাত্রকে যে ফ্রেজার বৃত্তি দেওয়া হয় মহারাজা বাহাদুরই সেই মূল্যবান্ বৃত্তির প্রবর্ত্তক। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভার স্থায়িত্বকল্পে তিনি যথেষ্ট অর্থানুকূল্য করিয়া থাকেন।

মহারাজা বাহাদুর অকৃত্রিম হিন্দু; যাহা বলেন কার্য্যতঃ তাহা করেন। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" এই কথাটি মহারাজের চরিত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে। মহারাজ পূর্ব্বে একজন অসমসাহসিক শীকার প্রিয় ছিলেন, এখনও তাঁহার মত নির্ভয়ে অনেকে ঘোড়ায় উঠিতে পারেন না। তাঁহার সুন্দর মনোরম অতিথি শালা অন্যান্য বাড়ী এবং কেল্লার মধ্যে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, রৌপ্য জুবিলি, ধর্ম্মশালা, ঠাকুর বাড়ী, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি মহারাজের গঠন শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। দরিদ্রের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে, অতিথিকে সযত্নে আতিথ্য-সৎকার করিতে, সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে এবং সম্রাটের বিপদকালে বুক দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে মহারাজা বাহাদুরের ন্যায় অল্প

গিধোড়ের মহারাজ কুমার বাহাদুর

ক্ষমাধিকারী পারেন। এই সকল গুণাবলীর সমাদরার্থে ও আতিথ্য স্মরণে যখন বিহার স্বতন্ত্র প্রদেশ সংগঠিত হয় তখন আতিথ্যকল্পে লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় বাঁকীপুর প্রাসাদে একবার শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া স্যার জন উড্‌বরণ, স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার, স্যার চার্লস্ বেলী প্রমুখ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ সকলেই গিধোড় যাইয়া মহারাজের আতিথ্য সৎকারে বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজের সদ্‌গুণে সকল প্রদেশের লোক আপামর সাধারণে মুগ্ধ।

লালগোলা-রাজবংশ।

বংশ তালিকা।
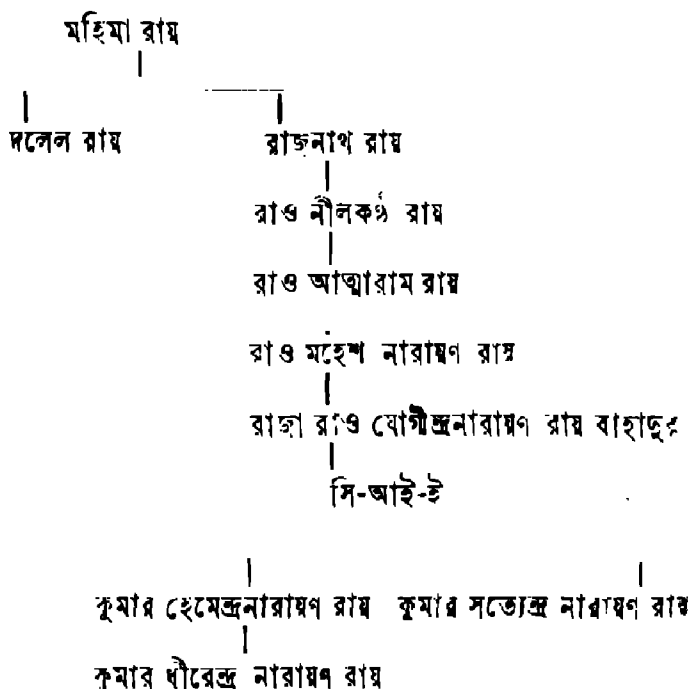
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাজিপুর জেলার পালিগ্রামে কৌষিকবংশীয় ভূমিহারদিগের বাস। ইহাদের মধ্যে এখনও প্রাচীন আর্য্য উপনিবেশের পৈত্র শাসন প্রথা (patriarchal form of Government) প্রচলিত আছে। প্রত্যেক গ্রামে একজন দলপতি এবং সমুদায় দলপতির উপরে একজন সর্ব্ব মণ্ডলেশ্বর। সর্ব্ব মণ্ডলেশ্বর সমাজপতি। এই সর্ব্বমণ্ডলেশ্বর বংশে লালগোলা রাজবংশের আদিপুরুষ মহিমা রায়ের উৎপত্তি। মহিমা রায় গাজিপুর ত্যাগ করিয়া রাজসাহি জেলার সুন্দরপুর গ্রামে বাস করেন;

রাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি-আই-ই

মহিমা রায়ের মৃত্যুর পর সুন্দরপুর খরস্রোতা পদ্মাগর্ভে বিধৌত হইলে তাঁহার দুই পুত্র দলেল রায় ও রাজনাথ রায় মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় আসেন। লালগোলা তখন নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। উভয় ভ্রাতার এখানে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা ইহার "শ্রীমন্তপুর" আখ্যা দেন। বাঙ্গালাদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের সহিত দলেল রায়ের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সূচিত হয়। নবাব সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলীবর্দ্দী খাঁকে বাংলার মসনদ প্রদানের যে ঘৃণিত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়।

আলিবর্দ্দী আজিমাবাদ হইতে সুতি উপস্থিত হইলে, নবাব সরফরাজ খাঁ দেওয়ান সরাইয়ে শিবির স্থাপন করেন। দলের রায় বহু উপঢৌকন লইয়া নবাব শিবিরে উপস্থিত হন। নবাব তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্‌পটুতা প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জিলাদারী কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তিনি জিলাদারী কার্য্যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কতক সম্পত্তি খরিদ করেন এবং কাশিধামে ত্রিপুর ভৈরব ঘাটে ২৭টী শিব স্থাপন করেন। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নীলকণ্ঠ রায় তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। নীলকণ্ঠের সহিত সুবেদার রাও অরুণ সিংহের কন্যার বিবাহ হয়। অরুণ সিংহের মৃত্যুর পর নীলকণ্ঠ রায় সুবেদারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। নীলকণ্ঠ রায় নবাব দরবারে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া বংশ পরম্পরা "রাও" উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাও নীলকণ্ঠের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাও আত্মারামরায় কিছুদিন সুবেদারী কার্য্য করিয়াছিলেন, অকালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র রাও রামশঙ্কর রায় তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তিনিই লালগোলা রাজবংশের খ্যাতি, প্রতিপত্তির ও উন্নতির মূলীভূত কারণ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন সুবেদারি কার্য্য করিয়াছিলেন।

নবাব হুমায়ুন খাঁ তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। উত্তর জীবনে রাও রামশঙ্কর রায় বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। লালগোলার উত্তরাংশে প্রবাহিত পদ্মানদীর শাখা করতোয়া কলকলীর কিয়দংশের পঙ্কোদ্ধার করিয়া তিনি দুইটী পাকাঘাট প্রস্তুত করিয়া দেন। লালগোলার মধ্যাংশে দুইটী বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহারও ঘাট বাঁধাইয়া দেন। ইহার দ্বারা লোকের যে কি উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আতিথেয়তা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ দেবের মন্দির সংলগ্ন একটী অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি মহাল একত্র করিয়া তাঁহার ও পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ, কালী, শিব, দধিবামন প্রভৃতি দেবতার নিয়মিতভাবে পূজাভোগ নির্ব্বাহের জন্য দেবোত্তর মহাল স্থজন করেন। তাঁহার সময়ে লালগোলার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল। রাও রামশঙ্কর রায়ের পুত্র রাও মহেশ নারায়ণ রায় সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় কতিপয় বলিষ্ঠ সিপাহী দিয়া জঙ্গীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যাস্লি ইডেনকে (পরে স্যর) বিদ্রোহ নিবারণের জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভগবানপুর কুঠির ইংরাজ ম্যানেজারের সহিত মহেশ নারায়ণ রায়ের বিরোধ হওয়ায় তিনি গোপনে গবর্ণমেণ্টকে লেখেন যে মহেশনারায়ণ রায় গোপনে বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিতেছেন ও কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহী তাঁহার আশ্রয়ে লুক্কায়িত আছে। এই ঘটনার তদন্ত জন্য অনৈক ইংরাজ কাপ্তেন সাত শত সশস্ত্র সৈন্য সহ লালগোলায় উপস্থিত হন। মহেশ নারায়ণ রায় নির্ভীক চিত্তে স্বীয় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। কাপ্তেন তাঁহার চরিত্রের দাঢ্য, প্রশান্ত সরল ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দেন যে মহেশ নারায়ণ রায় রাজভক্ত ও শান্তিপ্রিয়। যৌবনের প্রারম্ভে মহেশনারায়ণ রায় ইহলোক

ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বণিতা রাণী শ্যামাসুন্দরী যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই এক্ষণে লালগোলা জমিদার বংশের রাজা। শৈশবে ও কৈশোরে তাদৃশ বিদ্যাশিক্ষা না হইলেও যোগীন্দ্র নারায়ণ উত্তর জীবনে নিজের বুদ্ধি বলে ও অধ্যবসায় গুণে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। তাঁহার কর্ম্ম বহুল জীবনের একটি দিনও বিদ্যালোচনা ব্যতিরেকে ব্যয় হয় না। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে নানা বিপদে জড়িত হইয়াও তিনি তাঁহার স্বভাব সুলভ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য গুণে যশস্বী ও স্বীয় জমীদারীর মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। নিরহঙ্কার, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা ও আড়ম্বর-শূন্যতা তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার। তাঁহার ন্যায় নিরলস ব্যক্তি খুব কমই লক্ষিত হয়। ১৮৭৭ খৃঃ বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল অকপট রাজভক্তি, দরিদ্রগণের সেবা ও দক্ষতার সহিত জমিদারী কার্য্য পরিচালনার জন্য তাঁহাকে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ১৮৯৭ খৃঃ হীরক জুবিলী উপলক্ষে সরকার তাঁহাকে আর একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অসাধারণ দানের জন্য তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩১০ সালে তাঁহাকে খিলাৎ দিবার জন্য বহরমপুরে যে দরবার হয় তাহাতে বক্তৃতা কালে ছোটলাট বোর্ডিলন সাহেব যথার্থই বলিয়াছিলেন "বাংলার সামাজিক কালের ইতিহাসে গত ১৫।১৬ বৎসর হইতে আমি রাও যোগীন্দ্র নারায়ণের নাম বিজড়িত দেখিতেছি, তাঁহার দান সকল লোকের পক্ষে অনুকরণীয়।" ১৯০৯ খৃঃ সদাশয় গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দান করেন। তাঁহার সমুদায় সদ্‌গুণ ও দানের কথা উল্লেখ করিতে হইলে একখানি বৃহদায়তন পুস্তক হইয়া পড়ে। তাঁহার দানের স্তর প্রধানতঃ তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, ১ম।

শিক্ষা। ২য়। স্বাস্থ্য। ৩য়। ধর্ম্ম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে তিনি যেরূপ অসাধারণ দান করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অনন্যসাধারণ। মোটামুটি এখানে কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রাজা বাহাদুরের কীর্ত্তি স্তম্ভ। এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা অবধি ইহার স্থায়ীত্ব, উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য তিনি কতভাবে যে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দশ হাজার টাকা ব্যয়ে তিনি পরিষদের দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার ও প্রচারের জন্য তিনি প্রতিবৎসর বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। সাহনামা নামক প্রাচীন গ্রন্থ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঠাগার পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে ক্রয় করিয়া তাহার সমুদয় স্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন। পরিষদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে তিনি অনেকগুলি প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি ও কয়েক সহস্র টাকা ব্যয়ে প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দান করিয়াছেন। সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি বহুবাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহার ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক দুঃস্থ মনস্বী কবির গ্রন্থ তাঁহার ব্যয়ে বাহির হইতেছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক।

জঙ্গীপুর হাইস্কুলের ছাত্রাবাস (Boarding House) তাঁহার প্রদত্ত সাত হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। বহরমপুরের গ্রাণ্ডহল (Grand Hall and Edward recreation club) বিশ হাজার ও লালবাগে তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর নামে শ্যামাসুন্দরী বার লাইব্রেরি ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে।

লালগোলা বালিকা বিদ্যালয়, জুনিয়র মাদ্রাসা ভগবানগোলা বালিকা বিদ্যালয় ও মাইনর স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত তিনি অনেক জমি নিষ্কর রূপে দান করিয়াছেন।

পিতৃদেব রাও মহেশনারায়ণ রায়ের স্মৃতি চির স্মরণীয় রাখিবার

জন্য তিনি লালগোলায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে "মহেশনারায়ণ একাডেমি" স্কুল গৃহ ও তৎ সংলগ্ন মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া স্কুল পরিচালনের নিমিত্ত কমিটীর হস্তে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তা' ছাড়া ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রাবাসে মাসিক দুই শত টাকা হিসাবে দান করিতেছেন। এম এন একাডেমির নিকট আট হাজার টাকা ব্যয়ে সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া একটী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সাধারণ পাঠাগারে (Public Library) প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার গ্রন্থ আছে। তাহার পরিচালনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্কুল ও লাইব্রেরীর টাকা Charitable Endowment Fund সাধারণ দাতব্য ফণ্ডে জমা থাকিয়া তাহার সুদ হইতে স্কুল লাইব্রেরী চলিবে। স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে তাঁহার দান বড় কম নয়। বহরমপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় প্রধানতঃ রাজা যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায়ের ব্যয়েই পরিপুষ্ট। এ বাবৎ তিনি উহার বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসার গৃহ নির্ম্মাণ, রোগীর খরচ, যন্ত্রাদি ক্রয়, চিকিৎসিত হইবার জন্য দুঃস্থ ভদ্র ব্যক্তির অবস্থান গৃহ (Cottage ward) নির্ম্মাণ প্রভৃতিতে প্রায় ৫।০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—চক্ষু চিকিৎসার জন্য একলক্ষ, স্ত্রী-হাসপাতালের জন্য একলক্ষ, বাহিরের রোগীদিগের ঔষধ দিবার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্দ্ধ লক্ষ, সাধারণ বিভাগে এক লক্ষ ইত্যাদি। লালগোলায় তাঁহার নির্ম্মিত গৃহে তাঁহারই ব্যয়ে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় (out door dispensary) চলিতেছে। পাবনা ডিসপেনসারির জন্য কতক ভূমি ও ভগবান গোলার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রস্তুতের জন্য জমি ও এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার জল কষ্ট নিবারণ ও সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহের জন্য তিনি

গবর্ণমেণ্ট হস্তে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাহার সুদ হইতে প্রতি বৎসর ৪টী ইন্দারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া তিনি নিজ ব্যয়ে লালগোলা ও মুর্শিদাবাদের অন্যান্য স্থানে কত যে ইন্দারা ও পুষ্করিণী খনন ও পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রেরাও তাঁহার দত্ত জলপানে বঞ্চিত হয় নাই।

মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানের জীর্ণ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারে ও জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত তিনি স্বীয় পরলোকগতা পত্নীর নামে গবর্ণমেণ্ট হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

রাজা বাহাদুর নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার ন্যায় কঠোর সংযমশীল ব্যক্তি খুব অল্পই দেখা যায়। বৎসরের কয়েক মাস তিনি ব্রত উপবাসে কাটাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্ম নিষ্ঠার জন্য ৺কাশীধামের ধর্ম্মমণ্ডলী তাঁহাকে "বঙ্গরত্ন" উপাধি দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অনাসক্ত, ত্যাগী পুরুষ প্রায়ই দেখা যায় না। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও সাম্প্রদায়িকতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সকল ধর্ম্মেই তিনি উদারতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। লালগোলায় তিনি অনেকগুলি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবা পূজার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি সৃজন করিয়া দিয়াছেন।

তিনি বিভিন্ন স্থানে বহু দেব দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ ও জীর্ণ মন্দির নিজ ব্যয়ে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান— কৃষ্ণপুরে ৺তারা মন্দির (ব্যয় ১৬০০০ টাকা) বিষ্ণুপুরে ৺কালিমন্দির (ব্যয় ১০ হাজার) গদাইপুরে ৺কালিমন্দির (ব্যয় ২ হাজার) কাটোয়ায় বহুলাক্ষি মন্দির (ব্যয় ১ হাজার) ব্যাসপুরে শিবমন্দির, বালুচরে ভগবতী মন্দির, মাডায় শিবমন্দির ইত্যাদি।

বহরমপুর ও লালবাগে মৃতের সৎকারের সুবিধার জন্য তিনি ২টী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

জঙ্গীপুরের ম্যাকেঞ্জী পার্ক ও মহেশনারায়ণ সরাই, কান্দিতে রামেন্দ্র পান্থশালা তাঁহার পুণ্য স্মৃতি রক্ষা ও লোক হিতৈষণার উজ্জল কীর্ত্তি।

সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি কয়েকটী বৃহৎ রাস্তাও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

রাজা বাহাদুর নীরব কর্ম্মী। তিনি কোনরূপ হৈ চৈ না করিয়া স্বগৃহে একটী টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে বিনাব্যয়ে কৃষক বালকেরা চরকায় সুতা কাটা, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছে। রাজা বাহাদুর স্বয়ং সেই মোটা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১৯১৩ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "কৈশর-ই-হিন্দ্" সুবর্ণ পদক প্রদান করেন। সম্প্রতি তিনি সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র। কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় ও কুমার সত্যেন্দ্র-নারায়ণ রায়। কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্র-নারায়ণ রায় অতি অল্প বয়সেই সাহসের পরিচয় দিতেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই কয়েকটী বৃহৎ ব্যাঘ্র বধ করিয়া সকলের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

ডিমলা রাজবংশ।

—:•:—

আমাদের দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ে ও য়ুরোপের অভিজাত সম্প্রদায়ে একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইয়ুরোপে জেতার সহগামী বা রাজার বৈধ ও অবৈধ আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় অভিজাত বংশের বংশপতি; রমণীর সৌন্দর্য্য অনেক ক্ষেত্রে অভিজাত বংশের প্রতিষ্ঠার উপকরণ। সে সব দেশে অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্মানও বিস্ময়কর। ফরাসী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল তাহারা জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট হইত; রাজ্যের করভারপীড়িত জনসাধারণ সেই সম্প্রদায়ের বিলাসব্যসনের জন্য কষ্ট সহ্য করিত; আর দেশের লোকের অর্থশোষণ করিয়া সেই সম্প্রদায় বিলাসসাগরে বিচরণ করিত। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় দেশের লোকের মনে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তোষের সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। সেই অসন্তোষের ইন্ধনে শেষে দেশে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং সেই বহ্নিদাহে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে বিলাতে প্রথমাবধি প্রজাশক্তি রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে—যে বিলাতে প্রজারা রাজার নিকট হইতে আপনাদের অধিকার বুঝিয়া লইয়াছিল, সেই বিলাতেও রাজার অবৈধ সন্তান ডিউক অব মনমাথকে ফাঁসি দিবার সময় রেশমের রজ্জু ব্যবহার করা হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাজসেবায় অনেক প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বটে; কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে রাজানুগ্রহ যোগ্যতার পুরস্কার। এ দেশে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতেই প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের উদ্ভব

হয় এবং তাঁহারা প্রতিভাবলে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া সমৃদ্ধির শিখরে অরোহণ করেন। ইয়ুরোপেও এমন হইয়াছে। লর্ড গ্রেক্যোর বলিয়াছেন—The great humanising movements of the world have sprung from the people. কিন্তু তথাপি অভিজাত সম্প্রদায় জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের আভিজাত্যগর্ব্বে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনের ফলে এবং কাঞ্চনকৌলিন্যের জন্য সঙ্কীর্ণতা লুপ্ত হইতেছে বটে; কিন্তু এখনও তাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কত দিনে তাহার বিলোপ হইবে তাহাও বলা যায় না। এ দেশের সামাজিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্র—সে ব্যবস্থায় কাঞ্চনকৌলিন্যের স্থান নাই; সে ব্যবস্থা মনুষ্যত্বের ও গুণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রভাব যেরূপ পরিস্ফুট সেরূপ আর কুত্রাপি নহে। এ দেশে সমাজ ধনের বা জনের প্রাধান্য গ্রাহ্য করে না। সামাজিক কার্য্যে রাজাকেও সামান্য প্রজার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। ব্রাহ্মণ জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছেন—তাঁহাকে সম্মান করিতে হয়। দরিদ্র আত্মীয়-কুটুম্বের জন্য ধনী কর্ম্মকর্ত্তাকে বিনীত ব্যবহার উপহার লইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। এ সমাজে জ্ঞানের কৌলিন্য আছে—ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে। এ সমাজে গুণের আদর আছে—বল্লালী কৌলিন্য প্রথায়। এ সমাজে ধর্ম্মনিষ্ঠার ও লোকহিতৈষণার আদর আছে—জনগণের শ্রদ্ধাভক্তিতে। সেই জন্য এই সমাজে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিভাবলে উন্নতিলাভ করিয়া প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

এ দেশের প্রসিদ্ধ বংশসমূহের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বংশপতির প্রতিভায় বংশের সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা। তাহার

পর বংশের গৌরব বৰ্দ্ধিত হইয়াছে—বিলাসব্যসনে নহে, পরন্তু জনহিত-কর অনুষ্ঠানে, সমাজের উপকারসাধনে। সমাজের উপকার করিয়া এ দেশের বংশপতিরা সমাজপতি হইয়াছেন। সমাজ স্বেচ্ছায় তাঁহা-দিগের ললাটে সম্মানের চন্দনটীকা দিয়াছে, তাঁহাদিগের গলদেশে শ্রদ্ধার পুষ্পমালা দিয়াছে। সেই মাল্যচন্দনে তাঁহাদের অধিকার তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছেন। রাজার আদেশে সে অধিকারলাভ হয় না। সেই অধিকার লাভ করিয়া এক এক বংশের বংশপতি এক এক দিকে দিকপালের মত অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে ও সাহায্যে শত শত ব্যক্তি সমাজে থাকিয়া আপনাদের অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে পারিয়াছে।

আজ আমরা যে বংশের বিবরণ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে বংশের বংশপতি জগৎবল্লভ সেন মহাশয়ও মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে উদ্ভূত হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে ডিমলা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। রঙ্গপুরের এই সেন পরিবারের সম্পত্তির কেন্দ্র ডিমলা— সেই জন্য রাজবংশ "ডিমলা রাজবংশ" নামেই পরিচিত হইয়াছে।

জগৎবল্লভ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উড়িষ্যার নবাবের অধীনে শাসন বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন উড়িষ্যার শাসক নামে বাঙ্গালার মোগল সম্রাটের প্রতিনিধির অধীন হইলেও তাঁহার ক্ষমতা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ ছিল না। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যবস্থা সেইরূপই ছিল। তখন পথঘাট ভাল ছিল না; সুতরাং বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা প্রায়ই এক ব্যক্তি—তিনি বাঙ্গালাতেই থাকিতেন; তাঁহার অধীনে শাসকদ্বয় বিহারের ও উড়ি-ষ্যার শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসক নিযুক্ত হইয়া ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্যে সুজা একবার রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য। সুজার ভাগ্যরবি অস্তাচলগামী হইলে আবার ঢাকার সৌভাগ্যসূর্য্য সমুদিত হয়। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে আজিম উস্‌সানের শাসনকালে মুর্শিদকুলী খাঁ যখন বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া আইসেন, তখনও ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী। আজিম উস্‌সান মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করাইবার চেষ্টা করেন। মুর্শিদকুলী সেই জন্য ঢাকা ত্যাগ করিয়া দেওয়ানীর সব সরঞ্জামসহ মুর্শিদাবাদে গমন করেন। তাহার পর মুর্শিদাবাদই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী হয়। মুর্শিদকুলী স্বীয়জামাতা সুজাউদ্দীনকে উড়িষ্যার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা সুদূর প্রদেশখণ্ডে আপনার অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা চালনা করিতেন। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত একটি ঘটনায় তাহা বেশ বুঝা যায়। তখন আগা মহম্মদ জামান উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা—নামে বাঙ্গালার দেওয়ান-নাজিমের অধীন। ২১শে এপ্রিল আট জন ইংরাজ বাণিজ্য করিবার অধিকারলাভের জন্য বঙ্গদেশে আইসেন। তাঁহারা মহানদীতে নৌকা লাগাইয়া তিন জনকে বাহিয়া নবাবের দরবারে প্রেরণ করেন। যে তিন জন ইংরাজ আগা মহম্মদ জামানের দরবারে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রালফ কার্টরাইট সর্ব্বপ্রধান। ইংরাজত্রয় দরবারে উপনীত হইলে জামান তাহাদের দিকে মস্তক হেলাইয়া তাঁহাদিগকে আপনার পদ চুম্বন করিতে দেন। কার্টরাইট তাঁহার পদচুম্বন করিয়া উপহার দ্রব্য প্রদান করেন।

প্রভু সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজকে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী গড়িয়ায় পরাজিত ও নিহত করিয়া আলিবর্দ্দী যখন বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করেন, তখন সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলী উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা। আলিবর্দ্দী তাঁহাকে পরাজিত করিয়া স্বীয় মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদকে সে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করেন। আলিবর্দ্দী তাঁহার

কনিষ্ঠ জামাতাকে বিহারের শাসনকর্ত্তা করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার গর্ভে সিরাজউদ্দৌলার জন্ম হয়। বিহারে আলিবর্দ্দীর কনিষ্ঠ জামাতার লাঞ্ছনা ও হত্যাব্যাপার বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে।

আমরা কেবল দেখাইতে চাহি, যখন জামানের মত শাসনকর্ত্তা উড়িষ্যায় অক্ষুণ্ণ প্রতাপে শাসনদণ্ড চালন করিতে পারিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা দেওয়ান নাজিমের স্বজন বলিয়া অবশ্যই অধিকতর প্রতাপশালী ছিলেন। উড়িষ্যা বনাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশখণ্ড, বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নহে। সুতরাং সে প্রদেশখণ্ডের সকল ভার শাসকের উপর দিয়া বাঙ্গালার দেওয়ান নাজিম নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

আবার শাসনকর্ত্তারাও অনেক সময় বিলাসে কালযাপন করিতেন; যে জামানের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও শাসক ছিলেন; দিবাভাগে প্রাসাদে বাস করিতেন, রাত্রিকালে সৈনিকের মত শিবিরে প্রহরিবেষ্টিত হইয়া শয়ন করিতেন। তিনিও কিরূপ বিলাসে কালযাপন করিতেন তাহা ইংরাজ দপ্তরের বিবরণ হইতে জানা যায়। ইংরাজ বণিক কার্টরাইট দরবারে উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই মুয়াজ্জেম নামাজের সময় সমাগত জানাইলে—সমুজ্জ্বল বেশধারী পারিষদবর্গ অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন; সে দিনের মত রাজকার্য্য শেষ হইল। ওদিকে দেখিতে দেখিতে অসংখ্য বর্ত্তিকার আলোকে প্রাসাদ সমুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিল। যেন আরব্য উপন্যাসের স্বপ্নপুরীর কথা। এ অবস্থায় শাসনকার্য্য দেশের অবস্থাব্যবস্থাবিষয়ে অভিজ্ঞ এ দেশের কর্ম্মচারীদিগের উপরই সমর্পিত থাকিত।

সুতরাং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উড়িষ্যায় জগৎবল্লভের প্রভাব সহজেই অনুমেয়। তিনি বাদসাহী ফর্ম্মাণে প্রচুর জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

জগৎবল্লভ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। কিরূপে এই বংশের কোন প্রতিভাবান বাঙ্গালী রাঢ় হইতে সঙ্কটসঙ্কুল উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। এ দেশে ইতিহাসের উপকরণ লোক সযত্নে রক্ষা করে না। বিশেষ জগৎবল্লভের পরিবারের ইতিহাসের যে কিছু উপকরণ পুঁথিপত্রে নিবদ্ধ ছিল, তাহা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের দারুণ ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিম্বদন্তী কিছুদিন ইতিহাসের উপকরণ রক্ষা করে—কিন্তু কোথাও বা অতিরঞ্জনে, কোথাও বা ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাহা বিকৃত করিয়া ফেলে। শেষে নূতন কথার জন্য স্থান করিতে পুরাতন কথা লোক স্মৃতিচ্যুত করে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে উড়িষ্যায় বা বাঙ্গালায় কোন অধুনা অজ্ঞাত পুঁথির আবিষ্কারে জগৎবল্লভের পরিবারের উড়িষ্যাগমনের কারণ পাওয়া যাইবে এবং বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে এই রায় পরিবারের উৎকলবাসের সূত্র ধরিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অজ্ঞাত কথা জানা যাইবে। বাঙ্গালার সহিত উড়িষ্যার একটা যোগ পূর্ব্ব হইতেই ছিল—উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে বহু বাঙ্গালী যাত্রী যাইত। তখন পথঘাটের অবস্থা শোচনীয়—অনেকের উড়িষ্যা যাত্রাই মহাযাত্রাও যে না হইত এমন নহে। কিন্তু পুণ্যকামী বঙ্গবাসী বৈতরণী পার হইয়া ভুবনেশ্বরে ও নীলাচলে দেবদর্শন করিয়া সাক্ষীগোপাল দেখিয়া ফিরিবার জন্য সব কষ্ট উপেক্ষা করিয়া যাইত—যদি দেবতা দর্শন দেন। তাহারও পূর্ব্বে বাঙ্গালার বিজয়বাহিনী এককালে উড়িষ্যার তালীবনশ্যাম সিন্ধুকূলে জয়স্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার ভাব উড়িষ্যা প্লাবিত করিয়াছিল। উড়িষ্যা হইতে বিদ্যার্থীরা "ক্ষিতির-প্রদীপ" নবদ্বীপে বিদ্যাভ্যাস করিতে আসিত। চৈতন্যের উড়িষ্যাযাত্রার পর বাঙ্গালায় ও উৎকলে এই সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়।

বঙ্গদেশের মত উড়িষ্যাতেও কায়স্থদিগের বাস। তাঁহারা অনেকে

বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়াছেন। বঙ্গদেশে বাসভূমি অনুসারে কায়স্থগণ এখন দক্ষিণ রাঢ়ীয়, উত্তর রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদিগের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী শ্রীহট্টের বিবরণে বলিয়াছেন —"চাতুর্ব্বর্ণ্যের দ্বিতীয় বা ক্ষত্রিয় জাতিই কায়স্থ।* কায়স্থ নামেই তাঁহাদের ক্ষত্রিয়মূলত্ব প্রকটিত করে; ব্রহ্মকায়া সমুদ্ভূত বলিয়াই ইঁহারা কায়স্থনামে কথিত ১। ব্রহ্মা হইতে চিত্রগুপ্ত, তাহা হইতে চৈত্ররথ প্রভৃতির উৎপত্তি। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও নামান্তর গ্রহণ জন্য যুদ্ধের পরিবর্ত্তে লেখ্য বিদ্যাই ইঁহাদের উপজীবিকা নিরূপিত হয়। ২। ইঁহাদের এই বৃত্তিগ্রহণ ও নামধারণ সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে—

ক্ষত্রকুলনাশন পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করতঃ নিশিত-শর-সন্ধান পুরঃসর ধাবিত হইতেছেন দেখিয়া রাজন্যগণ এবং ক্ষত্রিয়রাজ চন্দ্রসেনের গর্ভবতী ভার্য্যা পলায়নপূর্ব্বক মহর্ষি দাল্‌ভ্যের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পরেই রাম দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমপদে উপনীত হইয়া ঋষি কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইলেন। তিনি ভোজনকালে স্বীয় মনোরথ জ্ঞাপন করিলে দাল্‌ভ্য তাঁহার অভীষ্ট প্রদানে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু তিনিও তৎসকাশে একটী বর প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর উভয়ে আহার সম্পন্ন করিলেন। আহারান্তে দাল্‌ভ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেব, আপনি ইতিপূর্ব্বে যাহা কামনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রকাশ করুন'। রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'মহাভাগ, ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেনের

---

* বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে—আপস্তম্ব।

(১) ব্রহ্মকায়াৎসমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।—ব্যোম সংহিতা।

(২ ক) কায়স্থোরাজসাক্ষীস্যাৎ গণকো লেখকস্তথা।—বিষ্ণু সংহিতা

(২খ) লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যবৃত্ত হিতৈষিণঃ।—বৃহৎ পরাশর।

গর্ভবতী স্ত্রী আপনার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে; তাহাকেই আমি চাহি।' ঋষি 'তথাস্তু' বলিয়া ভয়কম্পিতা, চঞ্চলনেত্রা চন্দ্রসেন-পত্নীকে আনিয়া পরশুরামের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভার্গব ইহাতে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া দাল্‌ভ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঋষিবর, এক্ষণে আপনার প্রার্থিতব্য কি আছে, প্রকাশ করুন।' দাল্‌ভ্য বলিলেন, 'হে জগদ্‌গুরো, এই চন্দ্রসেনপত্নী গর্ভস্থ বালকটীই আমার প্রার্থনীয়।' ভার্গব (অগ্রেই বরদানে স্বীকৃত ছিলেন, কাজেই) বলিলেন, 'আমি ক্ষত্রিয়হন্তা, এই বালকের জন্যই এ স্থানে আসিয়াছি, আপনি ইহাকেই প্রার্থনা করিলেন। আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইল; কিন্তু এই বালক যেন ক্ষত্রিয় শব্দে সংজ্ঞিত না হয়, (ব্রহ্মকায়া সমুদ্ভূত) ক্ষত্রিয় এই বালকের ভবিষ্যতে কায়স্থ নাম হইবে। কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়া বালক যদি ক্ষত্রধর্ম্মী হয়, তবে তাহাকে বারণ করিবেন।' এইরূপ বলিয়া দাল্‌ভ্যাশ্রম ত্যাগ করতঃ কল্পান্তাগ্নিসমপ্রভ ভার্গব ক্ষত্রিয় বিনাশ করিতে অন্যত্র ধাবিত হইলেন। এরূপে ক্ষত্রিয় তনয়ের কায়স্থ নাম প্রাপ্তি ঘটিল এবং এই হইতেই তাঁহারা ক্ষত্রধর্ম্ম বর্জ্জিত হইলেন।"

পুরাণান্তরে অনুরূপ আখ্যানও লিখিত আছে।

যাহা হউক, আমরা নিম্নোদ্ধৃত মত সমীচীন মনে করি—বঙ্গদেশের 'কায়স্থগণের উত্তর পুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্ষত্রিয়বর্ণ বটে, কিন্তু আচারভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে সংস্কারবর্জ্জিত হইয়াছেন; কতদিন হইতে তাঁহারা প্রথম সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ সেন রাজগণ অবসন্ন হইলে মুসলমানদিগের আগমনে এবং মুসলমান নবাবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে গিয়া সাবিত্রীচ্যুত হইয়াছেন। মিশ্রকারিকার মতে কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ও গায়ত্রীশূন্য হন। ক্রমে

বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তাঁহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও পরিশেষে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষা গ্রহণ ও পবিত্রতা লাভ করিয়া বিপ্রভক্ত হইলেন তাঁহারা তান্ত্রিক ও তন্ত্রদক্ষ। কিন্তু শ্রুতিশাসনানুসারে শূদ্রধর্ম্ম বলিয় খ্যাত।—

গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাদ্গতা।
ততো কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন্॥
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥
আগমোক্ত বিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ।
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্॥
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রণামপি পারগাঃ।
তথাহি শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ॥

(মিশ্রকারিকা)

"ধ্রুবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ শ্রুতির মতে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন হয় না; সুতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও অধ্যাত্মবিদের বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তবে যদি তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তৎপরে তান্ত্রিকী দীক্ষাদ্বারা অবশ্যই শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কোন শ্রুতিতেই তান্ত্রিককে শূদ্রধর্ম্মা বলা হয় নাই।

"বোধ হয়, অধ্যাত্ম ব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ নিন্দিত হন এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে তাঁহারা ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারেনাই। তবে তান্ত্রিকী দীক্ষাদ্বারা শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন.

এই মাত্র। মনুর মতে, যথাসময়ে উপবীত না হইলে ব্রাত্য হয় এবং সে ব্রাত্যস্তোম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে। আপস্তম্ব ও মিতাক্ষরার মতে বহুদিন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে অনুপনীত থাকিলেও ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে ('বাচস্পত্য' রচয়িতা শ্রদ্ধাস্পদ তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতিও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।")

মুসলমান শাসনের শেষকালে সামাজিক বিশৃঙ্খলায় ও দেশে অনাচারে সমাজ-শরীরে জড়তার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার পর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বিমুগ্ধ বাঙ্গালীও বহুদিন আপনাদিগকে হীন ও হেয় মনে করিয়া আপনাদের পূর্ব্বেতিহাসের আলোচনায় বিমুখ ছিল। এখন সে ভাব কাটিয়া গিয়াছে এবং বাঙ্গালী সকল বর্ণই আপনাদের পূর্ব্ব গৌরবের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদিদ্বারা আপনাদের ক্ষাত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কিন্তু এই চেষ্টার পূর্ব্বেও সমাজে ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের আসন ছিল এবং কায়স্থগণ বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। বিশেষ তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা অধিক থাকায় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে তাঁহাদিগের অনেকেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে ও অন্যান্য বিদ্যাসাপেক্ষ কার্য্যে তাঁহারা বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মূল কথা, বাঙ্গালার বিরাট সমাজে ব্রাহ্মণগণের পরই কায়স্থগণ চিরকাল প্রভাব ও প্রতাপ বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন।

আমরা বলিয়াছি, উড়িষ্যাই, জগৎ বল্লভের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ভিমলা রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ কবে উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তবে তাহাদের উড়িষ্যায় অবস্থানের ও সম্ভ্রমলাভের চিহ্ন

অদ্যাপি পাওয়া যায়। তখন লোক বিলাসব্যসনে অর্থ নষ্ট না করিয়া দেবালয়-প্রতিষ্ঠা করিত—পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিত—মানুষের ঐহিক ও পারলৌকিক হিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিত। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে সেই সংস্কারের অবশেষ ভগ্ন দেবমন্দিরে—ভগ্নাবশেষ ঘাটে ও শৈবালদলাচ্ছন্ন পুষ্করিণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন লোক বাড়ী করিতে প্রথমে চণ্ডীমণ্ডপ করিত। আপনি প্রাসাদ রচিত করিবার পূর্ব্বে দেবসেবার ব্যবস্থা করিত—গুরুপুরোহিতের বার্ষিক ব্যবস্থা করিত। এ দেশে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বেই যে সেন বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন, বালেশ্বর জিলায় মীরজাপুর গ্রামে ভগ্নাবশেষ গৃহে, পুষ্করিণীতে ও দেবালয়ে তাহার পরিচয় আছে। যদি অতীতের সেই সব মূক সাক্ষ্য কথা কহিতে পারিত, তবে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পুনর্গঠন সম্ভব হইত; উড়িষ্যাতেই জগৎবল্লভ কুলপুরোহিতকে প্রায় ৮০ বিঘা জমী ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন।

জগৎবল্লভের যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি বাদশাহী ফারমানে বহু জায়গীরের অধিপতি। তাঁহার মৃত্যুতে সে সব জায়গীর ও তাঁহার উচ্চ পদ তাঁহার পুত্র পীতাম্বর প্রাপ্ত হয়েন। তখন উচ্চপদও অনেক স্থলেই বংশানুক্রমিক ছিল—যিনি একবার কোন পদ অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন তাঁহার বংশধরগণ অনুপযুক্ত না হইলে সে পদ তাঁহাদেরই থাকিত। কাজেই প্রভুর পরিবারের সহিত কর্ম্মচারীর পরিবারের সম্বন্ধ ক্ষণভঙ্গুর হইত না—কর্ম্মচারী বংশের হিতকামনায় প্রভুর পরিবারের হিতসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিতেন; এ দেশে ইংরাজও বহুদিন মুসলমানদিগের এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন—তাহার পর প্রতিযোগী পরীক্ষায় পুরাতন প্রথা লোপ পাইয়াছে। ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে

হয় যে, বংশপরম্পরাগত যে কর্ম্মকুশলতা—যে লোকচরিত্রজ্ঞান—যে সদাচার অনুশীলনের ফলে প্রস্ফুটিত হয়, তাহা সহসা উচ্চপদে উন্নীত হইলেই পদের সঙ্গে লাভ করা যায় না—প্রতিভার সহিত তাহার সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ নহে।

পীতাম্বরের সময়ে বঙ্গদেশে মহা অশান্তির আবির্ভাব হয়—বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহা বর্গীর হাঙ্গামা নামে পরিচিত। তাহা বঙ্গদেশে মার্হাট্টাদিগের উপদ্রব। বাঙ্গালার ছেলে ভুলান ছড়ায় তাহার—সেই দেশব্যাপী আতঙ্কের স্মৃতি সংরক্ষিত হইয়াছে তখন বর্গী আসিতেছে জানিলে লোক ভয়ে গৃহ-গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত, পিতৃপুরুষের আবাস—সঞ্চিত শস্য সব নষ্ট হইত। তাই তখন মা ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ভয় দেখাইতেন—

'ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো .
বর্গী এল দেশে।
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে ?

বর্গীর উপদ্রবের বিবরণে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায় পূর্ণ। সে অধ্যায় বাঙ্গালীর দুঃখদুর্দ্দশায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও—তাহাতে আত্মত্যাগের ও বীরত্বের আলোকে যে স্থানে স্থানে সেই গাঢ় অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তাহাও বলা যাইতে পারে। কারণ, বাঙ্গালার নবাবরা যখনই মার্হাট্টাদিগকে দমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বা তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিয়াছেন তখনই বাঙ্গালার সৈনিক তাঁহাদের অবলম্বন। তখন বাঙ্গালী নিরস্ত্র হয় নাই—তাহার বাহুতে বল ছিল—সে রণকৌশল বিস্মৃত হয় নাই। বাঙ্গালী তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে পারিত—এমন কি অন্য দেশবিজয়ও তাহার পক্ষে স্বপ্নাতীত—কল্পনাতীত ছিল না। আলীবর্দ্দী

বাঙ্গালার পঞ্চসহস্র সৈনিক লইয়া যেরূপে মার্হাট্টাদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন—জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা কেবল দশ সহস্র গ্রীকের প্রত্যাবর্ত্তন। সে বিবরণ পাঠ করিলে বাঙ্গালীর পূর্ব্ব-গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া আজও বাঙ্গালীর শিরায় শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে।

বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে সমগ্র ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ আছে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর বিদেশ হইতে ভারত আক্রমণ করিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীরাও তাঁহারই মত রণ-কুশল! তিনি অভিযানের সময় সসৈন্যে বহুবার সিন্ধুনদ ও গঙ্গানদী সন্তরণে পার হইয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণবেগ ভারতে রাজা ও প্রজা কেহই প্রহত করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বিদেশ হইতে আসিয়া এ দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তদীয় পুত্র হুমায়ুন স্বদেশের সহিত সম্বন্ধ হারাইয়া ভারতেই স্থায়ী হয়েন—তদবধি মোগল বাদশারা ভারতবাসী হইয়াছিলেন। নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর হুমায়ুন দিল্লীর পুরাতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া সম্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এখনও তাঁহার সেই "পুরাণ কেল্লায়" তাঁহার মসজেদ ও পাঠাগার বিদ্যমান। হুমায়ুনের পুত্র—আকবর। তিনি হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি সংস্থাপিত করিয়া এ দেশে মোগল শাসন স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একে বাদশারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবাসী হইয়াছিলেন—তাহাতে আকবরের এই রাজনীতি—যেন সোণায় সোহাগা যোগ করিয়া ভারতবাসীকে মোগলদিগের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর বিলাসী ছিলেন—তিনি পিতার অনুসৃত নীতিরই অনুসরণ করিয়া-ছিলেন জাহাঙ্গীরের পুত্র সাহজাহান। তিনি বৃদ্ধ হইলে তদীয় পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁহাকে বন্দী করিয়া ও অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে বঞ্চিত

করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তখনও মোগল সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন গৌরবে বিরাজিত। কিন্তু আওরঙ্গজেব হিন্দুদ্বেষী ছিলেন। একে ত পিতার প্রতি ও ভ্রাতৃত্রয়ের প্রতি তাঁহার দুর্ব্যবহারে লোক তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল—কেবল ভয়ে কিছু বলিতে পারে নাই, তাহাতে তাঁহার হিন্দুদ্বেষ হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগের উত্যক্ত করিয়া তুলিল। তিনি হিন্দু প্রজাকে জিজিয়া নামক বিশেষ কর দিতে বাধ্য করিয়া তাহাদিগকে এবং সঙ্গীতালোচনাদি বন্ধ করিয়া সাধারণ জনগণকে অসন্তুষ্ট করিলেন। মোগল প্রাধান্যের বিশাল তরু, কোটরস্থিত বহ্নিতে নষ্ট করিতে লাগিল। এই সময় মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর আবির্ভাব। শিবাজী দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক প্রতিভাবলে স্বয়ং প্রধান হইয়া উঠেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মোগলপ্রতাপ ক্ষুন্ন হইয়াছে—দুর্ব্বল স্থান দেখিয়া আঘাত করিলেই সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তিনি তাহাই করিলেন। আওরঙ্গজেব প্রথম প্রথম এই পার্ব্বত্য সেনাদলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেনাপতিদিগকে এই সব পার্ব্বত্য-মূষিক বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর সেনাপতিরাই মাহাট্টাদিগের দ্বারা পরাভূত হইতে লাগিলেন। মাহাট্টারা পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে অতর্কিতভাবে আসিয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিত—পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলে পার্ব্বত্য পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিত—মোগল সেনা তাহাদের অনুসরণ করিতেও পারিত না। বাস্তবিক শিবাজীর আঘাতেই মোগল প্রতাপ-সৌধের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। শিবাজী স্বয়ং রাজ্য সংগঠিত করেন এবং বৃদ্ধ আওরঙ্গজেব ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যের দুর্দ্দশা-দুঃখে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেই শিবজীর মৃত্যু হইয়াছে, শিবাজী রাজ্যগঠন করিবার অবসর মাত্র পাইয়াছিলেন—রাজ্য সুসম্বদ্ধ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ও বিলাসব্যসনাসক্ত ছিলেন। প্রজারা তাঁহার

প্রতি বিরক্ত হয় এবং শেষে মদমত্ত অবস্থায় তিনি বন্দী হইয়া আওরঙ্গজেবের হস্তে পতিত হয়েন। আওরঙ্গজেব বলেন, তিনি মুসলমান হইলে তাঁহার জীবননাশ হইবে না, শম্ভুজী উত্তর করেন, বাদশাহ তাঁহাকে কন্যাদান করিলেও তাহা হইবে না। এই কথা বলিয়া তিনি পয়গম্বর মহম্মদের সম্বন্ধে নানা কটুকথা বলিলে আওরঙ্গজেবের আদেশে তাঁহাকে নিহত করা হয়। শম্ভুজীর উপর মার্হাট্টারা বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের হস্তে পতিত হইয়া তিনি যে সাহস দেখান তাহাতে এবং তাঁহার প্রতি আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে তাহারা তাঁহার সব অপরাধ বিস্মৃত হয়। তাহারা শম্ভুজীর শিশু পুত্র শাহুকে রাজা করিয়া তাহার পিতৃব্য রামরাজাকে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করিল। রামরাজা বহু কষ্টে গিঞ্জি দুর্গে যাইয়া রাজপাট স্থাপিত করিলেন। তিনি দুইজন সেনাপতিকে মোগল রাজ্য লুণ্ঠন করিতে প্রেরণ করিলেন। সেনাদল সেতারার সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাদের দলের রামচন্দ্র মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার এক নূতন কৌশল উদ্ভাবিত করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে কোন মার্হাট্টা সর্দ্দার সৈন্য লইয়া মোগল সাম্রাজ্যে "চৌথ" আদায় করিয়া লইতে পারিবেন—চৌথ না পাইলে তিনি সে প্রদেশ লুণ্ঠন করিবেন। এই ব্যবস্থায় পঙ্গপালের মত মার্হাট্টা সৈন্য দিকে দিকে "চৌথ" আদায় করিতে বাহির হইল। মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে মক্ষিকার দল যেমন চারিদিক হইতে আঘাতকারীকে আক্রমণ করে, মার্হাট্টারা তেমনই চারিদিক হইতে মোগলদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

মোগল সেনা মার্হাট্টাদিগের সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। মার্হাট্টা বাহিনীর জন্য কোন আয়োজন প্রয়োজন ছিল না। তাহাদের টাট্টু ঘোড়ায় জিন ছিল না—আরোহীর সাজসজ্জা ছিল না। অস্ত্রের মধ্যে তরবারী—সঙ্গে কতকগুলি আরোহী শূন্য অশ্ব—তাহাদের পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত

দ্রব্যাদি আনা হইবে। তাহারা যাইতে যাইতে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিত। মোগল সেনাপতি জুলফিকারের সঙ্গে বোধ হয় মার্হাট্টাদিগের যোগ ছিল। শেষে আওরঙ্গজেবের তাড়নায় জুলফিকার যখন গিঞ্জি দুর্গ অধিকার করিলেন, তখন রামরাজা পলাইয়া সাতারায় আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। রামরাজার সেনাদল অনায়াসে চারিদিকে চৌথ আদায় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। জল পথেও মার্হাট্টারা অত্যাচার করিতে লাগিল—মোগল সাম্রাজ্যের দেহে তাহারা কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। আওরঙ্গজেব জুলফিকারকে দেশরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া আর এক দল সেনা মার্হাট্টাদিগের দুর্গ দখল করিতে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময় মোগল দরবারে বিলাসের বিষ ব্যাপ্ত হইয়াছে—আমীর ওমরাহরা আর পরিশ্রম করিতে পারেন না—সকলেই বিলাসী। অর্থাৎ তখন অবনতি আরব্ধ হইয়াছে। আওরঙ্গজেব একাকী তাহার গতি নিবারণ করিবেন কেমন করিয়া? চারিদিকে বিশৃঙ্খলা—রাজকোষ অর্থশূন্য। এই অবস্থায় মার্হাট্টারা গুজরাটেও চৌথ আদায় করিতে লাগিল। এই রাজ্যব্যাপী অশান্তির মধ্যে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইল।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সিংহাসন লইয়া তাঁহার তিন পুত্রে কলহ বাধিল, আগ্রার নিকটে রণক্ষেত্রে আজিমের মৃত্যু হইলে মুয়াজ্জম বাহাদুর সাহ নাম লইয়া সম্রাট্ হইলেন। তাঁহার পক্ষ হইয়া জুলফিকার আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র কামবক্‌শকে পরাভূত করিলেন। এই সময় মার্হাট্টাশক্তিও অন্তর্বিপ্লবে ক্ষুণ্ণ হয়।

এদিকে বাহাদুর শাহ জুলফিকারকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা করিয়া দিলেন। জুলফিকার স্বয়ং রাজধানীতে থাকিয়া পাঠান দায়ুদখাঁর দ্বারা দাক্ষিণাত্যের শাসন কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। দায়ুদ খাঁ মধ্যে মধ্যে মান্দ্রাজে যাইতেন এবং তথায় ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষ তাঁহাকে মদ্য দিয়া

তুষ্ট করিতেন। এই সময় জুলফিকার দায়ুদ খাঁকে উপদেশ দেন—মার্হাট্টারা চৌথ আদায় করিতে পারে।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুরের মৃত্যু হইলে অপর তিন ভ্রাতাকে নিহত করিয়া তদীয় পুত্র জেহান্দর শাহ সম্রাট হইলেন। জুলফিকার তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতেই বঙ্গদেশ হইতে যাইয়া ফেরোকসিয়ার তাঁহাকে ও জুলফিকারকে পরাভূত করিয়া উভয়কেই নিহত করিলেন। দায়ুদ খাঁকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা করা হইল। তিনি মার্হাট্টাদিগকে অবাধে চৌথ আদায় করিতে দিয়াছিলেন। এখন তাহারা সে অধিকার হারাইয়া আবার বলপূর্ব্বক চৌথ আদায় করিতে লাগিল। দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পর নূতন শাসনকর্ত্তা হুসেনআলী মার্হাট্টাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন।

এই সময় হইতে দিল্লীর রাজসভা ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি হইল, সম্রাটগণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের ক্রীড়াপুতুল হইয়া কেবল বিশাল সম্রাজ্যে সুন্দরী সমাবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাজদণ্ড তাঁহাদের দুর্ব্বল হস্তে রহিল বটে, কিন্তু ক্ষমতা অপরের হস্তগত হইল। ইহাই মার্হাট্টাদিগের সুযোগ। এই সুযোগে তাহারা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। যখন দেশ অরাজক, রাজা প্রজাকে শাসন করিতে পারেন না—তখন মার্হাট্টাদিগের মত বলশালী সঙ্ঘবদ্ধ জাতিকে কে পরাভূত করিতে পারে? ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে ফেরোকশিয়ার নিহত হইলে যে দুই জনকে সম্রাটের তক্তে বসান হয় কয় মাসের মধ্যে তাহাদের উভয়ের মৃত্যু হয়। তখন আওরঙ্গজেবের এক পৌত্রকে মহম্মদ শাহ নাম দিয়া ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট করা হয়। মহম্মদ বুদ্ধিমতী মাতার পরামর্শে ওমরাহ দিগের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া এক দলকে আপনার পক্ষাবলম্বী করিলেন। তাঁহার শত্রুরা তাহা জানিতে

পারিয়াও তাহার প্রতীকার করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হুসেন আলী নিহত ও তদীয় ভ্রাতা পরাভূত হইলে মহম্মদ শাহ তাঁহাদের প্রাধান্যযুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে সম্রাজ্য শাসনে মন দিতে পারিলেন। কিন্তু তিনিও বিলাসবিষে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন এবং কামিনীকুহকে আপনার পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ শাহ মার্হাট্টাদিগের গতিরোধে অক্ষম হইয়া তাহাদিগকে চৌথ আদায় করিবার অধিকার দেন। কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের চৌথ আদায় করিবার অধিকার লাভ করিলেও মার্হাট্টারা সর্ব্বত্রই চৌথের দাবী করিত। দুর্ব্বল-মোগলসম্রাটের এমন সাধ্য ছিল না যে, তাহাদের গতিরোধ করেন। কাজেই রত্নপ্রসূ বাঙ্গালা তাহাদের লুব্ধ দৃষ্টি অতিক্রম করিল না ; তাহারা বঙ্গদেশে আসিল।

তখন আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার। আলীবর্দ্দী মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের অনুগ্রহে উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি কৃতঘ্ন হইয়া সুজার পুত্র সরফরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সুবাদার হয়েন। আলিবর্দ্দী সুবাদার হইয়া সরফরাজের ভগিনীপতি উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তাকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় মধ্যম জামাতা আহম্মদকে তথায় প্রেরণ করেন। আহম্মদের অশিষ্ট ব্যবহারে উড়িষ্যায় বিদ্রোহ হয় এবং সেই সংবাদ পাইয়া আলিবর্দ্দী বিদ্রোহদমনকল্পে উড়িষ্যায় গমন করেন। তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া—অনেক সৈন্যকে বিদায় দিয়া যখন রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন সেই সময় পথে সংবাদ পান, মার্হাট্টারা বঙ্গদেশে চৌথ আদায় করিতে আসিতেছে। আলীবর্দ্দী বহু কষ্টে তাহাদের আক্রমন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—কিন্তু মেদিনীপুর হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত অভিযানের পথ মার্হাট্টাদিগের অত্যাচারে জনশূন্য হয়—গ্রাম জনহীন—গৃহাদি ভগ্নাবশেষ

হয়। মার্হাট্টারা রাজধানী মুর্শিদাবাদও লুণ্ঠিত করে এবং তথা হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। মার্হাট্টাদিগের এই আক্রমনে বঙ্গদেশে সুবাদারের প্রতাপ বহুপরিমাণে ক্ষুন্ন হয়। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে তাহারা বঙ্গদেশ আক্রমন করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থিত প্রদেশ অধিকার করে। তাহাদের লুণ্ঠনে প্রজারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালার সুবাদার তাহাদিগকে পরবৎসর কাটোয়ার নিকটে পরাভূত করেন সত্য; কিন্তু লুণ্ঠনই যাহাদের উদ্দেশ্য —দেশজয় ঈপ্সিত নহে, তাহারা যুদ্ধে পরাভূত হইলেই আক্রমণে নিবৃত্ত হয় না। তাহারা প্রতিবৎসর পার্ব্বত্য বন্যার মত প্রবল বেগে বঙ্গদেশে আসিত। এই সময় কলিকাতায় ইংরাজরা বাণিজ্য করিতেছিলেন। তাঁহারা কলিকাতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মার্হাট্টা ডিচ নামে পরিচিত খাত খনন করিয়া কলিকাতা সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনের কাছে—সার্কুলার রোড রাস্তার পার্শ্বে এই খাতের চিহ্ন খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও লক্ষিত হইত। আলীবর্দ্দীর তখন ঘরে বাহিরে বিপদ। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজউদ্দৌল্লাকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহন করেন। মাতামহের অতিরিক্ত আদরে সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন ও মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েন। তিনি পাটনা আক্রমন করিলে শাসনকর্ত্তা জানকীরাম কর্ত্তৃক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কারারুদ্ধ হন। স্নেহান্ধমাতামহ তাহাতেও তাঁহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিতেই প্রয়াস পাওয়ায় যুবকের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িতে থাকে। তাহাতে বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী নিশ্চয়ই বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঘরে এই অশান্তি, বাহিরে মার্হাট্টাদিগের অনাচারে প্রজারা উৎপীড়িত। সমগ্র প্রদেশে শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে শেষে আলীবর্দ্দী বাধ্য হইয়া ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মার্হাট্টাদিগের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া প্রজাদিগকে

তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার উপায় করেন। তিনি তাহাদিগকে কটক প্রদেশ প্রদান করেন এবং বাঙ্গালার চৌথ হিসাবে লুণ্ঠিত দ্বাদশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন। এই ব্যবস্থায় বাঙ্গালার জনগণ বর্গীর হাঙ্গামা হইতে নিস্তার পাইয়া বৃদ্ধ সুবাদারকে ধন্যবাদ দিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে সুবাদারের দৌর্ব্বল্য সপ্রকাশ হওয়ায় বিদেশী বণিকরা প্রবল হইয়া উঠে। এই দৌর্ব্বল্যেই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থার সূচনা হয়। সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে দেশের লোকের বিরক্তি সেই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন দ্রুত করিয়াছিল। তাহার আলোচনা আমরা ইহার পরে—যথাস্থানে করিব। সে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

পিতাম্বরের পুত্র হররাম পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে বাবু হররাম সেন বলিত। তখন যে কেহ "বাবু" বলিয়া অভিহিত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে যেমন "রাজা" "মহারাজা" প্রভৃতি উপাধি ব্যক্তি বিশেষকে প্রদত্ত হয় তৎকালে তেমনই নবাব বাদশাহরা বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে "বাবু" উপাধি দিতেন। তৎকালে এই উপাধির সঙ্গে কতিপয় দ্রব্যের ব্যবহারেও অধিকার জন্মিত। হররাম ডিমলা রাজবংশে সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কুশাগ্র বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে মুসলমান শাসনের দুরবস্থা—অন্য দিকে ইংরাজের প্রভাব বিস্তার; দেশে এই ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাজনীতিক সতরঞ্চ খেলার নূতন জয়পরাজয় হইবে। বুঝিয়া তিনি উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং রঙ্গপুর সহরের মাহীগঞ্জ পল্লীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখন রঙ্গপুর জিলায় মুসলমান ও হীন জাতীয় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাধিক্য।

তথায় ডিমলা রাজবংশ ব্যতীত—রাজবংশের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ গোপাল প্রসাদ বসুর ও অন্নদা প্রসাদ সেনের পরিবার ব্যতীত আর দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ পরিবার নাই। তিনি কি মনে করিয়া উত্তর বঙ্গের এই স্থানে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। সে বোধ হয় ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা। তাহার দুই বৎসর পরে পলাশীক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়—বাঙ্গালার রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে নূতন অভিনেতাদিগের আবির্ভাব হয়। তখনও আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার সুবাদার। প্রতিভাবান হররামের কার্য্যদক্ষতা আলিবর্দ্দীর দৃষ্টি অতিক্রম করিল না—তিনি হররামকে উত্তরবঙ্গে কতকাংশের রাজস্ব আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরে আলিবর্দ্দীর মৃত্যু হইল এবং তাঁহার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। সিরাজদ্দৌলা এরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক ছিলেন যে, 'মুতাক্ষরীন' ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন, তিনি রাজপথে বাহির হইলে যাহাদিগকে দেখিতে পাইতেন তাহারা যদি লাঞ্ছিত না হইয়া নিষ্কৃতি পাইত তবে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিত। লোক তাঁহাকে দেখিলে ভগবানের নাম স্মরণ করিত। সমসাময়িক ফরাসীদিগের রচনায় প্রমাণিত হইয়াছে, তিনি যাত্রীপূর্ণ খেয়ার নৌকা ডুবাইয়া দিয়া যাত্রীদিগের প্রাণরক্ষার্থ প্রাণান্ত চেষ্টা দেখিয়া আনন্দানুভব করিতেন। এইরূপ লোক কখন প্রজার প্রিয় হইতে পারে না। আলিবর্দ্দীর পরিবার পাপের লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল —সেই পাপক্ষেত্রে বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিলে দেশের লোক ভয়ে অস্থির হইল। তিনি অতি অল্পকালই বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তৎকালে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করিতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন;

কিন্তু দেশের প্রধানগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আলিবর্দ্দীর মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সওকতজঙ্গ সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সওকতজঙ্গ নির্ব্বোধ ও অহঙ্কারী ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই বাঙ্গালার সুবাদার করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হয়। তাহার সন্ধান পাইয়া সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে পূর্ণিয়ার দিকে যাত্রা করেন; পথিমধ্যে তিনি ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন।

তখন ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভ বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী। এই রাজবল্লভের প্রাসাদমন্দিরাদি পদ্মাগর্ভে নষ্ট হওয়ায় পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত। সিরাজদ্দৌলা তাঁহার ধন-সম্পত্তি হস্তগত করিবার প্রয়াসী হইলে রাজার পুত্র কৃতদাস ধনরত্নাদি লইয়া সপরিবারে কলিকাতার ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিরাজদ্দৌলা অবিলম্বে কৃতদাসকে তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য ও কলিকাতা দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ইংরাজদিগকে আদেশ দেন। পূর্ণিয়া যাত্রার সময় তিনি জানিতে পারেন, ইংরাজরা তাঁহার আদেশ পালন করিতে চাহেন না। সামান্য বণিকদিগের এই ব্যবহার সিরাজদ্দৌলার কাছে অসহনীয় মনে হয় এবং তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যাইয়া নগরোপকণ্ঠস্থিত কাশিমবাজারে ইংরাজ কোম্পানীর কুঠি হস্তগত করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিলে অধিকাংশ ইংরাজ নরনারী জলপথে পলায়ন করেন; কেবল ১৪৬ জন ধৃত হন। নবাবের কর্ম্মচারীরা এই কয়জনকে ইংরাজদিগের দুর্গমধ্যস্থিত কারাগারে আবদ্ধ রাখেন। সঙ্কীর্ণ স্থানে বন্দীদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু দূষিত হওয়ায় বহু লোকের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা ইতিহাসে "অন্ধকূপ হত্যা" নামে

পরিচিত। কিন্তু ইহা ইচ্ছা-কৃত হত্যা নহে। বিশেষ ইহার জন্য সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং দায়ী নহেন।

কলিকাতা জয় করিয়া সিরাজদ্দৌলা ভীতি প্রদর্শন করিয়া চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ও চন্দননগরের ফরাসীদিগের নিকট হইতে যথাক্রমে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা ও সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা আদায় করেন। এদিকে তাঁহার সেনাপতি রাজা মোহনলাল সৈন্যসহ সওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া পূর্ণিয়ার নিকটে নবাবগঞ্জে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তখন নবাব মহাসমারোহে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সওকতজঙ্গের পরাভব হইল বটে, কিন্তু কলিকাতা আক্রমণ করিয়া সিরাজদ্দৌলা যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন অচিরে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। "অন্ধকূপ হত্যার" জন্য সিরাজদ্দৌলাকে দোষী করা যায় না বটে, কিন্তু ইংরাজগণ স্থিরভাবে সে সব কথার বিচার করিতে পারেন নাই। এই দুর্ঘটনার সংবাদ যখন মান্দ্রাজে পৌঁছিল, তখন মান্দ্রাজের কুঠীর ইংরাজরা ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কর্ণেল ক্লাইব ও এডমিরাল ওয়াটসন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জলপথে মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালায় আসিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহারা গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করিয়া কলিকাতা ও পরে হুগলী দখল করিলেন। সংবাদ পাইয়া সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিলেন, কিন্তু ভয় পাইয়া ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির সর্ত্তে ইংরাজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার এবং কলিকাতায় দু'টি টাকশাল রাখিবার অধিকার লাভ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এমন হীনতা স্বীকার করিয়া কোন নবাব ইতঃপূর্ব্বে প্রজার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন নাই। এই

দ্ধিতে সিরাজদ্দৌলার অসারতা প্রতিপন্ন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতাপ ক্ষুন্ন হওয়ায় তাঁহার শক্ররা ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ পাইলেন। এই ব্যাপারেই ইংরাজের প্রবল পরাক্রম দেখা গেল। আবার ইহার কয়েক মাস পরেই যখন য়ুরোপে ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদের সংবাদ রটিল, ক্লাইব চন্দননগর অতিক্রম করিয়া অধিকৃত করিলেন, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মীরজাফর, কোষাধ্যক্ষ রাজা রায় দুর্লভ এবং প্রসিদ্ধ ধনী জগৎ শেঠরা সিরাজদ্দৌলার বিরোধী হইলেন এবং ক্লাইবের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের প্রধান ইংরাজ ওয়াটশনও তাঁহাদের দলে যোগ দিলেন। সাব্যস্ত হইল, মীরজাফর নবাব হইবেন এবং নবাব হইয়া ইংরাজদিগকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিবেন। নবাব যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন উমীচাঁদ নামক এক ব্যক্তির অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়। তিনি ৩০ লক্ষ টাকার লোভে ইংরাজের সহিত মীরজাফরের ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত ব্যবস্থা স্থির করিলেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি ৩০ লক্ষ টাকা পাইবেন এই কথা লিখিয়া ক্লাইব এক জাল সন্ধিপত্র রচিত করেন এবং ওয়াটসন সেই প্রবঞ্চনার বিরোধী হইলে জাল সন্ধিপত্রে ওয়াটসনের সহি জাল করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজদ্দৌলার পরাভব হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজই প্রকৃতপক্ষে দেশের সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেও তাঁহারা সন্ধিসর্ত্তানুসারে মীরজাফরকে নবাব করিলেন। মীরজফর ও হরবরামের কার্য্যদক্ষতায় ও শাসনকৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রঙ্গপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমনই হরবাম রঙ্গপুর অঞ্চলে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়াছিলেন।

মীরজাফর এককালে দক্ষ সেনাপতি ছিলেন; কিন্তু তিনি শাসন কার্য্যে দক্ষ ছিলেন না। বিশেষ অপ্রত্যাশিতরূপে নবাব হইয়া তিনি ধীরভাবে কাজ করিতে পারিলেন না। তিনি বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করিবার অল্পদিন পরেই অন্যায় আচরণে কোষাধ্যক্ষ রাজা রায়দুর্লভের পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণের এবং মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা রাজা রামরামের সঙ্গে গোল বাধাইলেন। ইহারা সকলেই প্রভাবশালী ব্যক্তি। ক্লাইব মধ্যস্থ হইয়া বিবাদভঞ্জন করিয়া না দিলে মীরজাফরের কি হইত বলা যায় না। এই সময় বাদশাহ দ্বিতীয় শাহআলম পাটনা আক্রমন করিয়া রামনারায়ণকে পরাস্ত করিলেন কিন্তু ক্লাইব কর্ণেল কালিয়ডকে সেনাবল দিয়া তথায় পাঠাইয়া বাদশাহকে পরাভূত করিলেন। মীরজাফর সন্তুষ্ট হইয়া ক্লাইবকে কোম্পানীর জমিদারী জায়গীর দিলেন।

মীরজাফর যাঁহাদের অনুগ্রহে বাঙ্গলার মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই ইংরাজের কাছেও বিশ্বাসঘাতক হইলেন—তিনি ওলন্দাজদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সেই কথা জানিতে পারিয়া ক্লাইব চুঁচুড়া আক্রমণ করিয়া ওলন্দাজদিগকে লাঞ্ছিত করিলেন, কিন্তু যাহারা কুকুর "হাঁড়ি মারিলে" কুকুরকে মারে কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তিনি মীরজাফরকে কিছু বলিলেন না। এই সময় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ভ্যানসিটার্ট কোম্পানীর বাঙ্গালার কুঠির অধ্যক্ষ হইলেন।

মীরজাফর ইংরাজদিগকে দেয় সব টাকা দিতে পারেন নাই বিশেষতঃ বজ্রাঘাতে পুত্র মিরণের মৃত্যুতে তিনি শোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদীয় জামাতা মীরকাশিম কলিকাতায় কাউন্সিলের সঙ্গে গোল মিটাইতে আসিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় ইংরাজরা প্রীত হইলেন এবং মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহাকেই বাঙ্গালার

মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই জন্য মীরকাশিম কোম্পানীকে বৰ্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলাত্রয় প্রদান করিলেন। সাহায্যকারী ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও অর্থলাভ করিলেন।

কাশিম রাজকার্য্যে দক্ষ ছিলেন এবং মীরজাফরের মত সর্ব্বতোভাবে ইংরাজের অধীন থাকিবার লোকও ছিলেন না। তিনি কর বাড়াইয়া এবং ব্যয় কমাইয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই ইংরাজের দাবির টাকা শোধ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিয়া একদল সেনা শিক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজদিগের সহিত মীর কাশিমের বিবাদ বাধিল। বাদশাহী সনন্দবলে কোম্পানী এ দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিতেন। অসাধু ইংরাজ কর্ম্মচারীরা আপন আপন নৌকায় কোম্পানীর নিশান তুলিয়া শুল্ক দিবার দায় এড়াইবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাদিগের কাছে ছাড় কিনিয়া দেশীয় বণিকরাও সেই নিশান তুলিয়া শুল্ক এড়াইত। ইহাতে রাজস্বের কিরূপ ক্ষতি হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। মীর কাশিম ভ্যানসিটার্টের সহিত পরামর্শ করিয়া আদেশ করিলেন যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা কোম্পানীর তুল্যাধিকার পাইতে পারেন না—তাঁহাদিগকে আপনাদের ব্যবসায় পণ্যের উপর শতকরা ৯৲ টাকা হিসাবে শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু কাউন্সিলের স্বার্থপর সদস্যগণ কেবল লবণের ব্যবসায়ে শতকরা ২ টাকা ৮ আনা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের ব্যবহার স্মরণ করিলে ঘৃণানুভব হয়। ভ্যানসিটার্ট তাঁহাদের কথার অন্যায় ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। হেষ্টিংস ভ্যানসিটার্টের পক্ষাবলম্বন করায় বেটসন তাঁহাকে প্রহার করিলেন। মীর কাশিম বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য অন্তর্বাণিজ্যের শুল্ক

একেবারে তুলিয়া দিলেন। ইহাতে দেশের লোকের বিশেষ উপকার হইল বটে; কিন্তু বিশেষ সুবিধার পথ্য বন্ধ হওয়ায় ইংরাজরা অসন্তুষ্ট হইলেন। নবাবের কর্ম্মচারী পাটনায় ইংরাজদিগের কয়খানি নৌকা খানাতল্লাস করায় তথায় কোম্পানীর কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস পাটনা দখল করিলেন। কিন্তু গোরা সৈন্য মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া পড়ায় নবাবের লোক আবার নগর দখল করিয়া এলিস প্রভৃতিকে বন্দী করিল। নবাব রাজ্য মধ্যে সকল ইংরাজকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন।

এই সময় মীরকাশিম কতকটা সুসজ্জিত। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারী পাইয়া ভূমিরাজস্ব পরীক্ষা করিয়া নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত করেন এবং কঠোরভাবে বাকি বকেয়া আদায় করেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রদেশের রাজস্ব ১ কোটী টাকা বৃদ্ধি পায়। গুর্গন খাঁ নামে পরিচিত একজন আরমানী হুগলীতে বস্ত্রের ব্যবসা করিতেন। তাঁহাকেই নবাব সেনাদল শিক্ষিত করিবার ভার দেন। ৩ বৎসর যাইতে না যাইতে গুর্গন কোম্পানীর সেনাদলের আদর্শে ১৫ হাজার অশ্বারোহী ও ২৫ হাজার পদাতিক সৈনিক শিক্ষিত করেন। তিনি কামান ঢালাই করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উৎকৃষ্ট বন্দুক প্রস্তুত করান। তদবধি বহুকাল মুঙ্গেরের বন্দুক এ দেশে প্রসিদ্ধ ছিল।

মীরকাশিমের ব্যবহারে ইংরাজরা আবার মীরজাফরকে নবাব করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। যুদ্ধে কাশিমের পরাজয় হইতে লাগিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে গেরিয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনি পাটনা ত্যাগের পূর্ব্বে যে নৃশংস কার্য্য করেন, তাহাই তাঁহার চরিত্রে অনপণেয় কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত করিয়াছে। তিনি রাজা রামনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতিকে এবং এলিস প্রভৃতি ইংরাজ বন্দীদিগকে নিহত করেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে আবার কাশিমের পরাভব হইলে বাদশাহ ও ইংরাজের অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইলেন।

ওদিকে মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধের সংবাদে বিলাতে কোম্পানীর কর্ত্তারা ক্লাইবকে উপযুক্ততম লোক বুঝিয়া পুনরায় বাঙ্গালায় পাঠাই-লেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি যখন কলিকাতায় পৌছিলেন, তখন মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছে—তাঁহার পুত্র নাজিমুদ্দৌলাকে ইংরাজরা নবাব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ক্লাইব মুর্শিদাবাদে যাইয়া স্থির করিয়া আসিলেন, সেনাবিভাগ ও রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় সব কাজের ভার ইংরাজদিগের থাকিবে; খাজনা আদায়, বিচার প্রভৃতি যেমন নবাবের নামে এ দেশের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছিল, তেমনই হইবে। নবাব নিজ খরচা বাবদে ও বিদ্যালয়াদির ব্যয় জন্য বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। তাহার পর ক্লাইব বাদশাহকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে কোম্পা-নীর নামে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লইলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট এই সনন্দ কোম্পানীর হস্তগত হইল।

কোম্পানী হররামের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার প্রভাব বুঝিয়া তাঁহাকে আপনাদের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মিষ্টার গুডল্যাড যখন রঙ্গপুরের কালেক্টার তখন হররাম দেওয়ান দেবী সিংহের প্রতিনিধি হইয়া তথায় আগমন করেন। রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত বিধানে তিনি বিশেষ সাফল্যলাভ করিতেছিলেন। কিন্তু "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" সেই সাফল্যে বিঘ্ন ঘটে। ১৭৬৯—৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় বিষম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাঙ্গলা ১১৭৬ সালে সংঘটিত হয় বলিয়া ইহা এ দেশে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলিয়া পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের' আরম্ভে এই সময় দেশের দুরবস্থার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং

১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা একসন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৬ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাহিল, কৃষক-পত্নী আবার রূপার পৈঁছার জন্ম স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে কিছুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহণ ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর একসন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল। তারপর দুইসন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা মনে করিল, এই সময় "সরফরাজ" হইব। একেবারে শতকরা দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়। উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীচধান্য খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল, তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়েছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল; যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে

মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অনেকে জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত রোগে মরিল। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল, গৃহে গৃহে লোক বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে ? কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয়বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।"

এই দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষসঞ্জাত ব্যাধিতে বাঙ্গালার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐতিহাসিক হণ্টার বলিয়াছেন, বাঙ্গালার প্রজা ৪০ বৎসরে এই দুর্ভিক্ষজনিত ক্ষতি পূর্ণ করিতে পারে নাই। "It forms indeed the key to the history of Bengal during the succeeding forty years. It places in a new light those broad tracks of desolation which the English conquerers found everywhere throughout the Lower valleys ; it unfolds the sufferings entailed on an ancient rural society, by being suddenly placed in a position in which its immemorial forms and usages could no longer apply'

দেশের এই অবস্থা—প্রজার ঘরে অন্ন নাই, জমীদার অর্থশূন্য, অথচ জমীদারীর খাজনা বাড়িয়াছে। খাজনা দিতে না পারায় অনেক জমীদারের সম্পত্তি নিলাম হইতে লাগিল। এই সময় হররাম প্রায় ৪০ খানি মৌজা খরিদ করিয়া লইয়া পৈত্রিক সম্পত্তি বর্দ্ধিত করিলেন। এই সব মৌজার কতকগুলি তাঁহার পুত্র রামজীবনের নামে খরিদ হয়।

ইহার পর বাঙ্গালার রাজস্বের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" হয়। ১৭৭৭

খৃষ্টাব্দ হইতে যে ভাবে বৎসর বৎসর রাজস্ব বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহাতে খাজনা অনিশ্চিত হওয়ায় জমীদারেরা জমীজমার কোনরূপ উন্নতির চেষ্টা করিতেন না। সেই জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টাররা লর্ড কর্ণওয়ালিসকে রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরের জন্য "দশশালা" বন্দোবস্ত করেন এবং তাহাই চিরস্থায়ী হয়। এই বন্দোবস্তে স্থির হয়, জমীদারেরা নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিয়া পুরুষানুক্রমে জমীদারী সম্ভোগ করিতে পারিবেন ; কোম্পানী জমা বাড়াইতে পারিবেন না। বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কয়দিন সূর্য্যাস্তের মধ্যে কিস্তিমত খাজনা শোধ করিতে না পারিলে জমীদারের জমীদারী নিলাম হইয়া যাইবে। কোম্পানী যেমন জমীদারের রাজস্ব বাড়াইতে পারিবেন না, জমীদারও তেমনই হাজা, শুকা, ফৌতী, ফেরারী কোন অজুহাতে খাজনা মকুব পাইবেন না। প্রজার উপর যে সব মাথট বা আবওয়াব চলিত ছিল, সে সব এক করিয়া মোট জমা নির্দ্ধারিত হইবে। রাইয়ত তদনুসারে পাট্টা পাইবে জমিদার আর কোন নূতন মাথট বা আবওয়াব বসাইতে পারিবেন না।

এই বন্দোবস্তের সময় হররাম তদীয় পুত্র রামজীবনকে লইয়া কোম্পানীর সঙ্গে আপনার জমীদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। ইহাতেও তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা তখন অনেক জমিদার এ ব্যবস্থা করা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচনা করিয়া মন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। রঙ্গপুর জিলার জমিদারদিগের দ্বিধার বিশেষ কারণও বিদ্যমান ছিল।

যখন "দশশালা" বন্দোবস্ত প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার অল্পদিন পূর্ব্বেও রঙ্গপুর জিলার অনেক স্থান কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় রঙ্গপুরের জমীদারেরা সহসা কোম্পানীর সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। হররাম কিন্তু বুঝিয়াছিলেন, এ দেশে

স্বর্গীয় রাজা জানকীবল্লভ সেন বাহাদুর

ইংরাজশাসন বদ্ধমূলই হইবে। কাজেই বাদসাহের কাছে তিনি যে সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, ইংরাজ সরকারের সঙ্গে তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। তিনি "দশশালা" বন্দোবস্তের সুবিধাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে জমীদারেরা জমীদারী হস্তান্তর করিবার অধিকার পাইয়া পুরুষানুক্রমে একই খাজনায় জমীদারী ভোগ দখল করিতে পারিবেন—স্থির হইল। এইরূপে সমগ্র বাঙ্গলার রাজস্ব ২ কোটী ৬৮ লক্ষ ৯ শত ৮৯ সিক্কা টাকা বা ২ কোটী ৮৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭ শত ২২ টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে হররাম লোকান্তরিত হইলেন। তদীয় পুত্র রামজীবন তাঁহার বিপুল সম্পত্তি-লাভ করিলেন। ইহার সময় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে "দশশালা" বন্দোবস্ত কায়েমী হইয়া "চিরস্থায়ী" বন্দোবস্তে পরিণত হইল। সম্পত্তি লইয়া তাঁহাকে কতকগুলি মামলা মোকদ্দমায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সে সব মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি সম্পত্তির শৃঙ্খলাবিধানে ও উন্নতিসাধনে মন দেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামজীবনের পুত্র জয়রাম নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি দানশীল বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তিনিই মাহিগঞ্জ হইতে ডিমলায় বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। ডিমলা নীলফামারী মহকুমার অন্তর্গত। তাঁহার পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি নীলকমলকে দত্তক গ্রহণ করেন।

অল্প বয়সে নীলকমলের মৃত্যু হয়। তিনিও অপুত্রক থাকায় তাঁহার পত্নী শ্যামসুন্দরী চৌধুরাণী স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েন। কিন্তু নীলকমল পত্নীকে দত্তকগ্রহণের অধিকার ও অনুমতি দিয়া গিয়াছিলেন। সেই অনুমতিবলে শ্যামাসুন্দরী জানকীবল্লভকে দত্তক গ্রহণ করেন।

রঙ্গপুরে "শ্যামাসুন্দরী খাল" কাটাইয়া পুত্র জানকীবল্লভ জননীর পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন। অকালবৈধব্যে শ্যামাসুন্দরী এতই কাতর হইলেন যে, তিনি দেওয়ান রামরতন মিত্রের উপর সম্পত্তির ভার এবং পতির আত্মীয় ঈশ্বরচন্দ্রের উপর সাংসারিক সব ভার দিয়া ডিমলার গৃহে যাইয়া নির্জ্জনবাসে ধর্ম্মচর্চ্চায় পারলৌকিক কার্য্যে মন দিলেন। তিনি সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরচন্দ্রের উপর যে ভার দিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সদ্ব্যবহার করিলেন না। তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া অনিষ্ট চিন্তায় মন দিলেন। ফলে ডিমলার প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং শ্যামাসুন্দরী তাঁহার গৃহে বন্দী হইলেন বলিলেও অত্যুক্তি না। অগত্যা তিনি মাহিগঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। দেওয়ান রামরতন অবস্থা বিবেচনা করিয়া সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে প্রদান করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাহাই করিলেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সুব্যবস্থায় দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ টাকার ঋণ পরিশোধিত হইল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে শ্যামাসুন্দরীর লোকান্তর হয়।

বিষয়কার্য্যে অসাধারণ দক্ষতা ও লোকহিতকর কার্য্য—এই দুই কারণে রাজা জানকীবল্লভের নাম সুপরিচিত। বর্দ্ধমান জিলায় বাগনা-পাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, পরে শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন।

প্রথমে জানকীবল্লভকে দারুণ মোকদ্দমায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতামহ জয়রামের ভাগিনেয় কানাইলাল দত্তক অসিদ্ধ বলিয়া সম্পত্তি দাবি করিলেন। দুই পক্ষে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। শেষে হাইকোর্টের বিচারে জানকীবল্লভই যখন সম্পত্তির অধিকারী সাব্যস্ত হইলেন, তখন কয় বৎসর মোকদ্দমার ব্যয়ে সম্পত্তি ঋণভারে পীড়িত। কিন্তু জানকীবল্লভ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অদম্য উৎসাহে সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কেবল যে

সম্পত্তি ঋণমুক্ত হইল তাহাই নহে; পরন্তু তিনি বহু সম্পত্তি ক্রয়ও করিতে পারিলেন।

জানকীবল্লভ রঙ্গপুরে, বগুড়ায়, দিনাজপুরে, ২৪ পরগণায়, বারাণসীতে ও কলিকাতায় বহু সম্পত্তি ক্রয় করিয়া রাজপরিবারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে—তিনি নিঃস্বার্থভাবে বহু দায়িক জমীদারের জমীদারী কার্য্য পরিচালন ভার লইয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তি ঋণমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক স্থলে ঋণের আধিক্যে যে সব সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ও লইতে অস্বীকার করিয়াছেন, সে সব সম্পত্তি তাঁহারই সুব্যবস্থায় নির্দ্দোষ হইয়াছে। তাঁহার সাহায্য না পাইলে অনেক পুরাতন জমীদার ঘর দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিত। তিনি যে সব জমীদার ঘরের উপকার করিয়াছিলেন সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—রাধাবল্লভের অন্নদাপ্রসাদ সেনের ঘর, ফতেপুরের যতীন্দ্রকুমার চৌধুরীর, টাঙ্গাইলের কৈলাসগোবিন্দ মজুমদারের, ভূতসরার দুর্গাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের, কুণ্ডির চন্দ্রমোহন রায় চৌধুরীর নাবালক পুত্র প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরীর ও মনীষাচন্দ্র রায় চৌধুরীর, মাহিগঞ্জের ভুবনমোহন চৌধুরীর নাবালক পুত্র গোপালচন্দ্র চৌধুরীর ও মাহিগঞ্জের রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর। তিনি নিঃস্বার্থভাবে এইরূপে দুঃস্থ জমীদারদিগের উপকার সাধন করিয়াই নিরস্ত ছিলেন না; পরন্তু আরও বহুবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে আপনার অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং স্বাধীনভাবে মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান, জিলাবোর্ডের সদস্য এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। একই সময়ে এত কাজে তাঁহার অসাধারণ উৎসাহের ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পরিস্ফুট হইত। সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বুদ্ধি

বিবেচনার পরিচয় দিতেন। এইরূপ নানা কাজের পুরস্কার স্বরূপে সরকার ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

রঙ্গপুরের হিতকরকার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। দরিদ্র কখন তাঁহার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইত না। ১২৮০ বঙ্গাব্দে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি প্রায় ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া আপনার জমীদারীর এবং রঙ্গপুর জিলার অন্যান্য স্থানের লোককে চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন।

রঙ্গপুর জিলা হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বহু অর্থব্যয়ে শ্যামাসুন্দরী খাল খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। তখন সার ষ্টুয়ার্ট বেলী বাঙ্গালার ছোটলাট। তিনিই সে খালের প্রতিষ্ঠার উৎসব (Opening ceremony) সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

রঙ্গপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান হইয়া তিনি মিউনিসিপ্যালিটির আয় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং সহরে বহু স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থসাহায্যে মিউনিসিপ্যাল আফিস নির্ম্মিত হয়। রঙ্গপুর কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্রের জন্য তিনি ৮ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কৃষিই যে দেশে লোকের প্রধান অবলম্বন, সে দেশে কৃষির উন্নতি-বিধান কত প্রয়োজন তাহা তিনি বুঝিতেন এবং সেই জন্য রঙ্গপুরে কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

জানকীবল্লভের দান রঙ্গপুরেই নিবদ্ধ ছিল না ; তাঁহার জমীদারীতে নানাস্থানে তিনি বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে সকলের ব্যয়বহন করিতেন। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরোপকারী ছিলেন এবং দার্জ্জিলিং শৈলশিখরে হিন্দুদিগের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস (Sanitarium) প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি।

বঙ্গদেশের, বিশেষ রঙ্গপুরের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে পত্নী রাণী বৃন্দারাণী চৌধুরাণীকে ও পুত্র কুমার যামিনীবল্লভকে রাখিয়া রাজা জানকীবল্লভ দেহত্যাগ করেন।

ভাওয়ালের রাজবংশ

—————:০:—————

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী ভাওয়াল রাজষ্টেটের নাম কাহারও নিকট অবিদিত নহে। ভাওয়াল ঢাকা জেলার উত্তরে অবস্থিত। ঢাকার উত্তর হইতে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও মধুপুর গড়ের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত লক্ষ্মা নদীর পূর্ব্বে ও তুরাক নদীর পশ্চিমে বহুপরিমিতভূমি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। ঢাকার উত্তর হইতে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ এবং লক্ষ্মার পশ্চিম হইতে তুরাকের পূর্ব্ব ইহার মধ্যেই প্রায় ৫৭৯ বর্গমাইল অর্থাৎ ১১২০৯৭২ বর্গবিঘা ভূমি আছে। লোকসংখ্যা প্রায় ৬৫৩৮৬, তন্মধ্যে হিন্দু ২৭৬০৫ ও মুসলমান ৩৭৭৮১, ভাওয়ালে ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্প। ভাওয়ালের অধিকাংশ ভূমিই পতিত ও জঙ্গলময়। এস্থানে কোনও বৃহৎ নদী নাই। কেবল বালু ও টঙ্গী নদী নাম্নী দুইটি ক্ষুদ্র নদী আছে। ভাওয়ালের অধিকাংশ ভূমিই উচ্চ এবং সর্ব্বত্র সমতল নহে। জয়দেবপুরের কিয়দ্দূর উত্তর হইতে উত্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত গজার বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ইহাতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সকল বাস করে। ভাওয়ালে হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী, বহুয়া প্রভৃতি বাস করে। এখানকার বংশী ও কোচ নামক দুইটি অসভ্যজাতিও হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত। বংশীয় গণ বলবিক্রমশালী ও সাহসী। ইহারা দুর্গা কালী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর অর্চ্চনা করে, কৃষিকার্য্যই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কালীনারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুর ইহাদিগকে উপবীত ধারণের অনুমতি করিয়াছিলেন এবং তাহারা তদনুযায়ী আচরণ করিতেছে। কোচেরা দৃঢ়কায় শ্রমশীল। ইহারা স্বতন্ত্র কদর্য্য

ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাও জানে। ইহারা দুর্গাকালী প্রভৃতি কোন কোন হিন্দু দেবদেবীর অর্চ্চনা করে। কৃষিকার্য্য এবং কাষ্ঠ বিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ফিরিঙ্গিদের আচার ব্যবহার প্রায় মুসলমানের ন্যায়; কেবল বিবাহ ও ভজনাদি খ্রীষ্টানদের মতানুসারে হইয়া থাকে। বম্বুয়ারা বনদেবতার পূজা করে। কৃষিকার্য্য এবং চাকুরীই ইহাদের জীবনোপায়। ইহারাও বাঙ্গালা ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলে। সাঁকোসার পশ্চিম দিকে মাধব চালাগ্রামে সিদ্ধিমাধব নামে এক পাষাণময়ী দশভূজা মূর্ত্তি আছে। হিন্দু মুসলমান সকল জাতীয় লোকই তাঁহার অর্চ্চনা করে। হিন্দুগণ পাঠা বলিদান করে এবং মুসলমানগণ কুক্কুট বলি দেয়।

যিনিই কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই চেদি রাজ্য এবং চেদি পতি রাজা শিশুপালের নাম শুনিয়াছেন। অধুনা ঢাকার উত্তর পশ্চিমে ভাওয়াল, কাশীমপুর, চাঁদ প্রতাপ ও সুলতান প্রতাপ প্রভৃতি যে সকল বড় পরগণা বড়বড় জমিদারের সম্পত্তিরূপে বিরাজমান রহিয়াছে, সম্ভবতঃ এক সময়ে সেই সমগ্র ভূভাগ শিশুপালের চেদিরাজ্য ভুক্ত ছিল। তন্ত্রে চেদিরাজ্য কামাখ্যার এক অংশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং যে ভূখণ্ডের কথা বলা হইতেছে উহা পূর্ব্বদিকে হয়ত বর্ত্তমান কামাখ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল রাজ্য ছিল। ভাওয়ালের উত্তর পশ্চিম অংশে দীঘালির ছিট নামক স্থানে রাজা শিশুপালের রাজধানী ছিল বলিয়া লোকমুখে প্রবাদ প্রচলিত আছে। দীঘালির ছিট এখন হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতির আবাস স্থান হইলেও তথাপি ছিটের স্থানে স্থানে প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, প্রাচীরাদির ইষ্টক প্রভৃতি দৃষ্টি গোচর হয়। কামাখ্যার একাংশ কামাখ্যা বুড়ীগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ঢাকা নগরী যে এক সময়ে ভাওয়ালেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল, তাহাতে

আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বুড়ীগঙ্গা বোধ হয় এককালে ভাওয়ালের দক্ষিণ সীমার প্রাকৃতিক রেখা ছিল।

বর্ত্তমান মহেশ্বর দিও একদিন ভাওয়ালেরই এক অংশ ছিল। মহেশ্বরদির পৌরাণিক নাম মাহেশ্বতী। এই সম্মিলিত বিশাল ভূমির কটিদেশে রজত মেখলায় শীতল ও বিস্তীর্ণ লক্ষ্যা নদী প্রবাহিত। সেই লক্ষ্যাই এখন শীতললক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়া পশ্চিমে ভাওয়াল ও পূর্ব্বে মহেশ্বরদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন এই দুই পৃথক পরগনার সীমা রেখায় পরিণত থাকিয়া আপনার স্বাস্থ্যপ্রদ নির্ম্মল জলে একপারে ভাওয়ালের অন্য পারে মহেশ্বর দির অধিবাসীবৃন্দের পিপাসা নিবৃত্ত করিতেছেন।

রাজকীয় বিভাগ অনুসারে বর্ত্তমান ভাওয়াল ঢাকার উত্তর হইতে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও মধুপুর গড়ের দক্ষিণ এবং লক্ষা নদীর পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া তুরগ নদীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজমান ভাওয়ালের অধিবাসিগণ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী। এখানে মুসলমান প্রাধান্য অধিক হইবার কারণ এই যে বোধ হয় বহুদিন যাবত ভাওয়াল মুসলমান বাদশাহগণের শাসনাধীন ছিল। ভাওয়ালের ক্ষেত্র চির উর্ব্বরা; কৃষিকার্য্যের সুবিধা ভাওয়ালের ন্যায় আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কৃষি প্রধান স্থান বলিয়া বোধ হয় মুসলমান কৃষকই এখানে বহুসংখ্যায় বংশানুক্রমে বাস করিতেছে। রাজা শিশুপালের বংশ ধরেরা কতকাল ভাওয়ালে রাজত্ব করিয়াছিলেন তৎপরে কি সূত্রে কখন ভাওয়াল রাজ্য কোন্ রাজার অধিকারে ছিল সে সকল কথা বলিবার উপায় নাই। কালক্রমে পরাক্রান্ত প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব লোপ পাইলে ভাওয়ালে কতকগুলি ইতর শ্রেণীস্থ লোকের আধিপত্য ঘটে। এই সময় এক দুঃখিনী চণ্ডালিনীর গর্ভে যমজ পুত্রের উৎপত্তি হয়। একটির নাম প্রতাপ ও আর একটির নাম প্রসন্ন। দুঃখিনী চণ্ডালিনী গরু রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। দেশে রাজা নাই, সকলেই

স্ব স্ব প্রধান। যমজ বালকদ্বয় বিধাতার ইচ্ছায় যে শক্তি লইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, সে শক্তি গোচারণের মাঠে সীমাবদ্ধ থাকিবার নহে। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখিয়া স্বদেশে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন এবং স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধির বলে এবং বাহুর শক্তিতে ভাওয়াল ও চাঁদ প্রতাপ প্রভৃতি স্থানের স্বাধীন রাজা হইয়া বসিলেন। বর্ত্তমান জয়দেবপুরের প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে রাজবাড়ী নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। তাঁহারা "রায়" উপাধি গ্রহণ করেন। এখনও রাজবাড়ীতে রাজবাড়ীর চিহ্ন স্বরূপ ভগ্ন দালান ও পরিখাদি রহিয়াছে। প্রতাপরায় ও প্রসন্নরায় কৃষাণদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে যত্নবান ছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া শিখিতে গেলে কৃষি কার্য্যের বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া তাহারা লেখাপড়া শিখিতে সম্মত হয় না। পরিশেষে সহজে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্যে রায় রাজদ্বয় "চাষানাগরী" নামে একপ্রকার লেখার আবিষ্কার করেন। ভাওয়ালের কোন কোন চাষা এখনও সেই চাষানাগরী অবগত আছে। প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কারণ সৌভাগ্য বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের অহঙ্কারও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহারা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্ম - ণের জাতি নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহাদের রাজত্বের পর সমগ্র দেশ দিল্লীর সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়। কথিত আছে, প্রসন্ন ও প্রতাপ রায় একদা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছিলেন এবং নিজেরা অন্ন পরিবেশনের জন্য অন্নের থালা হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন যে তাঁহারা রাজমহিষীর হাতের ভাত ছাড়া আর কাহারও হাতে খাইবেন না। উভয় ভ্রাতা তখন উভয়ের স্ত্রীকে রাজমহিষী বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই আস্ফালন শেষে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হইল, যুদ্ধে উভয় ভ্রাতা প্রাণ হারাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের প্রতাপের যবনিকা পড়িল।

এই সময়ে ভাওয়ালের অন্তঃপাতী চৈরাগ্রামে যবন জাতীয় গাজী বংশীয়েরা বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তদ্বংশীয় পহলুয়ান সা গাজী সম্রাটের নিকট হইতে বর্ত্তমান চাঁদপ্রতাপ, কাশীমপুর, তালেপবাদ, সুলতান প্রতাপ ও ভাওয়াল—এই পাঁচ পরগণা একত্রে বন্দোবস্ত করিয়া লন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সা করকরমা গাজী ঐ জমিদারী ভোগ করেন। ইনি ছয় পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে সমস্ত জমিদারী পুত্রগণকে বিভক্ত করিয়া দিয়া যান এবং পুত্রদের প্রত্যেকের নামানুসারে যার যার অংশের নাম রাখা হয়। "ভাওয়াল গাজী" নামক একপুত্রের নামানুসারে এই দেশের নাম ভাওয়াল পরগণা রাখা হয়। বড়গাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুর গাজী কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র মহাতাপ গাজী, তৎপর তৎপুত্র ফাজীল গাজী, তৎপর তৎপুত্র নূরগাজী কর্ত্তৃত্ব করেন। নূরগাজীর পুত্র হীরা গাজী ও দৌলত গাজী ইঁহারা ক্রমে ভাওয়ালের কর্ত্তৃত্বপদ লাভ করেন। হীরাগাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দৌলত গাজী শাসন কর্ত্তা হন। ভাওয়ালের পূর্ব্বাংশে লক্ষানদীর তীরস্থ বর্ত্তমান কালী-গঞ্জের নিকটবর্ত্তী চৈরা গ্রামে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। তথায় আজিও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। গাজীবংশীয়েরা অতীব নিষ্ঠুর ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা এরূপ কাজ করিতেন যে তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। নানাস্থানে প্রাচীন ভগ্নবাড়ী ও দীর্ঘিকা দেখিয়া বোধ হয় যে এখানে অনেক ধনাঢ্য ও বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু গৃহস্থগণ বাস করিতেন, কিন্তু ইঁহাদের অত্যাচারে হিন্দু- গৃহস্থগণ একে একে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এমন কি ভাওয়ালের অনেক ইতর প্রজাও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া নানাস্থানে চলিয়া গিয়াছে। দৌলত গাজীর সময়ে ভাওয়ালের লোক সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। কাজেই তদ্দ্বারা নবাব সরকারের রাজস্ব শোধ

হইত না। দৌলতগাজীর নিকট বহু টাকা বাকী পড়িয়া থাকাতে ঢাকার নবাব সরকারে তাঁহার নামে মোকদ্দমা হয় এবং তাহাতে পরাস্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ নবাবের নিকট আপীল করেন। ঐ সময়ে কুশধ্বজ রায় নামক একব্যক্তি মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উকিল ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে দৌলতগাজী মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। তখন হইতে দৌলত গাজির সহিত কুশধ্বজ রায়ের পরম সখ্যতা ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনীর পুশিলাল বড়ই উচ্চ সম্মানাহ্ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশ। রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য বজ্রযোগিনীস্থিত পুশিলাল বংশ-

কুশধ্বজ রায়

সম্ভূত। রত্নেশ্বর কি কারণে জানি না গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে নিরুদ্দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যান না। সম্ভবতঃ তিনি বিদ্যা শিক্ষার জন্য দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। বিদ্যালাভ করিয়াও তিনি ঘটনা চক্রে দেশে ফিরেন নাই। মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী গোকর্ণনামক গ্রামে এক অধ্যাপকের বাটীতে যাইয়া তিনি পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। অধ্যাপক তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও সুচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া আপনার একমাত্র সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং কন্যা জামাতাকে স্বগৃহে স্থান দিয়া লোকান্তরে গমন করেন। পণ্ডিত রত্নেশ্বর আর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন না। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও পৌত্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী অধ্যাপনা করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নারায়ণ চক্রবর্ত্তীরই পুত্র কুশধ্বজ চক্রবর্ত্তী। কুশধ্বজ শিক্ষাবলে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উকিল নিযুক্ত হন। অল্পদিনের মধ্যে স্বকীয় বিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতার গুণে নবাব সরকারে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নবাব তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "রায়" উপাধি প্রদান করেন। মুর্শিদাবাদে উকিল কুশধ্বজ রায়ের যখন

বিস্তৃত পসার, সেই সময় দৌলতগাজীর স্বপক্ষে ওকালতী করিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বন্ধুত্ব লাভের পর কুশধ্বজ মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ভাওয়ালে বেড়াইতে আসিতেন।

কুশধ্বজ রায়ের পিতা নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তির ভ্রাতা রুদ্র চক্রবর্ত্তি। রুদ্রচক্রবর্ত্তীর সন্তানদিগের সহিত কুশধ্বজ রায়ের মনোবাদ উপস্থিত হয়। কুশধ্বজ তাঁহাদের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার সঙ্কল্প করেন। অনন্তর দৌলতগাজীর আগ্রহে ও যত্নে বাধ্য হইয়া বর্ত্তমান জয়দেবপুরের পশ্চিমদিগবর্ত্তি চাঁদনা গ্রামে জায়গীর স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানেই স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করিয়া লইলেন এবং সপরিবারে চাঁদনা আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ভাওয়াল আসিয়া ইনি সর্ব্বদাই গাজীদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের কার্য্য প্রণালী দেখিতেন। কার্য্য কর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া তিনি দৌলত গাজীকে সবিশেষ জানান এবং উক্ত গাজীও তাঁহাকে আপনার প্রধান দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য ইনি গাছা গ্রাম নিবাসী বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুত মহিমচন্দ্র ঘোষের পূর্ব্ব পুরুষকে বিলক্ষণ বিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ জানিয়া নায়েবী পদ প্রদান করিলেন এবং মফঃস্বলের সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রায় মহাশয় অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া সেই সেই স্থানে যোগ্য লোকসমূহ নিযুক্ত করেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপিত করেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া জমিদারী ভাল চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু গাজী জমিদারের স্বভাব চরিত্র আর কোনমতেই ভাল হইল না। তাঁহাদের অত্যাচার উৎপীড়ন পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে কুশধ্বজ রায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

রুদ্র চক্রবর্ত্তী

কুশধ্বজ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ৺বলরাম রায় গাজীবংশের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। ৺বলরাম রায় জানকীনাথ রায় নামে ভাওয়ালে পরিচিত। তিনি পিতার পদে নিযুক্ত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। গাজী জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রা কিন্তু ইহাঁর আমলেও কমিল না। ক্রমে ভাওয়ালের রাজলক্ষ্মী অত্যাচারী ও অকর্ম্মণ্য গাজী ভূস্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পুশিলালের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। ভাওয়ালের জমিদারী গাজী মুনিবের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ৺জানকীনাথ রায়ের নিজস্ব হইয়া পড়িল।

গাজীর পতন

৺জানকীনাথ রায় যারপর নাই কার্য্যক্ষম ও প্রকৃত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গাজীদিগের দেওয়ানীপদ গ্রহণ করিয়া জমিদারীর সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। গাজী ভূস্বামীর অত্যাচারে ও চরিত্র দোষে ভাওয়াল ইতিপূর্ব্বেই জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল প্রজা তথাপি দেশের মমতায় মুগ্ধ হইয়া শত অত্যাচার সহিয়াও ভিটা ছাড়িয়া যায় নাই, ক্রমে তাহাদের পক্ষেও গাজীর অপব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রজা সমস্ত দল বাঁধিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা খাজনা বন্ধ করিয়া দিল, গাজী আর রাজকর যোগাইতে পারেন না। নবাব গাজীর প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। পক্ষান্তরে জানকীনাথের কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া ভাওয়াল পরগণা জানকী রায়ের উপর সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু জানকীনাথ এইরূপ গুরুভার একাকী আপন স্কন্ধে লইতে সাহস পাইলেন না। গাছার বর্ত্তমান জমিদার মহিম বাবুর পূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি ভাওয়াল পরগণার ভার লইতে সম্মত হইলেন। অতঃপর জানকীনাথ নিজ নামে ।৶০, মহিমবাবুর পূর্ব্ব পুরুষের নামে ।৶০ এবং পানাসোণার পূর্ব্ব পুরুষের নামে ৵০ আনা

জানকীনাথ রায়

এই হারে বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ভাওয়ালের জমিদারী গ্রহণ করিলেন। বাদশাহও তাঁহাদের প্রতি প্রীত হইয়া ৺জানকীনাথকে ও গাছার ঘোষ মহাশয়কে "চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন।

জমিদারী দখল করিতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইল না। প্রজারা সকলেই গাজীর উপর অসন্তুষ্ট ছিল, সুতরাং প্রজার আনুকূল্য পাইয়া জানকী নাথকে ভাওয়ালের অধিপতি হইতে বড় বেশী বেগ পাইতে হইল না। জানকীনাথের ব্যবস্থায় ভাওয়াল রাজ্য বেশ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। কিছুদিন দক্ষতার সহিত জমিদারী পরিচালনার পর জানকীনাথ লোকান্তর গমন করেন। গাজীর বংশধরগণ এখনও পূর্ব্বোক্ত চৈরা গ্রামের নিকটবর্ত্তী জাঙ্গালিয়া নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

৺জানকীনাথ রায় মহাশয়ের তিন পুত্র। ৺রঘুনাথ রায়, রাজীব লোচন রায় ও শ্রীকৃষ্ণ রায়। জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ ও মধ্যম রাজীব জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রায় হিজরি ১০৮৮ সালে ৬ই জেলহজ্জ বাদশাহ উপাধির সনন্দ পাইয়া জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। চাঁদনা গ্রামে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর উৎপাত নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে শ্রীকৃষ্ণ রায় চাঁদনা হইতে "পীড়া বাড়ী" নামক স্থানে আপনার বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। রাজীব রায় তাঁহার সঙ্গে আসেন। জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ রায় দেওরায় অবস্থান করেন। রঘুনাথ রায়ের বংশলোপ হইয়াছে। রাজীবলোচন রায়ের বংশধরগণ এখনও রাজবাটীর সন্নিকটে সসম্ভ্রমে বাস করিতেছেন।

রঘুনাথ রায়

শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরীও তিন পুত্র রাখিয়া তনুত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ জগৎ রায় ও মধ্যম শ্যাম রায় অপেক্ষা সর্ব্ব কনিষ্ঠ জয়দেব রায় সমধিক বুদ্ধিমান ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া জমিদারী পরিচালনার অধিকার শ্রীকৃষ্ণ রায় জয়দেবরায়কেই দিয়া

শ্রীকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী

যান। অন্য দুই পুত্র কেবল মাসিক কিছু কিছু খোরাকীর বাবদ কিছু জমি পান। জগৎ রায়ের বংশ নির্ম্মূল হইয়াছে। শ্যাম রায়ের বংশধরগণ এখনও জয়দেবপুরে বাস করিতেছেন।

৺ জয়দেব রায় চৌধুরী

৺ জয়দেব রায় চৌধুরী যখন জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, তখন পলা সোনার ৵০ আনার অংশের অধিকার একজন অকর্ম্মণ্য নির্ব্বোধ লোকের হস্তে ছিল। সে শাসন কার্য্যে অক্ষম হইয়া নিজ দুই খানি অংশের জমিদারী জয়দেব রায় চৌধুরীকে লিখিয়া দেয়। জয়দেব রায় এই ভাবে ৷৷/০ আনা অংশের মালিক হওয়ায় অধিকতর প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। প্রজাগণের অনুরোধে তিনি নিজ বাস গ্রামের নাম—"পীড়াবাড়ী" স্থলে "জয়দেবপুর" রাখেন। জয়দেব রায় ৪৪।৪৫ বৎসর নিজবুদ্ধি কৌশল ও ক্ষমতা বলে সুশৃঙ্খলার সহিত জমিদারী শাসন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র ছিল। পুত্রের নাম ৺ ইন্দ্র নারায়ণ রায়।

৺ ইন্দ্র নারায়ণ রায়

৺ ইন্দ্র নারায়ণ রায় "চৌধুরী" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক ৷৷/০ আনি জমিদারীর মালিক হন। ভাওয়ালের ৷৷/০ আনিতে যখন ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মালিক, সেই সময়ে গাছার ঘোষ বংশের যিনি ৷৴০ আনির জমিদার ছিলেন তাঁহারও নাম ৺ ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ছিল। নামের ঐক্যতা হেতু উভয় ইন্দ্র নারায়ণে বিশেষ সখ্য ও বড়ই সদ্ভাব জন্মে। প্রথম হইতেই ৷৷/০ আনি ও ৷৴০ আনি এজমালী সম্পত্তি ছিল। উভয় ইন্দ্রনারায়ণ আপোষে ৷৷/০ আনি ও ৷৴০ আনির জমি বণ্টন করিয়া ভূমি পৃথক করিয়া লন। ঐ বিভাগ এখনও বলবৎ আছে। এই সময় আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। এখন গাজীর অত্যাচার নাই বটে, কিন্তু ভাওয়ালের নরনারী হিংস্রজন্তুর অত্যাচারে প্রতিনিয়ত উৎপীড়িত হইয়া প্রজাকুল

নির্ম্মূল হইতে লাগিল। অনেকে ভাওয়াল ছাড়িয়া দিগ্‌দিগন্তরে চলিয়া গেল। সুতরাং ভাওয়াল পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর জঙ্গলাবৃত হইয়া উঠিল। ॥৴০ আনি ও ।৶০ আনির উভয় ইন্দ্র নারায়ণ ভাওয়ালের রাজকর আর চলে না দেখিয়া হিংস্র জন্তু বিনাশ ও জঙ্গল আবাদের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়া তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবস্থা এরূপ শঙ্কট জনক হইয়া পড়িয়াছিল যে, জয়দেবপুর গ্রামবাসীরা হিংস্র জন্তুর উৎপীড়নে রাত্রিতে নিজ বাটীতে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে থাকে। ইন্দ্র নারায়ণ নিজ বাটীর কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে ইন্দ্রেশ্বর নামে শিব সংস্থাপন করেন। এখনও ঐ শিব ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থানটী তদবধি শিববাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রনারায়ণ হইতেই এই বংশের নামের সঙ্গে "নারায়ণ" শব্দের যোগ হইয়া আসিতেছে। বিজয় নারায়ণ, চন্দ্র নারায়ণ ও কীর্ত্তি নারায়ণ রায় এই তিন পুত্র রাখিয়া ইন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

চন্দ্রনারায়ণ ও কীর্ত্তিনারায়ণ

ইন্দ্র নারায়ণ রায়ের মৃত্যু সময়ে চন্দ্র নারায়ণ ও কীর্ত্তি নারায়ণ রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। তথাপি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বিজয় নারায়ণ রায় তাঁহাদের সহিত এক যোগেই জমিদারী কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। পরগণা অরণ্যময়। হিংস্রজন্তুর অত্যাচার অসহ্য। আয় দ্বারা সদরে খাজনাও ভালরূপ চলিয়া উঠে না। বিজয় নারায়ণ ।৶০ আনির জমিদারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাওয়ালের উন্নতি কল্পে এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বহুমৌজা নিষ্কর দিয়া এবং অনেক মৌজা বিনামূল্যে তালুকরূপে লিখিয়া দিয়া নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য

প্রভৃতি বংশের ভদ্রলোকদিগকে ভাওয়ালে আনিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভাওয়ালে বহু সংখ্যক তালুকদারের সৃষ্টি হইল। এই সকল তালুকের আয় বর্ত্তমানে প্রায় লক্ষ টাকা। বিজয় নারায়ণ রায় ও কীর্ত্তি নারায়ণ রায় জীবিত থাকিতে উদয় নারায়ণ রায় নামে একটি পুত্র রাখিয়া চন্দ্র নারায়ণ রায় লোকান্তর প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ কীর্ত্তি নারায়ণ রায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র উদয় নারয়ণ রায়কে রাখিয়া বিজয় নারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় মানব লীলা সংবরণ করেন।

কীর্ত্তিনারায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্র উদয় নারায়ণকে লইয়া এক যোগে জমিদারী কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই উদয় নারায়ণ রাজনারায়ণ নামে একটি শিশু পুত্র রাখিয়া কাল-গ্রাসে পতিত হন। অতঃপর কীর্ত্তিনারায়ণ রায় চৌধুরী একাকীই জমিদারীর কার্য্য করিতে থাকেন। তদানীন্তন ব্যবস্থানুসারে বিজয় নারায়ণের সম্পত্তির অধিকারী তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কীর্ত্তিনারায়ণই হইলেন। কীর্ত্তিনারায়ণের স্বভাব একটু ভীরু হইলেও তিনি বড়ই ধার্ম্মিক, উদার, দয়ালু ও ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন। কীর্ত্তি-নারায়ণ রায় চৌধুরী ৬১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নরনারায়ণ রায় নামে একপুত্র ও অষ্টম মাস গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া লোকান্তরিত হন। তিনি যখন তনুত্যাগ করেন, নরনারায়ণের বয়স তখন মাত্র ১১ বৎসর। কীর্ত্তিনারায়ণের মৃত্যু হইলে বয়স্ক রাজনারায়ণই জমিদারীর কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। খুল্লতাত নারায়ণ অল্প বয়স্ক হইলেও কাজ কর্ম্মে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। নরনারায়ণ রায় অল্প বয়সেই অসাধারণ বুদ্ধিমান, সাহসী ও বলবিক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নরনারায়ণের বাল্যে ঈদৃশ প্রতিভা দেখিয়া রাজনারায়ণ বাবুর পিতৃস্বসা অম্বিকাদেবী ভাবিলেন, এ বালক এখন যেরূপ প্রতিভা-

৮কীর্ত্তিনারায়ণ রায়

নরনারায়ণ রায়

শালী ও বুদ্ধিমান দেখিতেছি, না জানি এ বড় হইলে রাজনারায়ণকে কিরূপ বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে। অবশেষে কৌশল করিয়া শত্রুপক্ষ নারায়ণ সিকদারের বাটীতে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া নরনারায়ণকে বিষ প্রয়োগে মারিয়া ফেলিল। রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণে বিশেষ প্রণয় ছিল। রাজনারায়ণ এই অসহ্য শোক সহ্য করিতে পারিলেন না। যাহারা এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে অম্বিকাদেবী একদিন তাঁহাকে বলিলেন, তুমি ইহাদিগকে আর কষ্ট দিও না। ইহারা দোষী নহে, আর যদি দোষ করিয়াও থাকে তাহা তোমারই মঙ্গলের জন্য। অম্বিকাদেবী এই নৃশংস ব্যাপারে জড়িত, রাজনারায়ণ তাহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এখন আর অবিশ্বাস রহিল না। তিনি ক্রোধে ও দুঃখে আর অম্বিকাদেবীর মুখ-দর্শন করিলেন না। তাঁহাকে নৌকা করিয়া ৺কাশীধাম পাঠাইয়া দিলেন। এই ঘটনার পর রাজনারায়ণ রায় কিঞ্চিৎকাল জমিদারী ভোগ করিয়া লোকান্তরিত হন। রাজ নারায়ণের যত্নে ভাওয়ালের বহুসংখ্যক হিংস্র জন্তু নিহত হইয়াছিল।

রাজনারায়ণ যখন মৃত্যু-কবলে পতিত হন, তখন পিতৃব্য লোক নারায়ণ নাবালক। তিনি লোক নারায়ণের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলেন না। রাজনারায়ণ নিঃসন্তান। সুতরাং লোক নারায়ণ রায় চৌধুরীই জমিদারীর মালিক হইলেন। রাজনারায়ণের শাসন কালের শেষভাগে বঙ্গদেশ যবনের অধিকার হইতে চ্যুত হইয়া ইংরেজ রাজের অধীন হয়। লোকনারায়ণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া ভাওয়ালের বিপুল জমিদারী উত্তরাধিকারী সূত্রে তাঁহার হইল। বালক হইলেও লোক নারায়ণ বুদ্ধিমান্ ও তীক্ষ্ণদর্শী ছিলেন।

৺লোকনারায়ণ রায়

সুতরাং জমিদারী কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিল না। তিনি অতি পরিপাটীরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ১১১৪ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষের সময় কামাখ্যা ও কুচবিহার হইতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোচ ও বংশী জাতীয় লোক দুর্ভিক্ষে প্রাণ-রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। লোক নারায়ণ রায় চৌধুরী গাছার জমিদার কৃষ্ণানন্দ রায় চৌধুরীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই আশ্রয়ার্থী অসভ্যদিগকে ॥/০ ও ।৶০ আনিতে কতক নিষ্কর ভূমি দিয়া তাহাদিগকে স্থাপন করিলেন। এই উপায়ে ভাওয়ালের লোক সংখ্যা কিছু বাড়ে। বন্দুকাদি অস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী অসভ্যদিগের কৌশলে ভাওয়ালে হিংস্র জন্তুর ভয় অনেকটা নিবারিত হয়। এই দুর্ভিক্ষের সময় ঝাঝর গ্রামে ॥/০ আনির প্রজা সীতারাম রাহা নামে একজন বড় কৃষাণ ছিল এবং তাহার ঘরে প্রচুর ধান্য মজুত ছিল। সীতারাম উচিত মূল্যে নিজের গোলার ধান দিয়া দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বহুসংখ্যক প্রজার প্রাণ রক্ষা করেন। উদার হৃদয় লোক নারায়ণ রায় চৌধুরী সীতারামের এই সদ্ব্যবহারে এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, সীতারামকে এক নায়েবী কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তাঁহার বাসগ্রাম ঝাঝর তাহাকে তালুক করিয়া দিলেন।

১১৯৮ সনে লোক নারায়ণ রায় চৌধুরী ও কৃষ্ণ শ্যাম কিশোর চৌধুরীর নামে—২৫১৬০৲ টাকা সিক্কাতে ভাওয়াল সম্বন্ধে দশশালা বন্দোবস্ত হয় এবং তৎপর ১২০১ সালে ॥/০ আনি ৯নং মহল ১১৭৭৪ টাকা সিক্কাতে লোক নারায়ণ রায় চৌধুরীর নামে এবং ।৶০ আনি ১০ নং মহাল ১৩৩৮৬ টাকা সিক্কাতে কৃষ্ণশ্যাম কিশোর রায় চৌধুরী নামে পৃথক তালুক হইয়া পড়ে।

লোক নারায়ণের সময়ে ভাওয়ালে মলঙ্গির ধুম হয়। মলঙ্গির এক শ্রেণীর দস্যু। ইহারা জাতিতে মুসলমান। ইহাদের প্রকাশ্য ব্যবসায়

ফকিরের সাজে ভিক্ষা করা। কিন্তু লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনই ছিল ইহাদের প্রকৃত ব্যবসায়। শীতকালে উহারা আসিয়া ২।৩ মাস পর্য্যন্ত বর্গির মত ভাওয়ালকে উৎপীড়িত করিয়া চলিয়া যাইত। দুই তিন বার এইরূপ হওয়ায় পরে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক এই দৌরাত্ম্য নিবারিত হইয়া যায়। বলা আবশ্যক যে এ সময় এ দেশে ইংরেজের শাসন স্ফোটোনোন্মুখী। লোক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ৯ নং জমিদারি ভুক্ত "বান্দাখোলা" নামক স্থান চণ্ডালের জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল। লোক নারায়ণ তাহাদিগকে নিজের বাহুবল ও বুদ্ধি সামর্থ্যের দ্বারা অচিরে বশীভূত করেন। পার্শ্ববর্ত্তী কাশীমপুরের জমিদারের সহিত মৈত্রী স্থাপিত হয়।

লোক নারায়ণের পত্নীর নাম ৺ সিদ্ধেশ্বরী দেবী। সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী ভাওয়াল ইতিহাসের এক অতি বড় প্রসিদ্ধা রমণী। তাঁহার কথা যথাসময়ে কথিত হইবে। ১২০১ সালের ভাদ্র মাসে সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণীর গর্ভে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ গোলক নারায়ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। গোলকনারায়ণ যখন তিন মাসের শিশু তখন গোলকনারায়ণকে রাখিয়া লোকনারায়ণ ইহলোক হইতে চিরতরে প্রস্থান করে।

৺গোলকনারায়ণ রায়

স্বামী স্বর্গগত, পুত্র শিশু। সিদ্ধেশ্বরী দেবী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন কে বা জমিদারী রক্ষা করিবে? কিরূপেই বা ক্রোড়স্থ শিশু মানুষ হইবে? পতিশোকের সঙ্গে এই সকল দুরূহ ভাবনা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ হইতে নারায়ণ দাস বাবু নামে এক ব্যক্তি জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

কোন সম্পত্তির মালিক ও অভিভাবক নাবালক ও স্ত্রীলোক হইলে প্রাপ্ত বয়স্ক সর্প প্রকৃতি দুষ্ট লোকেরা অন্ধকার গর্ত্ত হইতে মাথা তুলিয়া বন্ধু ও হিতৈষীর মূর্ত্তিতে কুমন্ত্রণার বিষ ঢালিতে আরম্ভ করে। এ ক্ষেত্রেও

তাহাই হইল। রাজনারায়ণ রায় চৌধুরীর সন্তানহীনা বিধবা স্ত্রী তারিণী দেব্যা তখন জীবিতা ছিলেন, লোকেরা তাঁহাকে পোষ্য গ্রহণে মন্ত্রণা দিয়া তাহা কর্ত্তৃক ॥৵০ আনি হইতে।৵০ আনি পৃথক করাইয়া তাহার নিজ দখলে লইয়া যায়। উহারা প্রায় সমগ্র ॥৵০ আনীর প্রজাগুলিকে হস্তগত করিয়া সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণীর গ্রাসাদচ্ছাদন পর্য্যন্ত বন্ধ করায় তাঁহাকে উপবাসিনী করিয়া তুলেন। চৌধুরাণী পুত্র লইয়া মহা বিপদ সমুদ্রে পতিত হইলেন। কতিপয় জ্ঞাতি কর্মচারীর সাহায্যে তিনি কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ভগবানের দয়ায় সিদ্ধেশ্বরী অপার সমুদ্রে কূল পাইলেন। আদালতে নাবালক গোলক নারায়ণ রায়ের উচ্ছী রাম শঙ্কর রায়ের নামীয় ও ছায়েত নামা উপস্থিত করিয়া উহা প্রমাণিত হইলে বিত্ত ক্রোক হইতে মুক্তিলাভ করিল। উচ্ছী কর্ত্তা হইলেন। সিদ্ধেশ্বরী দেবীরও অন্নবস্ত্রের কষ্ট দূর হইল।

তারিণীদেব্যা পোষ্য লইয়া পূবাইলে বাস করিতেছিলেন। পোষ্য বয়স্থ হইলে তারিণী দেবীর সহিত তাঁহার ঘোরতম মনোবাদ উপস্থিত হইল। পোষ্য মাতাকে পূবাইল হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তারিণী দেব্যা যে সিদ্ধেশ্বরীকে পথের ভিখারিণী বানাইবার যোগাড় করিতে ছিলেন, এখন আবার তাঁহারই শরনাপন্ন হইলেন। পোষ্য নামঞ্জুর হইয়া যায়, সুতরাং উক্ত ৵০ আনি পুনরায় গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরীই প্রাপ্ত হন।

গোলকনারায়ণের এই সময়ে একটু বয়স হইয়াছে এবং তাহার প্রথম পরিণয় হইয়া গিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী ও জমিদারী শাসন সংরক্ষণে প্রকৃতই ক্ষমতাশালিনী ছিলেন। যেখানে শক্তি সেইখানেই সম্পদ। সিদ্ধেশ্বরী পুত্র নাবালক থাকা

কালে উহার সাহায্যে এমনভাবে জমিদারীর শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন, যে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে ভাওয়াল বিতাড়িত হইয়াও অক্ষুণ্ণ রহিল। গোলক নারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মাতার হাত হইতে জমিদারীর কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন না।

গোলক নারায়ণ রায় তেজস্বিনী মায়ের ছায়ায় নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকিয়া অন্তরূপে বিকাশ প্রাপ্ত লইলেন। গোলক নারায়ণ ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, উদার চরিত্র, দয়ালু, উদাসীন প্রকৃতির লোক হইয়া উঠিলেন। ১২২৫ সালের ২৫শে শ্রাবণ গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরীর প্রথম পরিণীতা পত্নী লক্ষ্মী প্রিয়া দেবীচৌধুরাণীর গর্ভে কালী নারায়ণ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

৺গোলক নারায়ণ রায়

ভাওয়ালে আবার একটা অতি ভয়ঙ্কর ঝটিকার সূত্রপাত হয় ভাওয়াল ।৶৹ আনির জমিদার ৺কালীকিশোর রায় চৌধুরী ঋণ দায়ে জর্জ্জরিত হইয়া ঢাকার প্রসিদ্ধ নীলকর জমিদার ওয়াইজ সাহেবের নিকট জমিদারীর কতক অংশ বিক্রয় করেন। সাহেব কৌশল ক্রমে ।৶৹ আনির অন্যান্য জমিদারদিগের নিকট হইতেও ।৶৹ আনির কিছু কিছু অংশ খরিদ করিয়া ভাওয়ালে প্রবিষ্ট হন। ওয়াইজের ত্রাসে এখন ঢাকা কম্পিত ছিল। ওয়াইজকে ভাওয়ালে প্রবিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিমতী সিদ্ধেশ্বরী চিন্তিত হইলেন। ওয়াইজ সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণীর জমিদারী দখল করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে বিবাদের সূত্রপাত করিলেন। ওয়াইজ সাহেব মদাফা নামক স্থানে সদর কাছারী এবং জয়দেবপুরের পশ্চিমাংশে ভাবারিয়া নামক স্থানে অন্য এক কাছারী বসাইয়া ৷৷/৹ আনির জমি বলপূর্ব্বক দখল ও প্রজা হস্তগত করিবার নিমিত্ত প্রজার উপর অপরিসীম অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী ২০ বৎসরের যুবক। নিতান্ত তরুণ বয়স্ক হইলেও তিনি পূজনীয়া পিতামহী সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী মহাশয়ার উপযুক্ত পৌত্ররূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। জমিদারী কার্য্যে এই বয়সেই তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তিনি যেমন সাহসী তেমনি কৌশলী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধেশ্বরী সুযোগ্য পৌত্র হইতে ওয়াইজ সাহেবের ন্যায় ভয়ঙ্কর প্রবল রিপুর আক্রমনে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন।

কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী

১২৪৭ সালে বিবাদ চরমে যাইয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী প্রজার কান্না ও সাহেবের লোকের অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। শেষে মরিয়া হইয়া তিনি পৌত্র কালীনারায়ণকে লইয়া ওয়াইজ সাহেবের অত্যাচার দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোচবংশী ও অন্তবিধ বহু লাঠিয়াল সংগৃহীত হইল। ভগীরথ পাঠক নামে ঢাকার এক প্রসিদ্ধ বলবান ভনুগীর চৌধুরাণী পক্ষের দলপতি হইল। ওয়াইজ সাহেবের দলপতি পাঞ্জু সর্দ্দার। এখনও ভাওয়ালের লোক ভগীরথ ও পাঞ্জুর নাম শুনিলে ভয়ে কাপিয়া উঠে। শান্তিপ্রিয় ও ধার্ম্মিক গোলকনারায়ণ রায় চৌধুরী এই সকল আয়োজন দেখিয়া তীর্থ পর্য্যটন উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে চলিয়া যান। তীর্থযাত্রায় তাঁহার বড় আনন্দ ছিল। তিনি সংসারে স্বভাবতঃ উদাসীন ছিলেন। অনেক সময় সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেন। কিন্তু মায়ের কৌশলে পারিতেন না। সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী ও কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী সপরিবারে জয়দেবপুর ত্যাগ করিয়া ঢাকায় বাসা বাটীতে গিয়া থাকেন। কার্য্যভার কর্ম্মচারীর উপর থাকে।

১২৪৫ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ অতি প্রত্যুষে ওয়াইজ সাহেবের দল পাঞ্জু সরদার নামক নায়কের অধীনে জয়দেবপুর লুণ্ঠন ও মাধবের মন্দির ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে তারারিয়া কাছারি হইতে জয়দেবপুর অভিমুখে

যাত্রা করে। ইহা শুনিয়া ভগীরথ পাঠকের দল তারারিয়া অভিমুখে ধাবিত হয়। তারারিয়া কাছারীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিখারখান আম্বী নামক পুষ্করিণীর উত্তরে মাঠের মধ্যে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পাণ্ডুর দল পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। ওয়াইজ সাহেব পরাভূত হন।

সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরী কতকাল জীবিত ছিলেন, ওয়াইজ সাহেবের সহিত বিবাদ বিসংবাদ ততকালই চলিয়াছিল। কিন্তু এরূপ প্রবল বিবাদ আর হয় নাই। ওয়াইজ সাহেবও বিবাদে মেটের উপর তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই।

এইরূপ ঝটিকার পর ঝটিকায় নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেজিত হইয়াও সিদ্ধেশ্বরীর বুদ্ধি কৌশলে ৷৷/০ আনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। অবশেষে ১২৫২ সালের বৈশাখ মাসে এই ভাগ্যবতী তেজস্বিনী ৷৷/০ আনির জমিদারী অক্ষুণ্ণ, গৃহে প্রভূত সঞ্চিত ধন ও পুত্র গোলকনারায়ণ রায় চৌধুরী ও পৌত্র কালীনারায়ণ রায় চৌধুরীকে সুস্থ করিয়া জয়দেবপুরে মানবলীলা সংবরণ করেন।

মাতৃবিয়োগের পর গোলকনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় পুত্র কালীনারায়ণ রায় চৌধুরীর প্রতি জমিদারীর কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া জপতপাদি করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় কিছুতেই পিতৃদেবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জমিদারীর ভার লইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা অনিচ্ছায় গোলক নারায়ণ রায়কেই জমিদারী-কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইল। মাতার জীবিতকালে তিনি জমিদারীর কোন খবর লইতেন না। কিছুদিন কার্য্য করিবার পর জমীদারীর ব্যাপার তাঁহার নিকট দুর্ব্বহ ভার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি কোন কর্ম্মচারীর সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া একদা একাকী ওয়াইজ সাহেবের বাটীতে

উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। সাহেব তাঁহাকে সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক বলিয়া অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং সন্ধির প্রস্তাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। পর দিনেই লেখা পড়া হইয়া যায়। অতঃপর ১২৫২ সালে কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর নামে জমিদারী লিখিয়া দিয়া তিনি পুনরায় জপ তপে নিযুক্ত হইলেন।

১২৫৬ সন পর্য্যন্ত ওয়াইজ সাহেবের সহিত আর কোন বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই। ভাওয়ালের লোক পরম শান্তিতে বাস করে। অতঃপর ওয়াইজ সাহেবের সহিত ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হয়। গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী বড়ই উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হইয়া পুনরায় ওয়াইজ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি অসীম সাহসের সহিত প্রস্তাব করেন, "সাহেব, বালক কালী নারায়ণের সহিত তোমার বিবাদ করা পোষায় না। অথচ তুমি ও আমি ভাওয়ালে থাকিতে শান্তি নাই। অতএব হয় আমার ইচ্ছানুরূপ মূল্য দিয়া আমার ৷৵৹ আনি খরিদ করিয়া লও অথবা ।৵৹ আনির যে সকল ভূমি তুমি খরিদ করিয়াছ বা দখল করিয়া লইয়াছ সাধ্য হইলে তোমার ইচ্ছানুরূপ মূল্য দিয়া আমিই তাহা ক্রয় করিয়া লই।" সাহেব তাহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বিক্রয় করিবে কেন? যদি আমার খরিদা হিস্যার প্রতি আমাকে লক্ষ টাকা মূল্য দেও, তবে আমিই বিক্রয় করিব।" গোলক নারায়ণ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আসেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার কর্ম্মচারিগণ বিস্মিত হন। কালী নারায়ণও তাহা শুনিয়া ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী কাহারও নিষেধ শুনিলেন না। অবশেষে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা মূল্যে ওয়াইজ সাহেবের ।৵৹ আনি সম্পত্তি খরিদ করা হয়। অতঃপর ভাওয়ালে স্থায়ীরূপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু গোলক নারায়ণ রায় মহাশয় এই কার্য্যে ঋণগ্রস্ত হইলেন।

১২৫৮ সালে জমিদারী খরিদ হইল। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুবুদ্ধি ও কার্য্যের সুবন্দোবস্তে ১২৬৩ সালের মধ্যেই সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গেল। এইরূপে জমিদারী নিরাপদ ও বর্দ্ধিত করিয়া এবং ঋণদায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া ১২৬৩ সালের ১৩ই পৌষ গোলক নারায়ণ স্বর্গারোহণ করেন। গোলক নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় নিজ বাটীর পশ্চিম দিকের জলাশয় সেঁচাইয়া অতি বৃহদাকার এক দীর্ঘিকা খনন করেন। ঠাকুর মায়ের বিগ্রহ পূর্ব্বে খড়ের ঘরে ছিল, তিনি সেই ঘর পাকা মন্দিরে পরিণত করেন। নিজ বাটীর খড়ের ঘরগুলি পাকা দু'মহলা অট্টালিকায় পরিণত করেন। ঢাকার মাদারজাওার গলিতে কিঞ্চিৎ ভূমি খরিদ করিয়া বড় একটা বাটী নির্ম্মাণ করা হয়। জয়দেবপুরে বাটীর নিকট বিস্তীর্ণ বাজার বসাইয়া আহার্য্য দ্রব্যাদির অভাব দূর করেন। তিনি বাটীর পশ্চিম দিকে মঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহাতে তারামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। যে জয়দেবপুর এক্ষণে ঢাকা হইতে ২২ মাইল দূরে অতুলশোভা ও সম্পদের পসার খুলিয়া ঢাকা নগরীর ঐশ্বর্য্য সম্পদকেও প্রতিহিংসা করিতেছে সেই জয়দেবপুরের প্রতিষ্ঠা স্বর্গীয় গোলক নারায়ণেরই অতুল কীর্ত্তির ফল।

সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণীর শাসন ও ঢাকার প্রবল প্রতাপ ওয়াইজ সাহেবের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গে বিংশতি বৎসরের যুবা কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর সাহস, বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। গোলক নারায়ণ জীবিত থাকিতেই ভাওয়ালের ॥৵০ আনির জমিদারী ঘটিত কর্ত্তৃত্ব কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের হাতেই গড়াইয়া পড়ে। পিতৃদেবের স্বর্গারোহনের পরে তিনিই ভাওয়াল ॥৵০ আনির সর্ব্বময় কর্ত্তা হন।

৺কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী।

গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পরিণয়। প্রথম পরিণীতা পত্নী লক্ষ্মী প্রিয়া দেবী চৌধুরাণীর গর্ভে প্রথমতঃ একটী কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তৎপর কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। কন্যা আনন্দময়ী দেবী যখন মাত্র ৯ বৎসরের বালিকা এবং কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মাত্র চারি বৎসরের শিশু, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী চৌধুরাণীর মৃত্যু হয়।

কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় শৈশবে একটী সোণার পুতুলের মত সুন্দর ছিলেন। গোলক নারায়ণ প্রভৃত সম্পত্তির মালিক; তাঁহার একটী মাত্র পুত্র শৈশবে মাতৃহীন। মাতা সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী স্নেহে আবরিয়া লইয়া শিশুকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পিতামহীর আদরে ও স্নেহে থাকিয়া কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের লেখা পড়ায় তত মনোযোগ ছিল না। তিনি তদানীন্তন চলিত সামান্যরূপ বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিলেন। সেই সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই তাঁহার কতকগুলি পুরুষোচিত গুণগ্রামের বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি অশ্বারোহণে অল্প বয়স হইতেই ভারি নিপুণ হইয়া উঠিলেন।

কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী যখন মাত্র ৯ বৎসরের শিশু তখন গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় গোপনে কামাখ্যা চলিয়া যান। জমিদারী তখন শত্রুসঙ্কুল। কালীনারায়ণ শৈশবে মাতৃহীন; এখন পিতৃদেবও নিরুদ্দেশ। কালীনারায়ণের এখন মাতাপিতা, সহায় ও শক্তি সমস্তই—পিতামহী সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী।

কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী যেমন একটু একটু করিয়া বয়সে বাড়িতে লাগিলেন, ততই তাঁহার শরীরে সৌন্দর্য্য, হৃদয়ে সাহস ও মনে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি

অশ্বারোহণে বড়ই সুনিপুণ ও পারদর্শী ছিলেন। মাঝে মাঝে অশ্বারোহণে একাকী ঢাকায় যাতায়াত করিতেন।

শুভক্ষণে তিনি ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ ওয়াল্টার সাহেবের কুঠিতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। সাহেব কালীনারায়ণের দিব্য কান্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মধুর বাক্যবিন্যাস পটুতা দর্শনে প্রীত হইলেন। তিনি শৈশবে মাতৃহীন। তাঁহার পিতৃদেব নিরুদ্দেশ। এই সকল দুঃখজনক কাহিনী শুনিয়া সাহেবের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। ক্রমে তিনি তাঁহাকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদীয় পত্নীও মাতৃহীন বালক কালীনারায়ণকে আদর করিতেন। ওয়াল্টার সাহেবের একটি পুত্র কালীনারায়ণ রায় চৌধুরীর সমবয়স্ক ছিল। তাঁহার সহিত কালীনারায়ণের সৌহার্দ্য জন্মিল—উভয়ে একত্রে বেড়াইতেন ও একত্রে খেলাইতেন। একসঙ্গে অশ্বারোহণে ক্রোশের উপর ক্রোশ পরিভ্রমণ করিতেন।

ওয়াল্টার সাহেব বালক কালীনারায়ণের অভিভাবক স্থানীয় হইয়া তদানীন্তন প্রচলিত পারশ্য ভাষা যাহাতে তিনি শিখিতে পারেন সেই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং যাহাতে নিরুদ্দিষ্ট গোলক নারায়ণের অনুসন্ধান হইতে পারে তাহারও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার উভয়বিধ চেষ্টাই ফলবতী হইল। কালীনারায়ণ পারশ্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। কামাখ্যায় গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরীরও সন্ধান পাওয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী বহু যত্নে গোলক নারায়ণকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন।

কালীনারায়ণ অশ্বারোহণে যেমন কৃতীত্ব লাভ করিলেন, বন্দুক চালনাতেও তেমনি সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিলেন। শিকারে তাঁহার উৎসাহ ও সাহস অপরিসীম, সন্ধান অব্যর্থ। এই দুই পৌরুষ গুণে ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুগ্রহে সাহেব মহলে তাঁহার পরিচয় ও আদর

হইতে লাগিল। তিনি সাহেবদের লইয়া শিকারে যাইয়া ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হইতেন। তাঁহার মিষ্টালাপ, চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া সাহেবেরা তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন।

কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী যখন মাত্র ১৪।১৫ বৎসরের বালক, তখন অর্থাৎ ১২৩৯ সনে তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়। কোন সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। ১৯ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১২৪৩ সনে তিনি দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেন। ১২৫১ সালে তাঁহার একটি কন্যা জন্মে, কিন্তু এই কন্যা একমাস মাত্র জীবিত ছিল। ইহার পর ৫।৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহার আর কোন সন্তান জন্মে নাই। গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর তিনি পুনরায় এক বিবাহ করেন। সেই পত্নীর গর্ভেও একটি কন্যা জন্মে। তাঁহার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। স্বর্ণময়ী ও গোলক নারায়ণের অনুরোধে কালীনারায়ণ তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন।

গোলক নারায়ণ রায়, পুত্র কালীনারায়ণ ও কন্যা স্বর্ণময়ী দেবীকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় পত্নীর গর্ভে প্রথম একটি কন্যা জন্মে। সেই কন্যার নাম কৃপাময়ী দেবী। অনন্তর ১২৬৫ সনের আশ্বিন মাসে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হয়, সেই পুত্রের নাম রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী কিরূপ বুদ্ধিমান, সাহসী, চতুর এবং কার্য্য কুশল ছিলেন, পিতা গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় জীবিত থাকিতেই বিশেষতঃ ওয়াইজ সাহেবের সহিত বিবাদে তাহা স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়াছে। এক্ষণে কালীনারায়ণ রায় চৌধুরীর কর্ত্তৃত্বে ভাওয়ালের প্রতি কমলার শুভ দৃষ্টিপাত হইল। ওয়াইজ সাহেবের সহিত বিবাদ মিটিয়া গেলে কালীনারায়ণ সমগ্র ॥/০ আনি ও এজমালি-রূপে ।৶০ আনির কতক আনা অংশের মালিক হইলেন। তিনি

জমিদারী কার্য্য কুশলতায় যেমন পরিপক্ক তেমনই কৌশলী ছিলেন। তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় নিজ জমিদারীর নিকটস্থ জমি ও অন্যান্য পরগণার অংশ খরিদ হইতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারি প্রভৃতির সহিত ভূমি গঠিত বহুমোকদ্দমায় তিনি জয়লাভ করিলেন। এইরূপে তাঁহার সম্পত্তির আয়তন ও আয় বৃদ্ধি এবং অধিকার ক্রমেই বিস্তৃত হইতে লাগিল। নিজ বাড়িটি সমগ্র চক মেলান ও পাকা করিয়া প্রস্তুত করা হইল। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের শিষ্টাচার সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া ইংরেজ ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ, শিকার ও বৈষয়িক প্রয়োজনে সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে গমনাগমন করিতেন। অতএব তিনি সাহেবদিগের অবস্থানার্থ একটি সুসজ্জিত রঙ্গমহাল প্রস্তুত করাইয়া নিজ গৃহের শোভা ও সৌন্দর্য্য আরও সংবর্দ্ধিত করিলেন। অতিথি সৎকারার্থ দীর্ঘ স্থানব্যাপী একটি একতালা বাটীর শ্রেণী নির্ম্মিত হইল। জয়দেবপুরের জঙ্গল পরিষ্কার হইল। বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ কতক বন্দুকের মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, কতক জঙ্গলের আশ্রয় হারাইয়া দিগন্তরে চলিয়া গেল। বনাবৃত জয়দেবপুর প্রাসাদ পংক্তি, নব নির্ম্মিত প্রশস্ত রাজপথ, সুদৃশ্য নানাদ্রব্য সহিত সুন্দর বাজার এবং বর্দ্ধিত লোক সংখ্যায় সুন্দর ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি ঢাকার নানাস্থানে কয়েকটি পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। কলিকাতা ও কাশীধামে কালীনারায়ণের ভূমি ও বাসোপযোগী বাটী খরিদ করা হইল।

জয়দেবপুরে ও ঢাকায় গাড়ী চলিবার উপযুক্ত রাস্তা ছিল। ঐ পথে ঘোড়ার গাড়ীতে ঢাকায় ও জয়দেবপুরে যাতায়াত চলিত। চৌধুরী মহোদয় নিজ বাটীতেও ভাল ভাল ঘোড়া সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার পীল খানায় হস্তী সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। হস্তী শিকারে তাঁহার বড়ই সখ ছিল। তিনি প্রতিবৎসর হাতী শিকারে বহির্গত

হইতেন। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বিদ্যোৎসাহী ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার গীত বাদ্যেও অভ্যাস ছিল। তাঁহার যত্নে জয়দেবপুরে ইংরেজী বিদ্যালয় ও ভাওয়ালের নানাস্থানে কতিপয় বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়দেবপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় ও পোষ্টাফিসও তাঁহারই কীর্ত্তি।

ভাওয়ালে ভদ্রলোক বড় কম ছিল। এই সময়ে তালুকদার ভিন্ন ভদ্রলোক অধিবাসীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার ভিতর দয়া ও সদাশয়তাও প্রচুর পরিমাণে ছিল। প্রজাবর্গের সুখ-দুঃখের সংবাদ তিনি সর্ব্বদা লইতেন এবং অতি সামান্য কর্ম্মচারী ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রজাও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন। প্রজারাও তাঁহাকে ভক্তি করিত এবং ভালবাসিত। ভাওয়ালের প্রজাহিতৈষিণী সভা তাঁহার প্রজা বৎসলতার অন্যতম প্রমাণ। তিনি ।৵০ আনির জমিদারদিগের সহিত একযোগে ১২৭২ সালের ১০ই বৈশাখ জয়দেবপুরে "প্রজা-হিতৈষিণী সভা" নামে একটী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে ভাওয়ালের ভূম্যধিকারীরা মোল্লাসেলামী, বর্ণ ব্রাহ্মণদিগের যাজনিক ক্রিয়ার জমা ইত্যাদি নানাপ্রকার জমা প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় করিতেন। "প্রজা হিতৈষিণী সভা"র সভাপতি কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী ঐ সকল জমা রহিত করিয়া দেন। ভাওয়ালের প্রজাবর্গের মধ্যে কেহ দুর্গোৎসব ও মহোৎসবাদি করিতে ইচ্ছুক হইলে জমিদার-দিগকে প্রচুর নজর দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য সনন্দ লইতে হইত। কালীনারায়ণের প্রজাহিতৈষিণী সভা ঐ সকল অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া প্রজাবর্গকে স্বেচ্ছানুরূপ জাঁকজমকে দুর্গোৎসব ও মহোৎসব করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

কন্যা পণ গ্রহণ করিতে তিনি ভাওয়ালের ইতর প্রজাদিগকে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছিলেন। ভাওয়ালস্থ অন্ধ আতুর প্রভৃতির ভিটা বাড়ীর জমা তিনি রেহাই করিয়া দিয়াছিলেন। জয়দেবপুরবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগের বিবাহে তিনশত টাকা হারে দানের তিনি ব্যবস্থা করেন। তিনি দীঘি পুষ্করিণী খননার্থ এককালীন দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক আত্মীয় স্বজনের বাটীতে নিজ ব্যয়ে জলাশয় খনন করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ও পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের পেন্সন দানেও তাঁহার আন্তরিক উৎসাহ ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ভাওয়ালের জঙ্গলে কোচ, বংশী প্রভৃতি জাতীয় বহুলোককে আশ্রয় দান করেন। বংশীদিগকে বৈশ্য স্থির করিয়া কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী তাহাদিগকে উপবীত গ্রহণে অধিকার দেন। বিদ্যালোচনা ও অন্যান্য সৎ কর্ম্মে তিনি সময়ে সময়ে অর্থদান ও সাধ্যানুসারে যত্ন করিতেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে বহু প্রশংসাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাক্‌লাণ্ড সাহেব যখন ঢাকার কমিশনার তখন বুড়ীগঙ্গার তটে পোস্তা বাঁধাইবার প্রস্তাব হয়। বাক্‌লাণ্ড সাহেব এই কার্য্যের নিমিত্ত কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট সাহায্য চাহেন। তিনিও অম্লানবদনে এতদুপলক্ষে এককালীন বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। অতঃপর ঢাকায় একটি কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হয়। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় এই মেলার সময় বহুবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উৎসাহের সহিত মেলার কার্য্যে যোগদান করেন। এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

তাঁহার তিন বিবাহ। তৃতীয় স্ত্রী রাণী সত্যভামার গর্ভে ১২৬৫ সনের আশ্বিনমাসে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ শৈশবকাল হইতেই কান্তিবান্,
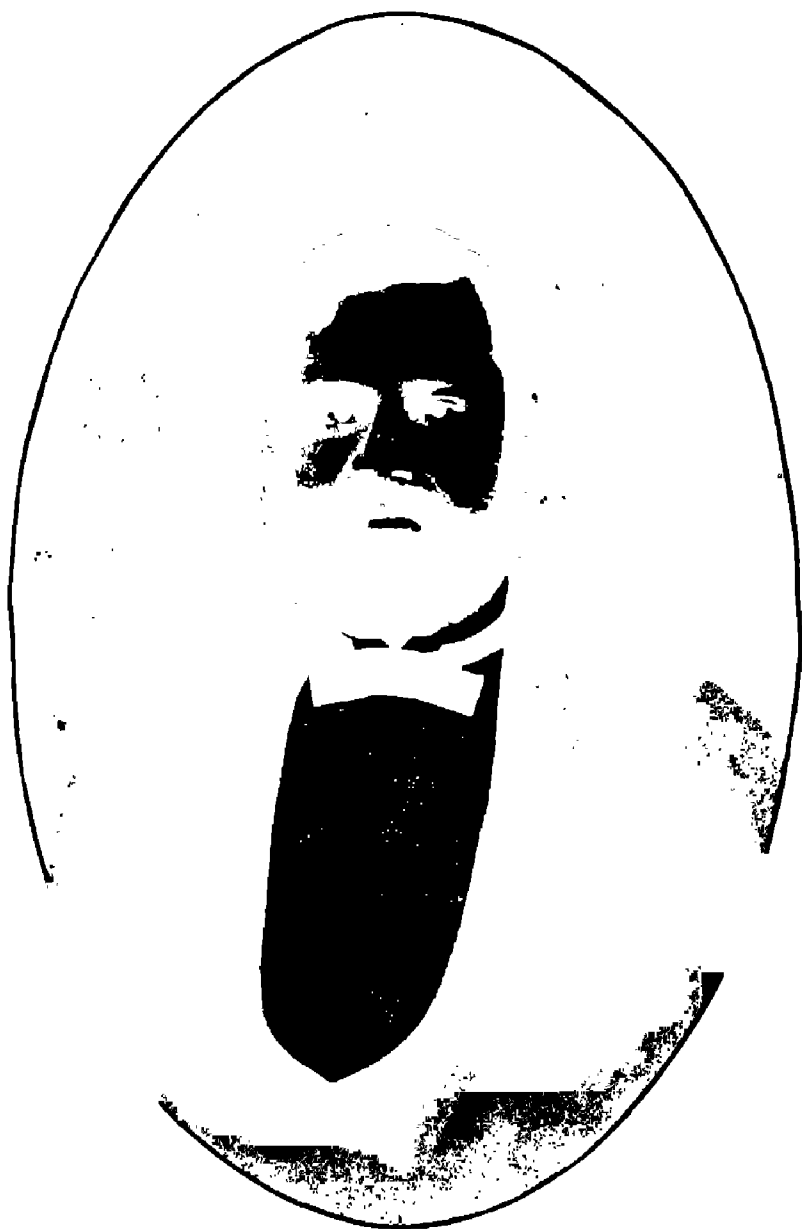
স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়

বুদ্ধিমান, মেধাবী ও সহৃদয়। তিনি বিদ্যালয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। রায় কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী বাহাদুর তাঁহার একমাত্র পুত্র যাহাতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত ও মানুষ হইয়া তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে সম্মানিত হইতে পারেন, সেইজন্ম সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন। তিনি স্বয়ং সাহেবদিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপাদি করিতেন বটে, কিন্তু ইংরেজী না জানা হেতু পলে পলে অসুবিধা অনুভব করিতেন। পুত্র যাহাতে এই অসুবিধায় পতিত না হয়, প্রথমাবধি তাঁহার সেইদিকে লক্ষ্য ছিল। পুত্রের শিক্ষা ও জমিদারী কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখার অভিপ্রায়ে কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী বাহাদুর "বেডফোর্ড" নামে একটি সাহেবকে কর্মচারী নিয়োগ করেন। বেডফোর্ডের শাসন সময়ে জমিদারী কার্য্যে তেমন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটে নাই, কিন্তু তাঁহা হইতে রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী সাহেবদিগের রীতিনীতি ও চরিত্র বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পান এবং প্রতিনিয়ত তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে তাঁহার ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিবার অভ্যাস হয়। কালীনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের গুণ গ্রামে, সদনুষ্ঠানে ও সৎকর্ম্মে উৎসাহ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর অধিকতর সন্তুষ্ট হন। অবশেষে তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" এই গৌরবজনক উপাধি প্রদান করা হয়। ঢাকা জেলার হিন্দুজমিদারবর্গের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই গৌরবজনক উচ্চসম্মান লাভ করেন। রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী তখন "কুমার বাহাদুর" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন। কুমার বাহাদুর অশ্বচালনা, বন্দুক ছোড়া, নির্ভয়ে ও উৎসাহের সহিত হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হওয়া প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ গ্রামে যতই অলঙ্কৃত হইতে লাগিলেন, রাজা বাহাদুরও হৃদয়ে ততই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাজা বাহাদুর সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সদ্বংশজাতা, একটি সুন্দরী ব্রাহ্মণ তনয়াকে পুত্রবধূরূপেধ

মনোনীত করিলেন। মহাসমারোহে পুত্রের শুভ পরিণয় ক্রিয়া সমাধা হইল।

এদিকে তিনি ওয়াইজ সাহেবের ফুলবাড়িয়ার সম্পত্তির বড় একটা অংশ খরিদ করিয়া স্বকীয় আয় ও এলেকা বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। কৃতী ও কীর্ত্তিমান্ রাজা বাহাদুর আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বহুকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সুখ সৌভাগ্যে যদিও ভাগ্যবান, তথাপি হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে একটি গুরুতর ভাবনা জাগরুক হইয়া তাঁহাকে অহোরাত্র জ্বালাতন করিতে লাগিল—সে ভাবনা ভবিষ্যতের।

বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী রাজা বাহাদুর দেখিলেন যে, বার্দ্ধক্য আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার দেহ-মন অধিকার করিয়া বসিতেছে। বুঝিলেন পৃথিবীতে তাঁহাকে আর বড় অধিক দিন বাস করিতে হইবে না। কুমার এখনও শিক্ষার্থী বালক। সম্পত্তি প্রকাণ্ড এবং উহার শাসন কার্য্যও জটিল। যদি হঠাৎ তাঁহাকে তনুত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে এই বিপুল সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রহিবে, কি প্রকারেই বা কুমারের শিক্ষাকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে! তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষু নীরবে একটি সুশিক্ষিত বিজ্ঞ ও বিশ্বাস-ভাজন কর্ম্মাধ্যক্ষের অনুসন্ধানে নিরত রহিল।

৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ তখন ছোট আদালতের হেডক্লার্ক। ঢাকায় তিনি দ্বিতীয় বাগ্মীরূপে সম্মানিত। বান্ধব পত্র এই সময়ে বঙ্গের সকল দিকে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া বঙ্গীয় লেখক সমাজে প্রথম শ্রেণীতে তাঁহার গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল।

৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ

রাজা কালীনারায়ণের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িতেছিল। তিনি গোপনে গোপনে কালীপ্রসন্নের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া বুঝিলেন যে কালীপ্রসন্নই তাঁহার বিশাল জমিদারী চালাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

অবশেষে বেডফোর্ড সাহেবের মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার ষ্টেটের ম্যানেজাররূপে নিযুক্ত করা হয়। কালীপ্রসন্ন বাবু জয়দেবপুর রাজ্যের কর্ম্মভার গ্রহণ করিলে রাজা বাহাদুর যেন তাঁহার হস্তে কার্য্যভার দিয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি কিছুদিন নানাতীর্থ স্থান পর্য্যটন করিয়া শান্তিতে গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং ১২৮৫ সনে ইংরাজী ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে রাজা কালীনারায়ণ স্বর্গারোহণ করেন। সমস্ত ভাওয়ালবাসী তাঁহার মৃত্যুতে কাঁদিয়া আকুল হইল। পিতৃশোকে কুমার বাহাদুর একেবারে মুহ্যমান হইলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর তত্ত্বাবধানে জমিদারীর কার্য্যে একটুও বিশৃঙ্খলা ঘটিল না—বেশ শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত কালীপ্রসন্ন বাবু জমিদারী চালাইতে লাগিলেন।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর বয়সে যুবক হইলেও

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

বুদ্ধিমান ও তেজস্বী এবং স্বভাবতঃই উদার ছিলেন। তাহাতে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের মত বিজ্ঞ মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি উত্তরোত্তর জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইতেছিলেন।

রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুরের লোকান্তর প্রাপ্তি সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারীদিগের সহিত বিবাদ বিসংবাদের গূঢ় কারণ বিদ্যমান ছিল। বৃদ্ধ রাজার তিরোধানের পরে চারিদিক হইতে কুমার বাহাদুরের তরুণ বয়স্কতার জন্য শত শিখায় বিবাদের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। একদিকে এই বিবাদ, অন্যদিকে ।৶০ আনির বহু মালিকের বহু অংশ এজমালি থাকা হেতু খাজনা আদায়ে অসুবিধা এবং মালিক-দিগের পরস্পর জেদ বাজে ও অবৈধ লোভে প্রজার প্রতি গুরুতর দৌরাত্ম্য চলিতে লাগিল। তৃতীয় আর এক দিকে ভাওয়ালের তালুকদারদিগের কতক বৃদ্ধ রাজার সময়েই জমিদারের ক্ষমতা

উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বস্ব প্রধান ভাবে মাথা খাড়া করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। এক্ষণে আরও বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। বিজয়নারায়ণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি ভাওয়ালের উন্নতিকল্পে একদিন যাহাদিগকে আদর করিয়া ভাওয়ালে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তালুক ইত্যাদি দানপূর্ব্বক যত্নের সহিত বাস করাইয়াছিলেন তাহাদের অনেকে কালবশে সেই আশ্রিত ও আশ্রয়ের পুরাতন সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। সমস্ত তালুকদারের আয়ের সমষ্টি এখন লক্ষ টাকার বেশী।

কালীপ্রসন্ন বাবুর বুদ্ধি চারিদিগের এই মারাত্মক গোলযোগের মধ্যেও ধীরভাবে আপনার গন্তব্য পথ বাছিয়া লইল। কুমার বাহাদুরের বৈষয়িক ব্যাপারে একটা মূল সূত্র সন্ধানে দৃঢ়তা আশৈশব আছে, সেই দৃঢ়তা ও তেজোপূর্ণ কার্য্যাকার্য্যের পথে অদ্বিতীয় সহায় হইল। সুতরাং চারিদিক ও অভ্যন্তর উল্লিখিত প্রকারে শত্রুসঙ্কুল রহিলেও তাঁহার উপর কোন দিক হইতে আঘাত পড়িতে পারিল না। বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমার বাহাদুরের বিবিধ উচ্চতর গুণের বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি ইংরেজী ভাষায় ইংরেজের মত অনর্গল ইংরেজী বলিতে শিখিলেন। শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে তাঁহার শৈশবাবধি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, এক্ষণে সেই অনুরাগ ঐ সকল বিষয়ে প্রকৃত কৃতিত্বে পরিণত হইল। তিনি স্বয়ং সাহিত্যানুরাগী ও কাব্যপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রী কালীপ্রসন্নও বঙ্গের অন্যতম প্রধান সাহিত্য সেবক ও কবি ছিলেন। এই হেতুই জয়দেবপুরে প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য সমালোচনী সভা হইতে বহু উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থমুদ্রণে সাহায্য দান করা হইয়াছে। অনেক লেখক ও গ্রন্থকার অল্পাধিক মাত্রায় পুরস্কৃত হইয়াছিল। এখনও সভার এই দেশহিতকর অনুষ্ঠান অব্যাহত চলিতেছে।

স্বর্গীয় কুমার রণেন্দ্র নারায়ণ রায়।

এতদ্ব্যতীত কুমার বাহাদুর অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই প্রচুর প্রবীনতা লাভ করিলেন।

কতকগুলি ধন কোথাও সঞ্চিত হইলেই সেই ভাণ্ডারের প্রহরীকে গবর্মেণ্ট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন না। ধনের সঙ্গে যদি গুণের সমাবেশ হয়, সাধারণের হিতে পরার্থে যদি অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে থাকে, তাহা হইলে দেশের রাজাও সেই দিকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন।

ভাওয়ালের প্রিয় দর্শন, মিষ্টভাষী, উদার প্রকৃতি ও সদাশয় যুবা কুমার বাহাদুরের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অচিরেই দৃষ্টি নিপতিত হইল। তাঁহার সৎকার্য্যে আন্তরিক অনুরাগ ও সাধারণের হিতে মুক্ত হস্তে দান এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন, রাজা কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর শ্রীমান্ পুত্র কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী তাঁহারই যোগ্য উত্তরাধিকারী বটে! গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। যে দিন রাজেন্দ্র নারায়ণ এই উপাধির সনন্দ গ্রহণ করেন, সেদিন ঢাকায় বিশেষ উৎসব ও সমারোহ হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান প্রতিষ্ঠান সারস্বত সমাজের তিনি অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঢাকা কলেজ ও তৎপ্রদত্ত বৃত্তি ও বিবিধরূপ সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারই সাহায্যে দরিদ্র ভাণ্ডার (Poor fund) স্থাপিত হয়। সারস্বত সমাজ ও ঢাকা কলেজ প্রীতি ও আনন্দ সহকারে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীকে দুইখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবল ঢাকার সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—তাহা দূরদিগন্তে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসৃত হইয়াছিল। রাজা হইয়াও তাঁহার ব্যবহারের অমায়িকতা ও শিষ্টাচার একটু ও কমে নাই। যে কেহই তাঁহার নিকট যাইত সেই-ই তাঁহার নিরভি-

মানিতায় মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ব্যবহারিক সমস্ত বুদ্ধি তাঁহার অতি প্রবল ছিল। কি ইঞ্জিনীয়ারিং, কি ডাক্তারী তিনি না জানিতেন এমন কর্ম্ম ছিল না। ভাওয়ালের তালুকদার ও প্রজাবর্গের মধ্যে যে অসন্তোষ ছিল তাহা তাঁহার সদ্ব্যবহারে দূর হইল। রাজা বাহাদুর বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে ভাওয়ালের স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া প্রজাবর্গের পাণীয় জলের অভাব দূর করিয়াছিলেন।

ভূমিকম্পে রাজা বাহাদুরের পুরাতন বাটী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি ঢাকার নদীতটে যে একটি অতি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাও ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তিনি বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নূতন প্রণালীতে ও নূতন ধরণে প্রকৃত রাজপ্রাসাদের মত এক বিরাট বাটী নির্ম্মাণ করেন। নূতন নূতন শোভা সম্পদে জয়দেবপুরের মূর্ত্তি তাঁহারই আমলে চিত্ত ও মনোমুগ্ধকর হয়। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের দানের তালিকা করা যায় না—করিতে গেলে এক বৃহদাকার গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তবে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, করিমগঞ্জ প্রভৃতি জেলা ও মহকুমায় এমন কোন সদনুষ্ঠান ও সৎকর্ম্ম হয় নাই যাহাতে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের দান না আছে।

রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ, মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ ও কনিষ্ঠ কুমার রবীন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ কালীগঞ্জে তাঁহার পিতা রাজা কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। জয়দেবপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণেরই কীর্ত্তি। তিনি তাঁহার জমিদারীর মধ্যে ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড রেলবর্ত্ম নির্ম্মাণ জন্য ইষ্টার্ণ

বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীকে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রেল রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ বিশাল জমীদারী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাকপুর নিবাসী কালী নাথ ভট্টাচার্য্যের কন্যা বিলাসমণি দেবীর পানি গ্রহণ করেন। রাণী বিলাস মণি দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

১৮৮২ খৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কুমার রণেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। কুমার রণেন্দ্র নারায়ণ মধ্যম কুমারের নামে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ একটি অতিথিশালা স্থাপন করেন। তিনি মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। দিল্লীর দরবারে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং এই সময় হইতে ভাওয়াল "রাজষ্টেট্" বলিয়া গবরমেণ্টের নিকট পরিগণিত হয়। কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ অতিশয় উদারচেতা লোক ছিলেন। জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল। দেবদ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং গরীব দুঃখীকে তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বহু টাকা ব্যয়ে তিনি জয়দেবপুরের অতিথিশালার দালান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঢাকায় যে স্পোর্টিং ক্লাব আছে তিনি তাহার একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

কুমার রণেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী

আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে কুমার বাহাদুর দেশের ও দশের অনেক উপকার সাধন করিতে পারিতেন, কিন্তু দুর্জ্জয় কাল অকালে তাঁহাকে তাহার করালগ্রাসে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে রাজ-পরিবারবর্গ ও ভাওয়ালবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বৌবাজারের প্রসিদ্ধ

মতিলাল বংশের বাবু সুরেন্দ্রনাথ মতিলালের পঞ্চম কন্যা শ্রীযুক্তা সরজুবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর বাবু সুরেন্দ্রনাথ মতিলাল ভাওয়ালে যাইয়া রাজষ্টেটের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও শৃঙ্খলা বিধান করেন এবং কিছুদিন তিনি ষ্টেটের ম্যানেজার পদেও নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্তা সরজুবালা দেবী স্বামীর ন্যায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গরীব দুঃখীকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। স্কুল ও কলেজের অনেক ছেলেদের ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেছেন। দেবদ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। তিনি প্রতিবৎসর বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘমাসে প্রত্যহ একটী করিয়া শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র ও মাঘমাসে উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র দান করিয়া থাকেন। তিনি অনেক টোল, স্কুল ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

ভাওয়াল রাজবংশ শিক্ষা বিস্তারে চিরকাল সচেষ্ট। ১৩২৭ সালের হিসাবে দেখা যায় ঐ সনে রাজকোষ হইতে ১৪০০০৲ টাকা শিক্ষা প্রচার কল্পে প্রদান করা হইয়াছিল। ভাওয়াল ষ্টেট হইতে নিম্নলিখিত স্কুল সমূহ পরিচালিত হইতেছে। কোন্ কোন্ স্কুল রাজকোষ হইতে সাহায্য পায় নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল:—জয়দেবপুরে রাণীবিলাসমণি হাইস্কুল, কালীগঞ্জে দুইটী হাই স্কুল, দশটি মধ্য ইংরেজী স্কুল, ৩৬টি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৭টি বালিকা বিদ্যালয়, ১টি সংস্কৃত টোল। ইহা ব্যতীত দরিদ্র অনেক ছাত্রকে বড়রাণী সরযূবালা দেবী নিজের তহবিল হইতে সাহায্য করিয়া থাকেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য প্রতি বৎসর ষ্টেট হইতে ১২১০০৲ টাকা খরচ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর এইরূপ ১৪।১৫ হাজার টাকা রাজকোষ হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। বহুদান ও বিবিধ সদনুষ্ঠানের জন্য ভাওয়াল রাজবংশ চির প্রসিদ্ধ।

ভাওয়াল রাজবাড়ী

বংশ তালিকা।

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নারায়ণ চক্রবর্ত্তী   রুদ্র চক্রবর্ত্তী

কুশধ্বজ রায়

বলরাম রায় চৌধুরী (জানকীনাথ রায় নামে পরিচিত)

রঘুনাথ   রাজীবলোচন   শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী

জগৎরায়   শ্যামরায়   জয়দেব নারায়ণ রায় চৌধুরী

ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

বিজয়নারায়ণ   চন্দ্রনারায়ণ   কীর্ত্তিনারায়ণ

উদয়নারায়ণ   নরনারায়ণ   লোকনারায়ণ

রাজনারায়ণ   গোলকনারায়ণ

রাজা কালীনারায়ণ   স্বর্ণময়ী দেবী (কন্যা)

কৃপাময়ী দেবী (কন্যা)   রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ

ইন্দুময়ী (কন্যা)   রণেন্দ্র   জ্যোতির্ম্ময়ী (কন্যা)   রমেন্দ্র নারায়ণ   রবীন্দ্র নারায়ণ   তড়িণময়ী (কন্যা)
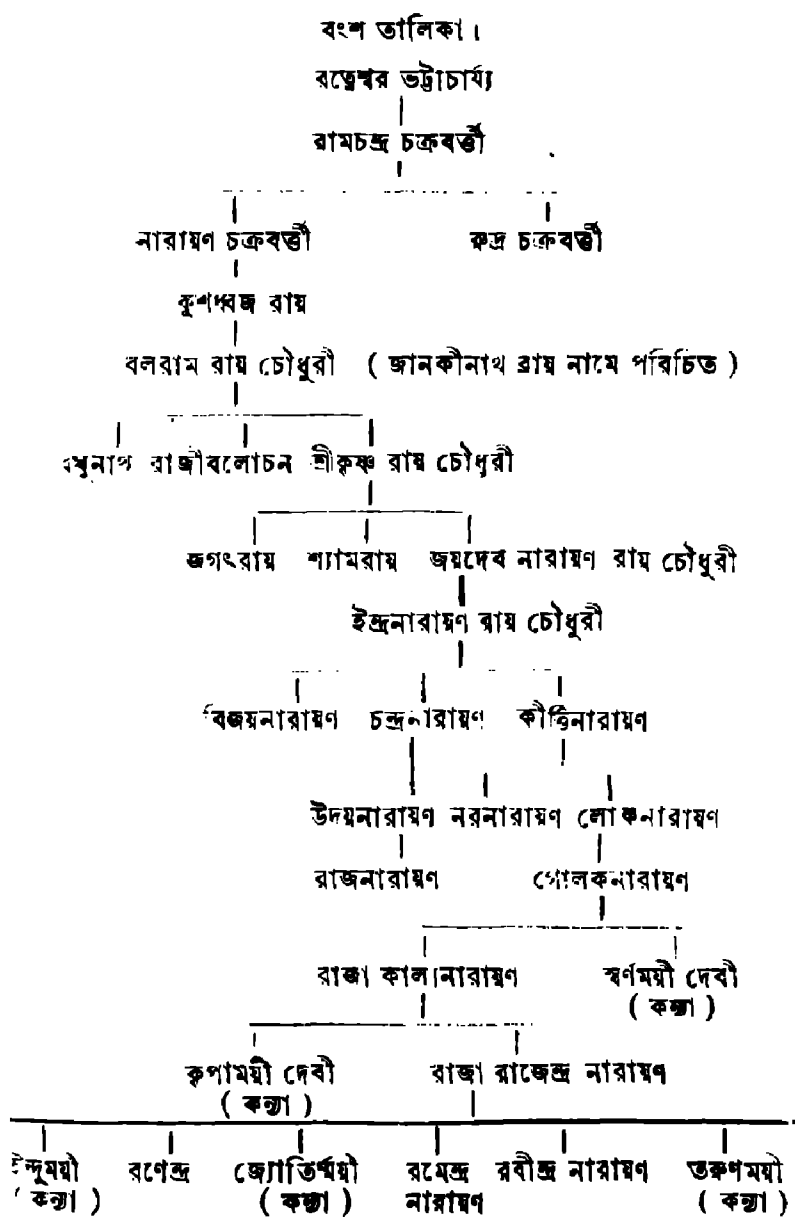
রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর

রঙ্গপুর-তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দলাল রায় মহোদয়ের ঔরসে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এই রায় বংশ পূর্ব্বে পঞ্জাবে বাস করিতেন, বাদসাহ ফরেকশাহের রাজত্বকালে তাঁহারা বঙ্গদেশে আগমন করেন। এই বংশের মান্নালাল রায় রংপুরের অন্তঃপাতী মহিমগঞ্জে আসিয়া বসবাস করেন। এখানে তিনি স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসায় করিয়া প্রভূত ধনরত্নের অধিকারী হন। তিনি যে স্থানে বাস করিয়া মণিকারের ব্যবসায় চালাইতেন, সেই অংশকে "তাজহাট" বলিত। ক্রমে তিনি রঙ্গপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। এইরূপে তাজহাটের বর্ত্তমান জমিদারী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দ লাল রায়ের জনহিতৈষণা ও পরোপকারিতা গুণ দর্শনে কি ভারতীয় কি ইউরোপীয় সর্ব্বশ্রেণীর লোকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিল। তিনি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন; গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্টও তাঁহার ঔদার্য্য ও দানশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে প্রথমে "রাজা" তৎপর "রাজাবাহাদুর" এবং পরিশেষে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু মহারাজ গোবিন্দলাল এই রাজদত্ত সম্মান বেশীদিন উপভোগ করিতে পারেন নাই। ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন তারিখে ভূমিকম্পে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় মহারাজ গোবিন্দলাল ইহলোক হইতে

মহাপ্রস্থান করেন। পিতার মৃত্যুকালে রাজাবাহাদুর গোপাললাল কেবল মাত্র দশ বৎসর বয়স্ক বালক ছিলেন। কাজেই তাঁহার বিশাল পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার মাতা মহারাণী শরতসুন্দরী দেবী এবং মাতামহ রামকৃষ্ণ মহতার স্কন্ধে পড়ে। কিন্তু অল্পকাল পরে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ তাঁহার জমিদারীর তত্ত্বাবধারণ ভার গ্রহণ করেন।

কয়েক বৎসর রাজাবাহাদুর কলিকাতা হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ যখন তাঁহার জমীদারীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন, তখন রাজাবাহাদুর মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরের রাজকুমার কলেজে প্রেরিত হন ; সেখানে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা দর্শনে প্রিন্সিপাল জে, ডি, অস্ওয়েল হইতে অধ্যাপকগণ সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করেন এবং তিনি কয়েকটী পারিতোষিকও লাভ করেন। ১৯০৫ সালে তাঁহার জননী মহারাণী শরত সুন্দরী দেবী স্বর্গারোহণ করেন। তখন তিনি রাজকুমার কলেজ পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে আগমন করেন। তাঁহার খুল্লতাত স্বর্গীয় লালা শিবনারায়ণ কপূর তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

রাজা বাহাদুরের চরিত্রে যাহা কিছু মহৎ ও অনুকরণযোগ্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ের মূল তাঁহার রাজকুমার কলেজের শিক্ষা ও খুল্লতাতের উপদেশ। এই সময়ে মিঃ ই, ক্যাণ্ডলার বি, এ, মিঃ ম্যাকেঞ্জী এবং মিঃ এ কোর্মাক্ ক্রমান্বয়ে তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। রাজাবাহাদুর ভবিষ্যদ্ জীবনে যে উচ্চ আসনে উপবেশন করিবেন, গৃহশিক্ষকের তাঁহাকে তদুপযোগী শিক্ষা দিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। নিজের জমিদারী কার্য্য পরিচালনে যেরূপ পরিমাণে জমিদারী কার্য্যপদ্ধতি শিক্ষালাভ করা দরকার, রাজাবাহাদুর তাহা শিক্ষা করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। অধিকন্তু তিনি অতীব মনোযোগের সহিত আইন শিক্ষা করিয়াছেন।

রাজা বাহাদুর সাবালকত্বে উপনীত হইয়া জমিদারীর কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার মিঃ সি, এইচ, পোপের সহিত নিজের জমিদারীর মধ্যে পরিভ্রমণ করেন।

দেশের অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র—তাঁহার প্রথম গৃহ শিক্ষক মিঃ ই, ক্যাণ্ডলারের সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করেন।

রাজা বাহাদুর যদিও অহোরাত্র অধ্যয়ন করিয়া মানসিক উৎকর্ষ লাভে তৎপর, তথাপি তিনি শারীরিক অঙ্গ চালনায় পরাঙ্মুখ হন নাই। বাল্যাবস্থা হইতেই রাজা বাহাদুর টেনিস, বিলিয়ার্ড ক্রিকেট ও ফুটবল ক্রীড়ায় সকলকে পরাজিত ও মুগ্ধ করিতেন। রাজা বাহাদুর একজন সুদক্ষ শিকারী এবং শিকারের প্রতি তাঁহার সন্ধান অব্যর্থ। তিনি অশ্বারোহণ ও সন্তরণেও অতি পারদর্শী। সাইকেল চড়িতে, মোটর চালাইতে রাজা বাহাদুর সুদক্ষ। ইহা ছাড়া সঙ্গীত শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে এবং নিজেও একজন সুগায়ক। ফটোগ্রাফ্ তুলিতে রাজা বাহাদুর সিদ্ধহস্ত।

১৯০৮ সালের ১লা আগষ্ট, রাজাবাহাদুর তাঁহার পৈতৃক তাজহাট জমিদারীর কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক প্রজারঞ্জন, রাজভক্তি, সচ্চরিত্রতায় শীঘ্রই গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নিয়মিতভাবে রঙ্গপুর ও অন্যান্য স্থানের স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তাজহাটে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা যে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যান, তিনি সেই স্কুলটী অর্থ সাহায্য দ্বারা পরিচালনা করিতেছেন।

তাজহাটে একটি দাতব্য ঔষধালয়েরও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। ১৯১২ সালের ৩রা জুন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার

রাজভক্তি, বদান্যতা ও দেশ হিতৈষণার পুরস্কার স্বরূপ—"রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

উত্তর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমিদার স্বরূপে তিনি উত্তর বঙ্গের যাবতীয় জেলার আন্দোলনে সর্ব্বাগ্রগণ্য পদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বিগত নয় বৎসর যাবত তিনি রঙ্গপুর মিউনিসিপালিটীর মনোনীত চেয়ারম্যানরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। একবার নয়—দুইবার নয়, তিন তিন বার তিনি এই পদে মনোনীত হইয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানরূপে তিনি ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বর্ত্তমান বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ জে. এন. গুপ্ত আই, সি, এস্. মহোদয় লিখিত "Rungpur to-day" নামক গ্রন্থে তাহার বিশদ বিবরণ আছে। রাজাবাহাদুর রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যরূপেও তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। গত পাঁচ বৎসর যাবত তিনি রঙ্গপুর জমিদার সভার সভাপতিরূপে অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। তিনি কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনেরও সভ্য এবং এক বৎসর কাল ইহার সহকারী সভাপতিরূপেও কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গীয় জমিদার সভা ও ভারতীয় জমিদার সভার সদস্য।

বিগত যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধ ভাণ্ডারে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন।

১৯১৮ সালের ৩রা জুন তারিখে তাঁহাকে তাঁহার রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ "রাজাবাহাদুর" উপাধি প্রদান করা হয়।

তিনি স্বকীয় মহত্ত্ব, ঔদার্য্য, বিনয় ও সরল ব্যবহার গুণে আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তির ভাজন হইয়াছেন। যদিও রাজাবাহাদুর বয়সে নবীন, তথাপি তিনি জমিদারী কার্য্য অতি সুন্দররূপেই বুঝেন এবং নিজে সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। রাজাবাহাদুরের তিনটী

সন্তান। জ্যেষ্ঠ রাজকুমারী সুধারাণী দেবী—১৯১৩ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় রাজকুমার গিরীন্দ্র লাল রায়—১৯১৪ সালের ৩০শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং তৃতীয় রাজপুত্র ভৈরব লাল রায়—১৯১৮ সালের ৩রা জুন জন্মগ্রহণ করেন।

রাজা বনবিহারী কপূর বাহাদুর সি, এস, আই

রাজা বনবিহারী কপূর বাহাদুর

সি-এস্-আই

৺ নন্দলাল সেট্ তালওয়ারের পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রথমতঃ লাহোর হইতে মথুরায় আসিয়া বসবাস করেন; পরে তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁকসা থানার এলাকার মধ্যে সোঁয়াই নামক গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। ৺ নন্দলাল সেট তালওয়ারের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; জ্যেষ্ঠ ৺ গোপালচন্দ্র, মধ্যম ৺ বল্লভচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ৺ গদাধরচন্দ্র। ৺ গোপালচন্দ্র সেট তালওয়ারের সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরিদাস সেট তালওয়ার।

বর্দ্ধমান নিবাসী খ্যাতনামা ৺ পরাণচন্দ্র কপূর, ইঁহার চারিপুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র ৺ শ্যামচন্দ্ কপূর, মধ্যম ৺ তারাচন্দ্ কপূর, তৃতীয় ৺ রাসবিহারী কপূর ও চতুর্থ ৺ চুনিলাল কপূর।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ৺ তেজচন্দ কপূরের ঔরসজাত পুত্র ৺ প্রতাপচন্দ্ কপূরের মৃত্যু হওয়ার পর তিনি ৺ পরাণচন্দ্র কপূরের কনিষ্ঠ পুত্র ৺ চুনিলাল কপূরকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন এবং মহাতাবচন্দ্ কপূর নাম দেন। ৺ পরাণচন্দ্র কপূরের তৃতীয় পুত্র ৺ রাসবিহারী কপূরের পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি

হরিদাস সেট সোয়াইগ্রাম নিবাসী ৺ গোপালচন্দ্র সেট তালওয়ারের কনিষ্ঠ পুত্র তালওয়ারকে ১৮৫৩ খ্রীঃ দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। সেই দত্তক পুত্রের ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ১১ই নভেম্বর তারিখে জন্ম হয়, তৎপরে তাহাকে জহুরিলাল কপুর নাম দেন। দত্তক পুত্র গ্রহণের অত্যল্পকাল পরেই ৺ রাসবিহারী কপূরের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম ভৈরব চন্দ্ কপূর রাখা হয় তাঁহার ঔরষজাত পুত্র জন্মানর পর ঐ বালকের প্রতি যেমন তাঁহার স্নেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনই অপরপক্ষে দত্তকপুত্র জহুরিলালের উপর স্নেহ মমতা ও যত্ন হ্রাস হইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া জহুরীলালের পিতৃস্বসা (৺ শ্যামচন্দ্র কপূরের মধ্যমা পত্নী) এবং মহারাজাধিরাজা ৺ মহাতাবচন্দ্ বাহাদুরের ধাত্রীমাতা উভয়ে একত্রে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে জহুরিলালের প্রতি অস্নেহাদির কথা সমুদয় বিশদরূপে জানান। তাহা শুনিয়া উক্ত মহারাজা তাঁহার সহোদরের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া তাঁহার বাটী হইতে তাঁহার দত্তকপুত্র জহুরিলালকে নিজ রাজঅন্তঃপুরে আনিয়া রাখেন এবং তাঁহার নাম জহুরিলাল পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ সহোদর ৺ রাসবিহারী কপূরের নামের সহ মিল করিয়া শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপুর নাম রাখেন। তদবধি মহারাজাধিরাজা বাহাদুর তাঁহাকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় লালন পালন করতঃ তদীয় বিদ্যাশিক্ষার সমুদয় ভারগ্রহণ করেন। মহারাজ মহিষী পরলোকগতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী ঠাকুরাণী বাল্যাবধি বনবিহারীকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। পক্ষান্তরে বনবিহারী কপুর মহারাজ এবং মহারাণীকে স্বীয় পিতামাতার তুল্য স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি রাজঅন্তঃপুরে প্রতিপালিত হইয়া পরে রাজবাটীর মধ্যে স্বতন্ত্র একবাটীতে বাস করিতেন।

মহারাজাধিরাজা বাহাদুর ইঁহার বিবিধ সদ্‌গুণাবলী দৃষ্টে ক্রমশঃ বিশেষ স্নেহ করিতেন,—একদণ্ডও চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না। তিনি ক্রমান্বয়ে রাজবাটীর যাবতীয় কার্য্য তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বাল্যাবধি মহারাজাধিরাজের নিকট শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার যাবতীয় সদ্‌গুণের অনুকরণ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ যেমন তাঁহার বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মহারাজাধিরাজা বাহাদুর তেমনি তাঁহাকে জটিল ও গুরুতর রাজকার্য্য সকল শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে রাজকার্য্য সকল শিক্ষা করতঃ কার্য্যভার গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ায় প্রথমতঃ তাঁহাকে জমিদারী ও দেবোত্তর খরচ এলাকার কার্য্য-ভার প্রদান করেন। ১২৮২ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১২৮৩ পর্য্যন্ত উভয় এলাকার কার্য্য উত্তমরূপে দক্ষতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করায় তাঁহার কার্য্য কৌশল, দূরদর্শিতা, যত্ন এবং পরিশ্রমে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে ইংরাজি ১৮৬৭ খৃঃ বর্দ্ধমান রাজের "দিওয়ান-ই-রাজ" আখ্যা দিয়া একটি পদ সৃজন করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত করেন।

১৮৭৯ খৃঃ মহারাজাধিরাজা মহাতাবচন্দ্‌ বাহাদুর একটি মন্ত্রণাসভা সংগঠন করতঃ ইঁহাকে উক্ত সভার ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত করেন। তিনি এতাদৃশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন যে, মহারাজাধিরাজা তাঁহাকে যখন যে কোন বিষয় প্রশ্ন করিতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া মহারাজাকে প্রীত করিতেন।

মহারাজাধিরাজ মহাতাবচন্দ্‌ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ শ্যালক বংশগোপাল নন্দে সাহেবের প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা কন্যার নাম নিরঞ্জন দেয়ী দেবী। ইঁহার বিবাহ আগ্রা

নিবাসী প্রহ্লাদ দাস কপুরের সহিত হয়। পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদনন্দকে মহারাজাধিরাজবাহাদুর ও মহারাণী অধিরাণী দেবী দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং আফ্‌তাবচন্দ্‌ মহাতাব্‌ বাহাদুর নাম দেন। কনিষ্ঠ কন্যা প্রণবদেয়ী দেবীর জন্মগ্রহণের অত্যল্পদিবস পরেই গর্ভধারিণীর মৃত্যু হয়। মহারাজা ও মহারাণী অতিযত্নে উক্ত মাতৃহীনা কন্যাটীকে লালন পালন করেন। পরন্তু মহারাণী অপেক্ষা তাঁহার প্রতি মহারাজের স্নেহ সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; মহারাজকুমার আফ্‌তাবচন্দ্‌ ও তাঁহার সহোদরা ভগিনীদ্বয় এবং বনবিহারী ইঁহারা এক সময়ে ও একত্রে রাজঅন্তঃপুরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং একত্রে থাকিতেন।

ক্রমে ইঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বংকালে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্ম মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ভাগলপুর নগরে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে ১২৭৯ সালের ২১শে মাঘ তারিখে মহারাজাধিরাজ বনবিহারীর পক্ষে ও মহারাণী-অধিরাণী প্রণব দেবীর পক্ষে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্রী স্বরূপে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের শুভ-বিবাহ দিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। বাল্যাবধি একত্রে একস্থানে প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিণীত হইয়া নবদম্পতী অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই বনবিহারীকে কিছু কিছু ভূসম্পত্তি দিতেছিলেন; বিবাহের পর তাঁহাদের ভরণপোষণ জন্য বনবিহারীকে রাজসরকার হইতে মাসিক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা চিরবৃত্তি ও অনেক গুলি ভূসম্পত্তি উভয়কে দিয়াছিলেন এবং বাসোপযোগী সুন্দর আবাস বাটী প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাস হইতে ঐ নূতন বাটীতে তাঁহারা বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। বাটীর নাম "বন আবাস" রক্ষিত হয়। ঐ সময়ের পূর্ব্বে ইঁহারা রাজবাটীর মধ্যে স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিতেন। ইঁহাদের দুইটি পুত্র ও দুইটি

কন্যা যথাযথ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম পুত্রের নাম বিজনবিহারী কপূর, দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুজনবিহারী কপূর ও প্রথমা কন্যার নাম শ্রীমতী শ্রীদেয়ী দেবী এবং দ্বিতীয় কন্যার নাম শ্রীমতী শক্তি দেবী রাখা হয়।

কনিষ্ঠ পুত্র সুজন বিহারী কপূর অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১২৯৩ সালের ১৯শে শ্রাবণ তারিখে প্রণব দেয়ী দেবীর মৃত্যু হয়। সহধর্ম্মিণীর বিয়োগের পর রাজা বাহাদুর আর বিবাহ করেন নাই; স্বয়ং তাঁহার পুত্র কন্যাদ্বয়ের লালন পালন করিয়াছেন।

কলিকাতা নিবাসী ৺ শালগ্রাম খান্নার একমাত্র পুত্র শ্রীমান লালা শ্যামল দাস খান্নার সহিত জ্যেষ্ঠ কন্যার এবং অমৃতসহর নিবাসী ৺ বাসুমল মেহেরার মধ্যম পুত্র শ্রীমান গুরাণদিত্তা মেহেরার সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন।

বৰ্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী আফ্তাবচন্দ্ মহাতাব-মহিষী বেন দেয়ী দেবী তাঁহার স্বামীর অনুমতিক্রমে বনবিহারী কপূরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিজন বিহারী কপূরকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন; সেই বিজন বিহারীই একণে বৰ্দ্ধমান অধিপতি অনারেবল্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চন্দ্ মহাতাব্ বাহাদুর কে, সি, এস, আই, কে, সি, আই, ই আই, ও, এম্ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

মহামহিমান্বিতা ভারতেশ্বরীর ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ কালে ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী তারিখে বন বিহারী কপূর দিল্লি দরবার হইতে একখানি সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র (certificate of honour) এবং ক্রমে বৰ্দ্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের মেম্বর ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৮৫ খৃঃ ২৩শে জানুয়ারী তারিখে প্রথমবার ইনি বঙ্গেশ্বরের মন্ত্রিসভার সদস্য পদ প্রাপ্ত হয়েন। দ্বিতীয়বার ১৯০৫ খৃঃ এবং তৃতীয়বার ১৯০৭ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী তারিখে উক্ত মেম্বর পদে নিযুক্ত হয়েন।

১৮৯৩ খৃঃ মহামান্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। দিল্লিদরবারে ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারী তারিখে মহামান্য গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর ইহাঁকে সি, এস, আই (ভারত নক্ষত্র) উপাধি ও পদক প্রদান করেন। ১৯১৪ খৃঃ ইনি প্রথম শ্রেণীর কাইসর-ই-হিন্দ্ স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃঃ "রাজা বাহাদুর" খেতাব প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে ইনি রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপুর বাহাদুর সি, এস, আই রূপে আখ্যাত হইতেছেন।

১১ই ডিসেম্বর ১৯১৬ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট হাউসের দরবারে যখন "রাজা বাহাদুর" উপাধি দেওয়ার সনন্দ বঙ্গের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে প্রদান করেন, তৎসময়ে লাটবাহাদুর নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিয়া তাঁহার হস্তে সনন্দ অর্পণ করেন :—

Raja Ban Beharl Kapur Bahadur C. S. I.,

I Congratulate you very heartily on the bestowal upon you of the title of "Raja Bahadur." You have always been a trusted adviser of the Government and are reppected by all classes of Community. In recognition of the valuable services rendered by you as a nominated member of the Bengal Legislative Council and as Manager under the Court of wards of the Burdwan Estates the title of "Raja" was Conferred upon you in 1893. Ten year later in 1903 your public sevice were further recognised by your appointment to be a Compa-nion of the Order of the Star of India. Your philanthro-pic work in connection with the floods of 1913 was in

valuable and as a mark of appreciation His majesty conferred on you the Kaiser—I-Hind medal of the first Class. Your whole life has been one of faithful and unobtrusive public survice ungrudgingly rendered, and you have fully earned the title of "Raja Bahadur" which I sincerely hope you may long live to enjoy.

মহারাজাধিরাজ, আফ্তাবচন্দ্ মহতাব বাহাদুরের মৃত্যুর পর ইনি রাজকার্য্য পরিচালন জন্য কোর্ট অফ্ওয়ার্ডের পক্ষ হইতে জয়েণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন, অর্থাৎ ইনি একজন এবং টমস্ ডিবর্গ মিলার এই উভয় মধ্যে কার্য্য বিভাগ মতে দুইজন সমান ক্ষমতা সহ জয়েণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন। উক্ত মিলার সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পদে এইচ, আর, রাইনি সাহেব নিযুক্ত হন। পরে রাইনি সাহেব উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের মোগলবন্দি মহাল আয়ের Settlement officer নিযুক্ত হইলে, বঙ্গেশ্বর ইঁহার কার্য্য দক্ষতা ও অশেষ সদ্‌গুণাবলী দৃষ্টে প্রীত হইয়া বোর্ড অফ্ রেভিনিউয়ের মেম্বরের প্রস্তাব অনুসারে ইঁহাকে বৰ্দ্ধমান রাজষ্টেটের একমাত্র ম্যানেজার নিযুক্ত করতঃ বিশাল রাজষ্টেটের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। ইঁহার দ্বারা বৰ্দ্ধমান রাজ্যের বিশেষ উন্নতি ও আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইঁহার কার্য্য কুশলতায় ও সদ্ব্যবহারে গভর্ণমেণ্ট ও সর্ব্ব সাধারণে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯০২ খৃঃ ১৯শে অক্টোবর তারিখ হইতে ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজা বাহাদুর একজন সুদক্ষ অশ্বারোহী। টেনিস্ ও র‍্যাকেট খেলিতে ইনি পারগ এবং ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি সকল প্রকার বন্য পশু শিকার করিতে ইনি বিশেষযোগ্য।

কোন কোন অদূরদর্শী গ্রন্থকর্ত্তার ভ্রমবশতঃ স্বীয়গ্রন্থে সূর্য্যবংশ

সম্ভূত পবিত্র ক্ষত্রিয় জাতিকে তন্নিম্নশ্রেণীস্থ জাতি ভুক্ত করায় তদ্দৃষ্টে বিগত লোক গণনায় তাঁহাদিগকে কৃষিবাণিজ্য-জীবি বৈশ্যজাতির শ্রেণীভুক্ত করায় ১৯০১ খৃঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫৭৪ নং বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইলে, বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, পঞ্জাব, প্রভৃতি প্রদেশস্থ যাবতীয় কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়মণ্ডলী সমবেত হইয়া অযোধ্যা প্রদেশস্থ বেরিলী নগরে একটী বিরাট ক্ষত্রিয় সভা স্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত রাজা বন বিহারী কপূর বাহাদুরকে তাহার সভাপতি পদে বরণ করেন। রাজা বাহাদুর যথোচিত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে মন্বাদি মহর্ষি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদি সহ উল্লিখিত বিজ্ঞাপনের ভ্রম প্রমাণ করিয়া দেখান ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণ জাতিরই নিম্নস্থ এবং বিগত ১৯০১ খৃঃ জুলাই মাসে ভারতবর্ষের সেন্‌সস্ কমিশনর স্যর এইচ্ এইচ্ রিজলি সাহেব বাহাদুরের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

কমিশনার সাহেব বাহাদুর রাজা বাহাদুরের প্রেরিত অভ্রান্ত যুক্তিপূর্ণ ও পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ প্রণীত ব্যবস্থাসহ উক্ত আবেদন পত্র পাঠ করিয়া তদীয় মতই অনুমোদন করতঃ প্রাগুক্ত বিজ্ঞাপনের ভ্রম সংশোধন-পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় জাতিকে পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ জাতির নিম্নস্থ স্বীকার করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন।

এই উপলক্ষে স্বদেশ ও বিদেশস্থ যাবতীয় ক্ষত্রিয়মণ্ডলী তাঁহার প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তদীয় অসীম যত্নের পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে বিরাট ক্ষত্রিয় সমাজের শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন।

চকদীঘির সিংহ রায় বংশ

——:•:——

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী চকদীঘির জমিদার বংশ প্রাচীনত্ব হিসাবে অতি উচ্চাসন দাবী করিতে পারে। এই বংশের আদিপুরুষ রাজপুতনাবাসী। কোন সময়ে বিখ্যাত কালিঞ্জর দুর্গ ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষের অধিকারভুক্ত ছিল। জাতিতে ইহারা সূর্য্যবংশীয় বনাফর (বনস্ফর) ছত্রি। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বিজয়ীও হইয়াছিলেন। এক সময় দিল্লীর শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথিরাজ ইহাদের কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া নিজ কন্যাকে ইহাদের মাতুল পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হন। হিন্দি ভাষায় লিখিত "আহলা খণ্ড" পুস্তকে বিবৃত আছে,কোন রাজনৈতিক কারণে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করিতে বাধ্য হন। বঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহারা এদেশে প্রভূত সম্পত্তি লাভ করেন এবং নীল ও রেশমের কারখানা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। বর্দ্ধমান জেলায় এই বংশ বর্দ্ধমান রাজের পরেই দ্বিতীয় স্থান, অধিকার করিয়াছেন, এবং ইংরেজাধিকারের প্রথমাবস্থা হইতেই রাজভক্তির জন্য যশস্বী হইয়াছেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার জঙ্গলে ভূগর্ভস্থ দুর্গ হইতে একজন বিদ্রোহীকে দমন করেন।

কেবল মাত্র হরিসিংহ রায়ের বংশধরগণ ব্যতিত এই বংশের সমস্ত শাখাই (in the male line) এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। এই

হরি সিংহ রায় "মহাশয়" আখ্যায় আখ্যায়িত হইতেন। সে কালে নিতান্ত সম্ভ্রান্ত ও সজ্জন ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে অন্য কাহাকেও এই গৌরবজনক উচ্চ সম্মান দেওয়া হইত না। তাঁহার পুত্র ছক্কনলাল সিংহ রায় অনারারি মেজর ছিলেন। তিনি লর্ড কার্জ্জনের শাসন সময়ে ১৯০৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে Lord Curzon এবং Lord Kitchner দুঃখ প্রকাশ করিয়া তৎপুত্র রাজা মণিলালকে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠে বুঝা যায় যে তিনি ইঁহাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তৎকালে এতৎ দেশীয়ের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথম সেনানি পদ (British commission) প্রাপ্ত হন। তিনি লর্ড রবার্টসের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র জীবিত,—(১) রাজা মণিলাল সিংহ রায় (২) ঠাকুর রজনী লাল সিংহ রায়।

রাজা মণিলাল স্বদীয় স্বভাব সিদ্ধ রাজভক্তির প্রভাবে রাজ প্রতিনিধি এবং সাধারণের হইতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণের পর্য্যন্ত বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। ১৯০৮ সালের ২০শে নবেম্বর তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এণ্ড্রুফ্রেজার বিপ্লবাদি দমন কল্পে যে গুপ্ত পরামর্শ সভা আহ্বান করেন, মণিলাল ছোটলাটের বিশেষ অনুরোধে সেই সভায় যোগদান করেন। ১৯০৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর বড়লাটভবনে রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর সভাপতিত্বে যে গুপ্ত পরামর্শ সভা হয়, মণিলাল তাহাতেও নিমন্ত্রিত হন। উভয় স্থলেই তিনি স্বাধীনভাবে জনহিতকর পরামর্শ দান করিতে নিরস্ত হন নাই।

ইউরোপের মহাসমর-বহ্নি প্রজ্বলিত হইলে মণিলাল প্রতি সপ্তাহে কলিকাতা বাজারের খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণকল্পে একটা সভা প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দেন। বলা বাহুল্য অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং মূল্য নির্দ্ধারণ কল্পে

একটী সমিতিও গঠিত হয়। এই সময় রাজা মণিলালের একমাত্র পুত্র শৈলেশ্বর ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয় প্রসাদকে মহামান্য ভারত সম্রাট অবৈতনিক সামরিক Lieutenant নিযুক্ত করেন।

রাজা মণিলাল বিংশতি বৎসরেরও অধিককাল কলিকাতা Volunteer rifles এর সভ্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা ছাড়া স্ব-জেলায় ও জেলার বহির্ভাগে তিনি এইরূপ বার তেরটীর অধিক অবৈতনিক পদে নিযুক্ত আছেন। এমন কি সুদূর দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে লুই জুবিলী স্বাস্থ্য নিবাসের (Lewis Jubilee Sanitarium) তিনি অন্যতম কার্য্য নির্ব্বাহক। দার্জ্জিলিঙ্গে প্রতি বৎসর কমিশনার ও নানাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের যে সভা হয় তিনি তাহাতে নিমন্ত্রিত হন। তিনি ১৫ বৎসরেরও অধিককাল বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের সভ্যপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯০৯ সাল হইতে তিনি বর্দ্ধমানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। তিনি এই বিচারাসনে একাকী উপবেশনপূর্ব্বক বিচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপস্থিত তিনি বিচার বিষয়ে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৬০ ধাঃ মতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা, তাঁহারও সেই ক্ষমতা। ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে সনন্দ প্রদানকালে তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার বলেন—"আপনাকে যে সম্মান প্রদান করা হইতেছে, এজন্য আমি আপনার প্রতি আমার আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি এবং কৃষিসমিতি ও চৌকিদারী সমিতির জন্য আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার সহায়তায় গভর্ণমেণ্ট অনেক প্রকার উপকৃত হইতেছেন।" মাননীয় স্যার হেন্‌রী হুইলারও ১৯০৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে তাঁহার বিশেষ প্রশংসাবাদ করেন। তিনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে

চৌকিদার সম্মেলনে সুন্দর কার্য্য করায় প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ অনুরোধে তিনি চকদীঘি চৌকিদারী সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ১৯০৫ সাল হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন।

১৯১১ সালের দিল্লীর রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে তিনি দিল্লীর দরবার পদক প্রাপ্ত হন। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট প্রিন্সেপ ঘাটে বঙ্গে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে সম্রাট দম্পতীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, মণিলাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কলিকাতায় সম্রাট দম্পতীর সংবর্দ্ধনার জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়, মণিলাল তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। "Imperial league" রাজা মণিলালেরই সৃষ্টি। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা রজনীলাল রাজকীয় সম্মেলনে (Royal Levee) বঙ্গদেশের ছোটলাট কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছিলেন। রাজা মণিলাল চকদিঘীর রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শৈলেশ্বর। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজনী লাল, উক্ত রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় কন্যার পানিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় M. A. B L., তিনি আর শৈলেশ্বর সিংহরায় উভয়েই কলিকাতা ভলান্টিয়ার রাইফেলস্ এর সভ্য ছিলেন। গভর্ণমেন্ট, রাজা মণিলাল ও তাঁহার ভ্রাতা রজনীলালকে অনুচরবর্গ সহ অস্ত্র আইনের পাশ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

১৯০৬ সালে বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার চকদীঘিতে ইঁহাদের গৃহে গমন করিয়া ইঁহাদিগকে সম্মানিত করেন।

রাজা মণিলাল চিত্র বিদ্যা ও কারুশিল্পের অত্যন্ত অনুরাগী। তিনি সুন্দর তৈল চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন। দার্জ্জিলিঙ্গে লুই জুবিলী

স্বাস্থ্য নিবাসে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের যে প্রকা● তৈল চিত্র ইনি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন তাহা দেখিলে ইনি তৈল চিত্রে যে সিদ্ধহস্ত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

১৯১৩ সালে দামোদরে যে প্রবল বন্যা হয়, সেই সময় বন্যা প্রপীড়িত অধিবাসিগণকে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময় যখন তিনি শুনিলেন যে চকদীঘির অনতিদূরেই দামোদরের তীর বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধকার রাত্রে উঠিয়া নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া নানা উপায়ে পঁচিশ খানি গ্রামের অধিবাসীকে জাগ্রত ও সতর্ক করিয়া দিলেন। তাহার ফলে একটী প্রাণীও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। তাঁহারই চেষ্টার ফলে গবর্ণমেণ্ট ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্দ্ধমানে রেল লাইন সমূহে জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঐ সময় রাজা মণিলাল বঙ্গদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীকরণার্থ যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট তদনুযায়ী কার্য্য করিতে রত হইয়াছেন।

১৯১৬ সালে নববর্ষোপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট মণিলালকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্ট হাউসে অনুষ্ঠিত দরবারে লর্ড কারমাইকেল তাঁহাকে খিলাত ও সনন্দ দিবার প্রসঙ্গে বলেন—

"রাজা মণিলাল সিংহ রায়, আমি আন্তরিকভাবে আপনার এই উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইতেছি। আপনি একটি বিখ্যাত রাজপুত জমিদার বংশের গৌরব। আপনার পিতা স্বর্গীয় ছকনলাল সিংহ রায় কলিকাতায় Vol, regiment এর অনারারি মেম্বর ছিলেন এবং কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয় সর্ব্বসাধারণেই তাঁহাকে সমান শ্রদ্ধা করিতেন। ১৯০৮ সালে আপনি "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। চক্দীঘি চৌকিদারী ইউনিয়নের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থ কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য আপনাকে উক্ত উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। আপনার পরামর্শ গভর্ণমেণ্টের অনেক সহায়তা সাধন করিয়াছে। আপনি অনন্যসাধারণ রাজভক্তির দ্বারা অন্যান্য জমিদার-দের মধ্যে একটা আদর্শ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

রাজা মণিলাল মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আপন অভিমত জ্ঞাপনের জন্য ভারতসচিবের নিকট আহূত হইয়া-ছিলেন। 'সাউথবরো" কমিটির সাবজেক্ট্ ও ফ্রানচাইজ—উভয় কমিটিতেই আহূত হইয়া তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে তিনি বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম বে-সরকারি অবৈতনিক চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। ঐ পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করায় তিনি কার্য্যকাল শেষ হইলে পুনঃ নির্ব্বাচনকালে সর্ব্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয়বার ঐ চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তিনি বঙ্গীয় লাটসভার জন সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত অন্যতম সদস্য। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় M, A, B, L, দ্বিতীয় সদস্য। রাজা মণিলাল বঙ্গীয় কৃষক সমিতিরও সহকারি সভাপতি। ইনি "Free Mason" সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করেন। নিম্নে ইহাদের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :—

ভিখারী সিংহ রায় (বঙ্গে আগমন করেন)
|
মানপর সিংহ রায়
|
স্বভাব সিংহ রায়
|
নল সিংহ রায়
|
হরিসিংহ রায়
|
মেজর ছকনলাল সিংহ রায়

(পুত্রগণ:)
- ৺বিনোদবিহারী সিংহ রায়
  - চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ রায়
- রাজা মণিলাল সিংহ রায়
  - Lt, শৈলেশ্বর
- রজনীলাল সিংহ রায়
  - Lt, বিজয়প্রসাদ, নিত্যানন্দ, প্রভানাথ, পশুপতি।
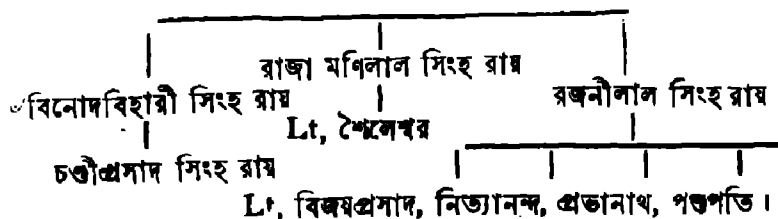
তিনি ১৯২২ সালের ১লা January তারিখে ভারত-সম্রাট কর্তৃক Companion of the most Eminent order of the Indian Empire সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। কি কারণে যে তিনি ইহা লাভ করিলেন তাহা বঙ্গের লাট Lord Ronaldshay তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে যে পত্র লেখেন তাহাতে এবং ১৬।১।২২ তাঃ বর্দ্ধমানে ডিঃ বোঃ পরিদর্শনকালে যাহা প্রকাশ্যে বক্তৃতা দ্বারা প্রকাশ করেন তাহাই প্রকাশ হইতেছে।

"Government House,
Calcutta, 31, 12, 21,

My dear Raja Shahib,

I am delighted to see that the most valuable public work which you have to your credit has been recognised

by the conferment upon you by His Majesty of a companionship of the order of the Indian Empire. I hasten to congratulate you upon it, 1 am indeed glad that all that you have done has met with this signal proof of His Majesty's approval,

Believe me
Yours sincerely,
Ronaldshay,

Raja Manilall Singa Roy of Chakdighy, C, I, E,

Extract from the speech of H, E, Lord Ronaldshay mentioned adove :—

It gives me special satisfaction to congratulate your chairman not only upon the manner in which he has discharged his duties but also upon the fact that in recognition of the admirable manner in which he has carried them out, he has recently been made by His Majesty the King Emperor, a Companion of the most Eminent order of the Indian Empire,

আন্দুল রাজবংশ।

হুগলীর প্রাচীন ও সম্রান্ত ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় মধ্যে আন্দুল রাজ-বংশের নাম সসম্মানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নানা প্রকার জন-হিতকর অনুষ্ঠান এবং দানশীলতার জন্য এই বংশ চিরদিনই বিখ্যাত। হুগলী জেলায় আন্দুল রাজবংশের নাম জানে না, এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম দেওয়ান রামচরণ রায়। ইনি অতি উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন। ইঁহার বুদ্ধি ও ধীশক্তি যথেষ্ট ছিল এবং সেকালের প্রথা অনুসারে পারশী ও আরবী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যৎসামান্য ইংরেজীও তিনি শিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পূর্ব্বে ঘটনাচক্রে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পা-নীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন।

দেওয়ান রামচরণ রায়।

তিনি প্রথমে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে হুগলীর উকিল পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি বাড়ীভাড়া ও পিওনের খরচ বাবদ মাসিক ৫৲ পাইতেন। তথা হইতে তিনি মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে মুর্শিদাবাদে বদলী হন, এই বেতন ছাড়া তিনি পিওন প্রভৃতির খরচ বাবদ মাসিক ২৮৲ টাকা পাইতেন। পলাশীর যুদ্ধের সময়ে তিনি মাসিক ৬০৲ বেতনে দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী এবং কর্ম্মী ব্যক্তি ছিলেন; কাজকর্ম্মে তাঁহার সাধুতা দেখিয়া তাঁহার উপর কোম্পানীর খুবই বিশ্বাসের উদ্রেক হয় এবং ক্রমে লর্ড ক্লাইভের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ে। মুন্সী নবকৃষ্ণের মত লর্ড ক্লাইভ ও হেষ্টিংশের তিনি

অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। পলাসীর যুদ্ধের পরে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকৃত পক্ষে এ দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া পড়েন। সেই সঙ্গে কোম্পানীর বিশ্বাসভাজন দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের পথও খুলিয়া যায়। দেওয়ান রামচরণ রায়ের সৌভাগ্যের শুভসূচনা এখন হইতেই আরম্ভ হইল এবং কোম্পানীর নিকট ক্রমেই তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্লাইভ প্রথমবার বিলাতে চলিয়া যাইলে তিনি কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না। তবে এরূপ প্রকাশ যে, যখন ক্লাইভ লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তারূপে দ্বিতীয়বার কলিকাতায় পদার্পণ করেন সেই সময়ে দেওয়ান রামচরণ রায় আসিয়া আবার তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হন। লর্ড ক্লাইবের এদেশে অনুপস্থিতকালে বক্সার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহিত একযোগে অযোধ্যার নবাব বিহার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন; ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরো ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে তাঁহাদিগকে এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। বক্সার যুদ্ধে ইংরেজদের তেমন লাভ হয় নাই।

লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং ঐ বৎসরেরই আগষ্ট মাসের ১২ই তারিখে সম্রাট শাহ আলম একটী ফরম্যানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ইহার অল্প দিন পরে সম্রাট শাহ আলম লর্ড ক্লাইভকে আরও তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কতিপয় কর্ম্মচারীকে যথাযোগ্য উপাধি প্রদানে সম্মানিত করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন; সেই সময়ে লর্ড ক্লাইভ দেওয়ান রামচরণ রায়কে উপাধি দিবার জন্য সুপারিশ

করিতে চাহেন। কিন্তু তিনি বিনয়ের সহিত লর্ড ক্লাইভকে জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলোচন রায় সম্রাটের প্রদত্ত উপাধি লাভের যোগ্য ব্যক্তি। লর্ড ক্লাইভ তাঁহার দেওয়ানের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং সম্রাট শাহ আলমের নিকট রামলোচন রায়ের নাম সুপারিশ করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট রামলোচনকে "রাজা" উপাধি দান করিলেন এবং লর্ড ক্লাইভও উহার অনুমোদন করিলেন। ইহা ব্যতীত রামলোচনকে সশস্ত্র ৫০০০ পাঁচ হাজার সৈনিকের অধিনায়কত্ব করিবার ও ঝালর দেওয়া পাল্কী ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল এবং তিনি যখন পথে বাহির হইবেন তখন তাঁহার অগ্রে অগ্রে কাড়া-নাগড়া বাজিবে এইরূপ হুকুমও সম্রাট্ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে একটী কামান আন্দুলরাজবংশের অধিকারে আসে; উহার দৈর্ঘ্য ৪ ফিট ৭ ইঞ্চি ও উহার মুখ গহ্বরের ব্যাস ৩ ইঞ্চি। এই কামান রাখিবার অধিকার এখনও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। রামচরণের মৃত্যু হইলে কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ তাঁহার পুত্রের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি নগদ ১২ লক্ষ টাকা, হুণ্ডী ও জমিদারীতে ১৮ লক্ষ টাকা, ২৫ লক্ষ টাকার অলঙ্কার, ৮০টি সোণার ও ৩২০টি রূপার কলসী রাখিয়া যান।

রামচরণের রাজভক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস জোরহাট গ্রামটী তাঁহাকে নিষ্কর দান করেন। মীরজাফরের প্রথম শাসনকালে তাঁহাকে কোলাড়া ও অন্যান্য গ্রাম এবং তালুক এবং কাশিম আলি খাঁর শাসনকালে তাঁহাকে পরগণা দেওয়া হয়। তিনি বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশই তিনি নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে ও ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করেন।

সামরিক মর্য্যাদা হিসাবে রাজা রামলোচন বাঙ্গালার নবাব

নাজিমের আদেশানুবর্ত্তী ছিলেন। রাজা রামলোচন রায় বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস্ তাঁহাকে মহিষাদল মৌজা জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন; কিন্তু রাজা রামলোচন তাহা রাণীর আবেদনানুসারে মহিষাদল অধিপতিকেই পুনরায় প্রত্যর্পণ করেন। তিনি প্রত্যেক পর্ব্ব ও সকল ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে পণ্ডিত-গণকে এবং টোলে ও চতুষ্পাঠীতে অর্থ সাহায্য করিতেন। তদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দকে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ দান করিতেন। তিনি সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী আন্দুল গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। যে সময় তিনি আন্দুল সহরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, সেই সময়ে সরস্বতী নদী 'বহতা' ছিল, বড় বড় নৌকা উহার উপর দিয়া যাতায়াত করিত। সরস্বতী পবিত্র নদী, নিম্নবঙ্গে ভাগীরথীর ন্যায় উহার জল পবিত্র বলিয়া খ্যাত। এখন সরস্বতী নদী মজিয়া গিয়াছে।

সমাজে রামলোচনের এতদূর প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল যে, তিনি "আন্দুলাব্দ" নামে একটী অব্দের প্রচলন করেন। বর্ত্তমানে ঐ অব্দের ১৪৬ বৎসর চলিতেছে। কালীঘাটে কালীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী সুবৃহৎ নাটমন্দির তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাম লোচনের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ রায় তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি রাজা রামলোচনকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে তিনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। রাজা রামলোচন ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে প্রকৃত সহায়তা করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের

বিচারের সময়ে তিনি গভর্ণমেণ্টের পক্ষের প্রধান সাক্ষী ছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে সিলেক্ট কমিটীর সভায় রণতরী বিভাগের হিসাব সম্বন্ধে রাজা রাম রামলোচনের জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছিল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের এক পত্রে কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টর নন্দকুমার সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—"নন্দকুমারের মামলা সম্বন্ধীয় কাগজপত্র পাঠ করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনি নিঃসন্দেহ জাল করিয়াছিলেন এবং রামচরণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের ১৭ তারিখে জন জনষ্টোন সাহেব তাঁহার মন্তব্য পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—রামচরণ যে ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ও লর্ড ক্লাইভ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

রাজা রামলোচনের যখন মৃত্যু হয়, তখন রাজা কাশীনাথের বয়স মাত্র এক বৎসর। কাজেই তাঁহার মাতা রাণী সখী সুন্দরী তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র রাজচন্দ্র রায় ও শিবচন্দ্র রায় তাঁহার অভিভাবক হন। রাজা কাশীনাথ অতীব বিনয়ী, শিষ্টাচারপরায়ণ এবং বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনিও সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণকে উৎসাহ দান করিতেন। বহু ব্রাহ্মণকে তিনি ভূমিদান করিয়াছিলেন। আন্দুলের অন্নপূর্ণা দেবীর সুদৃশ্য মন্দিরটী তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার পুত্র রাজনারায়ণ আন্দুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

রাজা কাশীনাথ রায়

পিতার মৃত্যুকালে রাজা রাজ নারায়ণের বয়স মাত্র ৬ বৎসর; কাজেই যতদিন তিনি সাবালকত্ব না পাইয়াছিলেন ততদিন কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডস্‌ তাঁহার জমিদারী চালাইয়াছিলেন।

তিনি হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। কায়স্থজাতির উন্নতিকর সকল আন্দোলনেই তিনি যোগদান করিতেন ও সামাজিক মর্য্যাদার হিসাবে কায়স্থগণ যে ঠিক ব্রাহ্মণেরই পরবর্ত্তী, ইহা তিনি বলিতেন; এবং সমাজে এই অধিকার বজায় রাখিবার জন্য তিনি শক্তিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কায়স্থগণের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহযোগিতায় "কায়স্থ কৌস্তভ" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; সেই গ্রন্থে কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় এবং তাহাদের যে উপবীত ধারণের অধিকার আছে ইহা তিনি সপ্রমাণ করেন। আন্দুলে তাঁহার পুত্রের বিবাহে তিনি কুশণ্ডিকা করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল এবং তিনি আন্দুল রাজবংশের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য তাঁহার শক্তি সমস্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং যাঁহারা সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন তিনি তাঁহাদিগকে প্রভূত উৎসাহ প্রদান করিতেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এবং গোয়ালিয়র হইতে যে সকল গীত-বাদ্যের কালোয়াৎ তখন বাঙ্গালা দেশে আসিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে আন্দুলে নিমন্ত্রণ করিতেন। আন্দুলের গীতবাদ্যের মজলিস উপভোগ করিবার সামগ্রী ছিল। প্রত্যেক মজলিসেই কলিকাতার সামান্য একটু নামওয়ালা সঙ্গীতজ্ঞ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহার বাটীতে যে সকল নিমন্ত্রিত আসিতেন তাঁহাদিগকে মুসলমান আদব কায়দার হিসাবে পায়জামা, চাপকান, কাবা, কোমরবন্ধ ও পাগড়ী পরিধান করিতে হইত।

রাজা রাজনারায়ণ রায়।

রাজা রাজনারায়ণ নিজে যেমন সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনায় উৎসাহ দান করিতেন। প্রসিদ্ধ অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ্ ও কবি বঙ্গবিশ্রুত পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে তিনি "আন্দুল রাজ

প্রশস্তি" নামক মৌলিক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় কয়েকটী কবিতা রচনাও করেন, কিন্তু রাজা রাজনারায়ণের মৃত্যু ঘটায় এই রচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

লর্ড অকল্যাণ্ড এদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিবার অল্পদিন পরেই রাজা রাজনারায়ণ তাঁহার সহিত পরিচিত হন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁহার 'রাজা বাহাদুর' উপাধির অনুমোদন করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার মর্য্যাদার উপযোগী সম্মানসূচক এক প্রস্থ পরিচ্ছদ এবং রত্নখচিত একটি তরবারি ও ছুরিকা প্রদান করেন। তখনকার সময়ে এইরূপ উপঢৌকন বিশিষ্ট সম্মানের পরিচায়ক ছিল এবং সমাজে বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ এমন উচ্চ মর্য্যাদাজনক উপঢৌকন পাইবার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন না।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ৪৬ সংখ্যক "কলিকাতা গেজেটে" নিম্নলিখিত ঘোষণা বাহির হইয়াছিল।

Fort William, 18th May, 1835

The Honourable Governor-General in Council has been pleased to confer upon Babu Raj Narain Roy, Zeminder of Andul, the dignity and title of Raja and Bahadur.

(sd) W. H. Macnaighton,

Secretary to the Government of India.

তাঁহার পিতামহ ও পিতার ন্যায় তিনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অনুরাগী

এবং রাজভক্ত ছিলেন। মিথিলা ও বারাণসীর কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে তিনি সভাপণ্ডিত করিয়াছিলেন। তিনি একটী চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার ভার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের হস্তে ন্যস্ত করেন। তাঁহার সময়ে আন্দুল সংস্কৃতালোচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং লোকে আন্দুলকে "দক্ষিণ বঙ্গের নবদ্বীপ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এবং যোগ-সাধক ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর আন্দুলকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। স্মৃতি, ন্যায়, কাব্য ও দর্শনে তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার ছিল। একবার নবদ্বীপের এক বিরাট ধর্ম্ম সভায় তিনি আহূত হইয়াছিলেন। সেই সভায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিদ্যাপীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। সেই সভায় যে বিচার হয় তাহাতে আন্দুলের পণ্ডিত ভৈরবরচরণ দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রে আমন্ত্রিত সমগ্র পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া বিজয়-গৌরব লাভ করেন এবং আন্দুলের নাম ভারতের বিদ্যাপিঠ-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে. বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের নিকট নিয়মিত বৃত্তি পাইতেন। জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠান-সমূহেও তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি স্বীয় জমিদারীর ভিতর বিস্তর পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বহু পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। আন্দুল হইতে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত পথ তাঁহারই অর্থে ও উদ্যোগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি জমিদারীর কাজকর্ম্ম ও বিষয় সম্পত্তি পরিদর্শনের কার্য্য খুব ভালরূপই জানিতেন; এইজন্য তাঁহার সময়ে আন্দুলের রাজপরিবারের জমিদারী ও আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার নির্ম্মিত আন্দুল রাজ প্রাসাদের দরবার হল স্থাপত্য সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালার উল্লেখযোগ্য আসন অধিকার করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সময় দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাজা রাজ নারায়ণের মৃত্যুর পর রাজা বিজয় কেশব রায় সিংহাসনের অধিকারী হন।

তাঁহার পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বয়স মাত্র তের বৎসর। কাজেই তাঁহার মাতা রাণী মহোদয়া ও ক্ষেত্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়া নাবালক রাজার অভিভাবক হিসাবে জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় কেশবের বিধবা স্ত্রী রাণী নবদুর্গা ও দুর্গা সুন্দরী দত্তক লইয়া মোকদ্দমা করিলে মিঃ জে-সি ম্যাগ্রেনর জমিদারীর রিসিভার নিযুক্ত হন। ইনিও সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং পণ্ডিতগণকে মুক্ত হস্তে অর্থদান করিতেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর বৈরাগ্য-পরায়ণ ছিল। তিনি প্রায়ই একাকী থাকিয়া পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন। শেষ বয়সে সাধু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সহিত কালযাপন করিতেন। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে ইহার দুই বিধবা পত্নী সম্পত্তির অধিকারিণী হন। শেষে দুই বিধবা পত্নীই দত্তক গ্রহণ করেন; কিন্তু একত্র দুই দত্তক গ্রহণ করা হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিলে কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা উপস্থিত হয়। সেই মামলা প্রিভি কৌন্সল পর্য্যন্ত চলে। পরে প্রিভি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ দুই দত্তককে অবৈধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে রাজা কাশীনাথের দৌহিত্র ক্ষেত্র কৃষ্ণ মিত্র আন্দুল রাজবংশের অধিকারী সাব্যস্ত হন।

রাজা বিজয় কেশব রায়।

ক্ষেত্রকৃষ্ণের পিতার নাম বাবু কালীপদ মিত্র। ইহারা বড়িশা সমাজের সম্রান্ত মুখ্য কুলীন; হুগলী জেলার কোন্নগরে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা কাশীনাথ রায় কালীপদ মিত্রের সহিত তাঁহার

কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কালীপদ বাবু রাজা কাশীনাথের নিকট হইতে বিস্তর ভূসম্পত্তি এবং একটী উৎকৃষ্ট বসত-বাটী যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষেত্র-কৃষ্ণ উদার হৃদয় ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। এই জন্য তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে "রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র" বলিয়া সম্ভাষণ করিত। এই সময়ে বহুদিনব্যাপী মোকদ্দমায় আন্দুল রাজবংশকে বিস্তর অর্থব্যয়জনিত ক্ষতি ভোগ করিতে হয়। রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ খুব হিসাবী লোক ছিলেন; তিনি অপব্যয় নিবারণ করিয়া জমিদারীর আয়-বৃদ্ধি কল্পে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু যে ব্যাপারে দশের কল্যাণ হইবে জানিতে পারিতেন সে ব্যাপারে তিনি মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার দানের তালিকা দেখিলেই তাঁহার হৃদয় যে কত বড় ছিল তাহা বুঝা যায়। তিনি উলুবেড়িয়ার কলেরা হাঁসপাতালে এককালীন অনেক টাকা দিয়াছিলেন এবং মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেন। উলুবেড়িয়া গবর্মেন্ট স্কুলে তাঁহার মাসিক অর্থ সাহায্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং খুলনার আমাদি মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে তিনি বার্ষিক সাহায্য করিতেন। হুগলীর ডফারিণ হাঁস-পাতালে তিনি বহু টাকা দান করেন। হাবড়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্রিয়ারসনের অনুরোধে তিনি আন্দুলে সরস্বতী নদীর সেতুটি পুনর্নির্ম্মিত করাইয়া দেন এবং এই কার্য্যে তাঁহার ৫০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। প্রত্যহ প্রায় ৫০০০ লোক এবং অনেক গরু ও বাছুর ও গো-শকট এই সেতু দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। ইনি আন্দুল রাজগঞ্জ রোড অনেক টাকা খরচ করিয়া পাকা করিয়া দেন এবং এজন্য এই অঞ্চলের অধিবাসিগণের প্রভূত উপকার হয়। ইহাতে ৮০০০ টাকা খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত আন্দুলে একটী অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় মাসিক ৫০০৲ টাকা ব্যয়ে প্রায় পাঁচবৎসর কাল চালাইয়া-

রাজা ক্ষেত্র কৃষ্ণ মিত্র।

ছিলেন। এই স্কুলটির নাম ছিল—"আন্দুল জুবিলী স্কুল।" এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় তাঁহার ৩০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। প্রকাশ, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অনুরোধে তিনি এই স্কুলটি উঠাইয়া দেন; কারণ ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে আপনার এই অবৈতনিক স্কুলটীর জন্য মহিয়াড়ীর গবর্মেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলটীর বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। আন্দুলের রাজবাটীর ঠাকুর বাড়ীতে শতশত শিবমূর্ত্তি, অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্ত্তি এবং নাড়ুগোপালের মূর্ত্তি বিদ্যমান; ইঁহাদের পূজার জন্য বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহার উপর প্রতি বৎসরই দুর্গা পূজার জন্য বার্ষিক ৩৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। পূজার নৈবেদ্য ও প্রসাদ ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে বিতরণ করা হয়। জোড়হাট মৌজার জমিদারীর আয় হইতে এই সকল পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আন্দুল বাজারের আয় হইতে 'সদাব্রত' ও প্রত্যহ সাধু ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা আছে।

শিবপুরের হনুমন্ত ঘাটে একটী প্রশস্ত ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত স্থান ও তৎসংলগ্ন কয়েকখানি পাকা ঘর আন্দুল রাজবংশ কর্তৃক শিবপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীদিগকে শ্মশানঘাটরূপে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ভাগীরথী এই স্থান হইতে সরিয়া যাওয়ায় ইহা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর দখলে আসিয়াছে।

শিবপুরের হনুমন্ত ঘাটের সন্নিকটে চারিটী মন্দির আছে; সেই মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। ইহাদের পূজার জন্য আন্দুল রাজবংশ হইতে বার্ষিক ৩০০৲ টাকা বরাদ্দ আছে। এই টাকায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার আট নয় পুরুষ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছেন। আন্দুল-রাজবংশের বর্ত্তমান বংশধরগণ এই মন্দির চারিটীর পূর্ণ সংস্কার করিয়া দেন। বারাণসীর দেবপুরা নামক স্থানে দুইটী সুবৃহৎ মন্দির রাজা

ক্ষেত্রকৃষ্ণ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইনি হাবড়া টাউন হল প্রস্তুতের সময় ১৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণের তিন পুত্র এবং তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার উপেন্দ্রনাথ পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। সকল সদনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য মূলে তাঁহার হাত ছিল। দ্বিতীয় পুত্রের নাম—কুমার দেবেন্দ্র নাথ; ইনি এক কন্যা রাখিয়া পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন। কনিষ্ঠের নাম—কুমার নগেন্দ্রনাথ।

রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র পরোপকার পরায়ণ ছিলেন এবং জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিতেন বলিয়া বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি বাহাদুর তাঁহাকে ভারত সম্রাজ্ঞীর নামে এক প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। মূল পত্র ও তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

June 20th 1897,

By command of His Excellency the Viceroy and Governor General, in council this certificate is presented in the name of Her Most Gracious Majesty, Queen Victoria, Empress of India to Babu Kshetra Krishna Mitter, Zaminder of Andul, Howrah, in recognition of his Public spirit and liberality,

Sd A, Mackenzie,
Lieutenant Governor of Bengal,

ইহার অর্থ মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের আদেশক্রমে এবং বিপুল রাজশ্রীমণ্ডিতা ভারত রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে হাওড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুলের জমিদার বাবু ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্রকে তাঁহার জনহিতকর অনুষ্ঠান ও দানশীলতার জন্য এই প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হইল। (২০শে জুন, ১৮৯৭)

স্বর্গীয় কুমার উপেন্দ্রনাথ মিত্র

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৮৫ বৎসর বয়সে রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ এক উইল করেন। সেই উইলে লেখা ছিল যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবেন ও বাড়ীর কর্ত্তা হইবেন এবং কনিষ্ঠ তাঁহার অধীনে কাজকর্ম্ম দেখিবেন। এইজন্য জ্যেষ্ঠ পাইবে বিষয়ের দশ আনা ও কনিষ্ঠ পাইবে ছয় আনা অংশ। কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর এই উইল লইয়া দুই পক্ষে মামলা বাধে; তাহাতে আন্দুল রাজবংশের অনেক টাকা খরচ হইয়া যায়। শেষে এই সর্ত্তে আপোষে মামলাটি মিটিয়া যায় যে, উভয় পক্ষই সমানভাবে সম্পত্তির অংশ পাইবেন, তবে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু অর্থ প্রদান করিবেন।

কুমার উপেন্দ্রনাথ জমিদারীর কার্য্য ভালরূপ জানিতেন; তিনি পিতার জীবদ্দশায়ই এই কর্ম্মে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই জমিদারী স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার স্বভাব বড় মিষ্ট ছিল; এইজন্য প্রজারা তাঁহাকে খুবই পছন্দ করিত। ইউরোপীয় সমাজে তাঁহার অনেক বন্ধু ছিলেন। একবার লর্ড কিচেনার তাঁহাকে সাক্ষাৎকার দান করেন ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে প্রদত্ত রত্নখচিত তরবারিটী দর্শন করেন। লর্ড কিচেনারের একটী প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার স্বাক্ষর সমেত আন্দুল রাজবাটীতে রক্ষিত আছে।

আন্দুল রাজপরিবারের সুবিস্তৃত জমীদারী দুই তরফে বিভক্ত, বড় তরফ ও ছোট তরফ। কুমার উপেন্দ্রনাথ বড় তরফের এবং কুমার নগেন্দ্রনাথ ছোট তরফের জমিদারীর মালিক। হাবড়া, হুগলী, খুলনা, বর্দ্ধমান, ২৪পরগণা, মেদিনীপুর জেলা এবং সাঁওতাল পরগণা ও পুরী প্রভৃতি জেলায় ইহাদের জমিদারী বর্ত্তমান।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই ৫২ বৎসর বয়সে কুমার উপেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। পাঁচপুত্র চারি কন্যা রাখিয়া ইনি পরলোক গমন করেন।

ইহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম—প্রমথনাথ, দ্বিতীয়ের নাম মন্মথনাথ, তৃতীয়ের স্মরথনাথ, চতুর্থের ভরতনাথ এবং কনিষ্ঠের জগৎ-নাথ। কুমার উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়ে জগৎনাথ নাবালক ছিলেন। সেই জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই মর্ম্মে উইল করিয়া যান যে, জগৎনাথ যতদিন সাবালক না হইবেন, ততদিন বিষয় সম্পত্তি দুইজন এক্সি-কিউটর তত্ত্বাবধান করিবেন। কিন্তু সাবালক হইবার পূর্ব্বে তত্ত্বাবধান ব্যাপার জগৎনাথের মাতার ও ভ্রাতাগণের অসন্তোষজনক হওয়ায় আবার হাইকোর্টে মামলা বাধে। প্রমথনাথের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইংরেজী ১৯১৯ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে উক্ত মামলায়ও ভ্রাতাগণ জয়লাভ করেন। তদবধি আন্দুল রাজবংশের বড় তরফের বিষয় সম্পত্তি পুনরায় প্রমথনাথ পরিদর্শন করিতেছেন। ইঁহার আমলে আন্দুলের ও শিবপুরের মন্দির সমূহ, পারিবারিক বাস ভবনাদি এবং বাজার সমূহের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ইঁহার চেষ্টায় বড় তরফ ও ছোট তরফের মধ্যে বহুদিনের মনোমালিন্য মিটিয়া গিয়া এষ্টেট পরিচালনের জন্য একজন ম্যানেজার (Joint manager) নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে যে রাজবংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে সে বিষয় আর সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় কুমার উপেন্দ্র নাথের বিধবা পত্নী তাঁহার পরলোকগত স্বামীর স্মৃতি-রক্ষাকল্পে আন্দুলে সরস্বতী নদীতীরে একটী শিবমন্দির ও শ্মশান ঘাট তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে তথাকার অধিবাসীদিগের প্রভূত উপকার হইয়াছে।

বাঙ্গালা ১২৯৬ সালে আন্দুল গ্রামে কুমার প্রমথনাথ মিত্রের জন্ম হয়। তিনি বরিশালে রাইরকাঠী গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুখ্য কুলীন কায়স্থ-বংশীয় বাবু ব্রজলাল বসুর তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা। কুমার প্রমথনাথ বিষয় কর্ম্মও ভালরূপ বুঝেন এবং জমিদারীর কাজকর্ম্ম উত্তমরূপে জানেন। তিনি উৎসাহী,

কুমার প্রমথনাথ মিত্র

উদ্যোগী, কর্ম্মঠ; সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, আলোকচিত্র, সঙ্গীত, মৃগয়া, কৃষি এবং যন্ত্র বিজ্ঞানে তাঁহার অনুরাগ আছে। তিনি কৃষকদিগকে শিক্ষা দানের জন্য একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আন্দুল ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান, আন্দুল অনাথ ভাণ্ডারের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট এবং গ্রাম্য হিতকারী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। তিনি পল্লীবাসিগণের কল্যাণের জন্যই এই সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। পল্লীস্বাস্থ্য ও পল্লীশিক্ষা এবং পল্লী সমাজের উন্নতি সাধনের প্রতি ইঁহার বিশেষ লক্ষ্য আছে। ইঁহার বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্যে আন্দুলের "গ্রাম্য হিতকরী বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে। ইনি দুঃস্থ গ্রামবাসিগণকে অর্থ সাহায্য করেন।

বাঙ্গালা ১২৯৮ সালে কুমার মন্মথনাথ মিত্রের জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি বাবু অক্ষয় কুমার বসুর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার একটি মাত্র কন্যা। ইনি সঙ্গীতানুরাগী একজন দক্ষ ক্রীড়ক (Sportsman) ও মৃগয়ানুরাগী।

কুমার মন্মথনাথ মিত্র ১৩০৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিএ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণি আফিসে Article clerk হইয়াছেন। ইনি শোভাবাজার রাজবংশের কুমার খগেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার উপস্থিত ১ পুত্র।

বাঙ্গালা ১৩০৬ সালে কুমার ভরতনাথ মিত্রের জন্ম হয়। তিনি এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। কুমার জগৎনাথ মিত্র বাঙ্গালা ১৩১৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি এক্ষণে পাঠাভ্যাস করিতেছেন।

কুমার নগেন্দ্রনাথ মিত্র খুব সামাজিক এবং দাতা ছিলেন। তিনি গীতবাদ্যের অনুরাগী ছিলেন এবং ব্যায়াম-ক্রীড়া (Sport) ভালবাসিতেন। গত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন—কুমার শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র।

কুমার শৈলেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাখরগঞ্জ জেলার বনাগ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশীয় বাবু রজনীকান্ত বসুর তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার উপস্থিত দুই পুত্র ও এক কন্যা। সঙ্গীত ও কবিতার প্রতি ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। ইনি স্বয়ং কবিতা রচনা করিতে পারেন। ইনি তাঁহার মাতার নামে "মাখন কুমারী চতুষ্পাঠী" স্থাপন করিয়াছেন, এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হস্তে এই চতুষ্পাঠী পরিচালনের ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি গ্রামের দরিদ্র পরিবারবর্গকে সাময়িক অর্থ সাহায্য করেন।

আন্দুল-রাজবংশ
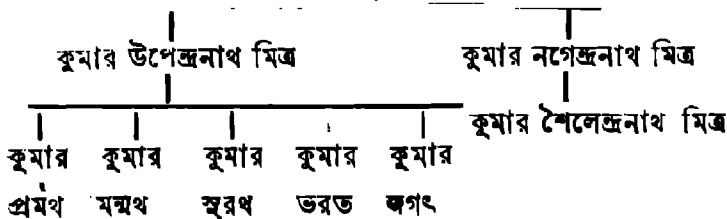
মিত্র-বংশ পর্য্যায়

১। কালিদাস(১ম পুত্র)
২। শ্রীধর ঐ ওঁশেপতি
৩। শুক্তি ঐ তারাপতি
৪। শোভারি ঐ
৫। হরি ঐ
৬। শ্যাম ঐ
৭। কেশব ঐ
৮। মৃত্যুঞ্জয় ঐ
৯। ধুই (বড়িশা সমাজ) ঐ ঐ (ঢাকা সমাজ)
১০। মকরন্দ ঐ
১১। বিকর্ত্তন ঐ
১২। হেরম্ব ঐ
১৩। পরাশর ঐ
১৪। ত্রিপুরারী ঐ
১৫। কৃষ্ণানন্দ ঐ
১৬। গোবিনাথ ঐ
১৭। নারায়ণ ঐ
১৮। চণ্ডীদাস ঐ
১৯। শ্রীরাম ঐ
২০। রামানন্দ (২য় পুত্র)
২১। কাশীনাথ ঐ
২২। আনন্দরাম (১ম পুত্র)
২৩। তিতুরাম (২য় পুত্র)

২৪। রাজচন্দ্র (৩য় পুত্র)
২৫। স্বরূপচন্দ্র কালীপদ গুরুপদ
২৬। প্রাণকৃষ্ণ ক্ষেত্রকৃষ্ণ
২৭। তিন কন্যা উপেন্দ্র দেবেন্দ্র নগেন্দ্র
কন্যা
২৮। প্রমথ মন্মথ সুরথ ভরত জগত ৪ কন্যা শৈলেন্দ্র ৩ কন্যা।
১ কন্যা বিদ্যুৎকুমার
আলোক ১ কন্যা
২৯। প্রফুল্ল কুমার ২ কন্যা
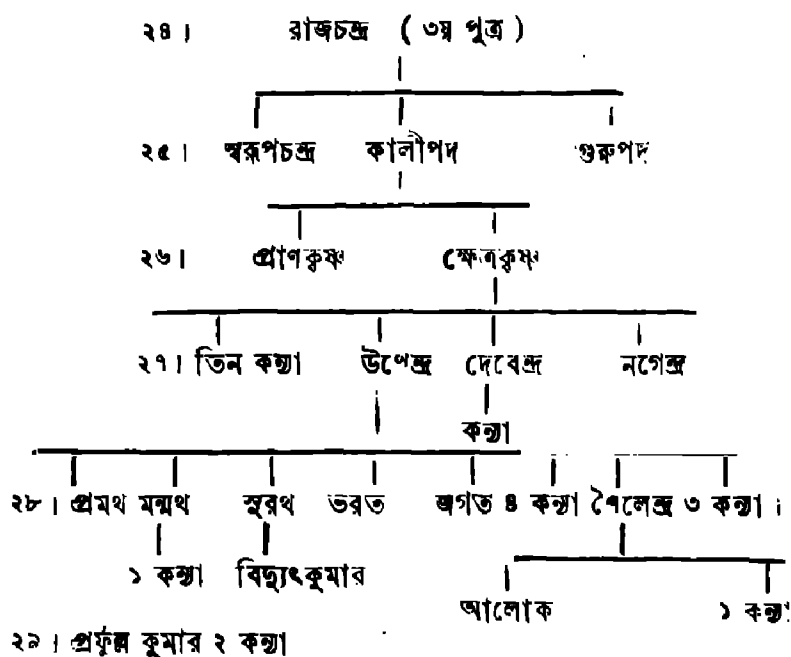
উত্তরপাড়া জমিদারবংশ

—:*:—

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী উত্তরপাড়া একটী গণ্ডগ্রাম। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণের বাস বলিয়াই ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। ইহাকেই বালী উত্তরপাড়া বলে। কলিকাতা হইতে ইহা ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত।

উত্তরপাড়া ও বালি পূর্ব্বে একই গ্রাম বলিয়া পরিচিত থাকাতে পুরাতন গ্রন্থাদিতে বালি গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়—উত্তরপাড়ার কোন নাম দৃষ্ট হয় না। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়া বালি হইতে পৃথক স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এখানে ব্রাহ্মণ বসবাসের পরিচয় পাওয়া যায়। সাবর্ণ চৌধুরীবংশই এখানকার পুরাতন বংশ। তাঁহারাই বিভিন্ন স্থান হইতে সদ্ব্রাহ্মণ ও কুলীন সন্তানগণকে এখানে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মোত্তর আদি দিয়া স্থায়ীভাবে এখানে বাস করাইয়া গিয়াছেন। সাবর্ণ চৌধুরী বংশের যিনি প্রথম উত্তরপাড়ায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন, তাঁহার নাম রত্নেশ্বর রায়। গয়লগাছানিবাসি রামনিধি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৌধুরীবংশে বিবাহ করিয়া উত্তরপাড়া-বাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা শিবানী দেবীর সহিত খামারগাছি নিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এই নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় হইতেই উত্তরপাড়া জমিদার বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

নন্দগোপাল পার্শী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ঢাকার কালেক্টরী অফিসে কর্ম্ম করিতেন। ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি জগমোহন নামক একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন।

নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

জগমোহন অধিক লেখাপড়া জানিতেন না। তিনি ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার কমিসেরিয়েট জেনারল আফিসে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে তিনি ইংরাজ সৈন্তের বেনিয়ান হইয়া নেপাল, মীরাট, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে ভরতপুর অবরোধের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হন। এই অবরোধের সমভিব্যাহারী হইয়া তিনি প্রভূত ধনের অধিকারী হন। তিনি তিনবার দার পরিগ্রহণ করেন; তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুইটী পুত্র জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ার গর্ভে বিজয়কৃষ্ণ এবং তৃতীয়ার গর্ভে নবকৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র হয়। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

৺জগমোহন মুখোপাধ্যায়

জগমোহনের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ১২১৫ সালের ৯ই ভাদ্র তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। মীরাটে পিতৃ-সন্নিধানে তাঁহার প্রথম বিদ্যাশিক্ষা হয়। তিনি যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, সেখানে অনেক সৈনিক কর্ম্মচারীর পুত্রগণ তাঁহার সহপাঠী ছিল। তাহাদের সহিত একত্র সংমিশ্রণের ফলে জয়কৃষ্ণ সাহসী ও অধ্যবসায়ী হইয়া উঠেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ব্রিগ্রেড মেজর অফিসে প্রধান কেরাণীর পদ লাভ করেন। উক্ত খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক ভরতপুর অবরোধের সময় তিনি পিতার সমভিব্যাহারী

৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ছিলেন। বিজয়ী ইংরাজ সৈন্য ভরতপুর অধিকার করিলে সৈন্যবাহিনী স্থানান্তরিত হওয়ায় পিতাপুত্রে প্রভূত ধনসম্পত্তি লইয়া উত্তরপাড়ায় প্রত্যাগত হন এবং কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণান্তর চুঁচুড়ায় অবস্থিত সৈন্যদলের "পে-মাষ্টার" পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর এই সৈন্যদল ইংলণ্ডে চলিয়া গেলে জয়কৃষ্ণেরও সৈন্যবিভাগে চাকরী যায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলী কালেক্টরীতে মহাফেজের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সুযোগ মত নীলামে জমিদারী ক্রয়করতঃ ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণ সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ কর্ম্মজীবন হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া জয়কৃষ্ণ নীরবেই জীবন যাপন করিলেন না। কি করিলে উত্তরপাড়ার রাস্তাঘাটাদির সংস্কার হয়,—কি করিলে পুস্তকাগার সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়—জয়কৃষ্ণ সেই দিকে মনোনিবেশ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কত যে কায়িক পরিশ্রম করিয়াছেন—কত অর্থ যে ব্যয় করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। হুগলী জেলার অধিকাংশ কলেজ ও স্কুল স্থাপনে তিনি একজন অগ্রণী কর্ম্মী ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান বিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ডানবার তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"He has by the general respectibility of his character, by his intelligence and abilities and by the interest he takes in public good, won for himself a place in the estimation of the community, which perhaps no other land-holder in the district, with the exception of Dwaraka nath Tagore, has attained to" অর্থাৎ চরিত্রের উৎকর্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, ও ক্ষমতা এবং সাধারণ হিতৈষণা গুণে তিনি স্বীয় সমাজের ভক্তি ও

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এক মাত্র দ্বারকা নাথ ঠাকুর ভিন্ন অন্য কেহই এরূপ সম্মানের অধিকারী হন নাই।"

বাবু জয়কৃষ্ণ তাহার সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহে অগ্রগামী ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁহারই নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি শেষদিন পর্য্যন্ত এই এসোসিয়েসনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিলেন এবং সদা সর্ব্বদা ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। যতই ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ততই সাধারণের হিত সাধনের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার স্বগ্রাম উত্তরপাড়াকে সহরে পরিণত করেন, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তরপাড়ায় একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার জমিদারীর মধ্যে অনেক ইংরাজী, বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাবর্গের উন্নতি সাধনের জন্য তাহাদের মধ্যে ইক্ষু, আলু প্রভৃতি চাষের প্রচলন করিয়াছিলেন এবং জল নিকাশ ও কূপের পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় জয়কৃষ্ণ অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় প্রজাবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন এবং অকাতরে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন।

বস্তুতঃ তাঁহার সমসাময়িক এমন কোন সাধারণ হিতকর আন্দোলন ছিল না, যাহাতে জয়কৃষ্ণ যোগদান না করিতেন। তিনি উত্তরপাড়া স্কুলের স্থায়ীত্ব বিধান কল্পে ১৫,০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি বিধানার্থ ২২,০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি, সাধারণ পাঠাগার গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে ৫৭০০০৲, উক্ত সাধারণ পাঠাগারের পুস্তক ও আসবাবক্রয়ার্থ ৪৫, ১০০৲, উক্ত পুস্তকাগারের স্থায়ীত্ববিধান কল্পে ৫৭, ৫০০৲ টাকার সম্পত্তি, ৮৮,৩৯৬৲ টাকা রাস্তা ও ঘাট নির্ম্মাণার্থ,১০,২১৮২৲টাকা জমিদারীর মধ্যে জলাশয়

খননার্থ, ৬২, ৭৫৭৲ টাকা জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত স্কুল সমূহের উন্নতি বিধানার্থ, ২৫,৬৬৮৲ অন্যান্য স্কুল ও চিকিৎসালয়ে, ৬২০৭৲ দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে, ৭০১৭৲ টাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে, ৪০৯৯৲ টাকা ঔষধ দানে, ৩৬,৪৯৭৲ টাকা নানাবিধ সভা সমিতিতে দান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ১৮৬৭ ও ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাগণকে ১২,১১০৲ এবং ১৩৫০৬৲ টাকার কর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

কোন পারিবারিক গোলযোগহেতু জয়কৃষ্ণের নামে জালিয়াতির মোকদ্দমা হয়। মোকদ্দমার বিচার ফলে জয়কৃষ্ণের প্রতি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ সদর নিজামত আদালত কর্তৃক ৫ বৎসরের সশ্রম কারাবাস ও যদি শ্রম না করেন তবে ১০,০০০ টাকা জরিমানার আদেশ হয়। তিনি ইংলণ্ডে প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করেন এবং প্রিভি কৌন্সীলের ভারতীয় ফৌজদারী আদালতের বিচারের উপর কোন অধিকার না থাকিলেও বিচারকেরা জয়কৃষ্ণের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্তি দেন।

তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই তাঁহার মত সুন্দরভাবে ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। তিনি চক্ষুর পীড়াবশতঃ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দৃষ্টিশক্তিহীন হন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হইত। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও তাঁহার স্মরণ শক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি অব্যাহত ছিল।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই জয়কৃষ্ণ নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের আপামর সাধারণ সকলেই একবাক্যে শোকপ্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া হিন্দু পেট্রিয়ট একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন "জয়কৃষ্ণ একজন স্বকৃত, স্বাধীন, চরিত্রবান লোক

ছিলেন।” ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনও সভা করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিল। এই এসোসিয়েশনে জয়কৃষ্ণের একখানি তৈল চিত্র রাখিয়া সভা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

জয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ট হন। তিনি সুবিখ্যাত কাপ্তেন রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজী শিখিয়া পিতার জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

৺ হরমোহন মুখোপাধ্যায়।

জয়কৃষ্ণের মধ্যম পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর ভূমিষ্ট হন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে তিনি উত্তরপাড়া ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ্‌্‌ এ, বি-এ, এম্ এ ও বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্যারীমোহন কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় লাট সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৪ খ্রীঃ তিনি লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক বড়লাট সভার সভ্য মনোনীত হন। তিনি একবার নয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও একবার বড়লাট সভার সদস্য পদে মনোনীত হন। এইবার তিনি প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন রচনাকালে রাজস্ব বিষয়ক আইন জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার “সুবর্ণ জুবিলী” উপলক্ষে রাজা প্যারীমোহন একই দিনে “রাজা” ও “সি, এস, আই” উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা প্যারীমোহন দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি যে কত সদনুষ্ঠানে অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। নিম্নে তাঁহার দানের তালিকা প্রকাশিত হইল।—

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

লর্ড মিণ্টোর মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণকল্পে	...	৫০০৲
সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিভাণ্ডারে	...	৫০০৲
রিপণ কলেজের নূতন গৃহনির্ম্মাণে	...	১০০০৲
কিংস্ হাঁসপাতালে	...	৩০০০৲
(বাৎসরিক ১০০৲ শত টাকাও এই হাঁসপাতালে দান করেন)		
বর্দ্ধমানের বন্যা প্রপীড়িতদিগের সাহায্যার্থে	...	৫০০৲
দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িতগণের জন্য	...	২৫০৲
বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে	...	২০০০৲
Bengal St. Jhon Ambulence	...	১০,০০০৲
Uttarpara Railway Station নির্ম্মাণ জন্য		১২,০০০৲
উত্তরপাড়া কলেজের জন্য সর্ব্বসমেত মোট	...	৮০,০০০৲

ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি

রাজা প্যারীমোহন British Indian Association এর একজন প্রধান হিতৈষী সভ্য ও এককালে ইহার সভাপতি ছিলেন। রাজা প্যারীমোহনের দুই পুত্র রাজেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ। রাজা প্যারীমোহন গত ১৩২৯ সালের ২রা মাঘ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার নানা স্থানে সভা সমিতি হইয়াছিল এবং সেরিফ কর্ত্তৃক আহূত শোক সভায় গবর্ণর লর্ড লিটন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি মহাসমারোহে তাঁহার দান সাগর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। এই দান সাগরের মধ্যে এক জোড়া হস্তী পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে দান করা হইয়াছিল।

কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্র মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে কৃষ্ণা প্রতিপদের শুভ প্রভাতে কুমার রাজেন্দ্রনাথ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন। উত্তরপাড়ায় তাঁহার জন্ম হয় নাই, বলাগড়ে কুমারের মাতুলালয়, সেইখানেই তিনি জন্মগ্রহণ

করেন। কুমার রাজেন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই প্রকৃতি সুন্দরীর অপরূপ দর্শনে কখনও বা আনন্দে নৃত্য করিতেন—মুগ্ধনেত্রে বালভানুর হিরণ্ময় মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া থাকিতেন—রাজেন্দ্র নাথ স্বভাবের শোভায় ভাব মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। এই অস্বাভাবিক প্রকৃতির উপাসনা কিন্তু পরিণামে তাঁহার ছাত্র জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। তিনি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু সেখানে যাইয়াও উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন—কখনও জাহ্নবীর বীচিবিক্ষোভিত সলিলের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। গাছটী বড় হইলে কিরূপ হইবে তাহা যেমন অঙ্কুর দেখিয়াই অনুমান করা যায়, তদ্রূপ রাজেন্দ্র কুমার যে ভবিষ্যতে একজন সাধু, সজ্জন, ধর্ম্মপ্রাণ, পরোপকারী আদর্শ স্থানীয় মহাপুরুষ হইবেন ইহা তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের গতি বিধি দেখিয়াই সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন বিমুখ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও সহপাঠীদিগের পীড়ার সময় তাহাদের সেবা শুশ্রূষায় রাজেন্দ্রনাথের ন্যায় দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। রাজেন্দ্র নাথ বড়ই সন্তরণপটু ছিলেন; ক্রীড়া করিতেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে তাঁহার ভিতরে আর একটী মহৎ গুণ ছিল। সে গুণ পরের জন্য স্বার্থত্যাগ। যেখানেই দুঃখীর মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাস, শোকার্ত্তের হৃদয় ভেদী চীৎকার সেই স্থানেই দয়ার্দ্র রাজেন্দ্রনাথ।

রাজেন্দ্রনাথ ইংরাজী শিখিতে শিথিল প্রযত্ন হইলেও তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবন দশায় উপনীত হইলেই পিতামহ জয়কৃষ্ণ ইঁহার উপর জমিদারী পর্য্যবেক্ষণের আংশিক ভার অর্পণ করেন। এই কার্য্যব্যপদেশে তিনি বিশেষ পারদর্শীতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রজা-রঞ্জক জমিদার বলিয়া সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইলেন। তাঁহার দয়া ও

কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভক্তিগুণে প্রজাগণ তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল। জয়কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া তাঁহার উপর সমস্ত জমিদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার ন্যস্ত করিলেন। তাঁহার নিরপেক্ষতা ও সুবিচারগুণে প্রজাগণ ভুলিয়া গেল যে, মিছরী বাবু (রাজেন্দ্রনাথের ডাক নাম) ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন বিচারক আছে।

রাজেন্দ্রনাথ সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি যেন পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর করালছায়া ধীরে ধীরে তাঁহার উপর আপতিত হইতেছে। তাই তিনি কর্ম্মচারিগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, শরীর অনিত্য, কবে কোন সময় ডাক পড়ে বলা যায় না। গরীব দুঃখীদিগকে জমিদারীর আয় হইতে যে দান করা হইতেছে তাহার জন্য কোন লিখিত আদেশ নাই। যদি সহসা আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তোমরা ঐ ঋণে সর্ব্বস্বান্ত হইবে, আর যাহারা সাহায্য পাইতেছে তাহারাও সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইবে। অতএব আমি একটা লিখিত আদেশ স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি।" কর্ম্মচারিগণ কেহ বা কুমারের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল, কেহ বা তাঁহার বহু খেয়ালের মধ্যে ইহাও অন্যতম একটি বলিয়া মনে করিল। কিন্তু হায়! তাহারা বুঝিল না যে এই খেয়ালের মধ্যে আসন্ন বিপদের কিরূপ বিষাদময় চিত্র লুকায়িত ছিল। দোয়াত, কলম, কাগজ আসিল—রাজেন্দ্রনাথ দুঃস্থগণের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া কাহাকে কত টাকা সাহায্য করা হইবে তাহা লিখিয়া নিম্নে নিজের স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

এক সময়ে কতিপয় মুসলমান আসিয়া কুমারের নিকট মসজিদ নির্ম্মাণ করিবে বলিয়া কিছু অর্থ ও কিঞ্চিৎ জায়গা প্রার্থনা করে। তাহারা "বক্‌রীদে" গোহত্যা করিত। একজন বন্ধু কুমারকে বলিলেন এই মুসলমানগুলি গোহন্তা ও গোখাদক, ইহাদিগকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিবেন না। রাজেন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলিলেন "দেখুন শিক্ষিত মুসলমানে

কখনও গোহত্যা করে না, অশিক্ষিত মুসলমানেরা সাধারণতঃ তামসিক প্রকৃতির, সুতরাং উগ্র স্বভাবাপন্ন। যদি মসজিদে ভগবানের উপাসনা করিয়া ইহারা ধর্ম্ম ভাবাপন্ন হইতে পারে তাহাতে আপত্তি কি?" এই বলিয়া তিনি সেই মুসলমানগণকে মসজিদ নির্ম্মাণার্থে জমি ও অর্থ প্রদান করিলেন।

গো-বধের অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া কুমার রাজেন্দ্রনাথ সুযুক্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াও তাহা প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ গোশালায় অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথেরই অনন্যসাধারণ চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ে উত্তর-পাড়ায় টেকনিকাল (Technical) স্কুল ও আরও একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজেন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার প্রবল প্রতাপে কোন দুষ্ট, দুশ্চরিত্র লোক তাঁহার জমিদারীর এলাকার মধ্যে কোন প্রকার উৎপাত ও উপদ্রব করিতে পারিত না। একটি ঘটনা হইতেই পাঠকগণ এ কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বালী গ্রামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী তিনটী যুবতী কন্যা লইয়া বাস করিতেন। গ্রামের কয়েকটী লম্পট ব্যক্তি তাহাদিগকে বড়ই উৎপাত করিত। বিধবা অনন্যোপায় হইয়া রাজেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইল। রাজেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ চারিজন বলিষ্ঠকায় পাইক প্রেরণ করিয়া বিধবার বাটীতে পাহারা ব্যবস্থা করিলেন এবং ইহাও গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে কেহই ব্রাহ্মণীর বাটীতে সামান্য উৎপাত করিবে ধরিতে পারিলে তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। বলা বাহুল্য, তদবধি আর কেহই ব্রাহ্মণীর বাটীর চতুঃসীমায়ও যাইত না।

সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজেন্দ্রনাথ প্রথম দার পরিগ্রহ করেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বিবাহের ত্রয়োদশ

শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এস, সি।　　শ্রীযুত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।　　শ্রীযুত অমরনাথ মুখোপাধ্যায়।

বর্ষ পরে প্রথমা পত্নী স্বর্গারোহণ করিলে রাজেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার পাণি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ার গর্ভে তিনটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতা পিতামহের আগ্রহে তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেন। এই শেষোক্ত পরিবারের গর্ভে তাঁহার একটী পুত্র হয়।

রাজেন্দ্রনাথ বাল্যাবধিই ধর্ম্মভাবানুরক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে কুমার রাজেন্দ্রনাথ তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। তিনি কামাখ্যা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, জগন্নাথক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর, কাশী, গয়া, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার, জ্বালামুখী প্রভৃতি হিন্দুর প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একজন সংস্কারক ছিলেন। তিনি সমাজের মস্তিষ্ক স্বরূপ ব্রাহ্মণের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এতদুদ্দেশে প্রণোদিত হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সভ্য ও সহায়ক পদ গ্রহণ করিয়া সভার উন্নতিকল্পে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসে রাজেন্দ্রনাথ পীড়িত হইয়া পড়েন, কত চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যেদিন মহাষ্টমীর মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সেই দিন রাজেন্দ্রনাথ সমগ্র বঙ্গদেশকে কাঁদাইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। রাজেন্দ্রনাথ মৃত্যুকালে বিধবা পত্নী এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ, শ্রীযুক্ত লোকনাথ, শ্রীযুত অমরনাথ ও শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে চারি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তারকনাথ বি, এস্, সি পাস করিয়াছেন এবং লোকনাথ ও বি, এ, পাশ, অমরনাথ বি, এ, পড়িতেছেন।

রাজা প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় সাধারণে "গগন বাবু" নামে পরিচিত। শীকারে তাঁহার যথেষ্ট অনুরক্তি পরিদৃষ্ট হয়। হেতমপুর রাজ-দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ভূপেন্দ্র-নাথের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত একপুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। ইনি দেশভ্রমণে বড়ই অনুরক্ত। ইনি বৎসরের অধিকাংশ সময় নানাদেশ ভ্রমণেই অতিবাহিত করেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাণীর একজন সেবক ও তিনি প্রজাপতি সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বরপণ প্রথা নিবারণী সভার উদ্যোক্তা ও সম্পাদক। ভূপেন্দ্রনাথ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পত্নীর মৃত্যু হইলে দ্বিতীয়বার বেহালার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই শেষোক্তা পত্নীর গর্ভে যোগেশচন্দ্র নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যোগেশচন্দ্র হাইকোর্টের প্রথিতযশাঃ উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর পৌত্রীকে বিবাহ করেন।

কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কুমার ভূপেন্দ্রনাথের নাম উত্তরপাড়ার বাহিরে ততদূর বিখ্যাত না হইলেও তিনি একজন নীরব কর্ম্মী। তিনি কোন সভাসমিতিতে যোগদান করেন না বটে, কিন্তু দীন দুঃখী, কন্যাদায়গ্রস্ত কখনই তাঁহার নিকট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া আইসে না। তিনি প্রজাবৎসল, তিনি একজন প্রকৃত কর্ম্মবীর, নাম অপেক্ষা কাজের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী।

জয়কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র ৺ রাজমোহন মুখোপাধ্যায় মাত্র সপ্তবিংশতি বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার চারিপুত্র।

৺রাজমোহন মুখোপাধ্যায়।

জগন্মোহনের প্রথমা পত্নীর কনিষ্ঠ পুত্র ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার ছিলেন। তিনি হাজারিবাগ সামরিক

আফিসে কিছুকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর একটি পুত্র হরিহর এবং দ্বিতীয়া পত্নীর তিনপুত্র শ্রীযুক্ত মনোহর, বিশ্বেশ্বর ও শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায়। রাজকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

হরিহরের পুত্র রাজা ৺জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার ছিলেন। তিনি দেশের অনেক সদনুষ্ঠানে প্রভূত অর্থদান করিয়াছিলেন।

৺রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

জগন্মোহনের কনিষ্ঠা পত্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। নবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণও কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন।

৺নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জগন্মোহনের দ্বিতীয়া পত্নীর একমাত্র পুত্র ৺বিজয়কৃষ্ণ উত্তরপাড়ার মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধায়ক এবং স্থানীয় হিতকারী সভার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র নরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, ফনীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৺বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জগন্মোহনের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র ৺নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গণিতশাস্ত্রে এম্, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

৺নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

৺পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৺রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। রাজমোহন উত্তরপাড়ার জমিদার স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন ভাই ও এক ভগ্নী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র তৃতীয় ভ্রাতা মনমোহন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবলচন্দ্র। ভগ্নীর নাম শ্যামাসুন্দরী।

৺পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পরেশচন্দ্র অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া, উপযুক্ত পিতামহের নিকট সব শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতুলালয় প্রসিদ্ধ আন্দার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ও ঐ বংশের মাতা বলিয়া, নাবালক পুত্রগণকে সৎশিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের পিতা ৺ রাজমোহন ধার্ম্মিক, ধীর প্রকৃতি ও দয়ালু ছিলেন, পরেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন; এই সময় পিতামহের মৃত্যু হওয়ায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিষয়কর্ম্ম দেখিতে থাকায় আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হইল না। ইনি অতিশয় বলবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন ও কখনও শৈশব হইতে মৃত্যুকাল অবধি কাহারও নিকট শারীরিক শক্তিতে পরাজয় স্বীকার করেন নাই। পরন্তু অনেকবার অন্যকে পরাজিত করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইনি জমিদারিতে অনেক উন্নতি করিয়া, বহুতর উপকার দ্বারা প্রজাদের অবস্থা ভাল করিয়াছিলেন। ইনি স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। ইনি দেশের সকল প্রকার সৎকার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতেন ও গোপনে অনেক দান করিতেন। যাঁহারা পাইত, তাঁহারা ইহা প্রকাশ করিলে বড়ই দুঃখিত হইতেন। সেইজন্য জন সাধারণে জানিত না। তাঁহার মৃত্যুর পর উপকারিগণ প্রকাশ করায় জানিতে পারা যায়। ইঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় মতি ছিল, ইনি বহু সাধু বহু দেশ হইতে

স্বর্গীয় পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আনাইতেন ও সাধু দর্শন করিবার জন্য বহু দেশে যাইতেন। মৃত্যুর বহু পূর্ব্ব হইতেই তপঃ জপঃ ও সন্ধ্যা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য লইয়া থাকিতেন ও ক্রমে তাঁহার সংসারে বীতরাগ হইয়া আসিতেছিল। ৩১৮ সালে আগষ্টমাসে ৫৫ বৎসর বয়সে, তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি কলিকাতার বহুবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের পৌত্রী ৺সুরেন্দ্রনাথের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীদুর্গাচরণ বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া পিতার সংসারে বীতস্পৃহতা দেখিয়া বিষয় কার্য্য দেখিতে থাকেন। ইহার মধ্যম-পুত্র শ্রীসত্যচরণ এম এ বিএল মিউনিসিপাল কমিসনার ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। কনিষ্ঠপুত্র শ্রীঅম্বিকাচরণ বি এস সি অনারে পাস করিয়া এম্ এস্ সি (M. S C) পড়িতেছেন। ইনি একমাত্র কন্যাকে লাহোরের জজ বাঙ্গালার মুখোজ্জলকারী সুসন্তান ৺স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র ক্যাপ্টেন (Captain) অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই এম এসের সহিত বিবাহ দিয়াছেন।

পরেশবাবু (ওরফে কালোবাবু, সংসারে এই নামেই ইহাকে অনেকে চিনিত) নীরব কর্ম্মী, নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক পরোপকারী ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেশচন্দ্রের জন্ম হয়। সুরেশচন্দ্র যখন অতি শিশু তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই অতি অল্প বয়স হইতেই ইঁহার স্কন্ধে সংসারের চাপ পড়ে। তিনি বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত সংসার চালাইয়া আসিতেছেন। তিনি উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ও চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেশের যাবতীয়

জনহিতকর কার্য্যে তিনি যোগদান করিয়া থাকেন। জমিদারী কার্য্য-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করার পর হইতে জমিদারীর আয় অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি উদার ও দানশীল জমিদার। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ, আহারে, বিহারে, আচারে অনুষ্ঠানে তিনি ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। তাঁহার এক কন্যা ও তিন পুত্র—জহরলাল, পান্নালাল ও মণিলাল।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরপাড়ার জমিদার বংশে যে কয়েকটী রত্ন জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ-মর্য্যাদা উজ্জ্বল করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি স্বনামধন্য ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরপাড়া স্কুলে প্রথমে শিক্ষালাভ করিবার পর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আগমন করেন। তিনি শিক্ষাদান করিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন এবং সহরের কয়েকজন যুবার অনুরোধে তিনি Thomas Inkhorn এই নামে ওয়াসিংটন আরভিংএর Sketch book এর নোট লেখেন। তিনি লণ্ডন আরিষ্টটেলিয়ান সোসাইটীতে যোগদানপূর্ব্বক দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি ভিক্টোর হিউগের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং কয়েকবৎসর পরে লর্ড টেনিসনের দ্বিতীয় পুত্র মাননীয় লিওনেল টেনিসনের সহিত পরিচিত হন। লিওনেলের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া তিনি তাঁহার যৌবনের কবিতাসমূহ বিনামে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই বাল্য ও যৌবনের কবিতারাশি এত সুন্দর হইয়াছিল যে সুকবি ও রাজনীতিবিদ মিঃ ডব্লিউ, এস্, ব্লাণ্ট তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লাণ্ট ভারত ভ্রমণকালে তাঁহার পিতামহের অতিথি হইয়াছিলেন। ওয়েল্‌স্ দেশীয় কবি স্যার লুই মরিস্ কবিতাগুলি পাঠে এতদূর মোহিত হইয়া-

শ্রীযুত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

ছিলেন যে, তিনি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; রনসার্ড, ভিক্টোর হিউগো, গোথে এবং শিলার—ইঁহাদের কবিতাও তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। সে কবিতাগুলিও বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছিলেন তৎসমস্ত ইংলিসম্যান্ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবনারায়ণ বাবু উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনাধিকার লাভে সক্ষম হন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন লর্ড ডাফরিণ উত্তরপাড়া সন্দর্শন করেন তখন তিনি চেয়ারম্যান মনোনীত হন। গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ মেকলে শিবনারায়ণ বাবুর রচিত সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যাপার সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠ করিয়া এরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তিকাগুলির মধ্যে অনেকখণ্ড হাউস অব কমন্সে কয়েকজন এংগ্লো ইণ্ডিয়ানের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতা গুণে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় চেয়াম্যানের পদে বরিত হইয়াছিলেন।

কর্ম্মজীবন।

লর্ড ল্যানসডাউনের শাসনকালে যখন শাসন পরিষদসংক্রান্ত আইন প্রথম পাশ হয় তখন তিনি বঙ্গীয় শাসনপরিষদে সভ্য হইবার জন্য প্রার্থী হইয়া শেষে বয়সের অল্পতানিবন্ধন পদ প্রার্থনাপত্র প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ লাভ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে মনোনীত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলা বোর্ডের সভ্যপদ লাভ করেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য মনোনীত হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি বিভাগীয় কৃষি সমিতির সভ্য পদে কার্য্য

উচ্চপদলাভ।

করিয়া আসিতেছেন এবং তিনি তাঁহার নিজের জমিদারীর মধ্যেও অনেক কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নর্থ ব্রিটিশ একাডেমী অব আর্টসের সভ্য হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন আর্ল অব্ মীগ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি সানন্দে তাঁহার শান্তি শৃঙ্খলার আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট জন য়্যাম্বুলেনস্ সমিতির আজীবন সভ্য মনোনীত হন এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ডের ব্রিটীশ য়্যাম্বুলেনস্ কমিটির সভ্য হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। সৈনিক হইবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে জাগাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবস্থা করেন যে, যাহারা যুদ্ধে যাইবে তাহাদের নিকট তিনি কোন কর গ্রহণ করিবেন না কিংবা যাহারা যুদ্ধে মরিয়া যাইবে কিংবা যুদ্ধান্তে ফিরিয়া আসিবে চিরকাল তাহাদের নিকট অর্দ্ধেক কর গ্রহণ করা হইবে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাদেশিক এড্ভাইসরী কমিটিতে ভারতীয় ছাত্রদিগের প্রতিনিধিরূপে সভ্য মনোনীত হন। ঐ বৎসর তিনি ন্যাশনাল লিবারেল লীগের সভ্য মনোনীত হন। নিখিল ভারতীয় জমিদার সমিতির সৃষ্টি হইলে তিনি তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হন এবং বড়লাটের নিকট জমিদারবর্গের যে প্রতিনিধিগণ গমন করেন তিনিও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম নির্ব্বাচিত হন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় লাট সভায় বর্দ্ধমানাধিপতির স্থলে সভ্য মনোনীত হন। লাট সভায় গঙ্গার জলের দূষিতাবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন—I have already gone too far a field, and have called to my aid the authority of antiquarians, oriental scholars and philosophers to prove that our Aryan ancestors paid homage to the Ganges. We find in the Greek historian,

লাটসভায়।

Strabo and the rest mention of the Ganges as the river that was worshipped by the Hindus. In place of their one self abnegating stoic of a Diogenes, they found thousands of Gymnosophists capable of seeing through the veil of mysticism, and finding out that it was not stones and trees, as Macaulay mistakenly declared, but the nonmenon behind the phenomenon to which the Hindus bent their knee and paid religious homage,

* * * *

শিবনারায়ণ বাবু চিরকাল ছাত্রগণের হিতৈষী। ম্যাট্রিকুলেশন ও আই এ পাশ করিবার পর কলেজে ভর্ত্তি হইতে ছাত্রগণকে কিরূপ কষ্টে পতিত হইতে হয় লাট সভায় সে কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—My Lord, anyone passing by the many colleges in Calcutta or in the muffassil during the first fortnight after the publication of the results of the Matriculation and the I A. and I. Sc. examination must have noticed knots of auxious-looking students, who like so many disconsolate angels, at the gates of paradise, have during the last few years unsuccessfully clamoured for admission,"

ছাত্রগণের কষ্ট।

তিনি নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে বড় ভালবাসেন। এ প্রবৃত্তি তিনি তাঁহার পিতামহ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যখন তিনি নিতান্ত অপরিণত বয়স্ক যুবক তখন তিনি মূর্খ বালকগণের জন্য একটি অবৈতনিক টেক্‌নিকাল স্কুল স্থাপন করেন। তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন সুশিক্ষিত, প্রজাবৎসল, পরোপকারগতপ্রাণ জমিদার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

নিরক্ষরের শিক্ষা

দরিদ্রের জন্য তাঁহার অকাতর দান এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য অদম্য উৎসাহ সমগ্র বঙ্গে সুপরিচিত। শিবনারায়ণ বাবু একজন পুস্তককীট এবং তাঁহার পুস্তকাগারটী অত্যন্ত প্রশস্ত। হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণা, বর্দ্ধমান, নদীয়া, ও মেদিনীপুরে তাঁহার বিশাল জমিদারী আছে।

শিবনারায়ণ বাবুর একটীমাত্র পুত্র, নাম অবনী নাথ। অবনীনাথ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতে ও বিদেশে একজন ভাল ফটোগ্রাফার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

সন্তান সন্ততি

গঙ্গানন্দ
রামাচার্য্য
রাঘবেন্দ্র
নীলকণ্ঠ
গঙ্গাধর ঠাকুর
গোপীরমণ
গৌরীচরণ
হরেকৃষ্ণ (ভঙ্গ)
নন্দলাল
জগমোহন
জয়কৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, নবীনকৃষ্ণ
রমোহন, রাজা প্যারীমোহন, রাজমোহন,

াসবিহারী শিবনারায়ণ রাজেন্দ্র ভূপেন্দ্র
অবনীনাথ
পঞ্চানন, যোগেশ, গণেশ, কার্ত্তিক,
তারকনাথ, লোকনাথ, অমরনাথ, চন্দ্রনাথ,
কৌস্তভভূষণ, গিরিজা ভূষণ

তেলিনী পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

—:০:—

অনেকেই জানেন যে জেলা হুগলীর অন্তর্গত তেলিনীপাড়ার জমীদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ বহু পুরাতন এবং ধনে মানে বিশেষ পরিচিত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি প্রত্যহ সুর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত গঙ্গাগর্ভে একপদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ উপশ্চরণ করিতেন, এই কারণে লোকে ইঁহাকে 'একপেয়ে বামুন' আখ্যা দিয়াছিলেন। ইঁহারই পুণ্যফলে পরবর্ত্তী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের উন্নতিলাভের কারণ শুনা যায়। ইঁহার পূর্ব্বনিবাস ভট্টপল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী ইছাপুর গ্রামে ছিল। তাঁহার ৪।৫ পুরুষ পরে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যনাথের সময় হইতেই এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

রতিকান্ত।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অনুমান ১৭৩৭ খৃঃ তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ অন্যতম। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ এই ভট্টনারায়ণেরই বংশধর। তাঁহাদের বংশ তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ২০শ পুরুষ মহাত্মা গৌরিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে নুলো পঞ্চানন কর্ত্তৃক গোষ্টীপতি সম্মান প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি তাঁহার বংশ

বৈদ্যনাথ।
বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌরীকান্তের সন্তান বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বৈদ্যনাথ অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিশেষরূপ সুযোগ ঘটে নাই, তবে সামান্তরূপ উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও ইংরাজি শিক্ষা করিয়া তেলিনীপাড়ার সন্নিকট পাইকপাড়া গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী (১) "কাচাপাকা" নামে পরিচিত এক ঘর তিলির অধীনে ব্যবসাক্ষেত্রে কর্ম্মচারী ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স অনুমান ২৫।২৬ বৎসর হইবে। তিনি দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, এবং সুপুরুষ ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে ইষ্ট গুরু মাণিকরাম বিদ্যালঙ্কারের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। মাণিকরাম তাঁহার প্রিয় শিষ্য বৈদ্যনাথের ধর্ম্ম ও আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং পরে সেগুলির যাথার্থ্য বর্ণে বর্ণে প্রমাণিত হইয়াছিল।

বৈদ্যনাথের সময়ে ভারতবর্ষের ইংরাজ রাজ্যের আরম্ভকাল অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল; তখন এখনকার মত, রেল টেলিগ্রাম ডাক প্রভৃতি কিছুই ছিল না এবং তখন বাঙ্গালা বর্গীর হাঙ্গামায় বড়ই উৎপীড়িত ছিল। তাহার পর ইংরাজ এ দেশের রাজা হয়। ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য কোন হিন্দু রাজা বা মুসলমান নবাবের অধীনে কুঠি স্থাপন করিয়া দস্যু তস্কর হইতে বাণিজ্য দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য ইংরাজ কোম্পানীর অধীনে কতকগুলি সৈন্য রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং সে সময়ে হিন্দু মুসলমানে ভারত রাজ্য ও স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম লইয়া ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। এইরূপে পরস্পর কলহ করিয়া হিন্দু মুসলমান রাজগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে কোন এক পক্ষ ইংরাজের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন। ইংরাজগণ বিনা

(১) কাঁচা পাকা অর্থাৎ বৈদ্যনাথের সময়ে পাইকপাড়া গ্রামে আর কাহারও পাকা ঘর না থাকায় ঐ ধনী তিলিকে "কাঁচা পাকা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কারণ কাঁচা পাকা ঘর একমাত্র ঐ তিলির ছিল।

আয়াসে এই সুযোগ লাভ করিয়া কোন পক্ষকে আশ্রয় দিয়া অপর পক্ষ দমন করা ইংরাজের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। ইহারই ফলে ইংরাজের ভারতে রাজ্য বিস্তারের সুযোগ ঘটে, এবং ক্রমে ক্রমে বিশাল ভারতবর্ষে একছত্র সাম্রাজ্য লাভ হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন "The English acquired In dia infit of absent-minded-ness.") ইংরাজ আগে বণিক, তাহার পর ভারতেশ্বর।

খৃষ্টীয় ১৭৬৭ অব্দে মহীশূরের রাজা হাইদার আলীর বিরুদ্ধে কলিকাতা হইতে বহু অশ্বারোহী সৈন্য চালনা করিয়া জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক" (Grand trunk Road) নামক প্রধান রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, প্রাতঃকালে তেলিনীপাড়ার নিকট আসিলে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম লাভ ও প্রাতর্ভোজন সমাধা করিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঐ সময় সৈন্য, কামান বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র, হাতি, ঘোড়া, উঠ, গাড়ী প্রভৃতি নানা রকমের রসদ দেখার জন্য উঁহাদের চারিদিকে বহুলোকের জনতা ঘটে। তন্মধ্যে কথিত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। এই সময় বৈদ্যনাথের ভাগ্য দেবতা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন, অগত্যা ঐ জনতার মধ্য হইতে কাপ্তেন সাহেব বৈদ্যনাথকে নিকটে আনাইয়া তাঁহার বাসস্থানাদির ও বিদ্যাবুদ্ধির কথঞ্চিত পরিচয় লইয়া তাঁহাকে নির্ভীক ও বলবান পুরুষ বিবেচনায় জিজ্ঞাসা করিলেন যদি এই অঞ্চলে একটী কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করা যায় তবে তিনি তাহা লইবেন কি না? তদুত্তরে বৈদনাথ প্রথমে অস্বীকৃত হন, পরে কাপ্তেনের বিশেষ অনুরোধে মায়ের অনুমতি লইয়া পল্টনে কর্ম্ম লইয়া উঁহাদের সহিত যাত্রা করেন। বৈদ্যনাথ নিরাপদে যথাস্থানে পৌছিলেন, কিছু দিন মধ্যেই ইংরাজ জয়ী হন। ঐ যুদ্ধে পরাজিত মহীশূর রাজ্যের কতিপয় দিন নানা বিশৃঙ্খলা ও সৈনিকগণের দ্বারায় লুটপাট চলিতে

থাকে। সেই অবসরে বৈদ্যনাথ বহু মূল্যবান জহরৎ, স্বর্ণমুদ্রা ও কতকগুলি স্বর্ণ নির্ম্মিত পুত্তলী সামান্য অর্থের বিনিময়ে ইংরাজ সৈনিকদের নিকট প্রাপ্ত হন, ইহার কারণ মূর্খ ও পানাসক্ত সৈনিকেরা ঐ পুত্তলীগুলি পিত্তল নির্ম্মিত বুঝিয়া অতি অল্প মূল্যেই বিক্রয় করিয়াছিল।

ঘটনাচক্রে তথায় একরাত্রে ভয়শূন্য পল্লীর একটী গৃহে যেখানে বৈদ্যনাথ বাস করিতেছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার এক ভৃত্য গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত সেই সময় একজন মদিরাসক্ত ইংরাজ সৈনিক কোন উপায়ে তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সামান্য সিন্দুকে রক্ষিত স্বর্ণ মুদ্রার মধ্যে কতকগুলি লইয়া চুপে চুপে পলায়ন করিতেছিল। সেই সময় বৈদ্যনাথের হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে স্পষ্ট চন্দ্রালোকে তিনি ঐ সশস্ত্র সৈনিককে দেখিতে পান এবং সে তাঁহার শয্যার নিকট দিয়াই ধীরে ধীরে পলায়ন করিতেছিল। তিনি ইহা দেখিয়াও অত্যাচার ভয়ে চীৎকার কিংবা চোর ধৃত করিবার কোন চেষ্টা না পাইয়া শয্যাপার্শ্বে রক্ষিত দোয়াত হইতে কলমে লাল কালি লইয়া চোরের অজ্ঞাতে তাহার পরিচ্ছদের পৃষ্ঠদেশ চিহ্নিত করিয়া দেন এবং পরে নাকি কাপ্তেন সাহেবের নিকট অভিযোগ করিয়া এবং ঐ চিহ্ন দর্শাইয়া চোর ধৃত করাইয়াছিলেন ; চোরের রীতিমত শাস্তির ব্যবস্থাও হইয়াছিল। ইহা বৈদ্যনাথের উপস্থিত বুদ্ধিরই সবিশেষ পরিচয় সন্দেহ নাই।

কাহারও কাহারও মতে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভরতপুর যুদ্ধের সময় উল্লিখিত রাজ্যের লুণ্ঠিত ধনরত্নের মধ্যে নিজাংশ স্বরূপ মূল্যবান জহরত, স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি লাভ করেন এবং উহা দ্বারা একটি শিবিকাপূর্ণ করিয়া শিবিকাদ্বার বন্ধ রাখিয়া বাহক দ্বারা লইয়া চলেন। পথে কয়েকটি ইংরাজসৈনিক অত্যাচারের উপক্রম করে, তিনি পরে উহাদের সনাক্ত করিবার সুবিধা হইবে বুঝিয়া লাল কালির ছিটা

দিয়া উহাদের পরিচ্ছদ রঞ্জিত করেন এবং পরে কাপ্তেন সাহেবকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

ভরতপুর রাজের মূল্যবান জহরত, অলঙ্কার, অঙ্গুরী, শিরপ্যাচ, মুক্তার মালা প্রভৃতি অলঙ্কার আজও তেলিনীপাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কাহারও কাহারও নিকট রক্ষিত আছে।

এইরূপ প্রবাদ যে তিনি যুদ্ধ শেষে প্রায় ১৫।১৬ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাটী প্রত্যাগত হন। ইহাই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের আর্থিক উন্নতির প্রথম ও প্রধান কারণ।

বৈদ্যনাথ এরূপ ধনশালী হইয়াও কিছুমাত্র ধনগর্ব্বিত হন নাই। তিনি যে ধনবান তাহা তাঁহার নিতান্ত আত্মীয় প্রতিবাসী ব্যতীত অপর কেহই জানিত না। এমন কি যদি তাঁহাকে "বাবু" বলিয়া কেহ সম্মানিত করিত তাহাতে তিনি সন্তোষলাভ ত দূরের কথা আপনাকে অপমানিতই বোধ করিতেন, পরন্তু "বাড়ুয্যে মহাশয়" সম্বোধনে বড়ই প্রীতিলাভ করিতেন। স্বগ্রামবাসী জেলে, মালা, নাপিত কুমার প্রভৃতিকে কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই, বরং দাদা, খুড়া, জেঠা, ভাই প্রভৃতি সম্বোধনে উহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন এবং তাহাতে নিজেও খুব আনন্দ পাইতেন। সর্ব্বদা উহাদিগকে অর্থ দিয়াও আপৎ বিপদে রক্ষা করিতেন। অপর পক্ষে উহারাও তাঁহার জন্য প্রাণপাত করিয়া উপকার সাধন করিত। এইরূপেই পূর্ব্বকালে পরস্পর অচ্ছেদ্য ভালবাসার বন্ধনে সমাজে আপন আপন কর্ত্তব্য রক্ষা করিয়া সকলে সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত।

যুদ্ধ শেষ হইবার পরে বৈদ্যনাথ এক সন্ন্যাসী প্রদত্ত শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ বিগ্রহটীকে লইয়া বহু ধনরত্ন সহ স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবা ও পূজাদির ব্যবস্থাও করাইলেন।

দেশে আসিয়া কিছু অর্থ লইয়া একটা ব্যবসা করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যশোহর হইতে নৌকাযোগে চিনি ও অন্যান্য দ্রব্য খরিদ করিয়া তদানীন্তন কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ী মেসার্স কলভিন এণ্ড কোম্পানীকে ঐ সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। কোন সময়ে ঐ কলভিন এণ্ড কোম্পানীকে প্রায় দশ লক্ষ টাকার হুণ্ডী দিবার আবশ্যক হয় এবং ঐ জন্য দিন স্থির ছিল। ঐ পরিমাণ টাকা কলিকাতার আফিসে না থাকায় বিলাত হইতে জাহাজে ধার্য্য দিনের মধ্যে টাকা আনাইবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে ঝড় বৃষ্টি হইয়া ধার্য্য দিনের মধ্যে ঐ জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসিয়া পৌছে নাই, তাহাতে কোম্পানির সাহেবরা প্রমাদ গণিলেন এবং এত টাকা ইতিমধ্যে কোথায় সংগ্রহ করা যায় ইহা লইয়া খুবই জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। বাহিরেও পাওনাদারেরা বাজারে রটাইতে লাগিলেন যে কোম্পানী ফেল হইয়াছে, ধার্য্যদিনে কিছুতেই টাকা দিতে পারিবে না। ব্যবসাক্ষেত্রে ধার্য্যদিনে হুণ্ডীর টাকা পরিশোধ না হইলে ব্যবসার যে কি ক্ষতি হয় তাহা বোধ হয় ব্যবসায়ী মাত্রেই অবগত আছেন। এদিকে কোম্পানির সাহেবরাও বিশেষ অপমানিত ও চিন্তান্বিত হইয়াও তখন পর্য্যন্ত ঐ টাকা সংগ্রহের কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। ঐ সময় বৈদ্যনাথের নিকট গ্রামবাসী গোন্দলপাড়াস্থ একজন ভদ্রলোক ঐ কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তিনি বৈদ্যনাথের অর্থসম্পদ সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞাত ছিলেন। তিনি গোপনে কোম্পানীর বড় সাহেবকে জানাইলেন যে, চিনি প্রভৃতির সরবরাহকারী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট ধনশালী লোক, সাহেব যদি তাঁহাকে ঐ টাকা কর্জ্জ দিবার অনুরোধ করেন তবে হয়ত অনায়াসেই ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সাহেব বিশ্বাসই করিলেন না, কারণ বৈদ্যনাথকে

দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিত না যে তিনি এক জন খুব ধনবান লোক ; পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ধনগর্ব্ব একেবারেই তাঁহাতে ছিল না, ঐ কর্ম্মচারী পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলায় এবং সাহেব তখনও টাকার কোন সদুপায় স্থির করিতে না পারায় বড় সাহেব তাঁহার নিজ নিভৃত কক্ষে বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া কোম্পানীর সমূহ বিপদবার্ত্তা জানাইয়া প্রায় ৯ লক্ষ টাকা অল্পদিনের জন্য কর্জ্জ চাহেন। তাহাতে বৈদ্যনাথ বিনীতভাবে সাহেবকে বলেন যে তিনি গরিব ব্রাহ্মণ, অত টাকা কোথায় পাইবেন ? কিন্তু পরে সাহেবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও কোম্পানীর আশু বিপদ বুঝিয়া সাহেবকে জানাইলেন যে তাঁহার অর্থাদি (সুবর্ণ মুদ্রাদি) বর্গী ও দস্যু তস্করের অত্যাচারে মাটীতে প্রোথিত আছে, তথা হইতে বাহির করিয়া কলিকাতায় আসার জন্য কতকগুলি সশস্ত্র সুনিপুণ দ্বারবান প্রার্থনা করিয়া উহাদের দ্বারা কলিকাতায় আনাইয়া ঐ টাকা কর্জ্জ দেন এবং ধার্য্য দিনে হুণ্ডীর টাকা পরিশোধ করিয়া বহু কষ্টে কোম্পানীর মান বজায় রাখা হয়। ইহার কয়েক দিন পরে জাহাজখানি নানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অর্থ দিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলে সাহেব সুদসহ ঐ কর্জ্জ টাকা পরিশোধ করিতে চাহিলেন, কিন্তু বৈদ্যনাথ কিছুতেই সুদ গ্রহণ না করিয়া আসল টাকাগুলি মাত্র লইয়াছিলেন। এই ব্যবহারে বৈদ্যনাথের প্রতি কোম্পানী বড়ই ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকার কথা সাহেব জানাইয়াছিলেন। ক্রমে এই মহদুপকারের বিষয় বিলাতে Directorগণের নিকট পৌঁছিলে তাঁহারা খুব সন্তোষ হইয়া কলিকাতায় সাহেবদিগের প্রতি এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে বলিয়াছিলেন যাহাতে বৈদ্যনাথের বিশিষ্টরূপে আর্থিক সাহায্য হইতে পারে। কলিকাতায় কোম্পানির বড় সাহেব নানা চিন্তার পর বৈদ্যনাথকে কোম্পানির মুতছুদ্দী (Banian) পদ দিবার সংকল্প করিলেন এবং তাঁহাকে ঐ পদ লইতে কহেন, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থার

উল্লেখ করিয়া ঐ কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় অগত্যা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক অভয়চরণকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। পুত্র কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে বৈদ্যনাথ ব্যবসায় ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া বৈষয়িক ও ধর্ম্ম কার্য্যে মন দিলেন। পুত্রের ঐ কর্ম্মে বাৎসরিক প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ ঐ সময় তেলিনীপাড়া গ্রামে অনেক জমি খরিদ করিয়া বাগান, পুষ্করিণী ও প্রাসাদ তুল্য বসতবাটী প্রস্তুত করাইলেন।

ঐ সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজের বহু বিস্তৃত জমিদারীতে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা রাজস্ব সরবরাহ করিতে এবং ঐ সমুদায় টাকা নিয়মিতরূপে আদায় করিতে বড়ই অসুবিধা হইতে থাকে, তৎসময়ে অষ্টম আইন প্রচলিত না থাকায় অনেক সময়েই পত্তনিদারগণ কিস্তিমত টাকা আদায় দিতেন না, এদিকে রাজস্বের বহুলক্ষ টাকার পাই পয়সা কম হইলে সূর্য্যাস্ত আইনের মহিমায় জমিদারী নীলামে চড়িবে, এই সমস্ত কারণে তদানীন্তন কালেক্টর সাহেবের আদেশে বর্দ্ধমান মহারাজের কয়েকটি জমিদারী বিক্রয় করা হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খরিদ করেন এবং পরে তাহা তিন অংশে তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া—হুগলী কালেক্টরীর ৪৬, ৪৭, ৪৮ নং তৌজী, লাট, গঙ্গাধরপুর সাঁচতাড়া ও সরসা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে—এই তিনটী তৌজির রাজস্ব প্রায় ন্যূনাধিক দেড় লক্ষ টাকা—ইহাই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের বিশিষ্টরূপ জমিদারীর সূচনা।

বাঃ ১২০৪ সালে হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা জেলায় বিস্তর জমিদারী ও কলিকাতা সহরে বহু জমী ও বাড়ী খরিদ হওয়ায় বিস্তর আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমার গর্ভে অভয়চরণ ও কাশীনাথ নামে দুই

পুত্র ও দ্বিতীয়ার গর্ভে রামধন ও বিশ্বনাথ নামক দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিশ্বনাথের বাল্যেই মৃত্যু হইয়াছিল।

বৃদ্ধ বয়সে বৈদ্যনাথ কাশীবাসী হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু সে সময় কাশী যাওয়া এখনকার মত সুলভ ছিল না। রেল ষ্টীমার প্রভৃতি শীঘ্রগামী যান বাহনাদি কিছুই ছিল না, হাঁটিয়া যাওয়া কিংবা নৌকা ও গো-যান ভিন্ন দূরদূরান্তর যাইবার আর কোন উপায় ছিল না এবং তীর্থ পথেও নানাস্থানে দস্যু তস্করের ও বন্য হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির ভয় ছিল। শীঘ্র সংবাদাদি পাঠাইবার জন্য ডাক ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি কিছুই ছিল না। এই সমস্ত অসুবিধার উল্লেখ এবং কাশীধাম যেরূপ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত তেলিনীপাড়া গ্রামটীও সেই পশ্চীম তীরে অবস্থিত হওয়ায় "গঙ্গার পশ্চিম কূল বারানসী সমতুল্য" এই প্রবাদ বাক্যের সারবত্তা দেখিয়া বৈদ্যনাথের পুত্র ও আত্মীয়গণ কাশীধামের তুল্য শিব অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়া তৎতুল্য পবিত্র স্থানে পরিণত করাইতে এবং স্বগ্রামে বাস করিয়া শেষ জীবন দেবসেবা ও লোক-হিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। পরিশেষে নানা যুক্তি তর্কের পর উহাই সুপরামর্শ বলিয়া স্থির হয়।

১২০৮ সালের ফাল্গুনী সংক্রান্তির দিবসে শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠা হয়—আজিও প্রতি বৎসর উক্ত দিবসে অন্নপূর্ণা মন্দিরে ঠাকুরাণীর জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সৎকর্ম্ম হইয়া থাকে।

সন ১২০৮ সালে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ও শ্রীশ্রীশিব ঠাকুরের অষ্টধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপনা ও উহাদের জন্য বৃহৎ মন্দির, নহবৎখানা, অতিথিশালা ও পিত্তলের রথ নির্ম্মাণ ও ঐ মন্দিরের নিকট পুষ্করিণী ও গ্রামের চতুর্দ্দিক পরিখা খনন করিয়াছিলেন। তাহাতে গ্রামটীকে বর্গী ও দস্যুর অত্যাচার হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দেন। তেলিনীপাড়ার গঙ্গাতীরে

একটী দেবালয় ও সাধারণের হিতার্থে একটী পাকা ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেওয়ায় লোকে বহু উপকৃত হয়। স্বগ্রাম নিকটবর্ত্তী ভদ্রেশ্বর গ্রামে গঙ্গাতীরে নিজ বাসোপযোগী একটী দ্বিতল বাটী ও ঐ সময় প্রস্তুত করান হয়, তথায় বৈদ্যনাথ রাত্রিবাস করিতেন এবং প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রতিদিন তেলিনীপাড়ার বাটীতে আসিয়া শিব, অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মী-নারায়ণ জীউর পূজা অর্চ্চনা সমাপন ও অতিথিসেবা অন্তে আহারাদি সমাপন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন। সন্ধ্যাগমে সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া আরত্রিক দর্শন মানসে ঠাকুরবাটীতে উপস্থিত হইতেন এবং তথায় অভ্যাগত সন্ন্যাসী, ভাট, ফকিরদিগকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আহারাদি দিয়া অতিথিশালায় রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করাইতেন। পরিশেষে ঠাকুর ঠাকুরাণীদের নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ান দেওয়া হইলে গঙ্গাতীরে আপন বাটিতে যাইয়া রাত্রিবাস করিতেন, ঐ সমস্ত দেবসেবার উদ্দেশ্যে প্রায় দশ সহস্র টাকা আয়ের একখানি জমিদারী শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ঐ ঠাকুরাণীর সেবা ও বারমাসে তের পার্ব্বণ আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। স্বগ্রামে সদ্‌ব্রাহ্মণ কতকগুলিকে জমি দান ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাইয়া, লোকশিক্ষার জন্য স্কুল পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপনা করাইয়া, গ্রামের বহু উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তাঁহার মৃত্যুর পর কিরূপ শ্রাদ্ধ হইবে, কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা স্বয়ং নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য-সম্ভার নানা দেশের শিল্পকুশল কারিগর আনাইয়া আপন মনোমত প্রস্তুত করাইয়া শ্রাদ্ধে যা কিছু প্রয়োজন হইবে তৎসমস্তই ব্যবস্থা করাইয়া ১২১৪ সালে তিন পুত্র, বিস্তীর্ণ জমিদারী ও প্রভূত অর্থ এবং নানা ধর্ম্ম ও লোকহিতকর কার্য্যের ব্যবস্থা করাইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে গঙ্গাজলে সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন।

বৈদ্যনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অভয়াচরণ বাঙ্গালা, উর্দ্দ এবং ইংরাজি

ভাষা কতকটা শিক্ষা করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত কলিকাতা কলভিন এণ্ড কোং অফিসে মুতচ্ছুদ্দীগিরি কর্ম্ম করিতে থাকেন এবং কিছুদিন পরে পিতা বৈদ্যনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ খুব সমারোহপূর্ব্বক সুসম্পন্ন করেন। শুনা যায় ঐরূপ সমারোহ পূর্ণ শ্রাদ্ধ তেলিনীপাড়া ও তন্নিকটস্থ পল্লিবাসীরা কখনও পূর্ব্বে দেখে নাই। তিনি ১০।১২ বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া মধ্যমভ্রাতা কাশীনাথকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া ঐ কর্ম্ম হইতে স্বয়ং অবসর লয়েন। গৃহে আসিয়া জমিদারী কার্য্যাদি ও জনহিতকর বহুকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করেন এবং তাঁহাদের গর্ভে অন্নদাপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদ নামে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলি নূতন জমিদারী খরিদ করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রভূত আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি দানশীল এবং ধার্ম্মিক ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সে জাহ্নবী-তীরে তিনি সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী স্বামীসহ এক চিতায় সহমৃতা হইয়া এতদ্দেশে সতী মাহাত্ম্যের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

অন্নদাচরণ।

বৈদ্যনাথের মধ্যম পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথ অল্প বয়সেই বাঙ্গালা ও উর্দ্দু লেখা পড়ায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন, তিনি ইংরাজী বিদ্যাও কতকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন, যাহা একবার পড়িতেন তাহা অল্পায়াসেই আয়ত্ত করিয়া লইতেন। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি কলিকাতার কলভিন কোম্পানীর অফিসে কিছুকাল খুব দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সাহেবগণ তাঁহার কার্য্যকুশলতায় বড়ই বাধ্য ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ও নিরভিমানী লোক ছিলেন। জীবনে কখনও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই।

কাশীনাথ।

তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, দিবসের অধিকাংশ সময় স্নান আহ্নিক পূজাতেই কাটিয়া যাইত এবং নিত্য গরিব দুঃস্থদিগকে মুক্ত হস্তে দান করিতেন। কুলদেবী শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর কিছু দিন পরে তিনি কলিকাতার কলভিন্ কোম্পানীর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র অন্নদাপ্রসাদকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। স্বয়ং বাটীতে অবস্থান করিয়া জমিদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও ধর্ম্মাচরণে মন দেন। তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় বহু নূতন নূতন জমিদারী ক্রয় হইয়া যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হয়।

"ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" নামক পুস্তকের ১৭২।১৭৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায় নদীয়া মহারাজের প্রধান পরগণা উখড়া ও গায়রহ বা: ১২২০ সালে নীলামে উপস্থিত হইলে কাশীনাথ ও কলিকাতা নিবাসী মধুসূদন দু' জনায় নীলাম ডাকিতে আরম্ভ করেন, পরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আট লক্ষ টাকায় খরিদ করেন। তদনন্তর রাজা গিরীশচন্দ্র বোর্ডে দরখাস্ত দিয়া নীলাম অসিদ্ধ করিবার বহু চেষ্টা করিলে কোনই ফল হয় না। রাজা ইহাতে অত্যন্ত অবমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মন্ত্রীবর্গকে জিজ্ঞাসা করেন যে তেলিনীপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধির কারণ কি? ইহার উত্তরে তাঁহারা নাকি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কুলদেবী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর কৃপাই ঐরূপ সমৃদ্ধির প্রধান কারণ, ইহা শুনিয়া নির্ব্বোধ রাজা ঐ ঠাকুরাণীর পরিচারক ব্রাহ্মণদিগকে বহু উৎকোচের প্রলোভনে বশীভূত করিয়া বহু চেষ্টায় মন্দির হইতে ঐ ঠাকুরাণীকে স্থানান্তরিত করাইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে বিগ্রহটীকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন করাইতে বাধ্য হন।

দেব সেবায় ভোগাদি রন্ধন কাশীনাথের দুই স্ত্রী করিতেন; তাঁহাদের

অভাবে স্বগোত্রীয় জ্ঞাতি স্ত্রীলোকেরা করিতেন, অপর স্ত্রীলোকের রন্ধন করিবার অধিকার ছিল না। ভোগাদি শেষ হইলে অতিথি, সাধু-সন্ন্যাসীর ভোগ হইত, তৎপরে নিজে আহারাদি করিতেন। বৈকালে ও রাত্রে জমিদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রজাদিগের দুঃখ কষ্টের বিষয় স্বকর্ণে শুনিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেন। তিনি তৎকালে একজন আদর্শ জমিদার ছিলেন এবং তাঁহার স্মরণ শক্তি এত প্রবল ছিল যে চার পাঁচ জন কর্ম্মচারিকে এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মুখে বলিয়া পত্র লেখাইতে পারিতেন, ইহা যে কত কঠিন ব্যাপার তাহা একটু চিন্তা করিলেই সকলে বুঝিতে পারেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী মধ্যে মেদিনীপুর, নদীয়া এবং বর্দ্ধমান জেলার জজ সাহেবগণ তাঁহার খরিদা বাটীতে ভাড়াটিয়া স্বরূপ বাস করিতেন এবং এখনও মেদিনীপুর জেলায় ঐরূপ ব্যবস্থাই চলিতেছে। তিনি বহু ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ও লাখরাজ জমি দান করিয়া এবং তাঁহার প্রত্যেক জমিদারীতে শিব স্থাপনা করাইয়া বহু সম্মানিত হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীর রাজস্ব স্বরূপ প্রায় চারিলক্ষ টাকা বাৎসরিক গভর্মেণ্টকে দিতে হইত।

তাঁহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামধন ক্রমে ক্রমে বড়ই অমিতব্যয়ী হইয়া ঘোর শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়েন, ইহাতে সূক্ষ্মদর্শী কাশীনাথ স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন এরূপ ব্যয়-স্রোত প্রবাহিত হইতে দিলে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন রামধনকে ঐ পথ হইতে নিবৃত্ত করাইতে পারিলেন না, তখন কাশীনাথ ও রামধন দুই ভ্রাতায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র অন্নদাচরণের মধ্যে বাঃ সন ১২৭৫ সালে আপোষ নিষ্পত্তিতে জমিদারী ও অহরতাদি বিভাগ হইয়া যায়।

কাশীনাথের দুই স্ত্রীর মধ্যে কনিষ্ঠার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয় তাঁহার নাম ছিল মহেন্দ্রচন্দ্র, কিন্তু বাল্যেই তাহার মৃত্যু হওয়ার পর

তাঁহার অদৃষ্টে আর পুত্র লাভ হয় নাই, তজ্জন্য স্বামীর অনুমতিক্রমে তাঁহার দুই স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর কালীদাস ও দুর্গাদাস নামে দুইটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ৬০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বৈদ্যনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রামধন বাঙ্গলা ১১৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবাবধি বেশ দীর্ঘকায় ও বলশালী পুরুষ ছিলেন।

রামধন।

বাল্যকালে মল্লদিগের নিকট কুস্তি শিক্ষা করিয়া ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে তিনি একজন বিলক্ষণ বলশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। যে সকল কার্য্যে বলের প্রয়োজন তাহাতে রামধনের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তিনি অশ্ব ও নৌকা চালনা, কুস্তি লাঠিখেলা প্রভৃতিতে উত্তমরূপ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখাপড়ায় তাঁহার বিন্দুমাত্র যত্ন ছিল না। রাজা রামধনের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের ন্যায় মনোরম ও সুবৃহৎ প্রস্তরলিঙ্গ ৺কাশীধামেও সুদুর্ল্লভ। রামধনের মন্দির সংলগ্ন পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভয়াচরণের প্রতিষ্ঠিত অপর কয়েকটি শিবলিঙ্গ আছে—বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় পরবর্ত্তী দুই এক ব্যক্তি পরে অপর কয়েকটি সুবৃহৎ শিবলিঙ্গের স্থাপনা করেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি একজন ঘোরতর শক্তি উপাসক হইয়া উঠেন এবং পঞ্চমুণ্ডীর আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথারীতি শক্তি উপাসনা করিতে থাকেন। তেলিনীপাড়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম মাণিকনগরে তিনি একটী বৃহৎ ত্রিতল ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী প্রস্তুত করিয়া অধিকাংশ সময় তথায় বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাণিকনগর-শ্মশানে শব সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ বাটিতেও নানাবিধ শক্তিসাধনা চলিত, তাহাতে কোন বিষয়ে ত্রুটী পরিলক্ষিত হইত না, ঐ বাটীতে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী পূজায় তিন দিবস অতি সমারোহের সহিত পূজা

সম্পন্ন করাইতেন এবং উহাতে একশত আট বলির ও শক্তি পূজার অন্যান্য উপচারের ভূরি ব্যবস্থা হইত। বহু ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায়ও হইত। শুনা যায়, পূজার তিন দিবসে তিনি প্রায় ১০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করাইতেন।

কাশীধামে গমন করিয়া তথায় বহুব্যয়ে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ও অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া একটী বৃহৎ এবং সুন্দর কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ স্থাপন ও প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রাহ্মণভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করেন এবং সেজন্য রাজ সম্মানে বিভূষিত হন। আজও কাশীবাসীরা রাজা রামধনের শিবমন্দির বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু তদানীন্তন গভর্ণমেণ্ট 'জাল প্রতাপচাঁদের' বিপক্ষে থাকায় তিনি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রকাশ্যে সাহসী হন নাই, যদিও পরোক্ষে 'জাল প্রতাপচাঁদকে' নানাবিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন—বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রতাপ চাঁদ বাহাদুর তাঁহার বন্ধু ছিলেন। জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমায় রামধন তাঁহাকে প্রকৃত রাজা স্থির করিয়া তাঁহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং নানারূপে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি জেলা ২৪ পরগণার অধীন আমডাঙ্গা গ্রামে শ্রীশ্রী৺কালীঠাকুরাণীর সেবার জন্য ঐ গ্রামে প্রায় ৫২/০ বিঘা জমিদান করেন এবং ঐ জেলার ইছাপুর গ্রামে গুরুগৃহে তিনটী শিবলিঙ্গ স্থাপন ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বহুব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করাইয়া দেন। হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর গ্রামে গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া এবং উহাতে শ্রীশ্রীশিব-অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অনাদি ভদ্রেশ্বর লিঙ্গ শিবঠাকুরের ও প্রতিষ্ঠিত শিব অন্নপূর্ণার নিত্য পূজার ব্যয়াদি বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুরা আজ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আসিতেছেন। তিনি বহু সৎকার্য্যে বড়ই দানশীল ছিলেন, কিন্তু অর্থাগমের

দিকে তাঁহার একেবারেই লক্ষ্য ছিল না; এজন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার একটী প্রধান জমিদারী দেনার দায়ে নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়।

সত্তর বৎসর বয়সে বাং ১২৫০ সালে একপুত্র শিবচন্দ্রকে রাখিয়া তিনি জাহ্নবী-গর্ভে প্রাণত্যাগ করেন।

শিবচন্দ্র।

রামধনের পুত্র শিবচন্দ্র বাং ১২০৫ সালে তেলিনীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও পিতার মত শক্তি মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। কুল-দেবীর পূজা অর্চ্চনায় দিবসের অনেক সময় কাটিয়া যাইত এবং তিনি খুব সুশ্রী, অমায়িক, দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, তিনি পরমাত্মচন্দ্র ও নবচন্দ্র নামে দুই স্ত্রীর গর্ভ-জাত দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

পরমাত্মচন্দ্র।

পরমাত্মচন্দ্র সন ১২২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বড়ই সুশ্রী ছিলেন। তাঁহাকে দেবসেনাপতি কার্ত্তিক বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার বিবাহ খুব সমারোহে হইয়াছিল, তখনকার কালে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল, বিবাহ বাসরগৃহে স্ত্রীলোকেরা অনুমান করিয়াছিলেন যে বর গায়ে রং করিয়া আসিয়াছে, তজ্জন্য শুনা যায় উহারা বস্ত্র ভিজাইয়া রং মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করিয়াছিল এবং পরে অকৃতকার্য্য হইয়া লজ্জিতা ও চমৎকৃতা হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, উর্দ্দু ও পারশিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার লিখিত হস্তাক্ষরগুলি মুক্তাপংক্তির ন্যায় পরিষ্কার ছিল। সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ দখল ছিল, আজও তাঁহার ব্যবহৃত সেতার প্রভৃতি দুই একটী যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সঙ্গীতাচার্য্য আলি রেজার শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার রচিত ২।৪টী সঙ্গীত এখনও লোকমুখে শ্রুত হওয়া যায়। তিনি ভগবতীচরণ ও হরিচরণ নামে দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া ৬৫ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লন।

সন ১২২৯ সালে নবচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি বড়ই অমায়িক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁহার তাদৃশ যত্ন না থাকায় ভালরূপ বিদ্যালাভ হয় নাই। তিনি সত্যজীবন ও সত্য-মোহন নামে দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমানে প্রায় ষাট্ বৎসর বয়সে ১২৮৯ সালে জাহ্নবীতটে সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পরলোক যাত্রা করেন।

নবচন্দ্র।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে সত্যজীবনের অনুরাগ দৃষ্ট হইত : তিনি মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ও সহকারী চেয়ারম্যান হইয়া তিনি সাধারণের বহু উপকার করেন। পরিশেষে প্রায় ৫২ বৎসর বয়সে সিদ্ধেশ্বর ও বিধুভূষণ নামে দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া তিনি ইহজীবন ত্যাগ করেন।

সত্যজীবন।

ভগবতীচরণ পরমাত্মচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বাং সন ১২৪৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত শিক্ষায় বিশেষ ঝোঁক দেখা যাইত। শুনা যায় গোন্দলপাড়ার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মধু বাঁড়ুয্যের নিকট তিনি গীত শিক্ষা করিতেন এবং স্নানের সময় জলে গলা নিমজ্জিত রাখিয়া স্বয়ং সাধন করিতেন। তাঁহার স্বর বড় মধুর ছিল এবং তবলা, সেতার ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি বলবান্ ও নির্ভীক ছিলেন। তিনি তেলিনীপাড়ার নিকট পাইকপাড়া গ্রামে একটী বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া সপরিবারে তেলিনীপাড়ার পুরাতন বাটী হইতে ঐ নূতন বাটীতে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। তিনিও একজন দেশপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতামোদী লোক ছিলেন। তিনি ৬২ বৎসর

ভগবতীচরণ।

বয়সে কলিকাতায় মানবলীলা সম্বরণ করেন, তিনি অক্ষয়কুমার, ব্রতেন্দ্রনাথ ও হৃদয়চন্দ্র নামে ৪ পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যান।

হরিচরণ।

পরমাত্মচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র হরিচরণ দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ লোক ছিলেন। যৌবনে খুব মেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি উন্মাদ হইয়া পড়ায় সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া যায়। তিনি দাতা ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার পুত্র জন্মে নাই। ৩ কন্যা ও ১ দৌহিত্র (কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র) রাখিয়া যান। তিনি ১৩১৫ সালে ২২শে কার্ত্তিক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। তিনি "যুবরাজের ভারত ভ্রমণ" পুস্তকের রচয়িতা।

অক্ষয়কুমার।

অক্ষয়কুমার ভগবতীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বলবান এবং নির্ভীক লোক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ উপাধি পাইবার কিছু দিন পরে স্বাধীন নেপাল রাজ্যের অধীনে একটী কর্ম্ম করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ৩।৪ বৎসর কর্ম্ম করার পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ পীড়া সাংঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন ১৩১৫ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহাকে গ্রাস করে। তাঁহার পুত্র জন্মে নাই, একমাত্র কন্যাকে রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

শচীন্দ্রনাথ।

শচীন্দ্রনাথ ভগবতিচরণের মধ্যম পুত্র, তিনি রূপবান ও মিষ্টালাপী পুরুষ ছিলেন। যন্ত্র সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। হারমনিয়াম এবং ক্লারিওনেট বাঁশি তিনি যেরূপ বাজাইতে পারিতেন তাহা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজি প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সবেমাত্র ব্যবসাক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার উন্নতির সূচনাতেই করাল কাল তাঁহাকে অকালে গ্রাস করিয়া লইয়া যায়। তাঁহার প্রথমা

স্ত্রী গত হওয়ায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন এবং তাঁহার গর্ভজাত এক পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাশীনাথের দুই স্ত্রীর সন্তানাদি না হওয়ায় দুইটী দত্তকপুত্র লওয়া হইয়াছিল। প্রথম স্ত্রী কালীদাসকে ও দ্বিতীয়া স্ত্রী দুর্গাদাসকে দত্তক লন। বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল, অশ্বারোহণে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন এবং তিনি অতি ধীর ও নিরীহ প্রকৃতির জমিদার ছিলেন। অল্পবয়সে বহুমূত্র পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়ায় তাঁহার অবস্থা একেবারে নষ্ট হইয়া পড়ে এবং মধ্যে ব্রণ ও স্ফোটকাদি পীড়ায় বড়ই কষ্টভোগ করিতেন। জমিদারী কার্য্যাদি শারীরিক অসুস্থাদির কারণে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না, এজন্য কতকগুলি কর্ম্মচারীর প্রতি ঐ ভার ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা কর্ত্তব্য-পরায়ণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাঁহারা প্রভুর নিকট প্রজাদিগের নামে নানা কুৎসা করিয়া নির্ভরশীল প্রভুর প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিবার অনুমতি লইতেন এবং তদনুসারে প্রজার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়া আপন আপন ঘৃণিত উদ্দেশ্য সাধন করিতেন। এক সময়ে তাঁহার অধিকৃত নার্ণা নামক গ্রামের প্রজাবিদ্রোহী হইয়া পড়ায় তাঁহাদিগকে শাসন করিতে যাইয়া এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন, যদিও তিনি অত্যাচারের বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত ছিলেন না, কেবল তাঁহার কতকগুলি অত্যাচারী কর্ম্মচারী ও দ্বারবানদিগের স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যেই উহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াও অব্যাহতি পান নাই। বিনা পরিশ্রমে কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে কারাবাস কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তথায় কিছু দিনের মধ্যে পীড়িত হইয়া পড়ায় মুক্তিলাভ করিয়া বাটী আইসেন এবং অল্পদিনপরে ঐ পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। নানারূপ

কালীদাস।

চিকিৎসার আয়োজন হয়, কিন্তু নিয়তির নির্দেশ লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য নাই। পরিশেষে কার্ত্তিকমাসে ৬ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া প্রায় ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কালীদাসের ৬ পুত্রের মধ্যে মনোমোহন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। তিনি সন ১২৫১ সালের ১লা মাঘ তেলিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশবের ও যৌবন কালের অঙ্গসৌষ্ঠব বড়ই চিত্তাকর্ষক ছিল। বাল্যকাল হইতে তিনি যাহা ধরিতেন; তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেন না এবং বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। সাহিত্যরথী অক্ষয়কুমার সরকার, জজ আমীর আলি প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। উহাঁরা সকলেই হুগলী কলেজের ছাত্র। যে বৎসর তাঁহার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কথা, সে সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, তজ্জন্য বৈষয়িক নানা গোলযোগে তাঁহার মাতা হরসুন্দরী দেবীর অনুরোধে তাঁহাকে স্কুল ছাড়িয়া বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। হুগলী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ Mr. Thowet তাঁহাকে অন্ততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষাটী দেওয়াইয়া লেখাপড়া ত্যাগ করিবার অনুরোধ করিতে তাঁহার মাতার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

কারণ ভালরূপে পাস হইলে কলেজের সুখ্যাতি বাড়িতে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে নানা কারণে তাহাও ঘটে নাই। মনোমোহন বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলেন না বটে কিন্তু ঐ অধ্যক্ষ সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া অযাচিতভাবে ছাত্রের স্বভাব চরিত্রের ও বুদ্ধির বর্ণনা করিয়া একখানি সুদীর্ঘ প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে যদিও তাঁহাকে বিদ্যালয় ছাড়িতে হইল, কিন্তু তিনি আজীবন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও শিক্ষাপ্রদ নানা শিল্প যথা চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করিয়া সময়ের যথার্থ ব্যবহার করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে "A good head has a hundred hands" এই প্রবাদ বাক্যটী বিশেষরূপে বলা যাইতে পারে। তাঁহার কার্য্যকুশলতা গুণে একটী বৃহৎ জমিদারী খরিদ হইয়া বৈষয়িক যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হয়।

প্রায় ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হন। ডাক্তারী, কবিরাজী প্রভৃতি নানা চিকিৎসায় কোন উপকার না পাইয়া চিকিৎসকদিগের পরামর্শে পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনে যান এবং তাঁহাদের ব্যবস্থামত ঔষধাদি ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন উপকার না হওয়ায় ঔষধের উপকারিতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়েই তথায় প্রায় আশী বৎসরের বৃদ্ধ এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে দেখিয়া বলেন ঔষধ ব্যবহার করায় স্থানীয় জল বায়ুর তিনি কিছুই উপকার পাইতেছেন না এবং তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে ঔষধের পরিবর্ত্তে যদি প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিয়া শারীরিক কিছু পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করেন, তবে তাঁহার বিশ্বাস যে সত্বরই পীড়ার উপশম হইবে। ঐ উপদেশ পাইয়া তাহাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়া তদনুরূপ ভ্রমণাদি করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইলেন। মনোমোহন বাবু ঐরূপ পরীক্ষা করিয়া যতই উপকার পাইতে লাগিলেন ততই তাঁহার ঔষধের উপর ঘৃণা বৃদ্ধি হওয়ায় আপন পুত্র কন্যাদিগের কঠিন পীড়াতেও বিন্দুমাত্র ঔষধ দিতেন না। সন ১২৮৮ সালের ১০ই কার্ত্তিক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কঠিন নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র ঔষধ দেওয়া হয় নাই। যৌবনকালে তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন, বন্দুকে তাঁহার অসাধারণ লক্ষ্য ছিল। চিত্রবিদ্যায় তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্কিত ২।৩ খানি উত্তম চিত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

যন্ত্র সঙ্গীতে, সেতার, সুরবাহার, এস্‌রাজ প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। পরিশেষে বৃদ্ধ বয়সে দুর্ব্বল দেহে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র অসাধারণ পরিশ্রমে শিক্ষা করিয়া প্রচলিত হিন্দু পঞ্জিকা সমূহের স্ফুটাদির গ্রহ ও সংস্কার অভাবে গ্রহণ ও তিথ্যাদি গণনায় ভুল হইতেছে ইহা "বঙ্গবাসী, "সাধারণী" প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্নের দ্বারা তথায় একটী সভা আহ্বান করাইয়া বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। স্বয়ং পঞ্জিকা প্রচার করিয়া লাভবান হইতে স্বীকার না হওয়ায় কলিকাতাবাসী মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন জ্যোতিষজ্ঞ ভদ্রলোকের প্রতি ঐ ভারাপণ করা হয়, এবং ইংরাজি নাবিক পঞ্জিকা (Nautical Almanac) হইতে প্রতি বৎসরে কি প্রকারে বিশুদ্ধ তিথ্যাদি নির্ণয় করা যায় তদুপায় দর্শাইয়া ঐ চট্টোপাধ্যায়ের নামে "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" প্রকাশের উপায় করাইয়া গিয়াছেন।

সুখের বিষয় এক্ষণে বহু প্রাজ্ঞ বিদ্বান রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত বঙ্গ পঞ্জিকা সংস্কার বিষয়ে বহু চেষ্টা দেখাইতেছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে মনোমোহন বাবুর প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকা সংস্কার আরও উন্নতি লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার প্রধান ও আদি সোপানাবলী পুনর্নির্ম্মিত বা প্রচারিত হইয়া সাধারণের ধর্ম্ম কর্ম্মগুলি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সুসময়ে আচরিত হইতে থাকিবে।

তিনি আচারে, ব্যবহারে, বিনয়ে, বিদ্যায় স্বদেশী আদর্শের ভক্ত এবং অনুরাগী ছিলেন এবং স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভিক হৃদয়ের পরিচয় দিয়া তিন পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া সজ্ঞানে সন ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসে লোকান্তরিত হন।

অভয়াচরণের পুত্র অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অতি অল্প বয়সে তাঁহার মাতা তাঁহাকে রাখিয়া স্বামী সহমৃতা হন। তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে অতিযত্নে লালন পালন করেন।

অন্নদাপ্রসাদ

তিনি খুব রূপবান ছিলেন। তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ ও সিঙ্গুরের নবাব বাবু তাঁহাদের সমসময়ে বিশেষ রূপবান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে কার্ত্তিক পূজায় প্রতিমা গঠনের সময় অন্নদাপ্রসাদের মুখাবয়ব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নবীন কুমারদের আদর্শ ছিল। তদানীন্তন হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্নদাপ্রসাদকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীর ভিতর যে এতাদৃশ রূপবান্ ব্যক্তি থাকিতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। তাঁহার খুল্লতাত বাণীনাথ Colvin কোম্পানীর বেনিয়ানের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র অন্নদাপ্রসাদকে ঐ কর্ম্মে নিয়োগ করেন। বাণীনাথ যৌবনকালের কুসংসর্গে পড়িয়া কিছুদিন বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন, কিন্তু পরে ইহার অপকারিত্ব বুঝিয়া সমস্ত দোষ পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সে সময় মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী ছিলেন। অন্নদা প্রসাদের ঐ ব্রাহ্মধর্ম্ম হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় তাঁহার সহিত খুব উৎসাহে ঐ ধর্ম্মপ্রচারকল্পে নিজ বাটীতে ব্রহ্মসভা স্থাপন ও বহু উপনিষদাদি গ্রন্থ প্রচারকল্পে বহু অর্থাদি ব্যয় করেন। তিনি কয়েকটী স্বর্ণ অঙ্গুরীয়কে সংস্কৃত নীতিবাক্য খোদাই করাইয়া সদাসর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন—যথা 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ'। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান এবং প্রতিপত্তিশালী হইয়া সমাজপতি আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল। তাঁহার দুই স্ত্রীসত্ত্বেও দুঃখের বিষয় কাহারও গর্ভে সন্তানাদি জন্মে নাই। তাঁহার অনু-মতিক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রী দুই সহোদর ভ্রাতা শ্রীসত্যদয়াল ও শ্রীসত্য-

স্বর্গীয় অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
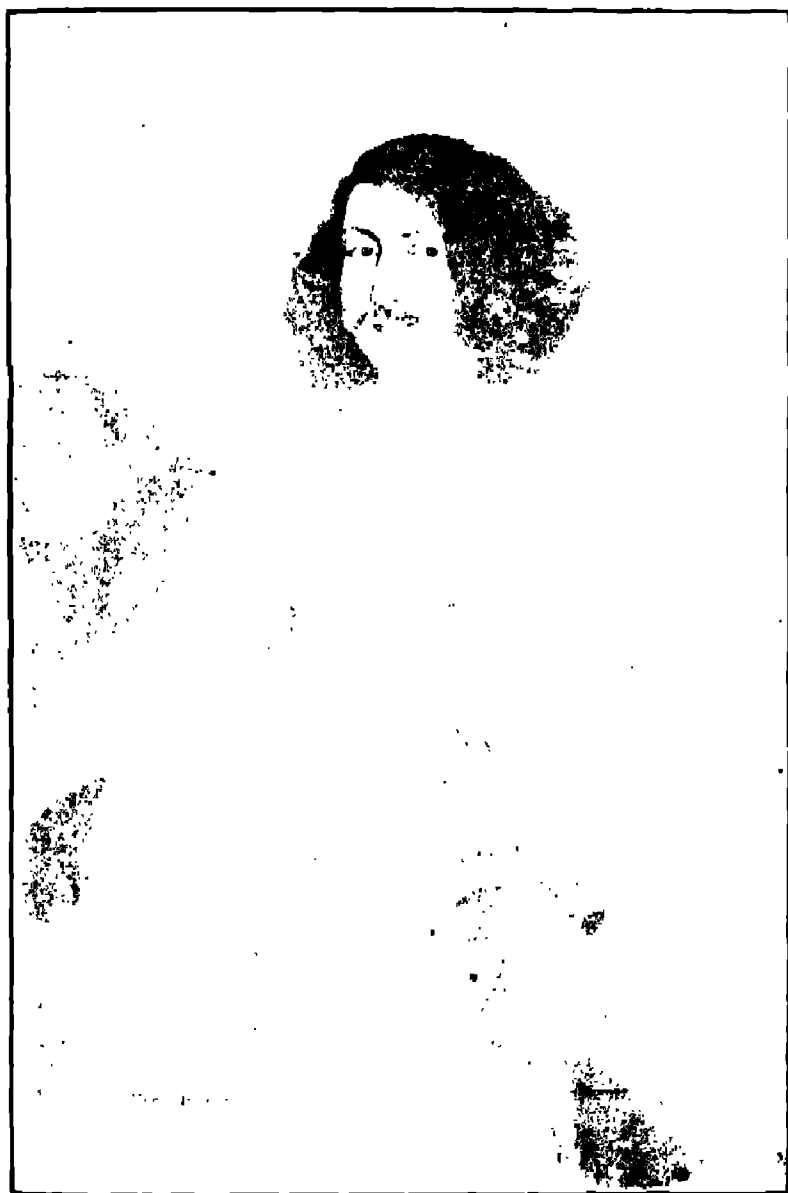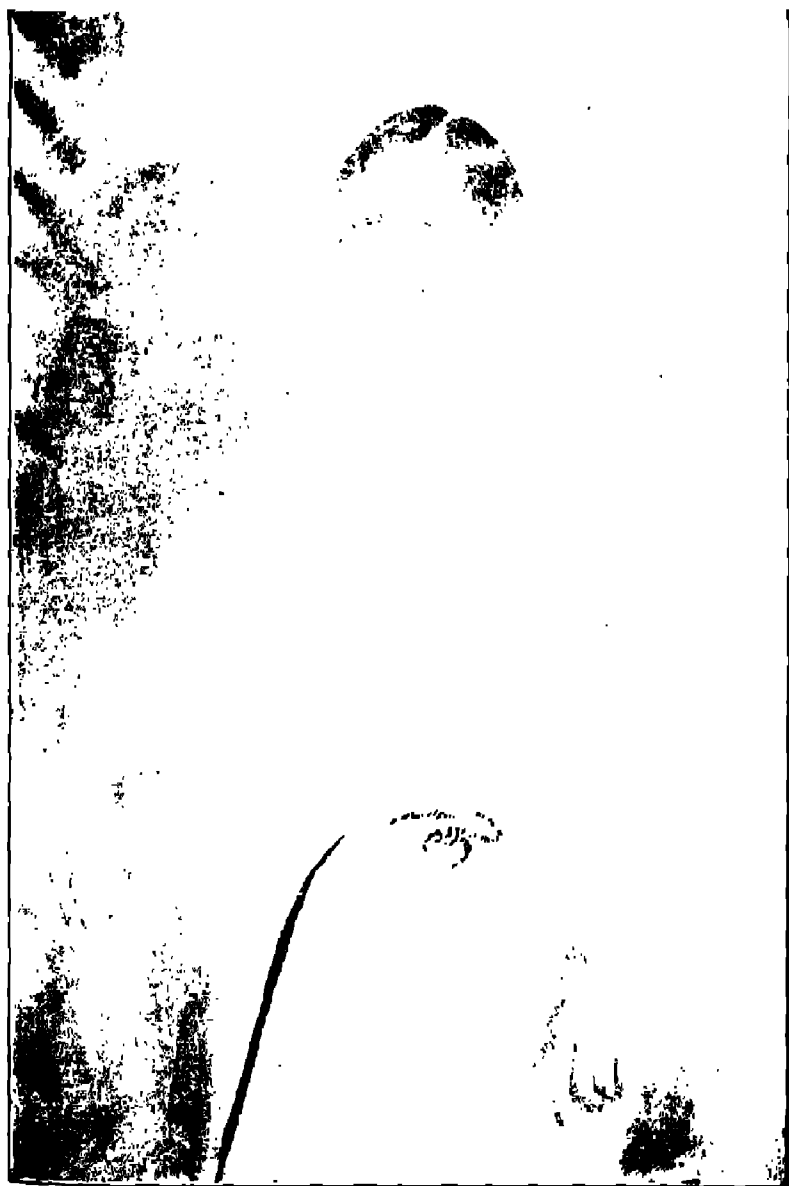
স্বর্গীয় সত্য প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসন্নকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া লালনপালন করেন। তিনি অনেক-গুলি জমিদারী পত্তনী বন্দোবস্ত করাইয়া নগদ টাকা ও জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়া যান। পরিশেষে বৃদ্ধ বয়সে জাহ্নবীগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন।

ইঁহারা দুই সহোদর এবং উভয়েই অন্নদাপ্রসাদের পোষ্যপুত্র।

সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন

সত্যদয়াল বাল্যকাল হইতে খুব পরিশ্রমী ও মিত-ব্যয়ী ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষায়ও পাস করিয়াছিলেন। তিনি নূতন কতকগুলি জমিদারী খরিদ করিয়া প্রভূত আয় বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার সবিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল, তিনি একটু মনোযোগী হইলেই রাজা খেতাব অনায়াসেই পাইতেন এবং গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে তাঁহার মনোমত অভিপ্রায় জানিতে চাহেন; কিন্তু তিনি রাজা হইবার আনুষঙ্গিক নানা বিরক্তিকর ব্যাপার পরি-হারের জন্য এ সম্বন্ধে অনুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই। তিনি বহু মূল্যবান জহরতাদি সংগ্রহ করিয়া নানা অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি একজন পাকা জহুরী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি একটী বৃহৎ পুস্তকাগার খরিদ করিয়া এবং তাহাতে বহু নূতন নূতন পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া যান তাহাতে সাধারণে অনেকে উপকৃত হন। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ পুস্তকগুলি যত্নাভাবে প্রায় সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। তিনি তিন পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া প্রায় ষাট বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রগণ খুব সমারোহ সহকারে তাঁহার শ্রাদ্ধ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যপ্রসন্ন খুব বলিষ্ঠ ও সৎকার্য্যে দানশীল এবং কুলদেবতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহার পুষ্পোদ্যান, চিড়িয়াখানা, ষ্টিমার,

গাড়ীঘোড়া, মৎস্যশিকার প্রভৃতি নানা বিষয়ে সখ ছিল। তিনি জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত এক পুত্র শ্রীসত্যশান্তি ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হন। তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

সত্যশান্তি।

সত্যশান্তি সত্যপ্রসন্নের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ইনি বিশেষ সত্যবাদী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। স্বার্থ সম্বন্ধে ক্ষতিকর হইলেও আদালতে কখনও সত্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ করেন নাই। ইনি অল্প বয়সেই পিতৃহীন হইয়া আমলা ও ও নায়েবের সাহায্যে স্বীয় জমিদারী স্বয়ং তত্ত্বাবধান করেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। সাধারণের বিদ্যার উন্নতিকল্পে ইহার প্রগাঢ় চেষ্টা ছিল, ইনি ২৩।২৪ বৎসর বয়ঃক্রমেই স্থানীয় ভদ্রেশ্বর স্কুলের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন। The First Book of Reading এর অর্থ পুস্তক, ইংরাজী সরল Idiom সংগ্রহ প্রভৃতি ৩।৪ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা নিম্ন ইংরাজী শিক্ষার সাহায্য কল্পে তিনি প্রণয়ন করেন। তাঁহার বাস ভবন চন্দননগর হাটখোলাস্থ উদ্যান বাটিকার সংলগ্ন একটি অনতিবৃহৎ একতালা বাটিতে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পাঠশালাটি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তিনি অশ্বচালনায় সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার আস্তাবলে অত্যুৎকৃষ্ট ৮।১০ টি অশ্ব সর্ব্বদা রক্ষিত ছিল। তিনি বেগবান্ ও তেজস্বী অশ্ববৃন্দসমন্বিত জুড়ী অথবা চৌঘুড়ীকে এক হস্তে অবলীলাক্রমে চালনা করিতে পারিতেন। সন ১৩০৮ সালে পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন—তাঁহার বিধবা পত্নীর ন্যায় মহীয়সী ও পুণ্যবতী মহিলা কলিকালে সুদুর্লভ। ইনি দানশীলা, মিতাচারিণী ও দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী। তেলিনী পাড়ার অধিবাসীবৃন্দের গঙ্গাস্নানের সুবিধার্থে তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ

সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ১৩১১ সালে মনোরম 'শিবতলার ঘাট' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ব্যতিরেকে ৺অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির নিজব্যয়ে প্রায় দুই সহস্র মুদ্রায় জীর্ণসংস্কার করান।

সত্যশান্তির চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র সত্যপ্রিয় অকালে প্রাণত্যাগ করেন। অপর তিনটি পুত্র এখন বর্ত্তমান আছেন। ইঁহারা তিনজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ। জ্যেষ্ঠ সত্যকিশোর হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। মধ্যম সত্যব্রত এম্ এ পাশ করিয়া জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ সত্যশরণ উচ্চ সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতেছেন।

কাশীনাথের পোষ্য-পুত্র দুর্গাদাস। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বিবরণ জানা না থাকায় লেখা হইল না। তিনি অল্প বয়সে পরলোক

দুর্গাদাস।

গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র লাভ না হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পর এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়, তাঁহার নাম ছিল "রাজকৃষ্ণ"।

দুর্গাদাসের দত্তক পুত্র রাজকৃষ্ণ তেলিনীপাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনকালে খুব শক্তিশালী এবং সুশ্রী ছিলেন,

রাজকৃষ্ণ।

একমন ভারি মুদ্গর অনায়াসে ভাঁজিতে পারিতেন। আহারাদি বিষয়ে তাঁহার খুব সখ ছিল। উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদিগকে সর্ব্বদা পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতে খুব ভালবাসিতেন। তিনি খুব ধীর এবং মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। পরের দুঃখে তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যথিত হইত। তিনি সাধ্যমতে ঐ দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্য ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। তিনি ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান (chairman)

পদে নিযুক্ত হইয়া বহুদিন কার্য্য করিয়া সাধারণের বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ আজও তেলিনীপাড়াগ্রামে 'রাজকৃষ্ণলেন' নামে একটী রাস্তা পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তিনি কয়েকখানি জমিদারী খরিদ করিয়া বিস্তর আয় বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুগন্ধ পুষ্পাদি ব্যবহার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তেলিনীপাড়া গ্রামে একটি বৃহৎ নানা ফল-পুষ্পশালী উদ্যান রচনা ও তন্মধ্যে একটি দীঘিকা খনন করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহার দুই বিবাহ ও তাঁহাদের গর্ভে তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পরিশেষে তিনি প্রায় ষাট বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ভাগিরথী-তীরে নশ্বর দেহত্যাগ করেন। খুব সমারোহে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার প্রদত্ত অর্থে ও মিউনিসিপ্যালিটির আংশিক সাহায্যে 'রামকৃষ্ণ দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে, ইহাতে স্থানীয় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অধিবাসীবৃন্দের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

তেলিনীপাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের হিতকর কার্য্যের বিবরণী—

১। তেলিনীপাড়া গ্রামে শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর ও শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দির, ৩টী শিবলিঙ্গ স্থাপন ও তাঁহাদের মন্দির ও গৃহাদি নির্ম্মাণ ও পূজার ব্যবস্থা।

২। সদাব্রত, ধর্ম্মশালা, নহবতখানা।

৩। তেলিনীপাড়া হাই স্কুল

৪। তেলিনীপাড়া গ্রামে ৬।৭টী পুষ্করিণী ও গড় খনন করাইয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ ও গঙ্গাযাত্রির জন্য ২টী গৃহ দান।

৮ অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির

৫। গঙ্গার তীরে ২টী পাকাঘাট দান।

৬। ভদ্রেশ্বর গ্রামে শ্রীশ্রী৺ভদ্রেশ্বর নাথ শিবের ও শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর মন্দির ও গৃহাদি নির্ম্মাণ।

৭। তেলিনীপাড়া গ্রামে রাজকৃষ্ণ দাতব্য চিকিৎসালয়।

৮। কাশীধামে শিবস্থাপন ও পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ।

৯। হুগলী কলেজে সূর্য্যমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ২০৲ টাঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২টী ছাত্রবৃত্তি দান।

১০। তেলিনীপাড়া গ্রামে রাজকৃষ্ণ দাতব্য চিকিৎসালয়ে অস্ত্র চিকিৎসার জন্য ১টী গৃহ চন্দ্রমোহন বাবুর স্ত্রীর নামে দান এবং রাখাল ও হরিচরণের নামে জমি দান

১১। ঐ গ্রামে ঘটক ও পুরোহিত বংশের বাসের জন্য নিষ্কর জমী দান

১২। কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺ কালীঠাকুরাণীর মন্দির পার্শ্বে ২টী পাকাগৃহ দান

১৩। Hugli Bar Library, Town Hall, Darjeeling Jubilee Sanitorium গৃহাদি নির্ম্মাণকল্পে ঐ ঐ ফণ্ডে অর্থ দান।

১৪। গাঁড়ুলীয়া (২৪ পৃঃ) গ্রামে ইংরাজি স্কুলের জন্য জমি ও অর্থ দান

১৫। তেলিনীপাড়া Public Library তে বহুপুস্তক ও অর্থ সাহায্য।

১৬। পিত্তলের রথ প্রতিষ্ঠা।

১৭। "যুবরাজের ভারত ভ্রমণ" "অশ্রুধারা" 'বিলাপমালা' "চিত্তরঞ্জন গল্প" প্রভৃতি পুস্তক প্রচার।

১৮। প্রতিবৎসর পূজাপার্ব্বন উপলক্ষে দান ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন।

১৯। মিউনিসিপাল কমিশনার, চেয়ারম্যান Hony Magistrate, স্কুল ও ডিস্পেন্সারীর সভ্য (member) প্রভৃতি হওয়া।

২০। Indian war relief fund এ অর্থ দান।

২১। তারকেশ্বর গ্রামে শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর শিবঠাকুরের সেবার জন্য ও ২৪ পং জেলার আমডাঙ্গা গ্রামে শ্রীশ্রী৺কালী ঠাকুরাণীর সেবার জন্য বিস্তর জমি দান।

২২। ইছাপুর গ্রামে (২৪ পং) গুরুগৃহে ৮টী শিবস্থাপন ও মন্দির নির্ম্মাণ।

২৩। তেলিনীপাড়া গ্রামের মধ্যে 'শিবতলার ঘাট' প্রতিষ্ঠা।

স্বর্গীয় গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশতরু।

১। ভট্টনারায়ণ
২। বরাহ
৩। সুবুদ্ধি
৪। বৈনতেয়
৫। বিবুধেশ
৬। সুভিক্ষ
৭। ভয়াপহ
৮। ধরণি
৯। মহাদেব
১০। মকরন্দ
১১। দাশু
১২। বনমালী
১৩। ভীম
১৪। মাধব
১৫। আদিত্য
১৬। পীতাম্বর
১৭। চতুর্ভুজ
১৮। সবাই

১৯। শ্রীগর্ভ
|
২০। গৌরীকান্ত
|
২১। রামভদ্র
|
২২। রামগোবিন্দ
|
২৩। রতিকান্ত
|
২৪। রামচন্দ্র
২৫। রামকৃষ্ণ

২৬। বৈদ্যনাথ

বৈদ্যনাথের পুত্র: অভয়াচরণ, কাশীনাথ, রামধন, বিশ্বনাথ (বাল্যে মৃত)

অভয়াচরণ
|
অন্নদাপ্রসাদ

অন্নদাপ্রসাদের পুত্র: সত্যদয়াল (দত্তক), সত্যপ্রসন্ন (দত্তক)

সত্যপ্রসন্ন (দত্তক)
|
সত্যশান্তি

সত্যশান্তির পুত্র: সত্যকিশোর, সত্যব্রত, সত্যপ্রিয় (বাল্যে মৃত), সত্যশরণ

সত্যকিশোর
|
সত্যপ্রসাদ

আম্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ।

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ অন্যতম। আম্বাড়ীয়ার স্বধর্ম্মনিরত জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এই ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভূত। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ কখন যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায় না। যমুনানদীর পশ্চিমতীরে পাবনা জেলায় "চন্দনী" নামে একটী গ্রাম আছে; এই গ্রামেই আম্বাড়ীয়ার জমিদার পরিবারের আদি নিবাস ছিল।

কান্যকুব্জ ও ভট্টনারায়ণ

আম্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ চন্দনীগ্রামে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহাদের বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ছিল। বহু বাণিজ্যতরণী সামগ্রীসম্ভার বহন করিয়া সদাই যমুনাবক্ষে ভাসমান থাকিত। দস্যুকর্তৃক এই পরিবারের গৃহ দুইবার আক্রান্ত হয়। এদিকে যমুনাও প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ ও দস্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাঁদেরই পূর্ব্বপুরুষ "রামশঙ্কর" তাঁহার হৃতাবশিষ্ট অর্থরাশি ও দ্রব্য সম্ভারসহ চন্দনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমুনার পূর্ব্বপারে ময়মনসিংহ জেলাস্থিত আম্বাড়ীয়া আগমন করেন ও বসবাস করেন।

অন্তর্বাণিজ্য ও আম্বাড়িয়া আগমন

আম্বাড়ীয়া প্রকৃতির লীলভূমি, বসন্তের রম্য নিকেতন, গড় মধুপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। আম্বাড়ীয়ার সঙ্গে মধুপুরের অচ্ছেদ্য প্রাকৃতিক

আবাড়ীয়া ও মধুপুর।

সম্বন্ধ। আবাড়ীয়াতে আজিও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পিতা ৺কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের যজ্ঞকুণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। এই পল্লীর তিন পার্শ্বে "বংশনদী" বেষ্টনীদ্বারা স্থানটিকে একটী প্রকৃত দুর্গের ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বপ্রান্তে দূর দূরান্তরে গজারির লহর চলিয়াছে। গড়মধ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু যথেষ্ট বিচরণ করিয়া থাকে।

৺রামশঙ্করের মধ্যমপুত্র ৺রামগোপাল চৌধুরী মহাশয় নিজ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমগুণে বিত্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

৺রামগোপাল চৌধুরী।

তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সর্ব্বদা সৎপথে ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে ও নিজ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পারসিক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

৺অন্নপূর্ণাদেবী ৺রামগোপাল চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী। ইনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন। ইনি অনেক সৎকার্য্য করেন, অনেক

৺অন্নপূর্ণাদেবী।

দেবক্রিয়ার সূচনা করিয়া যান; আজ পর্য্যন্তও তাঁহার বংশধরগণ তাঁহার সেই পুণ্যস্মৃতি পরম্পরাক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

৺রামগোপাল চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ৺পদ্মলোচন চৌধুরী মহাশয় ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমায় পরগণা পুখরিয়ার

পদ্মলোচন চৌধুরী

বিস্তৃত জমিদারীর অংশ খরিদ করেন। ৺পদ্মলোচন চৌধুরী মহাশয় ধর্ম্মপরায়ণ, সৎস্বভাবাপন্ন ও অমায়িক পুরুষ ছিলেন। মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

৺পদ্মলোচন চৌধুরী মহাশয়ের কীর্ত্তিমান্ বংশধর ৺কালীচন্দ্র চৌধুরী

মহাশয় অতিশয় তেজস্বী ও মেধাবী পুরুষ ছিলেন। তিনি একাধারে ভোগী ও যোগী ছিলেন। ইংরাজী, পারসিক ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার সময়ে এই জমিদার পরিবারে পুস্তকাগার (লাইব্রেরী) সৃষ্টি হয়। সেই পুস্তকাগারে যে সমস্ত পুস্তক আছে, তাহা হইতে তাঁহার শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালোচিত পোষাক পরিচ্ছদ চাল চলনে তাঁহাকে বিশেষ সৌখিন পুরুষ বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু ত্যাগের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার মত ত্যাগীপুরুষ খুজিয়া পাওয়া দুস্কর। দারুণ গ্রীষ্মে তিনি প্রজ্বলিত হোমানলের সম্মুখে বসিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতেন। বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ভীষণ উত্তাপ সহ্য করিয়াও মহাযোগী মহাপুরশ্চরণে বসিয়া যাইতেন। তখন সেই তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ গৌরকান্তি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বারানসীধামে "আম্বাড়ীয়া সত্র"। এই সত্রের জন্য তিনি দশ সহস্র মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি তৎকালোচিত বহু কুলকার্য্য করিয়াছিলেন। খড়দহ মেলের রত্নেশ্বরের সন্তান ঢাকা জেলার রাজদিয়া গ্রামবাসী ৺নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী দেবীর পরিণয় হয়। ফুলিয়া মেলের বৃন্দাবনের সন্তান মহাদেবপুর নিবাসী ৺তারক চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তদীয় মধ্যমা কন্যা ৺দক্ষিণাকালী দেবীর বিবাহ হয়।

৺কালীচন্দ্র চৌধুরী।

কাশীধামে আম্বাড়ীয়া সত্র।

কুলকার্য্য

ফুলিয়া মেলের সীতারামের সন্তান কাইচাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তদীয় কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীযুক্তা বরদাসুন্দরী দেবীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৺কালীচন্দ্রের দুই সহধর্ম্মিনী। প্রথমা স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয়া শশীমুখী দেবী মহাশয়া। দ্বিতীয়া পুণ্যবতী শ্রীযুক্তা হরদুর্গা দেবী মহাশয়া।

পত্নীদ্বয়। ৺শশীমুখী দেবীসাক্ষাৎ দেবীই ছিলেন, রূপে, গুণে তাঁহার তুল্য রমণী দুর্লভ। কি দানে, কি ব্যবহারে, কি পরদুঃখ-মোচনে তাঁহার তুলনা নাই। দীর্ঘ সপ্ততিবর্ষকাল তিনি এই সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন; আকাঙ্ক্ষার অতীত করিয়া তিনি প্রার্থীকে দু'হাতে সব বিলাইয়াছেন, তবুও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তাঁহার মনে হইত কেহ কিছু পায় নাই; অমন দয়াবতী আর হয় না। শেষ জীবনে তিনি শ্বাসকাশে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন, দৃষ্টিশক্তিরও হ্রাস হইয়াছিল, সে অবস্থায়ও তাঁহার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য কেহ দেখে নাই; সকলের অভিযোগ, প্রার্থনা তিনি অম্লানচিত্তে সমভাবে শুনিয়াছেন, সমভাবে তাহার প্রতিকার করিয়াছেন। গরীবদুঃখীর অভাব অভিযোগ শুনিলে তাঁহার প্রাণ গলিয়া যাইত। তিনি তাহাদের দুঃখমোচনে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অভাবে কত নরনারী মাতৃহারা হইয়াছে। আজীবন জপতপ ও পূজাদিতে তিনি সমস্ত দিন রত থাকিতেন। বার্দ্ধক্যের জড়তা ও নিদারুণ রোগের পীড়নেও তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই।

আজ কয়েকবৎসর হইল তিনি ৺বারানশীধামে চির আকাঙ্ক্ষিত মোক্ষলাভ করিয়াছেন; তাঁহার পূণ্য দেহ পূণ্যভূমিতে ৺বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার অভাব সাধারেণে মায়ের অভাব মনে করিয়া কাঁদিয়াছে ও এখনও কাঁদিতেছে।

তারপর দ্বিতীয়া পত্নী হরদুর্গা দেবী মহাশয়া; ইনিও সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা; পূজা, সন্ধ্যা জপাদিতে ইনি সদা নিবিষ্ট থাকেন। দান, ধ্যান, ব্রত ইঁহার নিত্যকার্য্য। ইনি বালবিধবা। যখন ৺কালীচন্দ্র চল্লিশবৎসর বয়সে নানাতীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া ৺কাশীধামে

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী।

গমন করেন, তখন পত্নী হরদুর্গা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সাধক কালীচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া ৺কাশী গমন করেন এবং তথায় ৺বিশ্বনাথের চরণে অকালে চল্লিশবৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ৺কালীচন্দ্র তাঁহার নাবালক পুত্র হেমচন্দ্রের অভিভাবকরূপে হরদুর্গা দেবীকে সর্ব্বময় কর্ত্রী করিয়া যান। ৺কালীচন্দ্রের স্বর্গ গমনের সঙ্গে সঙ্গে কুচক্রীর দল বন্ধু সাজিয়া আসিয়া হরদুর্গা দেবীকে ঘিরিয়া বসিল, কিন্তু কি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা! কি ধর্ম্মভীরুতা! কেহই তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। তিনি যক্ষের মত আগুলিয়া নাবালকের বিস্তীর্ণ সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিষয় তাঁহাকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটী আদর্শ ঘটনা; ইহা তাঁহাকে এই পরিবারে বংশানুক্রমে স্মরণীয়া করিয়া রাখিবে।

৺কালীচন্দ্রের আর একটী অক্ষয় কীর্ত্তি ময়মনসিংহ হাডিঞ্জ স্কুল। তিনি আজীবন শিক্ষাবিস্তার কল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন; এই বিদ্যালয়টীর বাটী নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ই তিনি নিজে বহন করিয়াছিলেন।

সাধক কালীচন্দ্র সাধনার স্বর্গ ৺বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার চরণতলে তাঁহার আজীবনের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তখন

হেমচন্দ্রের বাল্যজীবন

হেমচন্দ্র নাবালক। চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল চক্রীর চক্রজাল। এমনই সময়ে একজন উদ্যোগী পরমাত্মীয় তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ৺নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভগ্নীপতি; ৺নীলকান্ত নিজে সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। হেমচন্দ্রের ভাগ্যে ও নীলকান্তের কঠোর পরিশ্রমের ফলে সর্ব্বত্রই উন্নতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। আজিও সেই শুভানুধ্যায়ী কর্ম্মবীর ৺নীলকান্তের নাম এই জমিদারের পরিবার পরিজন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন।

হেমচন্দ্র অতি শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় স্কুল কলেজে থাকিয়া বিশেষ লেখাপড়া করিতে পারেন নাই। যে বৎসর তাঁহার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কথা, বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ও নাবালক বলিয়া সেই বৎসরই হেমচন্দ্রকে তাঁহার স্নেহপরবশ আত্মীয়গণ আর বিদেশে রাখা সমীচীন মনে করিলেন না। সে অনেক দিনের কথা, ঘরে ঘরে তখন শিক্ষার আদর ততটা ক্ষিপ্রগতিতে বিস্তার লাভ করে নাই,—কিন্তু বাড়ীতে বসিয়াও তিনি বেশ পড়াশুনা করিয়াছেন। অনেক ইংরেজী পুস্তক পড়িয়াছেন, অনেক প্রচলিত ইংরেজী পড়িয়াছেন। চর্চ্চা না থাকিলে বিদ্যা হ্রাস হয়,—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সহিত অতি সুন্দররূপে আলাপ করিতে পারেন। শৈশবে তিনি একখানা উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বই প্রায় সবটাই পড়িয়াছিলেন—তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা এতই প্রবল ছিল। Botany পড়ার পর বৈদেশিক যন্ত্রপাতি লাঙ্গল প্রভৃতি আনিয়াও সবল অশ্ব মহিষাদি দ্বারা স্বীয় পুরাতনবাটী আম্বাড়ীয়াতে দশ সহস্রমুদ্রা ব্যয়ে ও নিজের ঐকান্তিক আগ্রহে বর্ত্তমানকালোচিত বৈজ্ঞানিক নূতন উপায়ে কৃষিকার্য্যের তিনি সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও কৃষকদিগের কল্যাণকামী হইয়াই তিনি এই মহৎকার্য্যে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ব্রতী হইয়াছিলেন। এতদিন পূর্ব্বে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীতে ভূকর্ষণ প্রণালী তাঁহার মৌলিকত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যানুরাগ।

ইনি দেশীয় শিল্পোন্নতির জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন; গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর হইতে কুম্ভকার এবং ফরাসডাঙ্গা হইতে তাঁতি লইয়া যাইয়া নিজ গ্রামের কুম্ভকার এবং তাঁতিদের উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি কেবল ইংরাজী পুস্তক পড়িয়াই নিবৃত্ত হন নাই, বাল্যকাল হইতেই তিনি আর্য্যমতের অনুরাগী। সংস্কৃত পুস্তক—বিশেষতঃ ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিতে এই বৃদ্ধবয়সেও তাহার যেরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ দেখা যায় অনেক যুবকেরও তাহা কম অনুভূত হয়। যখন কম্বলাসনে বসিয়া তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের নিয়মপদ্ধতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ গীতা, মনু, দেবীচণ্ডী, তন্ত্র ও পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন তখন কে না বুঝিবে যে একটী স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কধর্ম্ম জগতে নিজের পরিপূর্ণ আনন্দ লইয়া এই ধূলি ও কর্দ্দমাক্ত সংসারে বিচরণ করিতে-ছেন। পারিবারিক বিপদেও তিনি তাঁহার যজ্ঞকুণ্ডলীর সম্মুখে যোগাসন ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রকৃত ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়া-ছেন। কালের কুটিলগর্ভে ময়মনসিংহের এই আদর্শচরিত্রের যবনিকা পাত হইলে যে আর দ্বিতীয়টী থাকিবে না তাহা বিন্দুমাত্রও অতিশয়োক্তি নহে। হেমচন্দ্র চিরদিনই বিদ্যোৎসাহী। অনেক আত্মীয় বিদ্যার্থীকে ও প্রার্থী ছাত্রকে তিনি বিমুখ করেন নাই; অনেকের অনেক সাহায্য করিয়া বিদ্যার্জ্জনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। নিজ বাড়ীতেও তিনি বহু গরীব আত্মীয়কে রাখিয়া থাকেন ও তাহাদের অন্নবস্ত্র এবং পড়িবার যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়া থাকেন।

কর্ম্মজীবন।

হিন্দুর পারিবারিক জীবনের বৃহৎপরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তার ঠিক যেমনটী হওয়া দরকার ইনি ঠিক তাহাই। এমন সহিষ্ণু, ক্ষমাবান ও সম্পূর্ণ নিরহংকারী পুরুষ আজকাল কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজের ভাবনার চেয়ে পরের ভাবনাই বেশী ভাবেন; পরের অভাব অভিযোগ, দুঃখমোচনের প্রতি তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ দৃষ্ট

হয়। দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের অভাব মোচনের জন্ত তিনি সাধ্যমত সাহায্য করেন। বহু কন্তাদায়, পিতৃমাতৃদায় ও ঋণদায়গ্রস্থ নিকট ও দূর আত্মীয় স্বজনকে তিনি দায়মুক্ত করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার এই সব দানকার্য্য অতি গোপনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। "নাম" অপেক্ষা তিনি "কার্য্যই" বেশী পছন্দ করেন। কেবল যে তিনি দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের দায়মোচন ও তাহাদিগকে দান বিতরণ করেন তাহা নহে, এতদ্ব্যতীত দুঃখী, কাঙ্গালীদের অন্নবস্ত্রাদি বিতরণ তাঁহার নিত্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য। তাঁহার আতিথেয়তার জাজ্বল্যমান নিদর্শনস্বরূপ হেমনগরের অতিথিশালা, নিত্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর নানাজাতির যথাভিপ্রেত আহার বাসস্থান যোগাইতেছে। তাঁহাদের কোন ক্রমে কোন ত্রুটি না হয় তজ্জন্য কর্ম্মচারী ও ভৃত্যনিযুক্ত আছে। ইহা ছাড়া তাঁহার সাধারণ দান (Public Donation) অনেক আছে। তাহার মোটামুটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাহা আমরা জানি, তাহা ইহার শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

পিতৃভক্তি।

হেমচন্দ্র যখন নাবালক, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত হেমচন্দ্রকে পৈত্রিকনিবাস আধাড়ীয়া ত্যাগ করিয়া স্ুবর্ণখালি নামক স্থানে আসিয়া নূতন আবাস স্থাপন করিতে হয়। সেখানে কিছুদিন বাস করিবার পর যমুনানদী স্ুবর্ণখালি গ্রাস করে; তৎপর বর্ত্তমানে ইঁহারা সপরিবারে "হেমনগর" আসিয়া বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে অবশ্য এই গ্রামের নাম হেমনগর ছিল না; হেমনগর নাম হেমচন্দ্রের নামানুসারেই হইয়াছে। সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পিতার কীর্ত্তিনিচয় আধাড়ীয়ার তৃণখণ্ডও তিনি স্থানচ্যুত বা হতশ্রী হইতে দেন নাই। ইষ্টকাবাস, পুকুরঘাট, দেবালয়, উদ্যান সব তিনি সুসংস্কৃত করিয়া পিতার কীর্ত্তি দেদীপ্যমান রাখিয়াছেন। সেখানে

সাংবাৎসরিক ক্রিয়াকাণ্ড যাহা পিতার প্রচলিত ছিল, তাহা ঠিক সমভাবে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পিতার শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি ৺কাশীধামে "আম্বাড়ীয়া ছত্র" যাহা হেমচন্দ্রের সাধক পিতা ৺কালীচন্দ্র মাত্র সূচনা করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, পিতৃভক্ত হেমচন্দ্র পিতৃসত্যরক্ষাকল্পে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সেখানে প্রকাণ্ড বাটি নির্ম্মাণ ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন; সেখানে শত শত লোকের নিত্য আহারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও পিতার নামে, পিতার প্রসঙ্গে, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়, কণ্ঠ বাক্রুদ্ধ হয়—অনাবিল পবিত্র পিতৃভক্তির উৎস তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, যেন কি একটা স্বর্গীয় স্পন্দন জাগাইয়া তোলে।

হেমচন্দ্রের মাতৃভক্তি অসাধারণ, অনুকরণীয়, দ্রষ্টব্য ও উল্লেখযোগ্য।

মাতৃভক্তি।

মায়ের কাছে তিনি যেন শিশুটীর মত। নিত্য মায়ের চরণ বন্দনা করা, সেবার কোন ত্রুটি না হয় এ সব লক্ষ্য করা, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ।

হেমচন্দ্রের দুই জননী, উভয়ের মধ্যে পরস্পর সহোদরার মত ভালবাসা ছিল—কেহই কাহারও অজ্ঞাতে কিছু করিতেন না। জ্যেষ্ঠা শশিমুখী হেমচন্দ্রের গর্ভধারিণী, তিনি আজ ৩।৪ বৎসর হইল স্বর্গগত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বিমাতা হরদুর্গা হেমচন্দ্রের মাতার স্থান অধিকার করিয়াছেন। হরদুর্গা যদিও বিমাতা, কিন্তু সাধারণ কেহ হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না যে ইনি বিমাতা। উভয় মাতাই হেমচন্দ্রের দৃষ্টিতে তুল্য। হেমচন্দ্রের বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় এই হরদুর্গার নামে উৎসৃষ্ট; নিত্য শত শত রোগী ইহার প্রসাদে ঔষধ পাইয়া বাঁচিতেছে ও আশীর্ব্বাদ করিতেছে। আর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নিজ গর্ভধারিণী স্বর্গীয়া শশিমুখী দেবীর নামে অভিহিত হইয়াছে। সংসারের বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই হেমচন্দ্র মাতাদের অভিমত ছাড়া

করেন নাই ও করেন না। নিজ গর্ভধারিণীর অভাব হইয়াছে আজ ৩।৪ বৎসর। কিন্তু মায়ের সাধক হেমচন্দ্র আজ পর্য্যন্তও মাতৃহারা অনাথ শিশুর মত মায়ের জন্য অনেক সময় অশ্রুত্যাগ করেন। শয্যা-পার্শ্বে মায়ের সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি লম্বিত রহিয়াছে, প্রতিদিন প্রাতে সর্ব্বাগ্রে মায়ের চরণে আভূমি প্রণত হন, তাহার পর তাঁহার অন্য কার্য্য। তাঁহার মত এমন মাতৃভক্ত এ যুগে কেহ আছেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই।

শুধু বিমাতা কেন, গুরুজনে ভক্তি তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় আত্মীয়া মাত্রকেই তিনি যেরূপ আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, সেরূপ আজকালকার পার্থিবতার যুগে দুর্লভ।

হেমচন্দ্রের বিস্তৃত জমিদারীর আমলা কর্ম্মচারী অধিকাংশই তাঁহার আত্মীয়স্বজন। যোগ্যতানুযায়ী তিনি সকলকে এক একটি কাজ দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন।

বিভিন্ন গুণাবলী।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকের সম্ভবমত "বার্ষিকের"ও বন্দোবস্ত আছে; অধিকন্তু তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ডেও সম্ভবমত সাহায্য করেন। এই বার্ষিক যে কেবল তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজনকেই দেন তাহা নহে, দেশ বিদেশস্থ দুঃস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী, পণ্ডিতমণ্ডলীর গুণানুসারে ১৲ ২৲ ৪৲ ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিকের ব্যবস্থা আছে। ইহার "বার্ষিক" দানের মোট সমষ্টি সংখ্যা নিতান্ত অল্প নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণকর্ম্মচারীবৃন্দ অনেককেই তিনি নিজ বাটীতে রাখিয়াছেন। পাছে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহাদের আহারাদির কোনও অযত্ন হয় এজন্য তিনি তাহাদিগকে লইয়া প্রত্যহ দু'বেলা সম্পূর্ণ একরূপ আহার করেন এবং বাটীস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ কেহ অসুস্থ হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহার তদারক করিয়া থাকেন। তিনি বস্তুতঃ এ মহৎগুণের অধিকারী। হেমচন্দ্রের ক্ষমাগুণ যথেষ্ট। অধীনস্থ যে কেহ গুরুতর অপরাধ করিয়াও যদি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আশ্রয়-

প্রার্থী হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ষমা করেন। অপরাধের গুরুত্ব মনে করিয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত বা গুরুতর শাস্তি দান করেন না। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটী উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব; এইজন্যই পূর্ব্ববঙ্গবাসী মাত্রে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট শ্রদ্ধা-নত হয়। হেমচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি অনন্যসাধারণ। যাহা একবার দেখেন বা শুনেন তাহা তিনি সহজে বিস্মৃত হন না। বৈষয়িক কাজকর্ম্মেও তিনি বিশেষ দক্ষ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি ৺নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত থাকিতে তাঁহার উপরই জমিদারীর সমস্ত কাজ কর্ম্মের ভার ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এবং তদ্ভিন্ন আরও অনেক সময় তিনি স্বয়ং সমস্ত বিভাগের কাজকর্ম্ম সুদক্ষভাবে চালাইয়াছেন। জমিদারী বিভাগের সমস্ত কাজ কর্ম্মই তাঁহার বিশেষ জানা আছে। এই বিশাল জমিদারীর কোথায় কোন্ মহাল তাহা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে যেন স্পষ্ট প্রতীয়মান থাকে। কার্য্যোপলক্ষে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

পৈত্রিক সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি যাহা পাইয়াছিলেন, নিজ অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে তাহা অপেক্ষা প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার বাৎসরিক আয়ের বিত্ত সম্পত্তি তিনি নিজের জীবনে বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কৃতিত্ব ও ভাগ্যের যথেষ্ট পরিচায়ক, কাজেই এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। পাছে তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত হয় এজন্য প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি বৈষয়িক জীবন হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক মার্গে লিপ্ত আছেন।

ইঁহার অনেক মুসলমান প্রজা আছে, তাহাদের ধর্ম্মের মর্য্যাদা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। পুরাতন বাটী আম্বাড়ীয়াতে "পীরের দরগা" আছে, উহার প্রতি হেমচন্দ্রের স্বর্গীয় পিতা কালীচন্দ্র যেমন সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন,

হেমচন্দ্রও উহার সম্মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেন নাই; বরং উহার সুবিধা সুযোগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জেও ইহার বড় কাছারী আছে, সেখানে প্রতিবৎসর শুভ পুণ্যাহের প্রথম দিনের টাকা হইতে "পীরের দরগায়"; সিন্নি দেওয়া হয়। এই দুই দরগার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি কিছু ভূসম্পত্তিও দান করিয়াছেন। প্রতিবৎসর হেমচন্দ্রের নিজবাড়ীতে রোজাকারী মুসলমানদিগকে এক বিরাট ভোজ দেওয়া হয়। ইহার অধীনস্থ জুম্মা মসজিদের পবিত্র স্থানগুলি "লাখরাজ" করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিজের বাটীর স্কুলের মুসলমান ছেলেদের মিলাদশরিফ পাঠ ও তৎসংক্রান্ত সভাসমিতিতে যোগদান ও উৎসাহ প্রদান, সাদরে সভাপতিত্ব গ্রহণ এবং ইসলামধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করা ইহাঁর মহামনার পরিচায়ক। নিজের এষ্টেটে কোন কোন স্থানে মুসলমান কার্য্যকারক আমলাও আছেন।

একদিনের একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না;—একদিন হেমচন্দ্র বর্ষাকালে মোটরবোটে পরিভ্রমণ কালে কোন বিশিষ্ট মুসলমান প্রজার বাড়ীতে নগ্নপদে মসজিতে নিজ মন্দিরের মত সম্মান দেখাইয়া প্রবেশ করেন ও বলেন, মুসলমানের ধর্ম্মস্থান হইলেও হিন্দুর পক্ষে উহা নিজ পবিত্র স্থানের মতই মনে করিতে হইবে।

তারপর আর একটী ইহার উদার গুণ এই যে ৺বিজয়া দশমীর দশহরার দিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর এষ্টেটের এবং গ্রামের যাবতীয় কর্ম্মচারী হিন্দু ও মুসলমান প্রজা ইত্যাদিকে আলিঙ্গন দান করিয়া থাকেন। একদিকে যেমন তিনি হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ, অন্যদিকে অপর ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এরূপ সহানুভূতি তাঁহারই উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিতেছে। অতিশয়োক্তি আমরা করিতে চাহি না। প্রাচীন যুগের ক্রিয়ান্বিত যাজ্ঞিক

ব্রাহ্মণ যদি খুঁজিতে হয়—সর্ব্বদা বিষয়ভাণ্ডারের মধ্যে থাকিয়াও তাহাতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ত্রেতার রাজর্ষি জনকের চিত্র যদি দেখিতে হয়, তবে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের অতিদূরে হেমনগরের শান্ত পল্লীর নীরবসাধক হেমচন্দ্রের জীবনেই যে তাহা সর্ব্বাগ্রে খুঁজিতে হইবে ইহা অকাট্য সত্য।

হেমচন্দ্র অতীব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—ইহা বাস্তবিক এতদ্দেশে প্রবাদের মত রাষ্ট্র। যখন দ্বারভাঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ পূর্ব্ববঙ্গের বিরাট ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হইয়া ময়মনসিংহে আগমন করিয়াছিলেন, তখন ময়মনসিংহস্থ অনেক সুরম্য প্রাসাদে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু ক্রিয়ান্বিত নৈষ্ঠিক মহারাজাধিরাজ দ্বারভাঙ্গাধিপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠাবান হেমচন্দ্রের ময়মনসিংহস্থ আলয়েই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আনন্দের সহিত ইহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে হেমচন্দ্রের ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত আধুনিক কালের শিক্ষা বা নিয়ম যাহা সত্যিকার ভাবে কল্যাণকর, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও কুসংস্কার নাই। প্রাচীন ও আধুনিক যাহা ভাল তাহা বাস্তবিকই তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। এতটা ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত তাঁহার এতটা উদারতা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে তাঁহার বাড়ীর পরিজনবর্গ প্রতিবৎসর "হেমনগর হিতৈষী" নামক যে পারিবারিক পত্রিকাখানি বাহির করেন, তাহাতে অনেক সময় তাঁহার ভগ্নী, কন্যা ও পুত্রবধূগণ কবিতা বা প্রবন্ধ দিয়া থাকেন। সে সব পারিবারিক পত্রিকাতে মুদ্রন করিতে তিনি কোনও আপত্তি করেন না; বরং তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীযুক্তা বরদাসুন্দরী দেবীর লিখিত কবিতাগুলি তিনি নিজে বিশেষ আগ্রহের সহিত পাণ্ডুলিপি সংশোধন

করিয়া পুস্তকাকারে "কবিতা কুসুম" নাম দিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন। ভগ্নীর কবিতারচনায় উৎসাহদানের জন্যই তিনি ইহা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ সেকেলে আচার নিয়ম পালনকারী পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তার পক্ষে স্ত্রীলোকদিগের সাহিত্য চর্চ্চার উৎসাহ প্রদান যে তাঁহার উদারতা ও বিদ্যানুরাগের পরিচায়ক তাহা সুধীবৃন্দকে বলাই বাহুল্য।

হেমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট,—সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান। ক্রিয়াকাণ্ডোপলক্ষে যখন তাঁহার বাটীতে নানা দিগ্‌দেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাবেশ হয় তখন তিনি তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেন।

হেমচন্দ্রের কবিত্বশক্তিরও সন্ধান আমরা জানি; তাঁহার স্বরচিত অনেক পুস্তক আছে যাহা সাধারণে অজ্ঞাত। তিনি কোন কিছু প্রচারের বাসনা করিয়া লেখেন নাই, খেয়ালের বশে লিখিয়া গিয়াছেন, নীরব কর্ম্মী তিনি, নিজের বিজ্ঞাপন বাজারে যাচাই করিবার প্রত্যাশা তাঁহার নাই। তাঁহার সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগও যথেষ্ট, নিজে সুকণ্ঠ ও সুকবি। তাঁহার একটী সঙ্গীত সাধারণের গোচরার্থ প্রচার করিলাম—ইহা হইতে তাঁহার ভাষা ও ভাবমাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত গানটী তাঁহার রচিত, তাঁহার আরও অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান আছে, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহার প্রথম বয়সের রচিত অসংখ্য গানের মধ্যে এই একটী গানই তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১)

হে দয়াল হরি কর করুণা
ভবে অগতির গতি——তুমি হে শ্রীপতি
আর্ত্তবন্ধু বলি আছে ঘোষণা।

(২)

আমার মনোমত্তকরী অবাধ্য সদাই
মম বশ সে তো হয় না ;
সে যে বিষয় কান্তারে, বিমুগ্ধ অন্তরে
ঘুরে মরে হরি পদে ধায় না।

(৩)

হরি করেছি প্রতিজ্ঞা ভজিব তোমায়
জঠরে পাইয়ে যাতনা
এখন আসিয়ে ধরায় জড়িয়ে মায়ায়
ভুলিনু তোমায় নাহি চেতনা।

(৪)

গত শৈশব কৈশোর খেলা রঙ্গরসে
(এখন) যৌবনে বিলাস বাসনা,
ক্রমে গত হয় দিন, আয়ু হয় ক্ষীণ
তবু হরি নাহি বলে রসনা।

(৫)

আমি শুনিয়াছি হরি বসিয়া হৃদয়ে
তুমি কর জীবের চালনা,
(হরিহে) আমায় করুণা বিতর, কুমতি সংহর
তব পদে মতি দেহ কামনা॥

হেমচন্দ্র কোনদিনই সুখবিলাসী নহেন, সামর্থ্য থাকিতেও তিনি কষ্টসহিষ্ণু, নিজের শরীরের সুখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আদৌ নাই। বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না। বেশ পারিপাট্যে এমন কোন স্বাতন্ত্র্য নাই যাহাতে তাঁহাকে বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। তবে

তাঁহার ঐ হেমকান্তি, ব্রহ্মচারীর মত অঙ্গের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ, তার উপর ঐ রাজচক্রবর্ত্তীর মত লক্ষণনিচয় যেন স্পষ্ট বলিয়া দেয় ঐ "হেমচন্দ্র"। তাঁহাকে দেখিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন—

"ব্যূঢোরস্কঃ বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্ম্মহাভূজ
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষত্রধর্ম্মইবাশ্রিত"

তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যান্য অধিকাংশ জমিদারদের মত বাড়ী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ভোগ বিলাসে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন, কিন্তু তা তিনি করেন না,—প্রজা ও সাধারণের অভাব অভিযোগ দূর করিবার মানসে সর্ব্বদাই বাটীতে অবস্থিতি করেন। তিনি কিরূপ প্রজাবৎসল তাহা নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট অবলোকনার পাঠেই জানা যায়।

CERTIFICATE.

Presented to Babu Hem Chandra Chowdhury of Ambaria, Mymensingh in the name of the Empress of India. June 20th 1897.

TRUE COPY.

By command of His Excellency the Viceroy and Governor-General in Council, this Certificate is presented in the name of Her Most Gracious Majesty Queen Victoria, Empress of India, to Babu Hem Chandra Chowdhury, son of Babu Kali Chandra Chowdhury of Ambaria, Mymensingh Zemindar, in recognition of his liberal treatment on his tenants and charity to the poor during the present searcity.

Sd/ A. MACKENJEE,
LIEUTENANT GOVORNOR OF BENGAL,
June 20th, 1897.

শ্রীযুত হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী।

এখন আমরা ১২৯৯ সালের বিরাট ধর্ম্মযজ্ঞের প্রসঙ্গ,—যাহা হেমচন্দ্রকে চিরাদন অমর করিয়া রাখিবে, যাহার পবিত্র সুষমা ভারতের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, যাহা হেমচন্দ্রের জীবনের প্রধান কীর্ত্তি,—তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া হেমচন্দ্রের কথা শেষ করিব। ১২৯৯ সনে তিনি এক বিরাট ধর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। চারিমাস ব্যাপী "মহাভারত" পাঠ ও তৎসঙ্গে ধান্যাচল; ছয়শত মণ ধান্যের দুইটী বিরাট পাহাড় সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেকটী ধান্যের পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে রৌপ্যনির্ম্মিত প্রায় একহস্ত পরিমিত উচ্চ বেষ্টনী দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ ছিল এবং এইসব পর্ব্বতের উপরিভাগে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, ইন্দ্রলোক এবং দশাদক্‌পাল প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

ক্রিয়া কলাপ

স্বর্ণ ও রৌপ্যের দেবতা ও বৃক্ষাদি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রৌপ্যনির্ম্মিত বহু মুনিঋষির সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তৎকালীন ভারতের প্রায় সমুদয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ এ ব্যাপারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাভারত শ্রবণ করিবার জন্য শ্রোতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে বেণারশী জোড় এবং স্বর্ণনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত দ্বারা বরণ করা হইয়াছিল। বহু পয়স্বিনী সবৎসা গাভী দক্ষিণার জন্য প্রদান করা হইয়াছিল। কাশী প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও পণ্ডিতবর্গ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ দ্বারভাঙ্গাপতির দ্বারপণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয়ও দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু কাঙ্গালী সমবেত হইয়াছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দলে দলে কাঙ্গালীতে গ্রাম গ্রামান্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ষ্টীমার কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া এই সব কাঙ্গালীর জন্য বিশেষ জলযানের (Special Steamer) ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক কাঙ্গালীকে এক একটী ঘটী, এক একটী রৌপ্যমুদ্রা, একখানা করিয়া

ধনাত দান ও পরিতোষ পূর্ব্বক লুচি সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা ভোজন করান হইয়াছিল।

হেমচন্দ্রের গর্ভধারিণীর শ্রাদ্ধোপলক্ষেও কাঙ্গালী বিদায় ও কাঙ্গালী ভোজন প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু মহাভারতের মত এমন মহাসমারোহের সহিত নহে।

হেমচন্দ্র তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতে ইচ্ছুক নহেন, এই পারিবারিক ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিবার কথা তিনি অবগত নহেন, ইহা একেবারে তাঁহার অমতে ও অজ্ঞাতসারেই সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল।

হেমচন্দ্রের পুরাতন বাটী আম্বাড়ীয়াতে ও বর্ত্তমান নিবাসবাড়ী হেমনগরে বাৎসরিক শাস্ত্রীয় যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড সমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার প্রায় অধিকাংশ ব্যাপারে গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ নিমন্ত্রিত হয়।

হেমচন্দ্রের তিন ভগ্নী তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেককে ইনি প্রচুর পরিমাণে সম্পত্তি দিয়া নিজ গ্রামে নিজবাটীর পার্শ্বে প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

নিজের কন্যাদের প্রত্যেককে তিনি বিখ্যাত কুলীনদের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন নিজের ছয়ভাগ্নিদেরও ছয়জন বিশিষ্ট কুলীনের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক অনেক বৃহৎ কুলকার্য্যের জন্য বিক্রমপুর প্রমুখ সমাজের কুলীন ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র মনে করিয়া আন্তরিক ভক্তি করেন।

হেমচন্দ্র দুই বিবাহ করিয়াছেন, প্রথমাপত্নী ৺চিন্তাময়ী দেবী বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে মুঙ্গেরে গঙ্গাতীরে স্বজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। ৺চিন্তাময়ী দেবী সাক্ষাৎ দেবীই ছিলেন,

শ্রীযুত গঙ্গেশচন্দ্র চৌধুরী

তাঁহার গুণের তুলনা ছিল না; সেই অল্প বয়সেই তাঁহার যথেষ্ট গুণগরিমা পরিবারের সকলের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে হেমচন্দ্র প্রথম জীবনের সেই প্রথম আঘাতে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎপরে সে শোকের বেগ প্রশমিত হইলে স্বদীয় অভিভাবক ও হিতৈষিগণ তাঁহাকে আবার বিবাহ করান। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম শ্রীযুক্তা ক্ষীরদাসুন্দরী দেবী। ইনিই এখন বর্ত্তমান। ইনিও দেবীস্বরূপা, দেবতার ভাগ্যেই দেবী জুটিয়া থাকে, ইনি পূর্ণ লক্ষ্মী। ভগবতীর মত ইঁহার দিব্যকান্তি, দয়ার প্রস্রবণ ইঁহার দু'হাতে সর্ব্বদা ঝরিতেছে। ইনি এমন শান্তিময়ী ও পুণ্যবতী যে ইঁহার সুব্যবস্থায় সংসারে কোন অশান্তি নাই; পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও জামাতাদিগের প্রতি ইঁহার সমদৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী প্রভৃতি সকলকে সুমিষ্ট ব্যবহারে ইনি কিনিয়া ফেলিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণ ইঁহার ব্যবহারে আন্তরিক সুখী। উপযুক্ত শাশুড়ীর উপযুক্ত বধূ। আজিও ছোট শাশুড়ী হরদুর্গাদেবী বর্ত্তমান, তাঁহার নিকট ইনি আজিও সেই ছোট, বিনম্রা বধূটির মত থাকেন; রন্ধন করিয়া খাওয়ান ও সেবা শুশ্রূষা করেন, তিনি বিনয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমা, মুখে উচ্চ কথাটি কেহ কোনদিন শুনে নাই। ইনি সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারিতেন ও পারেন; কিন্তু ইনি চিরদিন "তৃণাদপি সুনীচেন" হইয়াই কাটাইয়াছেন ও কাটাইতেছেন। বসুন্ধরার মত অনন্ত সাধারণ সহগুণ ইঁহার স্বভাবগত। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে ইনি সর্ব্বাংশেই ইঁহার শাশুড়ীর উপযুক্ত বধূ, স্বামীর উপযুক্ত পত্নী। এমন না হইলে কি বড় হয়! বড় এই জন্যই বড়, কারণ সে ছোট হয় বলিয়া।

হেমচন্দ্রের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র চৌধুরী বি, এ

পুত্রচতুষ্টয়। মহাশয় চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে ময়মনসিংহ জেলাস্কুল হইতে বিদায় লইয়া বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময় মধ্যে আলোকচিত্রবিদ্যা (Photography), যাদুবিদ্যা (Magic) সঙ্গীত বিদ্যায় (Music) বিশেষ পারদর্শী হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণ শিক্ষা তাঁহার প্রাণে সদাই একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করিত। তাই ত্রিংশবর্ষ বয়সে নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আই, এ ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ উপাধি লাভ করেন। তাঁহার এই অসাধারণ ধৈর্য্য অতীব প্রশংসনীয়। যে কয়েকটি আলেখ্য এতৎসঙ্গে সংযোজিত হইল তাহা সমস্তই তাঁহার নিজ হাতে তোলা।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চৌধুরী বি, এ মহাশয়। ইঁহার জ্ঞান স্পৃহা অতীব প্রবল, ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া ইনি বি, এ পাশ করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার জ্ঞানলাভের পিপাসার শান্তি হয় নাই, এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া ইনি এখনও আইন পড়িতেছেন। ইঁহার প্রকাশ্যসভায় বক্তৃতা করার ও প্রবন্ধ লিখিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। ইনিই এই বংশে সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পড়াশুনায় বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই; ইনি আই, এ পড়িতেছেন। ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে ইঁহার খুব আগ্রহ আছে। আহত ও রোগীর শুশ্রূষারূপ একটা মহৎগুণের ইনি অধিকারী। ইনি অতীব নাট্যকলাকুশল। ইঁহাদের বাটীতে বৎসর বৎসর প্রায়ই নাটকা ভিনয় হয়। তাহাতে তাঁহার নাট্যপ্রতিভার অভিব্যক্তি অতীব মনোমুগ্ধকর হইয়া থাকে।

চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী বি, এ মহাশয়। ইনিও অতিশয় জ্ঞানপিপাসু। ইঁহার বয়স অতি অল্প, এই অল্পবয়সেই ইনি

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র চৌধুরী

প্রেসিডেন্সি কলেজে এম, এ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এল অধ্যয়ন করিতেছেন। নাট্যকলায় ইঁহার ভ্রাতার ন্যায় ইনিও বিশেষ পারদর্শী। চাণক্যের ভূমিকায় ইনি যে প্রকার কুশলতা ও আধুনিক রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই কল্পনাতীত।

ইঁহাদের চারি ভ্রাতারই লিখিবার ও বলিবার শক্তি আছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার উৎসাহে ও অনুকরণে ইঁহারা প্রত্যেকেই আলোকচিত্র বিদ্যায় পারদর্শী। পিতার গুণ ইঁহারা অল্পাধিক সকলেই পাইয়াছেন। আচার-নিষ্ঠা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও ঔদার্য্য ইঁহাদের মজ্জাগত। ইঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যানুরাগী ; নিজেরা উৎসাহ করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রতিবৎসর "হেমনগর হিতৈষী" নামক এক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ক্ষুদ্র হইলেও পত্রিকাখানির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে বাহিরের ধারকরা লেখক লেখিকার প্রবন্ধাদি থাকে না। ইহা একেবারে খাঁটি পারিবারিক পত্রিকা যাহা আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালায় ছুটি আছে বলিয়া আমরা জানি না।

কন্যাচতুষ্টয়।

হেমচন্দ্রের চারি কন্যা, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ-কুলিনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। কন্যাদের প্রত্যেককেই ইনি প্রচুর সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দিয়াছেন। নিজ গ্রামেই ইঁহাদের বাড়ী করিয়া দিবার ইচ্ছা আছে।

ফরিদপুর জিলাস্থ নরিয়া গ্রাম নিবাসী ৺শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সুরবালা দেবীর পরিণয় হয়। ইনি ফুলিয়া মেলের বৃন্দাবনের সন্তান।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের সহিত তদীয় দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা কিরণবালা দেবীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইনি বগুড়া ও পাবনার অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায়

বাহাদুর গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় আই, এস, ও (I. S. O.) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শ্রীযুক্ত মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের সহিত হেমচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা দেবীর পরিণয় হয়। ইনি ঢাকা জেলাস্থ বিক্রমপুর পরগণার তন্তর গ্রাম নিবাসী ৺দুর্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র ও ৺জলধর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের সহিত তদীয় কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সুশীলাবালা দেবীর বিবাহ হয়। ইনি ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রোয়াইল গ্রাম নিবাসী ৺বিপিন চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ইনি খড়দহ মেলের আত্মারামের সন্তান।

দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

হেমচন্দ্র নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন—

১। "পিংনা" দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২৫০০৲

২। ময়মনসিংহে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল নির্ম্মাণ-কল্পে ৪০০০৲।

৩। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সৌধ নির্ম্মাণকল্পে ১২০০০৲।

৪। "পিংনা" উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের সৌধ নির্ম্মাণকল্পে ১০০০৲।

৫। গোপালপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণকল্পে যে জমি দান করা হয় উহার মূল্য ১৫০০৲

৬। ময়মনসিংহ, ঢাকা, পাবনা জেলায় সময় সময় যে চাঁদা দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ ১০০০০৲।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বি-এ।

৭। সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ এবং সপ্তম এড্ওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে; ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনাতে চাঁদা ৩০০০৲।

৮। ময়মনসিংহের Kirkwood বার লাইব্রেরীর নির্ম্মাণকল্পে ১০০০৲।

৯। ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ২০০৲।

১০। গোপালপুর বালিকা বিদ্যালয়ে ২৫০৲।

১১। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফণ্ডে ১০০০৲।

১২। সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের অভ্যর্থনার জন্য ৫০০৲।

১৩। টাঙ্গাইল "গ্রেশাম্" স্কুলে ১০০০৲।

১৪। ময়মনসিংহের পুরাতন হাসপাতালের সৌধ নির্ম্মাণকল্পে ১০০০৲।

১৫। বরিশাল "মূক বধির" বিদ্যালয়ে ২৫০৲।

১৬। ইং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় নিজ নিজ সৈন্য শ্রেণীর (The king's own Regiment) সপ্তদশ অশ্বারোহী (The 17th Cavalry) এবং দ্বাদশ অশ্বারোহী পল্টন (The 12th Cavalry) যখন ময়মনসিংহ জেলার নান্দিনা ও পিয়ারপুর গ্রামে ক্যাম্প করিয়াছিল তখন তিনি তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহনকল্পে দান করিয়াছিলেন ৪০০০৲।

১৭। সুদূর চট্টলে ৺চন্দ্রনাথ শৈলের দুর্গম পার্ব্বত্যপথে একটী লৌহসেতু নির্ম্মাণ জন্য ১০০০৲।

১৮। আম্বাড়ীয়াতে গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তাহার বাৎসরিক সমস্ত ব্যয় বহনকল্পে তিনি প্রতিবৎসর দেন ২১০০৲।

১৯। হেমনগরের দাতব্য চিকিৎসালয় রক্ষার জন্য প্রতি বৎসর ব্যয় ১৯০০৲

২০। যুদ্ধজয়ের দরুণ (Victoria Celebration) টাঙ্গাইল, জামালপুর ও হেমনগর যে ব্যয় হইয়াছিল ১০০০৲।

২১। Imperial Relief Fund (রাজকীয় মুক্তিফণ্ড) ১০০০৲।

ইহা ছাড়া তাঁহার আরও প্রচুর দান কার্য্য আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি সাধারণের অজ্ঞাতে গোপনে দান করিয়া থাকেন, কাজেই তাহা আমরা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আম্বাড়ীয়ার জমিদার বংশাবলী

ভট্টনারায়ণ

অধঃস্তন কয়েক পুরুষ পর পশ্চিম বঙ্গীয় কাঠাদিয়া গ্রাম নিবাসী

দাশরথি বন্দোপাধ্যায় (দাশু বাড়ুয্যে)

অধঃস্তন কয়েক পুরুষপর দুর্গাদাস ইনি নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। গোঁসাই দুর্গাপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন।

দুর্গাদাস

শিবরাম

অধঃস্তন কয়েক পুরুষপর

কালাচাঁদ

শ্রীনারায়ণ

রামশঙ্কর

গঙ্গারাম (নিঃসন্তান)

কৃষ্ণকিঙ্কর
রামগোপাল
জয়গোপাল
নিবাস সেন
পত্নী
কৃষ্ণচন্দ্র
অন্নপূর্ণাদেবী
নবকুমার
বাড়ী টাঙ্গাইল
যাদবচন্দ্র
পদ্মলোচন
পত্নী
ভগবতী দেবী
গোবিন্দকুমার
বনাম
কৈলাসচন্দ্র
যোগেন্দ্র
জ্যোতীশ
সতীশ, ক্ষিতীশ, পৃথ্বীশ, নরেশ, দেবেশ, ভবেশ, শৈলেশ
তিনকড়ি
মেঘনাদ
কালীচন্দ্র
পত্নী
শশীমুখী
হরদুর্গা
(নিঃসন্তান)
স্বর্ণময়ী
(কন্যা)
দক্ষিণাকালী
(কন্যা)
হেমচন্দ্র
পত্নী
বরদাসুন্দরী
(কন্যা)
৺চিন্তামযী
ক্ষীরোদাসুন্দরী
হেরম্ব
গণেশ
প্রফুল্ল
যোগেশ
সুরবালা
(কন্যা)
কিরণ
(কন্যা)
সুনীতি
(কন্যা)
হিমাংশু
(নিমাই)
শশাঙ্ক
(নিতাই)
কমলেশ
কুমারেশ
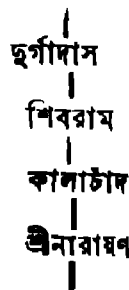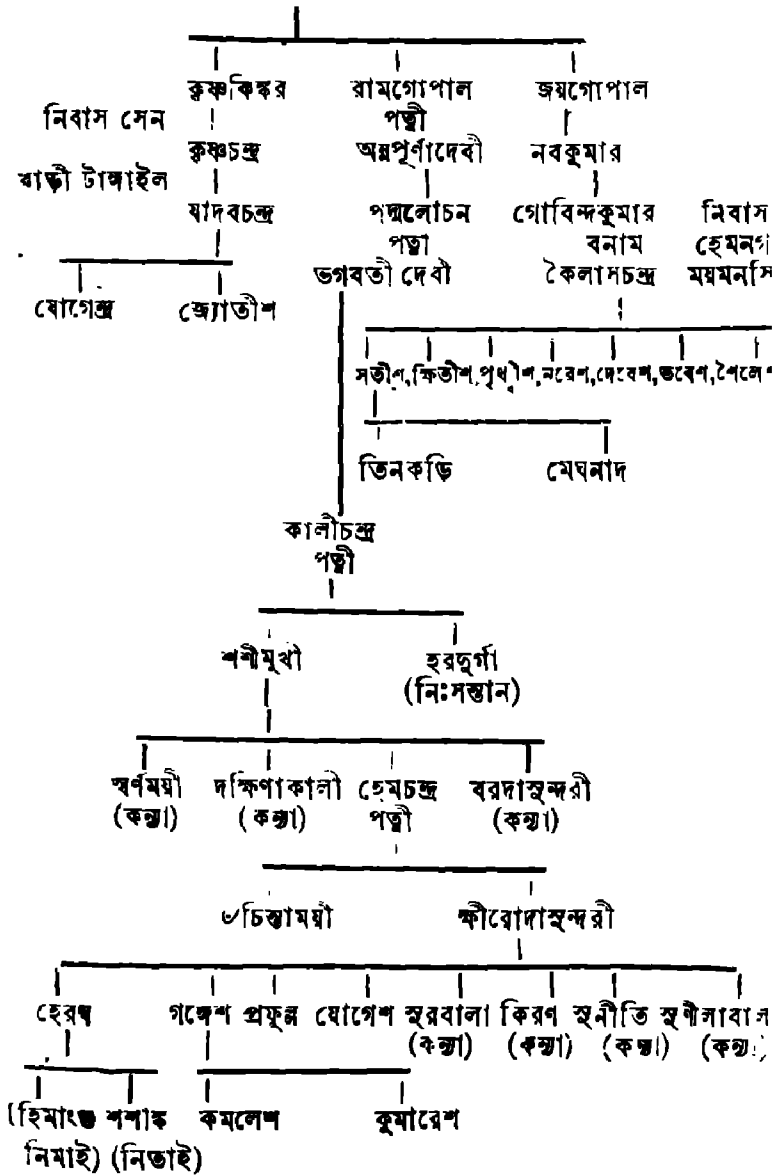
রামচন্দ্রপুর গুহ-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

—— :*: ——

রামচন্দ্রপুরের গুহগণ কান্যকুব্জাগত বিরাট গুহের প্রপৌত্র লক্ষ্মণ গুহের সন্তান। লক্ষ্মণ গুহের অধঃস্তন ষষ্ঠ অথবা বিরাট গুহ হইতে নবম এড়ু গুহ। ইঁহার সাত পুত্র। চতুর্থ কৃষ্ণ গুহ। ইঁহার ষোল পুত্র। দশম দৈত্যারি, দ্বাদশ শুক্লাম্বর, ত্রয়োদশ দশরথ। দৈত্যারি গুহ রামচন্দ্রপুর ও বিবনার গুহ বংশের ও দশরথ গুহ কাঁচাবালিয়ার গুহ বিশ্বাস বংশের আদি। শুক্লাম্বরের বংশধরগণ বর্ত্তমানে বরিশাল জেলায় কাশীপুর, জাগুরা, উমেদপুর ও বাইসারি গ্রামে বাস করিতেছেন। দৈত্যারি গুহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র অর্থাৎ বিরাট গুহ হইতে পঞ্চদশ শ্রীকৃষ্ণ গুহ। তৎপুত্র রূপনারায়ণ গুহ। দশরথ গুহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শিবদাস গুহ। শিবদাসের পৌত্র দেওয়ান রামভদ্র রায়, রায়পুরার রায় বংশের মূল। সুতরাং জ্ঞাতি সম্পর্কে রূপনারায়ণ রামভদ্রের খুল্লতাত হইতেন। রূপনারায়ণ গুহ পূর্ব্বে যশোহর জেলায় বাস করিতেন। কোন্ গ্রামে ঠিক করা যায় না।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কর্ত্তৃক যখন সুবা বাঙ্গালার রাজস্বের তৃতীয় বন্দোবস্ত হয়, তখন তদীয় কর্ম্মচারী নুরুল্লা খাঁ যশোহরে ফৌজদার নিযুক্ত হন। এড়ু গুহ এই বংশের সপ্তদশ। রামভদ্র রায় নুরুল্লার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ঐ বংশের ষোড়শ রূপনারায়ণ গুহ কাননগো নিযুক্ত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলায় প্রেরিত হন। ঐ কার্য্য

উপলক্ষে তিনি এই জেলায় অবস্থানকালীন পুনিহাটের হাজরা বংশের এক কন্যার পানিগ্রহণ করেন এবং যশোহরে আর না যাইয়া ঝালকাটী ষ্টেশনাধীন নাগপাড়া গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। তাঁহার সেই বসত বাড়ী অদ্যাপি "গুহের বাড়ী" বলিয়া খ্যাত আছে। নাগপাড়া গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল ও এখনও আছে, কিন্তু কোন কুলীন কায়স্থ সমাজ না থাকায় রূপনারায়ণ এই গ্রাম ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী কায়স্থ প্রধান বিক্না গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

রূপনারায়ণের তিন পুত্র—১ম মধুসূদন, ২য় রামজীবন ও ৩য় জনার্দ্দন। জ্যেষ্ঠ মধুসূদন রাঘব দাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া রামচন্দ্রপুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন; মধ্যম রামজীবন ও কনিষ্ঠ জনার্দ্দন বিক্নায় থাকেন। জনার্দ্দনের সন্ততিগণ এখন পর্য্যন্ত ঐ গ্রামেই আছেন। মধুসূদন ও জনার্দ্দনের বংশধরগণ মধ্যে কেহই সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিবার নাই।

রামজীবনের তিন পুত্র—১ম বিশ্বেশ্বর, ২য় কাশীশ্বর, ৩য় বাণেশ্বর। কাশীশ্বর গুহ চন্দ্রদ্বীপের রাজসরকারে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন ও রাজা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ঐ রাজষ্টেটে বাগ্‌পুর চাক্‌লার তহশীল কাছারী যে রামচন্দ্রপুর গ্রামে অবস্থিত ছিল, ঐ কাছারী বাড়ী নিজপুত্র রাজচন্দ্র গুহের নামে অতি অল্প জমায় মৌরসি পাট্টা লইয়া তিনি বিক্না ছাড়িয়া রামচন্দ্রপুর আসিয়া বাস করেন এবং কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরকে নিষ্কর বাটী দিয়া স্বগ্রামে তাঁহাদের বসতবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন ও নিজ বাটীতে ৺মনসা দেবী ও লক্ষ্মী নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। তৎকালে তিনি সমাজে একজন সমৃদ্ধিশালী গণ্য মান্য লোক ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী কাশীপুর বিল্লবাড়ীর রাজার দেওয়ান রামানন্দ বসুর কন্যা ৺করুণাময়ী তাঁহার সহগামিনী হন। তদীয় পুত্র রাজচন্দ্র গুহ তখন শৈশব অবস্থায় ছিলেন ও কুসংসর্গে পড়িয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহার অবস্থা এক সময় এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের সেবা চালাইতে নিজেকে অক্ষম মনে করিয়া তাহা হস্তান্তর করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং এই প্রবাদ আছে যে ঐ বিগ্রহ এই সময় তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করেন যে, আমাদিগকে হস্তান্তর করিও না, তোমার অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। ইহাতে তিনি ঐ বিগ্রহ হস্তান্তর করিতে ক্ষান্ত থাকেন এবং তাঁহার পুত্রগণের চেষ্টায় বাস্তবিকই তাঁহার অবস্থার পুনরুন্নতি হইতে থাকে। এই পুত্রগণ মধ্যে ৺পঞ্চানন গুহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণই ধনে, মানে, বিদ্যায় বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি পাদ্রী শিবপুরের প্রবীণ জমিদার ডি-সিল্‌ভা সাহেবের ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন ও পিতামহের স্থাপিত মনসা ও লক্ষ্মীনারায়ণের জন্য পাকা দালান প্রস্তুত করিয়া অতিথি সেবা আরম্ভ করেন। এ দালানে ঐ সকল বিগ্রহের অর্চনাদি অদ্যাপি হইতেছে ও তাঁহার বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত অতিথি সেবা করিতেছেন। দিবা রাত্রির যে কোন সময়ে যত অতিথি উপস্থিত হউক না কেন, সকলেরই সেবা সমাদরে হইয়া থাকে, কাহাকেও বিমুখ হইয়া যাইতে হয় না। অতিথি সেবার জন্য বাহির বাড়ীতে অনেক ঘর ও পৃথক বন্দোবস্ত আছে।

পঞ্চানন গুহ ৫পুত্র জীবিত রাখিয়া বাঙ্গালা ১২৭০ সালে পরলোক গমন করেন। পুত্রগণের মধ্যে ৪র্থ জগৎচন্দ্র গুহের অল্প বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হয়। অপর ৪জন সকলেই পার্শী ও

উর্দ্দু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং কেহ বা জমিদার সরকারে, কেহ বা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সকলেই প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। জ্যেষ্ঠ মোহনচন্দ্র ও ডি-সিলভা ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন; ২য় আনন্দ চন্দ্র অনেক জমিদার সরকারে ভাল ভাল কাজ করিতেন; ৩য় গোবিন্দচন্দ্র ১৮৭০—৭১ সনে ইন্‌কম্ ট্যাক্সের ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, কনিষ্ঠ স্বরূপ চন্দ্র বরিশালে একজন প্রধান উকীল ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৮৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়; তাঁহার পুত্র শ্রীঅবিনাশ চন্দ্রগুহের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বরিশালে তিনি যে চাউল ও পিতলের ঘটী বিতরণ করিয়াছিলেন অদ্যাবধি লোকে তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে বাজারের সমস্ত ঘটী খরিদ করিয়া বিতরিত হইয়াছিল।

ইঁহারা কয়েক ভ্রাতা নিজ গ্রামে খাল খনন ও রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়া লোকের জলের ও চলাচলের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্চানন গুহ যেরূপ মনসা ও লক্ষ্মী নারায়ণের দালান করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রগণ সেইরূপ দুর্গাপূজার জন্য এক পাকা মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এইরূপ বড় ও সুন্দর দুর্গামণ্ডপ এ জেলায় অতি কম আছে। জ্যেষ্ঠ মোহনচন্দ্র ও কনিষ্ঠ স্বরূপচন্দ্র চিরকাল এক অন্নে ছিলেন ও রত্নাদি কালিকাপুর পরগণার জমিদারীর অংশ খরিদ করিয়া 'রায় চৌধুরী' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের ওয়ারিশগণ পরে ঐ পরগণার আরও কতক অংশ ও অপর অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়া এই জেলায় এক ঘর প্রধান ভূম্যধিকারী বলিয়া খ্যাতনামা হইয়াছেন।

৺মোহন চন্দ্র গুহ তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমানে ১২৯৫ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবিতকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র সারদা প্রসন্ন গুহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বরিশাল জিলাস্কুল হইতে যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি ও ডি-সিলভা স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়া চতুর্থ বার্ষিক

শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য ও সকলেই যশের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন গুহ, বি- এল, বরিশালের একজন খ্যাতনামা উকীল ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। মধ্যম তারা প্রসন্ন গুহ বি-এল, হাইকোর্টের উকীল, কনিষ্ঠ উমা প্রসন্ন গুহ এম্-এ, প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ selection grade এ ১০০০৲ টাকা বেতনের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্; প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি ভিন্ন ডি-সিলভা স্বর্ণপদকও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৌহিত্র দেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ-বি এল্, হাইকোর্টের উকিল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতি প্রসিদ্ধ ছাত্র। ইনি প্রবেশিকা হইতে এম-এ-বি-এল পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতঃ বি-এ, পরীক্ষায় ঈশান বৃত্তি ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তি এবং এম্, এ ও বি এল, পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। আনন্দ চন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্র গুহের কোন পুত্র সন্তান বর্ত্তমান নাই। গোবিন্দচন্দ্র এক দত্তক পৌত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ঐ দত্তক পৌত্রই তাঁহার তাবৎ ষ্টেটের উত্তরাধিকারী। স্বরূপচন্দ্র গুহের একমাত্র জীবিত পুত্র শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গুহ এম্-এ-বি-এল্, হাইকোর্টের উকীল। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র। প্রবেশিকা হইতে এম্ এ, পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বরাবর বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বরিশাল স্কুলের ডি-সিল্ভা স্বর্ণ পদক ও বি-এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় রাধাকান্ত স্বর্ণপদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কালী প্রসন্ন গুহের একমাত্র পুত্র শ্রীযতীন্দ্র নাথ গুহ এম্-এ। ইনি অনারের সহিত গণিত শাস্ত্রে বি-এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এবং

রায় কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী।

এম্-এ, পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তারা প্রসন্ন গুহের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীজিতেন্দ্র নাথ গুহ এম্-এ বি-এল্ বরিশালের উকীল, গণিতশাস্ত্রে অনারের সহিত ও সংস্কৃতে পারদর্শীতার সহিত বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া বৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়া এম্, এ পরীক্ষায় গণিত শাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করতঃ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনিও প্রবেশিকা পরীক্ষায় ডি-সিল্ভা ও আসমত আলী র স্বর্ণপদকদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছেন। তারা প্রসন্ন গুহের ৩য় পুত্র শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গুহ এম্-এ। ইনি ইতিহাসে অনারের সহিত বি-এ-পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এবং উক্ত বিষয়ে যোগ্যতার সহিত এম্-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নাবালক। অবিনাশচন্দ্র গুহের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনরেন্দ্র নাথ গুহ বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া এম্-এ পড়িতেছেন। অপর পুত্রগণ নাবালক। এই জেলায় ধনে-মানে বিদ্যায় এই পরিবারের ন্যায় অল্পই পরিবার দেখা যায়। আপামর সকলেই বলিয়া থাকে যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একত্রে রামচন্দ্রপুরে বিরাজমানা।

এই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ যদিও ইংরাজী শিক্ষিত, তথাপি সকলেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ইঁহারা পৈতৃক দেবার্চ্চনাদি ক্রিয়া কর্ম্ম সমস্ত অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন ও ৺মোহন চন্দ্র গুহের শ্মশানোপরি অতি মনোরম এক পঞ্চরত্ন প্রস্তুত করতঃ তাহাতে রাজরাজেশ্বর শিব স্থাপন করিয়া প্রত্যহ পূজা অর্চ্চনাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন ও ঐ পঞ্চরত্নের পার্শ্বে একটী বড় দীঘি উৎসর্গ করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ লোকের জলকষ্ট দূর করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ বিবাহ ব্রত প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নানা কার্য্যে অনেকবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া ইঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সাধারণের হিতকর কার্য্যেও অর্থব্যয় করিতে ইঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। গবর্ণমেণ্টের উপাধি গ্রহণ করিয়া ও সংবাদ পত্রে নাম উঠাইয়া যশঃ

অর্জ্জনের জন্য ইহারা ব্যগ্র নহেন। যাহাতে লোকের প্রকৃত উপকার হয় সেইরূপ কাজ করিতেই উৎসুক। অন্নজল দান করিয়া লোকের হিত করাই এই বংশের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই জমিদার পরিবার নিজ গ্রামে দীঘি-পুষ্করিণী-খাল খনন করিয়া ও রাস্তা ঘাট বাঁধাইয়া দেশস্থ লোকের ও সদাব্রত অতিথি সৎকার দ্বারা পথিক গণের নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। নিজ গ্রামের উন্নতি করিয়াই ইঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। বাঙ্গালা ১২৮৩ সালের ১৬ই কার্ত্তিকের বন্যায় এই জেলার দক্ষিণ সাহাবাজপুর মহকুমায় যে খণ্ডপ্রলয় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। ঐ বন্যায় এরূপ জল বৃদ্ধি হইয়াছিল যে নারিকেল সুপারিগাছ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল। তাহাতে ৫০।৬০ হাজার লোকের ও মহিষ গরু ইত্যাদি গৃহপালিত অসংখ্য পশু ও বন্য জন্তুর জীবন নষ্ট হইয়াছিল এবং যে সকল লোক জীবিত ছিল তাহাদেরও শস্য ও ধনসম্পত্তি ভাসিয়া যাওয়ায় তাহারা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিল। ধন, জন, মহিষ, গরু তাহাদের কিছুই ছিল না। এইরূপ অবস্থায় প্রজারা জমিদারের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলে দেশের এবম্প্রকার দুরবস্থা দেখিয়াও কোন জমিদার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। একমাত্র স্বরূপ চন্দ্র গুহ চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার একান্নভুক্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতা মোহনচন্দ্র গুহ চৌধুরী মহাশয় বিনা সুদে বহু সহস্র টাকা তাগাদি দিয়া এবং প্রজাগণের এক বৎসরের দেয় খাজানাদির ৷৷ অংশ রেহাই দিয়া প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ টাকা না দিলে অনেক দেশ ছাড়া পড়িয়া জঙ্গলে পরিণত হইত। প্রজাগণ এই কৃতজ্ঞতা এখনও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্যও ইঁহারা জমিদারীর নানাস্থানে অনেক পুষ্করিণী কাটাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বরিশাল সহরে জলের কল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব দেখিয়া বহু

শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী

লোকের সুবিধা হয় এইরূপ একটী রিজার্ভ পুষ্করিণী খননজন্য কালী প্রসন্ন বাবু, উমা প্রসন্ন বাবু ও অবিনাশ বাবু বহু অর্থ ব্যয়ে সহরের মধ্যস্থলে কতক জমি খরিদকরতঃ বিনা মূল্যে তাহা মিউনিসিপালিটীর হাতে অর্পণ করেন। তাহাতে মিউনিসিপাল বোর্ড এক রেজলিউসন্ (Resolution) দ্বারা ঐ পুষ্করিণী Kali Babu's Reserve Tank নামে অভিহিত করিয়াছিলেন ও তাহার জল এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে তাহা ব্যবহারে সহরের কলেরা রোগ একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। বরিশাল জেলায় শিকারপুর গ্রাম একটী পীঠস্থান। কথিত আছে, দেবীর নাসিকা সেই স্থানে পতিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ঐ স্থান "তারা বাড়ী" বলিয়া বিখ্যাত। দেবীর অর্চ্চনা ও ভোগের জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল ও পূর্ব্বে অনেক জাক জমকের সহিত অর্চ্চনাদি হইত ও বহু যাত্রির সমাগম হইত। কিন্তু কালক্রমে সেবাইতদের অমনোযোগীতায় ও স্বার্থপরতায় অর্চ্চনাদিতে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আরম্ভ হইল ও যাত্রির ভিড়ও পূর্ব্বের ন্যায় আর হইত না। সুতরাং সেবাইতগণের আয় ক্রমশঃ কমিতে লাগিল; তাহারা পূজা অর্চ্চনাদিতে ক্রমশঃ উদাসীন হইল ও পীঠস্থানের গৌরব রক্ষা করিতে ক্রমশঃ বিরত হওয়ায় দেবীর মন্দির কালে ভূমিসাৎ ও প্রাঙ্গন নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইল। অনেক কাল এই অবস্থায় থাকার পরে ঐ গ্রামনিবাসী শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের যত্নে ও সাধারণের সাহায্যে জঙ্গল আবাদ হইয়া দেবীর মন্দির পুনঃ নির্ম্মিত হওয়ায় যাত্রিগণ আবার দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ স্থানে জলের এরূপ অভাব ছিল যে ডাবের জল ভিন্ন লোকের পিপাসা নিবারণের আর অন্য কোন উপায় ছিল না। সেই ডাবও যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত না। এই কথা কালী প্রসন্ন বাবুর কর্ণগোচর হওয়ায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মাতা শ্রীযুক্তা শ্যামা সুন্দরী চৌধুরাণীর নামকরণে "শ্যামা দীঘি" আখ্যা দিয়া একটী বড়

রকমের দীঘি খননকরতঃ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য তিনি তাহা উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। এইক্ষণ ঐ দীঘির জলদ্বারা শত সহস্র লোক পিপাসা নিবারণ করতঃ তৃপ্তিলাভ করিতেছে।

লোকের অন্নকষ্ট দূর করিতেও জ্যেষ্ঠ কালী প্রসন্ন বাবু প্রমুখ কয়েক ভ্রাতা অনেক সময় অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল; বাখরগঞ্জ জেলা বাঙ্গালার শস্য ভাণ্ডার বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, অন্নকষ্ট কাহাকে বলে এ জেলার লোকে তাহা জানিত না। বাঙ্গালা ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের পরে ১৩১২ সালে এই জেলার ধান্য শস্যের প্রথম হ্রাস হইতে থাকে ও তাহার ফলে ১৩১৩ সালের প্রথম হইতেই চাউলের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের কষ্টের একশেষ হইল ও ঘরে ঘরে হাহাকার রব উঠিল। তখন স্থানীয় নেতৃবর্গ দেশ বিদেশে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করায় নানাস্থান হইতে বহু অর্থের সমাগম হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা লোকের কষ্ট কথঞ্চিত নিবারণ হইল বটে, কিন্তু একেবারে দূর না হওয়ায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. T. Emerson. সাহেব স্থানীয় কয়েকজন নেতাকে ডাকিয়া চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন চাউল আনাইয়া বিনা লভ্যে বিক্রী করিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু অন্য কেহ টাকা দিতে অগ্রসর না হওয়ায় কালীপ্রসন্ন বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ হইতে অনেক টাকা দিয়া রেঙ্গুন চাউলের আমদানী করতঃ খরিদ দরে ও অনেক সময়ে লোকসান দিয়া বিক্রী করায় বাজারে চাউলের দর আর বাড়িতে পারিল না। এইরূপে তিনি সহরের বহুলোকের কষ্ট দূর করেন। এতদ্ব্যতীত নিজগ্রামে যে সকল পরিবার নিঃস্ব ও টাকা দ্বারা চাউল খরিদ করিতে একেবারে অপারগ ছিল, তাহাদের নামের এক ফর্দ্দ করিয়া প্রত্যেক ঘরে লোকসংখ্যা অনুসারে তিনমাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ চাউল বিতরণ করিয়া ৫০।৬০টী দুঃস্থ পরিবারের জীবন রক্ষা করিয়া-

ছেন। এই সমস্ত ব্যয় ইহাদের এজমালী ষ্টেট হইতে দেওয়া হইয়াছিল। ১৩২১ সালের বর্ষাকালে দ্বিতীয়বার যখন এই জেলায় অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয় তখনও জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. F. W. Strong সাহেব কালী বাবুকে ইহার ব্যবস্থা করিতে বলায় তিনি পূর্ব্বের ন্যায় রেঙ্গুন চাউল আনাইয়া বিনা লাভে বিক্রি করতঃ লোকের কষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারণ করিয়াছিলেন।

১৩২৫ সালে পুনরায় ধান্য শস্য নষ্ট হওয়ায় ১৩২৬ সালের বর্ষাকালে বঙ্গদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই স্মরণ আছে, ঐ দুর্ভিক্ষে কেবল বাখরগঞ্জ নয় বঙ্গদেশের অনেক জেলাই আক্রান্ত হইয়াছিল ও অন্নচিন্তায় দেশময় হাহাকার উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যে দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মূল্য বৃদ্ধি হেতু অর্থাভাবে চাউল খরিদ করিতে লোকের কষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু জিনিষের অভাব ছিল না। ১৩২৬ সালের দুর্ভিক্ষ অন্য প্রকারের। এ বৎসর ধান চাউলেরই অভাব হইয়াছিল ও রেঙ্গুন চাউল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্ধ (Controlled) হওয়ায় সাধারণের ইচ্ছানুসারে তাহা খরিদ করা যাইত না, ফলে এই জেলায় বড় বড় বন্দরের চাউলের গোলা সকল ক্রমশঃ খালি হইয়া পড়িল ও হাট বাজারে ধান চাউলের আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। দেশের এই প্রকার অবস্থা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া সত্বেও রেঙ্গুন চাউল খরিদ করার অনুমতি তিনি প্রথমে কিছুতেই দিলেন না। লোক সমূহ অন্নাভাবে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তখন লোকের অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত; অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চক্ষু ফুটিল ও তিনি কেবলমাত্র ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে রেঙ্গুন চাউল আনার জন্য অনুমতি দিলেন।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড লক্ষাধিক মন চাউল আনিয়া বরিশালে এক কেন্দ্র

করিয়া নিজ হাতে বিক্রী করিতে লাগিলেন, অন্যান্য স্থানে কেন্দ্র খুলিয়া খরিদ দরে বিক্রী করার জন্য অনেকে অনুরোধ করিলেন ; তদনুসারে কালীপ্রসন্ন বাবু প্রথমে অনেক টাকার চাউল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে খরিদ করিয়া বরিশালে দ্বিতীয় এক কেন্দ্র ও নিজ গ্রাম রামচন্দ্রপুরে এক কেন্দ্র খুলিয়া চাউল বিক্রী করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে লোকের কষ্ট কিছুই মোচন হইতেছে না দেখিয়া আরও কতক রেঙ্গুন চাউল আনিবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন ও তজ্জন্য নিজে অনেক টাকা মিউনিসিপ্যালিটীকে ধার দেন। তদ্রূপ উকীল লাইব্রেরী হইতে যে চাউল আনা হইয়াছিল তাহাতেও তিনি বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও উকীল লাইব্রেরীর এই চাউল পাইয়া সহরের ও সহরতলীর লোক কতক পরিমাণে ঠাণ্ডা হইল বটে, কিন্তু গ্রামের লোকের কষ্টের কিছুই লাঘব হইতেছে না দেখিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়কে দেশের অবস্থা ভালরূপ বুঝাইয়া চাউল খরিদের অনুমতি চাহিলে ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তাঁহাকে ঐ অনুমতি দেন ও দেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বেশী পরিমাণ চাউল আমদানী করার জন্য নিজ হইতেই কালী বাবুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কালীপ্রসন্ন বাবুও বহু টাকার চাউল নিজ বাটীতে আমদানী করতঃ জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট বিনা লভ্যে বিক্রী করিয়া সহস্র সহস্র লোকের অন্নকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। এই সময়ে টাকায়ও চাউল মিলিত না, তাহাতে সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রী হইতেছে শুনিয়া ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহুলোক আসিত ও চাউল পাইয়া কৃতার্থ হইত। এই চাউল না পাইলে কত শত লোকের জীবন যে নষ্ট হইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। চাউল খরিদ জন্য নৌকায় ও তটপথে প্রত্যহ শত সহস্র লোকের একত্র সমাগম হওয়ায় ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত রামচন্দ্রপুরের

জমিদার বাটীতে যেন এক অপূর্ব্ব মেলা মিলিত ও সমবেত লোকমণ্ডলী এই জমিদার পরিবারের গুণ কীর্ত্তন করিয়া দলে দলে গমন করিত। এই ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন বাবু অনেক টাকা দিয়াছিলেন ও যে কীর্ত্তি রাখিয়াছেন তাহা এ জেলার লোকে কখনও ভুলিতে পারিবে না। এইরূপ ছোট বড় অনেক কার্য্যে অনেক সময় এই পরিবারস্থ জমিদারগণ বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন, সমস্ত কার্য্যের উল্লেখ করা এইরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব।

১। বিরাট গুহ (কান্যকুব্জাগত)
|
২। নারায়ণ গুহ
|
৩। দশরথ গুহ
|
৪। লক্ষ্মণ গুহ
|
৫। হাড় গুহ
|
৬। রুদ্র গুহ
|
৭। শ্রীশ্রীচণ্ডেশ্বর গুহ
|
৮। গোবিন্দ গুহ
|
৯। প্রক্রু গুহ
|
১০। কৃষ্ণ গুহ
|
১১। দৈত্যারি গুহ
|
১২। কংশারি গুহ
|
১৩। বল্লভ গুহ
|
১৪। অজ্ঞাত
|
১৫। শ্রীকৃষ্ণ গুহ
|
১৬। রূপনারায়ণ
|
১৭। রামজীবন
|
১৮। কাশীশ্বর
|
১৯। রাজচন্দ্র
|
২০। পঞ্চানন
|

মোহনচন্দ্র — আনন্দচন্দ্র — গোবিন্দচন্দ্র — জগতচন্দ্র — স্বরূপচন্দ্র

আনন্দচন্দ্র
অনুকূলচন্দ্র

গোবিন্দচন্দ্র
কৈলাসনাথ

মোহনচন্দ্র

সারদাপ্রসন্ন — কালীপ্রসন্ন বি, এল (পত্নী কাদম্বিনী) — মোক্ষদাসুন্দরী (কন্যা) — তারাপ্রসন্ন বি, এল, (পত্নী অনুপমা) — উমাপ্রসন্ন এম, এ (পত্নী মনোরমা) — অন্নদাসুন্দরী (স্বামী ক্ষেত্রনাথ ঘোষ)

কালীপ্রসন্ন বি, এল
যতীন্দ্রনাথ এম, এ, (পত্নী শৈলবালা

তারাপ্রসন্ন বি, এল,
বীরেন্দ্র — জিতেন্দ্র — ধীরেন্দ্র — নগেন্দ্র

বীরেন্দ্র
প্রতীরঞ্জন

জিতেন্দ্র
সুধীরঞ্জন

উমাপ্রসন্ন এম, এ
দেবেন্দ্র — উপেন্দ্র — ভূপেন্দ্র

উপেন্দ্র
শান্তিরঞ্জন

অন্নদাসুন্দরী (স্বামী ক্ষেত্রনাথ ঘোষ)
দেবপ্রসাদ ঘোষ

ধানকোড়া জমিদার বংশ।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ঢাকায় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর নগর স্থাপন করিলে ধানকোড়া জমিদার বংশের পূর্ব্ব পুরুষ মুকুন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী নামক একজন বংশধর উক্ত সম্রাটের অত্রত্য ঢাকা নগরীতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে এক হাজার সৈন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব ও তিনি "হাজরা" উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপর, তিনি মুকুন্দ হাজরা নামে খ্যাত হন। ইঁহাদের বাড়ী পূর্ব্বে বরিশাল জিলার অন্তর্গত বাকপুর গ্রামে ছিল; ইঁহারা রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ বংশীয় "বাকপুরের সিমনাই"। ইঁহাদের শেষ পূর্ব্ব পুরুষ রাম প্রসাদ রায় চৌধুরী। তাঁহার তিন পুত্র; তন্মধ্যে রাম নরসিংহ রায় চৌধুরী কৃতবিদ্য ও ভাগ্যবান লোক ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের শেষ আমলে ও ইংরাজ রাজ্যের প্রথম সময় ব্যবসায় উপলক্ষে ইনি ময়মনসিংহে থাকিতেন। সেই সময় হইতে অতিরিক্ত বিষয় সম্পত্তি খরিদ করেন। তৎকালে কলিকাতা বোর্ডে সম্পত্তি নিলাম হইত। তাঁহার জীবনের বহু সৎসাহসের মধ্যে মাত্র একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল যাহাতে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ময়মনসিংহের জমিদার কৃষ্ণ কিশোর ও কৃষ্ণ গোপাল দুই ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী গৌরীপুর ছিল। কৃষ্ণ কিশোর ও কৃষ্ণ গোপাল পরলোক গমন করিলে কৃষ্ণ গোপালের দত্তক পুত্র যুগল কিশোর রায় কৃষ্ণ কিশোরের দুই পত্নী রত্নমালা ও নারায়ণী দেবী পুষ্য পুত্র রাখিতে চাহিলে যুগলকিশোর রায় বাধা দেন ও উঁহাদিগকে আটক করেন। যুগলকিশোরের তৎকালে প্রবল প্রতাপ ছিল। বিধবা-য়কে আটক হইতে মুক্ত করার জন্য তাঁহারা তৎকালীন ময়মনসিংহ

শ্রীযুত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী

জেলার জমিদারগণের নিকট আশ্রয় চান, কিন্তু কেহই যুগলকিশোরের ভয়ে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হয় না। তখন রাম নরসিংহ রায় চৌধুরী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বিধবাদ্বয়কে মুক্ত করেন ও কালকাতা যাইয়া নিজের অর্থব্যয় করিয়া মোকদ্দমা রুজু করতঃ উহাদের সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দেন। অতঃপর রামগোপালপুর গ্রামে তাঁহাদিগকে স্থাপন করাইয়া পোষ্যপুত্র রাখিয়া দিয়া এই বংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন।*

রাম নরসিংহ রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তস্য পুত্র রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী মহাশয় বহু সম্পত্তি খরিদ করিয়া জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তৎপুত্র গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরীর কর্ত্তৃত্ব সময় তিনি বহু সৎকর্ম্ম করেন। ধানকোড়ায় একটী মধ্য ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন ও নিম্ন ক্লাসে কতক গুলি ছাত্রবৃত্তি দেন এবং মধ্য বাঙ্গালা ও মধ্য ইংরাজি পরীক্ষা কেন্দ্র (centres) ডাইরেক্টর সাহেব হইতে লেখা পড়া করিয়া নিজ বাড়ীতে আনেন। পরীক্ষার্থী ছাত্র, গার্ড ও ইন্‌স্পেকটীং অফিসার যাহারা আসিতেন উহাদিগের বাসা ও পরীক্ষার কয়দিনের খোরাক সমস্তই তিনি বহন করিতেন।

১২৮৬ কি ১২৮৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় যখন লোক না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করে, তখন ধানকোড়ায় একটী অন্নছত্র খোলা হয়। এই অন্নছত্রে প্রতিদিন প্রায় আড়াই হাজার লোককে প্রায় ১½ দেড় মাস যাবত খাইতে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার সাহেবের অনেক চিঠি পত্র আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার নকল দেওয়া হইল না।

গিরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী ঢাকায় একটী ছাপাখানা করিয়া "বিজ্ঞাপনী

* ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদার ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৯ পাতা

ও বার্ত্তাবহ” নামে একটী সংবাদ পত্র চালাইয়াছিলেন। ইহাই ঢাকার প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। উহা পরে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে উঠাইয়া ময়মনসিংহে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় উহা ঐ নামে কয়েক বৎসর চলে। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র নাবালক থাকায় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (Executor) উহা উঠাইয়া দেন।

পরে ষ্টেট্ ১৮৯০ সনে কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে মুক্ত হইলে গিরিশ-চন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মালিক হন। তিনি ১২৭৭ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ধানকোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাণিক-গঞ্জ স্কুলে দালান প্রস্তুত সময় হেমবাবু খুব বেশী পরিমাণ টাকা চাঁদা দেন। তৎপর ১৩০৫ সনের ভূমিকম্পের সময় পুনঃ উহা মেরামতের জন্যও টাকা দিয়াছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ ও ঢাকার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাসিক চাঁদা দিতেছেন। কেন্দুয়া Spry High স্কুলে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁহার নামে একটি লাইব্রেরী করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩১৩ সালের ঢাকার দুর্ভিক্ষের সময় হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী চারিহাজার টাকা তৎকালীন ঢাকার District Magistrateএর হাতে চাউল বিতরণের জন্য দেন।

ধানকোড়া মধ্য ইংরাজী স্কুলটী তিনি প্রায় ৩০,০০০ ত্রিশহাজার টাকার উপর খরচ করিয়া High স্কুলে ১৯১৭ সনে উন্নীত করিয়া তাঁহার পিতার নামে (Girish instution) স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত পত্নীর নামে ঐ স্কুল-সংলগ্ন একটী বড় লাইব্রেরী করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৪২৫ জন। এই স্কুলে তিনি ৪০০০ চারি হাজার টাকার War Bond দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসে স্কুলের ব্যয় ও Boarding এবং ছাত্রদের সুবিধার জন্য মাসে প্রায় দুইশত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁহার পিতা হইতে যে সম্পত্তি পাইয়াছেন তাহা ব্যতীত নূতন

সম্পত্তি খরিদ দ্বারা ষ্টেটের আয় অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঢাকায় তিনি বহু ছাত্রের খোরাকী, স্কুল ও কলেজের বেতন দিয়া পড়াইয়া থাকেন। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধাদিতে অনেককে বিস্তর পরিমাণ সাহায্য করিয়াছেন এবং এমন কি অনেককে ঋণদায় হইতে নিজে অর্থ সাহায্য দ্বারা ঋণ-মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মফঃস্বল সম্পত্তিসমূহে বহু পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়া দিয়াছেন।

ইনি নিম্নলিখিত সম্মানজনক পদগুলি অধিকার করিয়াছেন :—

Land Holders' association সভার মেম্বর।

Peoples' association সভার মেম্বর।

Honarary magistrate

ইনি মানিকগঞ্জ লোকাল বোর্ডের ও ঢাকার District-Board এর মেম্বর ছিলেন। তখন তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মে সাধারণের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। শিক্ষা বিস্তার কল্পে তিনি যে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট হইতে আরম্ভ করিয়া বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টার প্রভৃতি সকলেই তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লায়ালের দ্বারা ছোটলাট তাঁহাকে তাঁহার ধন্যবাদ পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বংশ তালিকা।

নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী
|
জিতমিত্র রায় চৌধুরী
|
মুকুন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী (হাজরা)

গোবিন্দমাধব রায় চৌধুরী | যাদবেন্দ্র রায় চৌধুরী (তলাপত্র) | রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বড়ঠাকুর

রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বড়ঠাকুর
|
কালাচাঁদ রায় চৌধুরী

শিবরাম রায় চৌধুরী | আত্মারাম রায় চৌধুরী | জয়নাথ রায় চৌধুরী

জয়নাথ রায় চৌধুরী
|
রামদেব রায় চৌধুরী
|
অযোধ্যারাম রায় চৌধুরী
|
রামপ্রসাদ রায় চৌধুরী

রামনরসিংহ রায় চৌধুরী | রামরতন রায় চৌধুরী | ব্রজমোহন রায় চৌধুরী

রামনরসিংহ রায় চৌধুরী
|
রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী
|
গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
|
হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী

গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী | বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী | হীরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
|
মুনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

কুণ্ডির জমিদার বংশ

বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" রূপী মোগল সম্রাট ভারতের রাজ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া প্রজা-রঞ্জন করিতেছিলেন, সেই কালে মোগল সেনাপতি অম্বরেশ্বর মহারাজ মানসিংহ আসাম ও কোচবিহার রাজ্য মোগলের বিজয় পতাকার অধীন করিবার উদ্দেশ্যে এবং দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্রোহী রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসন ও শাস্তি প্রদানের সঙ্কল্পে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপ বিজয় করিয়া যখন মুর্শিদাবাদের মসনদ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উদয়নালার পথে উত্তরবঙ্গের দিকে তাঁহার বিরাট চমূসহ অগ্রসর হইতেছিলেন, ঐ সময় কাটোয়ায় আসিয়া তাঁহার পুরোহিতের তিরোভাব হয়। রাজার পিতৃশ্রাদ্ধ বাসর নিকটস্থ হওয়ায় পৌরহিত্য কার্য্যের জন্য একজন পণ্ডিত এবং জ্ঞানবান সদ্‌ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। কাটোয়ার সন্নিকটে আঙ্গারপুর চরখিয়া নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে নিষ্ঠাপুতঃ জ্ঞানবান সুপণ্ডিত ৺শঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। রাজদূত তাঁহাকে মহারাজ মানসিংহের সন্নিধানে আনয়ন করিলে তাঁহার প্রতিভা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া রাজা উক্ত শঙ্করশর্ম্মাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন এবং সম্রাটের বাহিনীর সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সেনাপতি অম্বরেশ্বরের সমভিব্যাহারে উত্তর বঙ্গে আনিতে আদিষ্ট হইলেন, কিন্তু গঙ্গাহীন দেশে তিনি এখন যাইতে আপত্তি করায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইতে রাজ অনুমতি পাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র মোগলবাহিনীর সহিত পিতৃসমভিব্যাহারে উত্তর বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেনাপতি অম্বরেশ্বর কেশবচন্দ্রের সাহস, বিদ্যাবুদ্ধি এবং

কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ উত্তরবঙ্গে উপনীত হইয়া যখন মোগল বাহিনী * সূর্য্যকুণ্ডি বা ফকির কুণ্ডি অধিকার করিয়া তথায় মোগল বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া আসাম বিজয় জন্য ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিলেন এবং বিজিত মোগল অধিকারের উত্তর বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম পরগণা ফকির কুণ্ডি সরকার বাজুহার † অন্তর্গত করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত ৺শঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে সুবেদার নিযুক্ত করিয়া উক্ত পরগণা তাঁহার জায়গীর স্বরূপ প্রদান করতঃ মহারাজা মানসিংহ ব্রহ্মপুত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

৺কেশব মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথাযোগ্যভাবে রাজকার্য্য সুনির্ব্বাহ করিয়া তদানীন্তন শাসনকর্ত্তার সুনজরে পতিত হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর আকবরের শেষ দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হওয়ায় মহারাজ মানসিংহ রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৬০৪ খ্রীঃ ভারতেশ্বর মোগল কেশরী সম্রাট্ আকবর মানবলীলা ত্যাগ করিলেন এবং তৎপুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এ দিকে কেশবচন্দ্র বঙ্গেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অম্বরেশ্বর মহারাজ মানসিংহের সাহায্যে ১৬০৬ খৃঃ দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইয়া সম্রাট সমীপে নীত হয়েন এবং পরগণে কুণ্ডির ২ বৎসরের কর নজর দাখিল করিয়া তাঁহার রাজভক্তি ও সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ পরগণে কুণ্ডি জমিদারী এবং তৎসহ "রায়চৌধুরী" উপাধি ও আসা, সোটা, বল্লম, বর্ষা, নিশান, হাতি, আড়ানী ও ডঙ্কা খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদশাহী ফরমান খানি স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট

---

* আইন-ই-আকবরী।

† Bengal District board Rongpore Part I and আইন-ই-আকবরী।

ছিল, উহা বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূকম্পে তাঁহার বাসগৃহাদি সহিত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত ঘটনাবলী দ্বারা বিগত ১০১১ বঙ্গাব্দে মোগল বাহিনীর সহিত সামবেদীয় ফুলিয়া মেল মুখুটি গাঁই বংশোদ্ভব রামের সন্তান ভরদ্বাজ গোত্র স্বর্গীয় শঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর জেলার অন্তঃপাতী সূর্য্যকুণ্ডি বা ফকির কুণ্ডিতে আগমন করেন এবং ১০৩১ বঙ্গাব্দে তৎপুত্র স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী উপাধি এবং সরগণে কুণ্ডির জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই জমিদার বংশের স্থাপন করেন।

নৈকষ্য কুলিন ব্রাহ্মণ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ক্রমান্বয়ে চারিটী বিবাহ করিয়াছিলেন। চারি পত্নীর গর্ভে আট সন্তান জন্মিয়াছিল। অধুনা উক্ত সন্তানগণের বংশাবলি বহু বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্ব পুরুষোপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। তদানীন্তন কালের রীতি অনুযায়ী তাঁহার চারি পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র স্বর্গীয় রামদেব রায়চৌধুরী মহাশয় সম্পূর্ণ বিষয়ের।০ চারি আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বক্রি ৸০ বার আনা সম্পত্তি অপর তিন পত্নীর গর্ভজাত ৭ পুত্র বণ্টন করিয়া লইয়াছিলেন। কালের কঠোর নিয়মে ঐ সপ্ত পুত্রের বংশাবলী কতক নির্ব্বংশ হওয়ায় তাহার নিকটবর্ত্তী জ্ঞাতি সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে বিগত ১১৭৪ বঙ্গাব্দ হইতে বড় ৶১০ আনি, ছোট ৶১০ আনি, বড় ৶১০ আনি, ছোট ৶১০ আনি এই কয়েক সরিকে পরিণত হয়েন। তৎপর ঐ সকল অংশ কিছু দিন পরে পুনরায় রূপান্তরিত হইয়া ৶১৫ মধ্যে সমান ২ সরিক ⁄৫ পাই, বড় ৶১০ আনি, এবং ছোট ৶১০ আনি মধ্যে দুই সরিক হইয়াছিলেন। ⁄৫ পাই অংশ রাজস্ব বাকির দায়ে ইংরাজ আমলে নিলাম হইয়া যায় এবং কলিকাতার স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের

পিতা উহা খরিদ করিয়াছিলেন। এখন ঐ সম্পত্তি কলিকাতা হাই কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺মোহিনীমোহন রায়ের নিকট তাঁহার দৌহিত্র ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে চারি আনি হিস্যার বংশধরগণ আদিপুরুষ কেশব চন্দ্রের সময় হইতে মূল বংশ সমুদ্ভূত। ৺রামদেব রায়চৌধুরী ব্যতীত কেশবচন্দ্রের অন্যান্য সাত পুত্রেরই বংশলোপ ঘটে। পোষ্য পুত্রদ্বারা ঐ সকল বংশাবলী রক্ষিত হইয়াছে।

মোগলবাহিনী কুণ্ডির যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন উহাই বর্ত্তমান সদ্যঃ পুষ্করিণীগ্রাম। এই স্থানে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার অধীনস্থ বিপুল সৈন্যবল দ্বারা অতি অল্প সময় মধ্যে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। উক্ত পুষ্করিণীর নামেই এই গ্রামের নাম "সদ্যঃ পুষ্করিণী" হইয়াছে। অদ্যাপি উক্ত পুষ্করিণী এবং তাহার পশ্চিম তীরে অম্বরেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ৺শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছে।

কুণ্ডির ভূম্যধিকারিগণ চিরকালই বংশানুক্রমে রাজভক্ত এবং নানা প্রকার সদ্‌গুণরাজি-বিভূষিত। এই বংশের স্বর্গীয় কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী একজন সাহিত্য সেবী ও বহু গুণীলোকের পালক ও পোষক ছিলেন। রঙ্গপুর সদর ডাকঘর ব্যতীত তখন এ জেলায় অন্য কোন ডাকঘর ছিল না। তিনি গোপালপুর গ্রামে (তাঁহার স্বগ্রাম সদ্যঃ পুষ্করিণী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে) সর্ব্ব প্রথম পল্লী ডাকঘর এবং একটি বিদ্যালয় সদ্যঃ পুষ্করিণী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় বর্ত্তমানে কুণ্ডি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং সেই ডাকঘর এক্ষণে শ্যামপুর নামে পরিচিত হইয়া চালিত হইতেছে। কুলিনকুলসর্ব্বস্ব নাটক এবং গ্রন্থ কালিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার ব্যয়ে এবং পৃষ্ঠপোষকতায়

স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায় চৌধুরী

"পাতিব্রতা" নামক একখানি উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৩৬ খৃঃ রঙ্গপুর নগরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সদর হাঁসপাতাল এবং সাধারণ পুস্তকাগার কুণ্ডি বংশের অন্যতম বংশধর কর্ম্মবীর স্বর্গীয় রাধামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে ও অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বংশে বহু সাধক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও এই বংশের বংশধরগণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সর্ব্বদা পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ রক্ষার জন্য যত্নবান আছেন। ইঁহারা মুসলমান ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে বহু পীরপাল জমি দান ও মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কেশব চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুণ্ডি পরগণার চারি আনা অংশের মালিক। ৺রামদেব রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশধরগণের মধ্যে। স্বর্গীয় রাঘবেন্দ্র, তৎপুত্র শিবনারায়ণ, তৎপুত্র রাজচন্দ্র, তৎপুত্র দুর্গাপ্রসাদ, তৎপুত্র গঙ্গাধর ইঁহারা সকলেই সাধন মার্গে নিযুক্ত থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন ও নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সৎকার্য্য দ্বারা বহু কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর এবং ৺বিনোদবিহারী। নিয়তির কঠোর নিয়মে বিনোদবিহারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র শ্রীমান শ্যামাদাস বংশধর আছেন। এই বংশের রাজর্ষি স্বর্গীয় রাজচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ১১৮০ বঙ্গাব্দ হইতে ১২১০ সাল পর্য্যন্ত জমিদারী পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি পরগণে কুণ্ডির ।০ আনা অংশ ব্যতীত এই জেলার এবং দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার কতকগুলি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন এবং গৃহদেবতা ৺ শ্যামাসুন্দরী কালীমাতা ও ৺ রাধামাধব বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেবসেবার জন্য পৃথক দেবোত্তর জমিদারী খরিদ করিয়া গিয়াছেন। স্বনামধন্য আদর্শ জমিদার স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায়চৌধুরী মহাশয়

ঐ সকল জমিদারীর অনেক উন্নতি সাধন এবং নীলকুঠি ইত্যাদির আয় দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। কুণ্ডি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন দ্বারা স্বগ্রামে অশেষ কল্যাণ সাধন এই মহাত্মা করিয়া গিয়াছেন। এই বংশে ৺ শিবনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী সহমরণ গিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত নথ এখনও ইহাঁদের গৃহে সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয় ১২৮৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে পিতৃ এবং ভ্রাতৃহীন হইয়া সংসারে নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন রোগ শোক ইত্যাদির সহিত সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইনি সুশিক্ষিত এবং বিশেষ বিজ্ঞ ও স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ, রাজভক্ত ও দেশসেবক। গত ১৯০১ ইং জুলাই মাস হইতে ইনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য প্রশংসার সহিত করিয়া আসিতেছেন। গত ১৯১১ খ্রীঃ দিল্লী দরবারে 'দরবার মেডেল' ও সার্টিফিকেট অব অনার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কলিকাতা নগরীতে মহামান্য সম্রাটের 'লেভি দরবারে' সম্রাট সম্মুখে পরিচিত হইয়াছিলেন। কুণ্ডি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং কুণ্ডি বিদ্যালয় ইহার সম্পাদকতায় সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইহার যত্নে ও চেষ্টায় কুণ্ডি মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ইহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্রব্য বিষয়ে ইহার যথেষ্ট উৎসাহ এবং নিজেও বহু ব্যয়ে অনেক মুদ্রাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্য চর্চ্চায় ইনি বিশেষ উৎসাহী। ইহার ব্যয়ে রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষদ চণ্ডিকা বিজয় নামক প্রাচীন গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন এবং সাহিত্য পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার রাজভক্তি, প্রজারঞ্জন এবং বহু গুণের পুরস্কার স্বরূপ ১৯১২ খ্রীঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ ইঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। বিগত ১৯১৩ খ্রীঃ হইতে ইনি রঙ্গপুর

রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যানের কার্য্য বিশেষ দক্ষতার ও প্রশংসার সহিত করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার কার্য্যসময়ে রঙ্গপুর জেলার সর্ব্ব-বিষয়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইনি রঙ্গপুর জেল-খানার যে সরকারী পরিদর্শকের কার্য্য গত ৫ বৎসর যাবত করিতেছেন। রঙ্গপুর পাবলিক্ লাইব্রেরীতে অনেক পুস্তক ক্রয় জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। রায়বাহাদুর অক্লান্ত কর্ম্মবীর। নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখ, সুবিধা এবং শান্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বদা পরহিতব্রতে রত থাকেন। রঙ্গপুর কলেজ স্থাপন জন্য বিনামূল্যে ইঁহার জমিদারীর অন্তর্গত ১২৫ বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন এবং স্বর্গীয় পিতৃদেব গঙ্গাধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে রংপুরবাসী একটি ছাত্রের বিনা বেতনে কলেজে অধ্যয়ন করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল এবং লর্ড রোণাল্ডসে ইঁহাকে স্বহস্তে প্রত্নতত্ত্বাদির সন্ধান ও সংগ্রহ এবং সরকারী কার্য্যের সহায়তা জন্য যে পত্র লিখিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক রিপোর্টে, ও বিভাগীয় কমিশনার ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে প্রতিবৎসর যে প্রশংসাবলী লিখিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বহু কার্য্যে ইনি সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। স্বগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জেলা বোর্ডের সাহায্যে একটী পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার এবং পয়ঃপ্রণালী ও গ্রাম্য পথ সংস্কার করাইবার ব্যবস্থা এবং সদ্যঃ পুষ্করিণী ইউনিয়ন কমিটি স্থাপনপূর্ব্বক গ্রামের বিবিধ উন্নতি সাধনের উপায় করিয়াছেন এবং করিতে যত্নবান আছেন। ইঁহার দুইটী পুত্র, উভয়েই এখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বর্ত্তমানে কুণ্ডির এই বংশ আদি বংশবৃক্ষের মূল কাণ্ড এবং ইঁহারা স্বভাব কুলিনই আছেন। ১৩১৫ সালের বগুড়ার দুর্ভিক্ষে তিনি ৮ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

কুণ্ডি জমিদারগণের আদি বসত বাড়ী সদ্যঃপুষ্করিণী পশ্চিম পাড়ে

অবস্থিত ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কতক বিদ্যমান আছে। সরিকগণ ভিন্ন হইয়া চারি আনি এবং পৌনে চারি আনি সন্তঃ পুষ্করিণী গ্রামে, ছোট ৶১০ আনির সরিকদ্বয় গোপালপুর গ্রামে এবং বড় ৶১০ আনির সরিকগণ হরিদেবপুর গ্রামে বসতি করিয়াছেন। মহারাজ মানসিংহের এবং জমিদারী প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও কেশব চন্দ্র রায় চৌধুরীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই পরগণে কুণ্ডির মধ্যে মানসিংহপুর, শঙ্করপুর ও কেশবপুর নামক তিনখানি মৌজার নামকরণ হইয়াছিল। উহা ইংরাজ রাজ্যের প্রথম জরিপ ও বন্দোবস্ত আমলের কাগজে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও ঐ সকল গ্রাম কুণ্ডির জমিদারগণের দখলে আছে।

সন্তঃপুষ্করিণী-তীরস্থ প্রাচীন বাড়ীর চণ্ডিমণ্ডপে ধ্বংশপ্রাপ্ত একটী শিবমন্দির গাত্রের ও আদি বংশধর রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর চণ্ডিমণ্ডপের (সেই প্রাচীন মন্দির ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূকম্পে ধ্বংস হইয়াছে) এবং গোপালপুর ৺কাশিচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর একটী প্রাচীন শিব মন্দিরের গাত্রে যে খোদিত লিপি আছে তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত করা গেল :—

কুণ্ডির তরফ চারি আনি সন্তঃ পুষ্করিণী—শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী বাহাদুরের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ লিপি :—

বর্ষে শরাশ্ব রসভূগণিতেতু চৈত্রে নারায়ণোতি স্বকৃতী
শিবপূর্ব্বক শ্রীযুক্তস্থ সৌধ মকোরদ্বিরিশৃঙ্ঘ তুল্যং
তাত প্রারব্ধ মঙ্গলং খলু সচ্চরিত্র।

কুণ্ডির ছোট ৶১০ আনির সরিক—গোপালপুর গ্রামে একটী শিব মন্দিরের গাত্রে খোদিত লিপি।

রা ... পবার ... ... ১১৪৪ সাল।
... মনমধু ... ... চারম্।

সপ্তঃ পুষ্করিণী-তীরস্থ ধ্বংস প্রাপ্ত কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির গাত্রে খোদিত লিপি :—

শাকে বেদগ্রহ তিথি মিতে শ্রীহরেঃ পাদ পদ্মনি।
বোমৌ রজয়তি ইতি কেশবঃ শ্রীযুক্তো সৌ।

কুণ্ডি তরফ ৵১৫ আনীর জমিদার বংশ।

কুণ্ডি জমিদারদিগের আদিপুরুষ কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরীর তৃতীয় ..র গর্ভজাত কৃষ্ণজীবন, তৎপুত্র রামচন্দ্র, রামচন্দ্র-পুত্র কাশীকান্ত। .. অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিলে তৎপত্নী দয়াময়ী দেবী ..াতিপুত্র রাজমোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে, ..ঙ্গলা ১১৯৩ সালে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১২২৭ সালে কুণ্ডি .. আনী জমিদারী অংশে নাম জারী করেন। রাজমোহন রায়-..ধুরী কুণ্ডী পরগণার স্বনামখ্যাত আদর্শ ভূম্যধিকারী। উত্তরবঙ্গে ..াহারই প্রযত্নে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা হয়। নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও ..িনি শিক্ষা সম্বন্ধে তাৎকালিক সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ..ন্দু কলেজ হইতে উত্তীর্ণ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক শিক্ষককে ..ৗকাপথে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় সন্তানগণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার ..চনা করেন। এই প্রকারে ইংরেজী শিক্ষায় জাতিনাশ আশঙ্কা ..দূরিত করিয়া ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে রঙ্গপুরে প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় ..পনপূর্ব্বক বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থার দ্বারা উত্তরবঙ্গে ..নালোক বিস্তারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বীয় বাসস্থান ..ঃপুষ্করিণীগ্রামে বহু অর্থ ব্যয়ে মফঃস্বলের মধ্যে প্রথম একটী মধ্য ..রেজী বিদ্যালয় (তৎকালে সরকারী পাঠশালা বলিয়া কথিত হইত) ..ং প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক ১২৫৪ সাল ইংরেজী ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দ ..তে "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" নামক মফঃস্বলের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রের সূচনা

করিয়া উত্তর বঙ্গের যুগান্তর সাধন এবং সাহিত্য জগতে তিনি চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত, পারসীক, ইংরেজী ও বাঙ্গলা এই চারিভাষা আয়ত্ত করিয়া তদানীন্তন রাজপুরুষ ও পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছিলেন। রঙ্গপুরের সাধারণ হিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত ইঁহার স্মৃতি চিরবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে রঙ্গপুর নগরে ইঁহার নেতৃত্বে ও অর্থ সাহায্যে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ চিকিৎসালয়ের সহিত তাঁহার স্মৃতি চিরবিজড়িত রাখিবার জন্য নিম্নোক্ত লিপিযুক্ত একখানি মর্ম্মর স্মৃতিফলক উক্ত চিকিৎসালয়ের দ্বারদেশে সংযুক্ত আছে :—

"In Memory of
Rai Raj Mohon Chowdhury
Zeminder of Kundi
and
in recognition of his services
in establishing the
Rungpur Dispensary
in 1840 A. D."

সদ্যঃ পুষ্করিণী গ্রাম হইতে রঙ্গপুর সদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম রাজমোহনের চির উজ্জ্বল কীর্ত্তিরাজির অন্যতম নিদর্শন এই রাজবর্ত্মের মধ্যবর্ত্তী ঘর্ঘট (ঘাঘট) নদীতে তিনি বিনাব্যয়ে পারাপারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। উহা রাজমোহনের "ধর্ম্মঘাট" বলিয়া পরিচিত। পরে তাঁহার বংশধরগণ রাজমোহনের স্মৃতি রক্ষার্থ ঐ নদীতে লৌহ সেতু প্রস্তুতের জন্য জেলাবোর্ডের হস্তে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। সেতু গাত্রে সংযুক্ত মর্ম্মর স্মৃতি ফলকে সগৌরবে

আজও রাজমোহনের যে কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে তাহা নিম্নোক্ত ফলক লিপি প্রকাশ করিতেছে :—

কুণ্ডীর দানশীল ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় মহাত্মা রায় রাজমোহন চৌধুরী মহোদয়ের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার পৌত্র :—

শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত বাবু মনীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত বাবু নরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী

মহোদয়গণ কর্ত্তৃক এই সেতু নির্ম্মাণের ব্যয় ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা প্রদত্ত হইল। ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

To Commemorate the memory of the Late Ray Raj Mohan Choudhury.

The renowned and Charitable Zeminder of Kundi, Rs. 5000 was paid for the Construction of this Bridge by his grand sons.

Babu Manindra Chandra Roy Choudhury
Babu Manish Chandra Roy Choudhury
Babu Surendra Chandra Roy Choudhury
Babu Naresh Chandra Roy Choudhury

1903. A. D.

রাজমোহন চৌধুরী অন্তিমে ৺গঙ্গালাভ আশায় নৌকাপথে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া ১২৫৪ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

রাজমোহনের দুই পত্নী, কাত্যায়নীদেবী চৌধুরাণী ও মণিকর্ণিকা দেবী চৌধুরাণী। ইঁহারা উভয়েই কীর্ত্তিমতী ছিলেন। বৃহৎ পুষ্করিণী

খনন, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ হিতকর নানাকার্য্যে অর্থদান করিয়া গিয়াছেন।

রাজমোহনের দুইপুত্র, মধুসূদন ও চন্দ্রমোহন। চন্দ্রমোহন সঙ্গীত ও মল্ল ক্রীড়াদির একজন উৎসাহদাতা ছিলেন।

১২৮৬ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখে মধুসূদনের জন্ম হয়। তিনি আপন জমিদারীর মধ্যে বহু নীলকুঠী স্থাপন এবং মুর্শিদাবাদে একটী রেশমের কুঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া বিস্তর ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় অন্নসত্র খুলিয়া বহু দরিদ্র প্রজার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে শ্রীপাঠ নবদ্বীপ ধামে দুরন্ত বিসূচিকা রোগে তাঁহার ৺গঙ্গালাভ ঘটে। রঙ্গপুর তুষভাণ্ডারের সন্নিহিত বৈরাতী নামক ত্রিস্রোতা নদীর কূলবর্ত্তী একখানি সমৃদ্ধ গ্রামের প্রসিদ্ধ পালধী বংশের গঙ্গাপ্রসাদ পালধী মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা মহামায়া দেবীর সহিত মধুসূদনের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। মধুসূদনের মৃত্যুর পর মহামায়া দেবী চৌধুরাণী অতি দক্ষতার সহিত জমিদারী পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং ব্রত নিয়ম ও অশেষ দানশীলতার দ্বারা এতদ্দেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি পিতৃ ও স্বামীকুলে ধন সম্পত্তির মধ্যে লালিতা ও পালিতা হইয়াও এত কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন যে নিজে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রন্ধনাদি করিয়া পরগণার যাবতীয় ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য বহুবার সম্পন্ন করিয়াছিলেন, পাচকের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ইহার রন্ধন পটুতা দেশ বিখ্যাত। ১২৬৪ সালের ২০শে কার্ত্তিক ইহার জন্ম হয় এবং ১৩২৬ সালের ১৭ই কার্ত্তিক পুত্র, পৌত্র, কন্যা, দৌহিত্র দৌহিত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সজ্ঞানে কলিকাতায় ৺গঙ্গালাভ করেন। ইহার কৃতী পুত্রদ্বয় ৺ গঙ্গাতীরেই দশাহে মাতার পুণ্যের অনুরূপ দান সাগর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সুনির্ব্বাহ করিয়া মাতৃভক্তির

পরিচয় দিয়াছেন। ঐ শ্রাদ্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, সি, আই, ই মহোদয় অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। ইঁহার মাসিক ও সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধেও কাঙ্গালী ভোজন, শীতবস্ত্র দান ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়াছিল। কুণ্ডিতে অধুনা এরূপ বৃহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয় নাই।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মধুসূদন রায় চৌধুরীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ১২৭৯ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁনি একজন সুবিজ্ঞ জমিদার। মণীন্দ্র বাবু বিশ বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। সদর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ৯ বৎসর উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং সন্তঃপুষ্করিণী ইউনিয়ন কমিটী স্থাপনাবধি উহার চেয়ারম্যানের কাজ করিতেছেন। কুণ্ডির মধ্যে ইঁনি এখন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রধান জমিদার।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে ইনি একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। নিম্নে পত্রখানির প্রতিলিপি দেওয়া হইল :—

By command of His Excellency the Viceroy and Governor-General in Council this certificate is presented in the name of His most Gracious Majesty King George V, Emperor of India, on the occasion of His Imperial Majesty's Coronation Darbar at Delhi to Babu Manindra Chandra Roy Chowdhury, Zamiuder Koondi in recognition of his services as an Honarary

Magistrate, a Member of the District Board and Chairman of the Local Board, Rangpur.

Thos. S. Bayley.

December, 12th 1911. LIEUTENANT-GOVERNOR OF EASTERN BENGAL AND ASSAM.

মনীন্দ্রচন্দ্রের পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র কুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

মধুসূদন রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক। "রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ" এবং "উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন" সুরেন্দ্রচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রচন্দ্র রঙ্গপুরের সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই প্রযত্নে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গ সাহিত্যের একজন চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া সুরেন্দ্র চন্দ্রের প্রসিদ্ধি আছে। বাঙ্গালা মাসিক পত্র পাঠকের নিকট তাঁহার নাম অজ্ঞাত নহে। কবিত্ব শক্তিতেও সুরেন্দ্র চন্দ্র নিতান্ত কম নহেন। রঙ্গপুর জেলার অতি গবেষণা পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর একখানি ইতিহাস প্রণয়নে তিনি ব্রতী আছেন। কামরূপ তত্ত্বাদি সঙ্কলন করিয়া সুরেন্দ্রচন্দ্র ঐতিহাসিক সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর জে, ব্যাস্ আই, সি, এস্ সাহেব বাহাদুর ডিষ্ট্রীক্ট গেজেট (District gazette) রচনা

করিবার সময় তাহার উপাদান সংগ্রহার্থ সুরেন্দ্রচন্দ্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি সাহিত্যে, কি জনহিতকর কার্য্যে সুরেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় অদম্য অধ্যবসায়ী ব্যক্তি রঙ্গপুর জেলায় আর কেহ আছে কিনা সন্দেহ। স্বগ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য সমিতির কার্য্য তৎপরতা দেখিয়া লোকাল বোর্ড প্রতিবৎসর সমিতিকে সাহায্য করিতেন। এক্ষণে ঐ সমিতি ইউনিয়ন কমিটিতে পরিণত হইয়াছে। সুরেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডি গোপালপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও বেতগাড়ী মধুসূদন মেমোরিয়াল মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় সমিতির সভাপতি এবং রঙ্গপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা কমিটির সহকারী সভাপতি। কলিকাতাস্থিত প্রজাপতি সমিতির ইনি অন্যতম সহকারী সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাজনের সুদে যাহাতে দরিদ্র প্রজাবর্গ জর্জ্জরিত না হয় তজ্জন্য তিনি 'রঙ্গপুর জমিদারী ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এই ব্যাঙ্ক হইতে প্রজাগণ জমিদারদিগের মারফতে কমসুদে টাকা ধার করিতে পারে। সুরেন্দ্র বাবু "উত্তরবঙ্গ জমিদার সভা" নামক বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। রঙ্গপুরের অধিবাসিগণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সুরেন্দ্র বাবুকে কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখে এবং তিনি রঙ্গপুরবাসীর হৃদয়ে কতটা আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন তাহা রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ তাঁহার পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের পর তদানীন্তন রঙ্গপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে আই, সি, এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে আহূত পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে সর্ব্বজন সমক্ষে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন তাহা পাঠে জানিতে পারা যাইবে।

অভিনন্দন পত্রখানি এইঃ —

অশেষ প্রীতি সম্মান-ভাজন—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ-সম্পাদক

মহোদয় করকমলেষু—

মহাত্মন্!

আপনার কঠিন পীড়ার সংবাদে রঙ্গপুরবাসী চিন্তাকুল হইয়াছিল সাহিত্য পরিষদ অধীর হইয়াছিল। মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় আপনি নিরাময় হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরাগমন করিলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আপনাকে পাইয়া পরিষদের হৃদয়ে যে আনন্দ হইয়াছে, তাহা আপনাকে না জানাইলে চিত্তের তৃপ্তি বা আনন্দের সার্থকতা হয় না।

যে উদ্যমে সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি, যে কর্ম্ম বৃত্তিতে তাহার উন্নতি যে অসামান্য কার্য্য দক্ষতা ও শ্রম পরায়ণতায় তাহার বিস্তার, সেই শক্তি সমষ্টি বিধাতার ইচ্ছায় কিছুদিনের জন্য পরিষদের মঙ্গল চেষ্টা হইতে অপসারিত হইয়াছিল। বিধির এই বিধান পরিষদের সহ্য বেদন নহে, তাই আজি বিধাতা সেই শক্তি ও সেই উদ্যম অক্ষুণ্ণ ভাবে পরিষদকে ফিরাইয়া দিলেন।

শুনিয়াছি দুঃখের পরে চিত্ত সবল হয়, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি পরিপূর্ণতার সহিত উন্মেষিত হয়, সংসারের করুণতার সঙ্গে প্রাণের স্পর্শ সংঘটিত করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি করাইয়া দেয় ও কর্ম্মকে কামনা-বর্জ্জিত করিয়া পরিণত সাফল্যে লোকহিতে নিয়োজিত করে।

সর্ব্বনিয়ন্তা আপনার চিত্ত পরীক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত দুঃখেরই আয়োজন করিয়াছিলেন। আপনি স্বয়ং যখন জীবন মরণের সন্ধিক্ষেত্রে অবস্থিত ঠিক সেই সময়ে কর্ম্ম সঙ্গিনী পত্নীকে ভগবান অনন্তের পথে টানিয়া লইলেন। ক্ষুদ্র হৃদয়কে এই বেদনায় বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এই চরম বেদনা আপনার চিত্তবৃত্তিকে শান্ত করিয়া সম্পূর্ণ একাগ্রতায় কর্ম্মের দিকে ধাবিত করিল। এই মহাদুঃখ এবং তাহা গ্রহণের এই মহাদৃশ্য লোক শিক্ষাস্থল, সন্দেহ নাই।

হে কর্ম্মবীর, তুমি সেই দুঃখের পথে পরিভ্রমণ করিয়া আসিলে, নিষ্ঠুরতা সংস্পর্শে তোমার হৃদয় করুণ কোমল হইল, তোমার যাতনা বিধৌত হৃৎপিণ্ড পরিষদের জন্য দ্রুততর স্পন্দিত হইল, তুমি তোমার কণ্টকের ভার লইয়া পরিষদের অন্তরে ফিরিয়া আইস। পরিষৎ সেই কণ্টকের মুকুট মাথায় পরিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউক।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়।
তারিখ ২৮ভাদ্র ১৩১৯।

আপনার—
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের
সভ্যবৃন্দ।

বাঙ্গালা ১৩২০ সালের ২৯শে কার্ত্তিক বঙ্গের তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল রঙ্গপুরে উপস্থিত হইলে পরিষৎ সম্পাদক সুরেন্দ্রবাবু সভাপতিসহ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

১৩১৬ সালে রঙ্গপুরে মাননীয় বিচারপতি স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতির সভাপতিত্বে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন প্রধানতঃ সুরেন্দ্রবাবুরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে হয়। উক্ত সম্মিলনের প্রত্যেক শাখার অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য্যবিবরণ সুরেন্দ্রবাবুর সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কার্য্য বিবরণগুলি তাঁহার সাহিত্যশ্রমের বিরাট নিদর্শন বলিয়া

সুধী সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। মিঃ জে এন, গুপ্ত যখন রঙ্গপুরের কালেক্টর ছিলেন, তৎকালে সুরেন্দ্রবাবু রঙ্গপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। তাহার ফলে তথায় "কারমাইকেল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি উক্ত কলেজের প্রথম অন্যতম সম্পাদক এবং একজন প্রধান কর্ম্মী। এই কলেজের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ইঁহারা উভয় ভ্রাতা নিজ জমিদারী হইতে ৪১৯ বিঘা উৎকৃষ্ট ভূমি দান করেন। তাঁহাদিগের এই মহৎদান চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কলেজের প্রধান দ্বারোপরি নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি মর্ম্মর স্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রকৃত গুণ গ্রহণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন:—

"This Tablet is erected to Commemorate the munificence of Babus Monindra Chandra Roy Chowdhury and Surendra Chandra Roy Chowdhury, and Zeminders of Kundi, in making a free gift to the Carmichael College of their propritory interest in 419 Bighas of lands, on which the College stands."

সুরেন্দ্রবাবু পূর্ব্ববঙ্গে টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটির (Text book committee) একজন সভ্য। ইনি সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে একটী সম্মানসূচক দরবার পদক প্রাপ্ত হন সম্প্রতি ইনি রঙ্গপুর জেলা বোর্ডের প্রথম অন্যতম বে-সরকারী সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইনি কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য স্বরূপে বহুদিন কাজ করিতেছেন ইনি রঙ্গপুর জেলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। রঙ্গপুর অঞ্চলে গৃহ শিল্পের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি ইনি কুটি বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু প্রথমে ভবানীপুরের রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা হরিমতী দেবীকে বিবাহ করেন, সেই পত্নীর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় বংশের দৌহিত্রী নীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিমলা কুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই পত্নীর গর্ভে সৌরেন্দ্রকুমার ও শীতল কুমার নামক দুইটী শিশু পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক বিবরণ—মন্তব্য

কুণ্ডী জমিদারগণের আদি বসত বাড়ী সন্তঃপুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কতক বিদ্যমান আছে। সরিকগণ ভিন্ন হইয়া তিনআনি এবং পৌনে চারি আনি সরিকদ্বয় সন্তঃপুষ্করিণী গ্রামে, এক আনির সরিকগণ অযোধ্যাপুর গ্রামে, ছোট ৴১০ আনির সরিকদ্বয় গোপালপুর গ্রামে এবং বড় ৴১০ আনির সরিকগণ হরিদেবপুর গ্রামে বসতি করিতেছেন।

পৌণে চারি আনীর জমিদার বংশের অধিকারভুক্ত উক্ত স্থানের চণ্ডী মণ্ডপের গাত্রে দুই খানি লিপিযুক্ত ইষ্টক সংযুক্ত ছিল; তন্মধ্যে অর্দ্ধের ইষ্টক-খানিতে "শাকে বেদগ্রহ তিথিমিতে শ্রীহরেঃ পাদপদ্মনি" শ্লোকাংশটি দেউল নির্ম্মাণের সময় লিখিত ছিল। কালের করালগ্রাস ইষ্টকখানিকে কোথায় লইয়া গিয়াছে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। অপরস্থিত ইষ্টকখানি সুরেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া রঙ্গপুর পরিষদের সুখ্যাত চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে; উহার লিপি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"......শিবরামেণ প্রাসাদোঽয়ং।
সংস্কৃত ১৬৬৬ শাক।"

রঘুরাম কুণ্ডীর আদিপুরুষ কেশবের পৌত্র পর্য্যায়ভুক্ত, সুতরাং এই সংস্কৃত প্রাসাদ নির্ম্মাণের কাল ১১৫১ বঙ্গাব্দের অন্ততঃ শতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০৫০ সালে উক্ত চণ্ডীর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ চণ্ডীমণ্ডপের সান্নিধ্যে কেশব প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ দ্বারা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ ৵১৫ আনির জমিদারবর্গ তদ্বংশীয়গণের আদি বাসস্থানের চিহ্ন কালের করালকবল হইতে রক্ষা করিয়া অশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

কুণ্ডী পৌনে চারি আনী ছোটতরফ জমিদার বংশ।

স্বনামধন্য রাজমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের জীবনী পূর্ব্বে বিবৃত হওয়ায় তাহার পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই। রাজমোহনের দুই পত্নী—কাত্যায়ণী দেবী চৌধুরাণী ও মণিকর্ণিকা দেবী চৌধুরাণী। তাঁহার দুই পুত্র মধুসূদন ও চন্দ্রমোহন। উক্ত পুত্রদ্বয় তুল্যাংশে পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিয়া লওয়ায় পৌনে চারি আনীর বড় তরফ ও ছোট তরফের সৃষ্টি। চন্দ্রমোহন ছোট তরফের আদি মালিক। চন্দ্রমোহনের ন্যায় দানশীল, বদান্যবর জমিদার অতি বিরল ছিল। তাঁহার ন্যায় সৌখিন ব্যক্তি তৎকালে রংপুর জেলায় আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। সেকালের আদর্শ জমিদারদিগের ন্যায় তিনি সঙ্গীত ও মল্লক্রীড়ার একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সন ১২৮০ সালের দুরন্ত মন্বন্তরের সময় তিনি নিজ এলাকাধীন ফতেপুর ঘাটে বহু অর্থ ব্যয়ে প্রকাণ্ড অন্নসত্র খুলিয়া দুঃস্থ জন সাধারণের দুঃখ নিবারণের ব্যবস্থা করেন। এই সত্রে ভাত ডাল রন্ধন করিয়া নৌকায় ঢালিয়া রাখা হইত। এই বিরাট অনুষ্ঠানের কথা আজ পর্য্যন্ত কিম্বদন্তীরূপে এ দেশে চলিত আছে।

কলিকাতা সহরে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অল্প সময় মাত্র রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ গঙ্গা লাভ করেন। ডিমলা পরগণের সুপ্রসিদ্ধ রাজা জানকীবল্লভ সেন ইঁহার বন্ধু ছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বকালের রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা বন্ধুত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ হন।

চন্দ্রমোহন মৃত্যুকালে উক্ত রাজা বাহাদুরকে তাঁহার ষ্টেটের একজিকিউটার করিয়া যান।

ইঁহার প্রথমা পত্নী অন্নপূর্ণা দেবী চৌধুরাণীর গর্ভজাত তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতাপচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। চন্দ্রমোহনের অপর পুত্রগণের ন্যায় ইঁহারাও পিতার বদান্যতা ও সৌজন্যতা গুণের অধিকারী হন। জ্যেষ্ঠ প্রতাপচন্দ্র বিখ্যাত বলশালী ও শিকারী ছিলেন। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার নিকটস্থ মানিক্যডিহির প্রসিদ্ধ জমিদার ৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় ভূকৈলাশের বিখ্যাত রাজা সত্যকৃষ্ণ ঘোষালের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তৃতীয় পুত্র মনীশচন্দ্র ১২৭৩ সালের ১লা ভাদ্র তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী, সুরসিক, উদার ও অমায়িক স্বভাবের ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। রংপুরের প্রায় সকল জমিদার এমন কি সুদূর আসাম অঞ্চলের ও ভিন্ন দেশীয় বহু জমিদার তাঁহার সহিত আন্তরিক বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না। আত্মীয় স্বজন বা জ্ঞাতিবর্গ মধ্য কেহ কোনরূপ বিপদগ্রস্থ হইলে মনীশচন্দ্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহার সাহায্য করে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সাংসারিক নানাবিধ শিল্পকর্ম্মে, কৃষিকার্য্যে, পশু পালন ও পশু চিকিৎসায় তাঁহার অপার আনন্দ ও অসীম দক্ষতা ছিল। তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকই হস্তী, গো, অশ্বাদির ভাল মন্দ চিনিতে পারিতেন। তিনি যৌবনকালে তিনটী অশ্ব পাশাপাশি রাখিয়া একটীতে আরোহণ করতঃ সকলগুলি এক সঙ্গে চালাইতে পারিতেন। হস্তী চালনে ও শিকারে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। সদ্ভঃ পুষ্করিণীস্থ মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির তিনি সরিকগণ সহ সংস্কার করেন এবং ফতেপুর ঘাটে সাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য

সেতু নির্ম্মাণ করে তিনি ভ্রাতাগণ সহ পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। রঙ্গপুরে কলেজ স্থাপন জন্য তিনি নিজ জমিদারী হইতে বহু জমি দান করেন। তাঁহার নাম ধারণ করিয়া আজও শ্বেত প্রস্তর খণ্ড কলেজের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। তিনি রাজনৈতিক (Political and Public life) জগতে নাম প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল (motto) "আমি চাহি না হইতে, এ বিশ্বজগতে, বিরাট বিপুল বিস্ময় মহান। কর মোরে ধন্য, সৃজিয়ে নগণ্য, যাহাতে জীব লভয়ে কল্যাণ।"

হুগলী জেলাস্থিত শিমলাগড়ের প্রাচীন এবং সাত্ত্বিক জমিদার ৺নবীন চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা প্রভাবতী দেবী ও কনিষ্ঠা কন্যা উষাবতী দেবী একই দিবসে যথাক্রমে মনীশচন্দ্র এবং স্বনামধন্য সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (M. A. D. L. রায় বাহাদুর) মহাশয়ের সহিত পরিণীতা হন। সন্তানগণের শিক্ষাদান বিষয়ে তিনি রংপুর জমিদার সম্প্রদায়ে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ১৩২৮ সালের ১৫ আষাঢ় তিনি তাঁহার রঙ্গপুর সহরস্থিত বাসাবাটীতে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে রঙ্গপুর সহরবাসী সকল জমিদার এবং মনীশচন্দ্রের জ্ঞাতিগণ ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ভদ্র মহোদয় শোকার্ত্ত হৃদয়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

মনীশচন্দ্রের সহোদরা কনিষ্ঠা ভগিনী যোগমায়া দেবী, পদ্মিনী উপাখ্যান রচয়িতা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশোদ্ভব খিদিরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর (Hony. Mag. municipal commissioner, vice-Chairman. Dist—Board 24 perg.) মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ৺ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (municipal commssioner) মহাশয়ের সহিত বিবাহিতা হন।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ, বি এল।

মনীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ জিতেন্দ্রচন্দ্র ও কনিষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র। জিতেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার মাতামহের হুগলী সহরস্থিত বাটীতে ১২৯৫ সালের ১০ই আষাঢ় তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি স্থানীয় (কুণ্ডী) বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু মধ্য ইংরাজি স্কুল হইতে পরীক্ষা দেওয়া হেতু শিক্ষা বিভাগের নিয়মানুসারে রঙ্গপুর জেলার মধ্যে অতি উচ্চ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও বৃত্তি পান নাই। তৎপর তিনি রঙ্গপুর জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতঃ উক্ত স্কুল হইতে মধ্য ইংরাজী (M. E.) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া "বৃত্তি" প্রাপ্ত হন। তৎপর বৃত্তি ও সংস্কৃত সাহিত্যে স্বর্ণ পদক সহ রঙ্গপুর জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। F. A. পরীক্ষাতেও তিনি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার হইতে B. A. এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে university Law college হইতে B. L. পাশ করেন। তিনিই রংপুর জমিদার সম্প্রদায় মধ্যে প্রথম B. A. এবং অদ্যাবধি প্রথমও ও এক মাত্র B. L.। অঙ্ক, বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বরাবরই বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখা গিয়াছে। মনীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের শিক্ষার গুণে জিতেন্দ্রচন্দ্র আধুনিক "সাহেবী ধরণে" শিক্ষিত যুবকগণের ন্যায় জীবনের অন্য দিক ও উপেক্ষা করেন নাই। টেনিস, ক্রীকেট, ফুটবল প্রভৃতি "সাহেবী" খেলা তাশ, পাশা, ইত্যাদি দেশীয় খেলা প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বালক কাল অর্থাৎ এগার বৎসর বয়স হইতে তিনি শীকার করিতে আরম্ভ করেন। তখন বন্দুক নিজে তুলিতে পারিতেন না, অপর এক

প্রনের স্কন্ধে রাখিয়া আওয়াজ করিতেন। তিনি বাল্যাবধিই শিকারের অত্যন্ত অনুরাগী, স্কুল কলেজ হইতে পলাতক হইয়াও শিকার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তিনি প্রথম ব্যাঘ্র শিকার করেন, অধুনা জিতেন্দ্র বাবুর ন্যায় দক্ষ শিকারী এবং বন্দুক, রাইফেল প্রভৃতি সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। কোচবিহারের সুবিখ্যাত মহারাজা ৺নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর, তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর, ডিমলার কুমার যামিনী বল্লভ সেন, জলপাইগুড়ীর কুমার প্রসন্ন দেব রায়কত এবং রঙ্গপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব প্রভৃতি সহ এবং একাকী ইনি রংপুর জেলার নানা স্থানে, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সুন্দরবন, কটক, কোচবিহার, কাশিমবাজার ও কলিকাতার সন্নিকটস্থ নানা স্থানে বহু শিকার করিয়াছেন। হস্তী, অশ্ব, শকট, দ্বিচক্রযান ইত্যাদি চালনে জিতেন্দ্র বাবুর সবিশেষ নিপুণতা আছে। সঙ্গীত অভিনয় প্রভৃতি বীণাপাণির চারু শিল্প কলাও তিনি যথেষ্ট আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি একজন সুনিপুণ অভিনেতা, সকল দিক দেখিতে গেলে ইংরেজী ভাষায় সংক্ষেপে বলা যায় যে জিতেন্দ্রবাবুর ন্যায় Highly accomplished and good all round sports man সচরাচর দেখা যায় না। পিতার বদান্যতা, সৌজন্যতা ও মিষ্টভাষীতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তিয়াছে।

সাহিত্যিক সমাজেও জিতেন্দ্র বাবু সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত নিজ শিকার কাহিনী ইত্যাদি বঙ্গসাহিত্যের উপেক্ষিত অংশের পুষ্টি সাধন করিতেছে। যদিও পিতার ন্যায় ইনিও রাজ নৈতিক গগনে "প্রখর ভাস্কর" রূপে দেখা দিবার জন্য লালায়িত নহেন তথাপিও জিতেন্দ্র বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সে দিকেও যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে। তিনি Koondi H. E. স্কুলের Secretary, Koondi

Dramatic Association এর President, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের (Education committeeর মেম্বর, Local Board (Sadar) এর মেম্বর। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে যখন বাঙ্গালার লাট সাহেব Lord Ronaldshay রঙ্গপুরে আগমন করিয়াছিলেন তখন জিতেন্দ্র বাবু তাঁহার Reception Committeeর Secretary ছিলেন। ইনি উত্তর বঙ্গ জমিদার সভা এবং Rangpore Institute প্রভৃতির Executive Committeeর মেম্বর।

ইনি বহুবাজার সার্পেণ্টাইন লেনের সুবিখ্যাত কৃতিপুরুষ রায় ক্ষেত্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বাহাদুরের পৌত্রী শ্রীমতী মায়ালতা দেবীর পানি গ্রহণ করিয়াছেন।

পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তগত হইবার অল্পকাল মধ্যে তাহার অভিনব সুবন্দোবস্ত করিয়া ইনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এ।

মনীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র সিমলা গড়স্থ মাতামহ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি ইহারও লেখা পড়ায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখা যাইতেছে। রংপুর জমিদার সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষিত অল্প সংখ্যক যুবকগণের মধ্যে ইনি একজন, রংপুর জেলাস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেসন ও কারমাইকেল কলেজ হইতে I A ও B. A. পরীক্ষার যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আরও উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী আছেন। পিতার ও ভ্রাতার নানাবিধ গুণাবলী ইহাতেও বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। এখনও ইহার ছাত্র জীবন চলিতেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে জ্ঞানেন্দ্র বাবু সম্বন্ধেও অনেক কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

কুণ্ডির জমিদারদিগের বংশক্রম।

আদিস্থর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীহর্ষ হইতে ২৬ পর্য্যায় ভুক্ত শঙ্কর—

রামদেব রায় চৌধুরী — রামচরণ রায় চৌধুরী — কৃষ্ণজীবন রায় চৌধুরী

রাঘবেন্দ্র — কৃষ্ণচন্দ্র — রামচন্দ্র

শিবনারায়ণ — রুদ্রদেব — কাশীকান্ত

রাজচন্দ্র — সদাশিব — ভবানী — রাজকিশোর — রাজমোহন (দত্তক)

দুর্গাপ্রসাদ — ঈশ্বরচন্দ্র (দত্তক) — কাশীচন্দ্র (দত্তক) — কালীচন্দ্র

মহেশচন্দ্র

ভুবনমোহিনী (কন্যা) — পূর্ণচন্দ্র (দত্তক) — সতীশচন্দ্র (দত্তক) — জগৎমোহিনী (কন্যা)

প্রফুল্ল — রমেশচন্দ্র (দত্তক)

লালরঞ্জন — শ্যামারঞ্জন — শ্রীশচন্দ্র — যতীশচন্দ্র

কৈলাশ — গোলক — গুরুদাস — গঙ্গাধর — মধুসূদন (দত্তক) — চন্দ্রমোহন (দত্তক)

মৃত্যুঞ্জয় — বিনোদবিহারী

দাস — দুর্গাদাস — শ্যামাদাস

মণীন্দ্রচন্দ্র — সুরেন্দ্রচন্দ্র

মহেন্দ্র — সুধার — মোহিত — জগৎ — সৌরেন্দ্র — শীতল

প্রতাপ — সুরেশ — মনীশ — উপেন্দ্র — নরেশ — বিমল — ক্ষীতীশ

জিতেন্দ্র — জ্ঞানেন্দ্র — অজিৎকুমার — বজার — বসন্ত

আজিমগঞ্জ নওলাক্ষা বংশ।

আজিমগঞ্জের নওলাক্ষা বংশ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিকানীর হইতে আজিমগঞ্জে আগমন করেন। আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। এই বংশ জৈনসম্প্রদায়ের ওসওয়াল সম্প্রদায়ভুক্ত। পূর্ব্বে এই বংশের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ছিল, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস যে এই বংশের এক-জন পূর্ব্ব পুরুষ কন্যার বিবাহে নয় লক্ষ টাকা পণ দেওয়ায় এই বংশকে সর্ব্ব সাধারণে নওলাক্ষা উপাধি প্রদান করে। গোপালচাঁদ নওলাক্ষা সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালাদেশে আসেন। নিম্নে এই বংশের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—

গোপালচাঁদ নওলাক্ষা ব্যবসায় বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক ছিলেন; অতি

স্বর্গীয় গোলাব চাঁদ নওলাক্ষা

অল্প কালের মধ্যে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, কাজেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যশরূপচাঁদ নওলাক্ষা তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। যশরূপ আবার হরেকচাঁদকে পোষ্য গ্রহণ করেন।

হরেকচাঁদ নওলাক্ষা ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার সহিত পৃথক্ হন; তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র। হরেকচাঁদ নিজে ব্যাঙ্কার ও বণিক হিসাবে ব্যবসা চালাইতে থাকেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ের এত বিস্তৃতি সাধন করেন যে, তাঁহার ব্যবসায়ের শাখা কলিকাতা, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, পূর্ণিয়া, মুরলিগঞ্জ, মহারাজগঞ্জ, রাড়িয়াগোলা, কোয়াড়ি, নবাবগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হয়। তিনি মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে জমিদারীও ক্রয় করেন। আজ যে এই বংশ এতটা ধনী, মানী ও মর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়াছে তাহার মূলে হরেকচাঁদের চেষ্টা নিহিত। তিনি অমায়িক ও পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন। কি ইউরোপীয় কি দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার আধিপত্য ছিল। ১৮৭৪ সালের ৬ই নবেম্বর তিনি মারা যান, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোলাপচাঁদ নওলাক্ষা জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখে গোলাপচাঁদ নওলাক্ষা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা তিন ভ্রাতা, তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁহার অন্য দুই ভাই বুলচাঁদ ও দালচাঁদ একই দিনে মারা যান, মৃত্যুকালে তাঁহারা অতি ছোট ছিলেন। এই দুই পুত্রের মৃত্যুতে হরেকচাঁদের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল।

গোলাপচাঁদ তাঁহার পিতার জমিদারী ও ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সেই জমিদারী ও ব্যবসায় তিনি আপন পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে বাড়াইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ বেঙ্কে

তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে দশ বৎসর যাবত কাজ করিয়াছিলেন। পরে রোগাক্রান্ত হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হয়। যদি সেই সময় গোলাপচাঁদ ইহাতে অর্থ সাহায্য না করিতেন তবে অনেক লোক অনাহারে মারা যাইত। দুস্থ প্রজাগণের খাজনা তিনি ত হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেনই, তদুপরি দুই হাজার দরিদ্রকে জুন মাসের প্রথমাবধি খাওয়াইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার যশঃ ও খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। তিনি কারুশিল্পের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচার আদর্শ-স্থানীয় ছিল। আজিমগঞ্জ রেল লাইনের ধারে "রোজ ভিলা" নামক যে সুন্দর অট্টালিকা দেখা যায় তিনি তাহা নির্ম্মাণ করেন। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ আশক্তি ছিল, অধিকাংশ সময় তিনি বন্ধু বান্ধবগণকে লইয়া সঙ্গীতালাপে কাটাইতেন। কি সরকারী, কি বে-সরকারী সমস্ত ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাঁহাকে বিশেষ খাতির ও যত্ন করিতেন। তিনি ইতিহাস-বিখ্যাত জগত শেঠের বংশধর শেঠ কিষণচাঁদের পৌত্রী ও কিষণচাঁদ গোলেকার কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র হইয়াছিল, পুত্রটীর নাম ধনপত সিং নওলাক্ষা। গোলাপচাঁদ দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন; পরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং বহুদিন ব্যাধিতে ভুগিবার পর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন তিনি মারা যান।

ধনপত সিংহ নওলাক্ষা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুরের প্রসিদ্ধ জগত শেঠের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার পিতামহী তাঁহাকে লালন পালন করেন। ধনপত বাবুও দুইবার বিবাহ করেন; তাঁহার প্রথমা পত্নী দুই কন্যা রাখিয়া মারা যান। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তাঁহার তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্র দুইটির নাম আনন্দ সিংহ ও

রোজ ভিলা গান

রায় ধনপৎ সিংহ নওলাক্ষা বাহাদুর
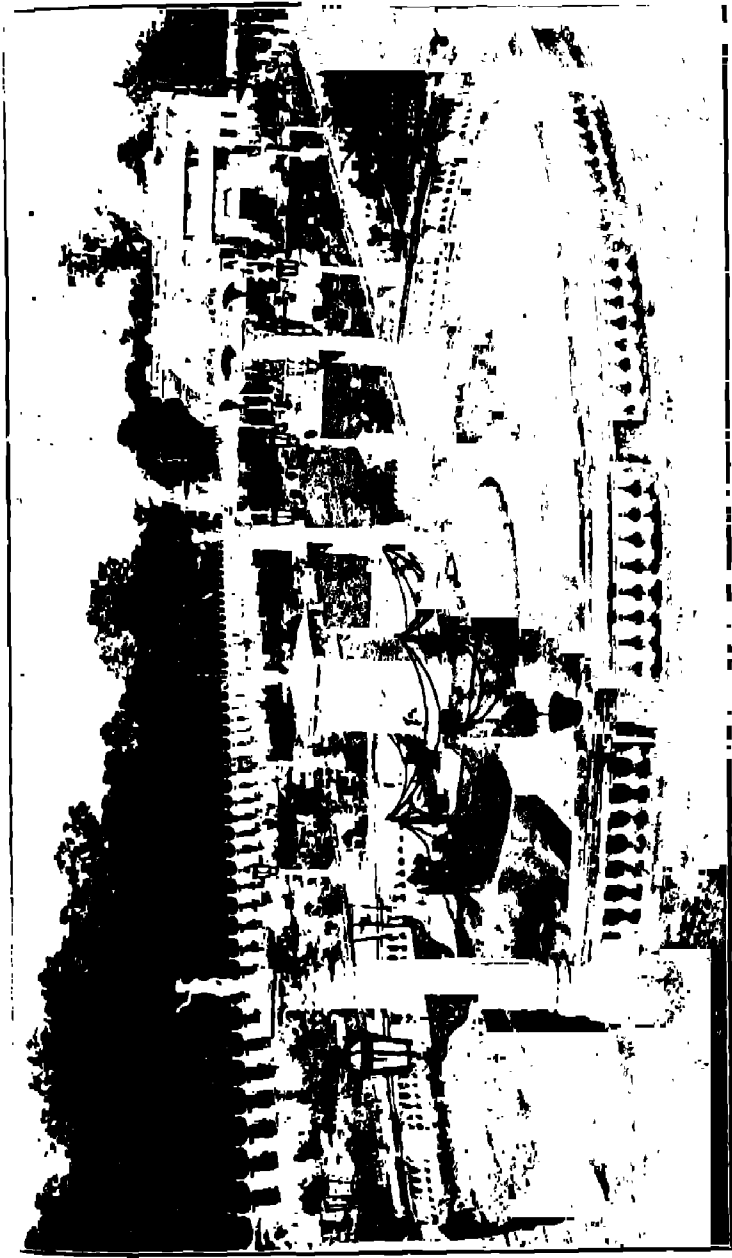
ইন্দ্রজিৎ সিংহ। নওলাক্ষা ধনপত সিংহ মুর্শিদাবাদের জমিদারবর্গ ও জৈনদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার যত কিছু গুণগ্রাম তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন এবং ব্যবসায় ও জমিদারী পরিচালনা ব্যাপারে তিনি পিতার ও পিতৃ-পুরুষের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তিনি লালবাগ বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে ২০০০৲ টাকা, এডওয়ার্ড মেমোরিয়েল এবং লেডী ডাফরিণ ফণ্ড,উডবরণ মেমোরিয়েল ফণ্ড ও ট্রান্সভাল ওয়ার ফণ্ডে ৭০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

আজিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য তিনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ১৫০০০৲ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। পরে ঐ হাসপাতালের বাড়ী ঘরের জন্য আরও ৪৭১৩৲ টাকা দিয়াছিলেন। ভবানীপুরের শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাসপাতালে তিনি ২৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। আজিমগঞ্জ হাসপাতালের ভিত্তি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ কলিন স্থাপন করেন এবং সেই অট্টালিকার নাম হয়—"গোলাপ চাঁদ নওলাক্ষা হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়।"

১৯০৯ সালে বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এড্ওয়ার্ড বেকার হাসপাতালটীর উদ্বোধন করেন। ১৯১০ সালে ধনপত সিংহকে গবর্ণমেণ্ট "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৯১০ সালের ১৬ই জুলাই বহরমপুরে একটি দরবার করিয়া ছোটলাট তাঁহাকে উপাধির সনন্দ ও খিলাত প্রদান করেন। সেই সময়ে ছোটলাট বাহাদুর বলেন—**Your family has been settled in Bengal for more than 150 Years and has flourished and prospered exceedingly. Following the honourable tradition of the Jain Com-**

munity, you have used your wealth in promoting the cause of public charity, with special regard to the relief of the sick and suffering......"

উপাধি পাইবার চারি বৎসর পরে ধনপত সিং দুইপুত্র ও অপরাপর আত্মীয় স্বজন রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ১৯১০ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দ সিং নওলাক্ষা মারা যান। ১৯:৪ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিৎ সিংহ মারা যান। এই দুই পুত্রের মৃত্যুতে নওলাক্ষা বংশ একেবারে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া পড়ে। ১৯১৮ সালে নির্ম্মল কুমার সিং নওলাক্ষাকে পোষ্যগ্রহণ করা হয়। তিনি বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ১৯১৯ সালে তিনি সাবালকত্বে উপনীত হন এবং নিজ হস্তে জমিদারী গ্রহণ করেন।

মুর্শিদাবাদ-বালুচর বড়কুঠীর জমিদার বংশ।

এই বংশের বর্ত্তমান মালিক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপৎসিংহ দুগড় ও শ্রীযুক্ত বাবু জগৎপৎ সিংহ দুগড়।

এই বংশ অতিশয় প্রাচীন এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ রাজপুতনার অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা চৌহানবংশীয় অগ্নিবল রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজপুতনার অন্তর্গত সিন্দমিয়ার নামক স্থানে ইহারা প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন, পরে ইঁহারা আজমীরের অন্তর্গত বসেলপুর নামক স্থানের রাজা হইয়াছিলেন।

সিন্দমিয়ার থানার রাজা সোনচাঁদের অধঃস্তন নবম পুরুষ রাজা মহীপাল বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং সাহসী ভূপতি ছিলেন। তিনি প্রথমে খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, পরে বল্লভপুরি নামক জৈনধর্ম্মাবলম্বী এক মহাপুরুষের যুক্তিপূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রাজা মহীপালের পুত্র মাণিক দেও নাগপুর প্রদেশের অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া বাসনপুর নামক নগর সংস্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র সুরচন্দ্র মালব প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সুগার ও দুগড় নামে দুই পুত্র ছিল। দুগড় রাজ হইতেই বর্ত্তমান জমিদার বংশের উদ্ভব হইয়াছে। কালক্রমে মালবপ্রদেশের অধঃপতন ঘটিলে এই বংশীয় বীরদাসজি দুগড় নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রাজপুতনার অন্তর্গত কিশেনগড় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বালুচরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং বাণিজ্য দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশীয় জৈন সমাজের নেতা ছিলেন।

বীরদাসজি এবং তাঁহার বংশধরগণ জৈনধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। বর্ত্তমান জমিদারগণ জৈনধর্ম্মের একান্ত সেবক বলিয়া পরিচিত। বীরদাসজির দুই পুত্র। এক পুত্রের নাম বুধসিংজি ও অন্যতম পুত্রের নাম বনসিংজি। বনসিংজির কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। বুধসিংজির বাহাদুর সিংজি ও প্রতাপ সিংজি নামে দুই পুত্র ছিল। প্রতাপ সিংজির সময় হইতেই এই বংশ, এই প্রদেশে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করে। প্রতাপ সিংহ বাবু যে সময়ে মুর্শিদাবাদের মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও সম্ভ্রান্ত জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন, সে সময় মুর্শিদাবাদ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধির প্রতি ইংলণ্ডের মহামান্য ডিরেক্টর সভার দৃষ্টি পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তখন মুর্শিদাবাদই ভারতের "লণ্ডন" বলিয়া পরিচিত ছিল। আজ সেই বিরাট ঐশ্বর্য্যশালী মুর্শিদাবাদ এক মহা-ধ্বংসের উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত।

প্রতাপ সিংহ বাবু বালুচরে ও আজিমগঞ্জে দুইটী সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বিপুল বাণিজ্য পরিচালনার নিমিত্ত কলিকাতা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, কুচবিহার, রামপুর-বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানেও সুন্দর সুন্দর কুঠী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান ধনী-মহাজন বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অমায়িক, উদার এবং ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ ছিলেন। একবার তিনি বালুচর ও আজিমগঞ্জনিবাসী স্বজাতীয় বহু লোককে সঙ্গে করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে সকলকে তীর্থস্থান দর্শন করাইয়া আনাইয়াছিলেন। পরোপকারে তিনি সর্ব্বদাই মনোযোগী ছিলেন। তিনি নিজ বসতবাটীর নিকট দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিমিত্ত একটী অন্নসত্র দিয়াছিলেন। এই অন্নসত্রে প্রতিদিন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অনেক

শ্রীযুক্ত শ্রীপত সিংহ দুগার

ও

শ্রীযুক্ত জগপত সিংহ দুগার

সহায় সম্পদহীন নিঃস্ব ব্যক্তি তৃপ্তির সহিত আহার করিত। তিনি অনেক স্থানে জৈন উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। প্রতাপ সিংহ বাবু শেষ জীবনে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জিলায় বিস্তর জমিদারী সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন।

প্রতাপ সিংহ বাবু চারিবার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রথম তিন ভার্য্যা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তিনি ৬০ বৎসর বয়সে পুনরায় মহাতাপকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। এই মহাতাপ-কুমারীর গর্ভেই রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুর ও রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরই বর্ত্তমান জমিদারগণের পিতামহ। প্রতাপ সিংহ বাবু মৃত্যুকালে তাঁহার দুই সুযোগ্য পুত্র, প্রায় এক কোটী টাকা নগদ এবং বিভিন্ন স্থানে বিস্তীর্ণ জমিদারী সম্পত্তি ও বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার বহু জিলায় অনেক সুন্দর সুন্দর কুঠী বাড়ী এবং বিস্তর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাস্তবিকই দেশের একজন বিরাটকর্ম্মী পুরুষের অভাব ঘটিয়াছে।

প্রতাপ সিংহ বাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি রায় লছমী-পৎ সিংহ বাহাদুর ও রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের মধ্যে বিভাগ হয়। প্রতাপ সিংহ বাবু অসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি প্রভাবে বিষয়-কার্য্য পরিচালনা করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন দ্বারা তাঁহার এই বিপুল সম্পত্তির কলেবর আরও বৃদ্ধি করেন। পিতার যাবতীয় সদ্‌গুণেরই তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। পরোপকারে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কত দুঃস্থ পরিবার তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিনি স্বদেশ, স্বজাতি ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্য অকাতরে অজস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি নিরহঙ্কার ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় বালুচরের ও আজিমগঞ্জের অনেক স্বজাতীয়

ভদ্রলোককে নিজব্যয়ে তীর্থ দর্শন করাইয়া আনাইয়াছেন। এই তীর্থ দর্শন ব্যপদেশে তিনি ভারতীয় বহু সামন্ত নৃপতির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। জয়পুরের তদানীন্তন মহারাজা রামসিংজি বাহাদুর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে তিনি একবার কলিকাতায় রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ইতর প্রাণীর প্রতিও তাঁহার বিশেষ দয়া ছিল। সংবৎ ১৯১২ সালে তিনি বালুচর আজিমগঞ্জস্থ ভাগীরথীর জলকরের বন্দোবস্ত লইয়া মৎস্য স্বীকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুর উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে উভয়পক্ষে তুমুল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং উহা সুপ্রীমকোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়। পরিশেষে রায় বাহাদুর লছমীপৎ সিংহের অনুকূলেই ডিক্রী হয়।

তিনি জমিদারী কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী পরিদর্শন করিয়া তাহার শৃঙ্খলা করেন এবং প্রজা-গণের বহুবিধ অসুবিধা দূর করিয়া একজন আদর্শ জমিদার বলিয়া পরিচিত হন। উচ্চপদস্থ বহু রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। তিনি বহুবিধ লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কত হিন্দু-বিধবা তাঁহার অর্থ সাহায্যে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াছে এবং কত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে তিনি অকাতরে অর্থ দান করিয়াছেন তাহা ভাবিতে গেলে বাস্তবিকই তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তিনি দরিদ্রব্যক্তিগণের জন্ম মাসিক প্রায় ২০০০৲ টাকা স্থায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি প্রায় কোটী টাকা লোক-হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া-ছিলেন। মহামান্ত গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহার এবম্বিধ সৎকার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ১৯২৪ সংবতে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি

দানে সম্মানিত করেন। রায় বাহাদুর উপাধি তৎকালে বিশেষ কৃতী-ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেওয়া হইত না। তাঁহাকে বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয় অস্ত্র রাখিবার অধিকারও প্রদান করা হইয়াছিল।

রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুর ১৯১৫ সংবতে অজিমগঞ্জ নিবাসী রায় বুধ সিংহ বাহাদুর ও বিষণ চাঁদ বাহাদুরের ভগ্নীর সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু ছত্রপৎ সিংহ দুগড়ের বিবাহ দেন। এই বিবাহ এত ধুমধাম ও আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে মুর্শিদাবাদ জিলায় এরূপ বিবাহ আর কখনও কেহ দেখে নাই। প্রায় লক্ষ কাঙ্গালী ব্যক্তি এই বিবাহ উপলক্ষে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়াছিল। নৃত্য, গীত, প্রসেসন প্রভৃতির কথা বহুদিন পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদবাসিগণের মনে জাগ্রত ছিল। এই বিবাহে বাঙ্গালার সমস্ত নৃপতিগণ, প্রধান প্রধান জমিদারগণ এবং মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

রায় লছমী পৎ সিংহ বাহাদুর বহু টাকা ব্যয় করিয়া নশীপুর রাজবাটীর পূর্ব্ব দিকের একটী সুরম্য উদ্যান বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাতে শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত একটি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ সুরম্য বাগান বাটী বঙ্গদেশে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। বহু দূর দেশ হইতে এই বাগান দেখিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর বহু লোকের সমাগম হয়। বাগানে অসংখ্য শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। বাগানের সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই দর্শন যোগ্য।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রায় লছমী পৎ সিংহ বাহাদুর একমাত্র পুত্র বাবু ছত্র পৎ সিংহকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

বাবু ছত্রপৎ সিংহ খুব স্বাধীনচেতা, নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় নানাবিধ সৎগুণে অলঙ্কৃত ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ Jain

Defamation case বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া ভারতীয় জৈন সমাজে বিশেষ বরণীয় হইয়াছিলেন। তিনি বহু দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার দানের বিষয় অন্য কেহ জানিতে পারিতেন না। তিনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি শ্রীযুক্ত শ্রীপৎসিংহ ও শ্রীযুক্ত জগৎ পৎসিংহ পুত্রদ্বয়কে উত্তরাধিকারী রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারাই ছত্রপৎ সিংহ বাবুর বিপুল সম্পত্তির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই শিক্ষিত, বিনয়ী, উদার ও দয়াবান। পরোপকারব্রত ইঁহাদের বংশগত প্রথা। ইঁহারা সর্ব্ব বিষয়েই বিশেষ কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতেছেন। উচ্চ শিক্ষার প্রতি ইঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে। রাজমহালের কুমারী হাইস্কুলের জন্য ইঁহারা এককালীন ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত স্কুলে মাসিক সাহায্যও করিতেছেন। অনেক দাতব্যচিকিৎসালয়ের ব্যয় ভার ইঁহারা অকাতরে বহন করিতেছেন। ১৩২৬ সালের অন্ন কষ্টের সময় ইঁহারা বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা উচ্চ মূল্যে অনেক চাউল খরিদ করিয়া তাহা নাম মাত্র মূল্য লইয়া দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন; তাহাতেও বহু নিঃস্ব ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপৎসিংহ দুগর অনেক সভাসমিতির সভ্য, তিনি মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর নমিনেটেড্ কমিশনার। তিনি বড়ই অমায়িক ও শান্ত প্রকৃতির লোক। যে কোন ভদ্র লোক একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার ব্যবহারে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স বর্ত্তমানে প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছে। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স প্রায় ৩৪ বৎসর হইবে।

নিম্নে ইহাদের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—

মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ।

বঙ্গদেশের এডভোকেট জেনারেলের পদ সম্মানে ও মর্য্যাদায় সমুচ্চ। প্রতিপত্তি ও প্রভূত অর্থ এই পদের পুরস্কার। এ পর্য্যন্ত এই উচ্চ সম্মানজনক পদে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বসিয়াছিলেন, আর সম্প্রতি বসিয়াছেন মাননীয় শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয়। সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয় সাধারণতঃ মিঃ এস্, আর, দাশ বলিয়াই পরিচিত। হাইকোর্টে যিনি বড় ব্যারিষ্টার, আইন ও যুক্তিতর্কে যাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা তিনিই এই পদের অধিকারী হন।

ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার তেলির বাগ গ্রামে। এই বংশ চিরদিনই বদান্যতা ও সহৃদয়তা গুণে সুপরিচিত। দাশ মহাশয়ের পিতা ৺দুর্গামোহন দাশ স্বগ্রামে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। দাশ মহাশয়ের পিতামহ ৺কাশীশ্বর দাশের তিন পুত্র ছিল। (১) কালীমোহন (২) দুর্গামোহন (৩) ভুবনমোহন। দুর্গামোহন মাত্র একুশ বৎসর বয়সে বরিশালের সরকারী উকিল হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ পদ্ধতির তিনি সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। এই কারণে তত্রত্য হিন্দু সমাজ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করে এবং দীর্ঘ ছয় মাসের মধ্যে তিনি ভৃত্য, পাচক, পাচিকা প্রভৃতি না পাওয়ায় অতি কষ্টে কাটাইয়াছিলেন। দুর্গামোহন অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন, তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন প্রাণান্তেও তাহা হইতে বিচলিত হইতেন না। হিন্দু সমাজ তাঁহার উপর কঠোর হইতে কঠোরতর অত্যাচার করিতে লাগিল, দুর্গামোহন তথাচ তাঁহার স্থির মতের পরিবর্ত্তন করিলেন না। তাঁহার উদারতা

মুর্শিদাবাদ বালুচরের
৺রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের
বংশ পরিচয়।

এই বংশের বর্ত্তমান মালিক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপৎসিংহ দুগড় ও শ্রীযুক্ত বাবু জগৎপৎ সিংহ দুগড়।

এই বংশ অতিশয় প্রাচীন এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত। ইহাঁদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ রাজপুতনার অধিবাসী ছিলেন। ইহাঁরা চৌহানবংশীয় অগ্নিবল রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজপুতনার অন্তর্গত সিন্দমিয়ার নামক স্থানে ইঁহারা প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন, পরে ইঁহারা আজমীরের অন্তর্গত বাসলপুর নামক স্থানের রাজা হইয়াছিলেন।

সিন্দমিয়ার থানার রাজা সোমচাদের অধঃস্তন নবম পুরুষ রাজা মহীপাল বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং সাহসী ভূপতি ছিলেন। তিনি প্রথমে খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, পরে বল্লভসূরি নামক জৈনধর্ম্মাবলম্বী এক মহাপুরুষের যুক্তিপূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রাজা মহীপালের পুত্র মাণিক দেও নাগপুর প্রদেশের অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া বাসলপুর নামক নগর সংস্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র সুরচন্দ্র মালব প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার দুগড় ও সুগড় নামে দুই পুত্র ছিল। দুগড় রাজা হইতেই বর্ত্তমান জমিদার বংশের উদ্ভব হইয়াছে। কালক্রমে মালবপ্রদেশের অধঃপতন ঘটিলে এই বংশীয় বীরদাসজি দুগড় নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রাজপুতনার অন্তর্গত কিশেনগড় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বালুচরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং বাণিজ্য দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশীয় জৈন সমাজের নেতা ছিলেন।

বীরদাসজি এবং তাঁহার বংশধরগণ জৈনধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। বর্ত্তমান জমিদারগণ জৈনধর্ম্মের একান্ত সেবক বলিয়া পরিচিত। বীরদাসজির দুই পুত্র। একপুত্রের নাম বুধসিংজি ও অন্যতম পুত্রের নাম বনসিংজি। বনসিংজির কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। বুধসিংজির বাহাদুর সিংজি ও প্রতাপ সিংজি নামে দুই পুত্র ছিল। প্রতাপ সিংজির সময় হইতেই এই বংশ, এই প্রদেশে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করে। প্রতাপ সিংহ বাবু যে সময়ে মুর্শিদাবাদের মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও সম্ভ্রান্ত জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন, সে সময় মুর্শিদাবাদ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধির প্রতি ইংলণ্ডের মহামান্য ডিরেক্টর সভার দৃষ্টি পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তখন মুর্শিদাবাদই ভারতের "লণ্ডন্" বলিয়া পরিচিত ছিল। আজ সেই বিরাট ঐশ্বর্য্যশালী মুর্শিদাবাদ এক মহা-ধ্বংসের উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত।

প্রতাপ সিংহ বাবু বালুচরে ও আজিমগঞ্জে দুইটী সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বিপুল বাণিজ্য পরিচালনার নিমিত্ত কলিকাতা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর কুচবিহার, রামপুর-বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানেও সুন্দর সুন্দর কুঠী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান ধনী-মহাজন বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অমায়িক, উদার এবং ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ ছিলেন। একবার তিনি বালুচর ও আজিমগঞ্জ নিবাসী স্বজাতীয় বহু লোককে সঙ্গে করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে সকলকে তীর্থস্থান দর্শন করাইয়া আনিয়াছিলেন। পরোপকারে তিনি সর্ব্বদাই মনযোগী ছিলেন। তিনি নিজ বসতবাটীর নিকট দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিমিত্ত একটী অন্নসত্র দিয়াছিলেন। এই অন্নসত্রে প্রতিদিন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অনেক

সহায় সম্পদহীন নিঃস্ব ব্যক্তি তৃপ্তির সহিত আহার করিত। তিনি অনেক স্থানে জৈন উপসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রতাপ সিংহ বাবু শেষ জীবনে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জিলায় বিস্তর জমিদারী সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন।

প্রতাপ সিংহ বাবু চারিবার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রথম তিন ভার্য্যা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তিনি ৬০ বৎসর বয়সে পুনরায় মহাতাপকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। এই মহাতাপ-কুমারীর গর্ভেই রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুর ও রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরই বর্ত্তমান জমিদারগণের পিতামহ। প্রতাপ সিংহ বাবু মৃত্যুকালে তাঁহার দুই সুযোগ্য পুত্র, প্রায় এক কোটী টাকা নগদ এবং বিভিন্ন স্থানে বিস্তীর্ণ জমিদারী সম্পত্তি ও বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার বহু জিলায় অনেক সুন্দর সুন্দর কুঠি বাড়ী এবং বিস্তর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাস্তবিকই দেশের একজন বিরাটকর্ম্মী পুরুষের অভাব ঘটিয়াছে।

প্রতাপ সিংহ বাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি রায় লছমী-পৎ সিংহ বাহাদুর ও রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের মধ্যে বিভাগ হয়। লছমীপৎ সিং বাবু অসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি প্রভাবে বিষয় কার্য্যে পরিচালনা করিয়া প্রভূত ধনউপার্জ্জন দ্বারা তাঁহার এই বিপুল সম্পত্তির কলেবর আরও বৃদ্ধি করেন। পিতার যাবতীয় সদ্গুণেরই তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। পরোপকারে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কত দুঃস্থ পরিবার তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিনি স্বদেশ, স্বজাতি ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্য অকাতরে অজস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি নিরহঙ্কার ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় বালুচরের ও আজিমগঞ্জের

অনেক স্বজাতীয় ভদ্রলোককে নিজব্যয়ে তীর্থ দর্শন করাইয়া ছিলেন। এই তীর্থ দর্শন ব্যপদেশে তিনি ভারতীয় বহু সামন্ত নৃপতির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। জয়পুরের তদানীন্তন মহারাজা সবাই রায়-সিংজি বাহাদুর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে তিনি একবার কলিকাতায় রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ইতর প্রাণীর প্রতিও তাঁহার বিশেষ দয়া ছিল। সংবৎ ১৯১১ সালে তিনি বালুচর আজিমগঞ্জস্থ ভাগীরথীর জলকরের বন্দোবস্ত লইয়া মৎস্য শীকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুর উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে উভয়পক্ষে তুমুল মোকোদ্দমা উপস্থিত হয় এবং সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়। পরিশেষে রায় বাহাদুর ছলমীপৎ সিংহের অনুকূলেই ডিক্রী হয়।

তিনি জমিদারী কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী, পরিদর্শন করিয়া তাহার শৃঙ্খলা করেন এবং প্রজাগনের বহুবিধ অসুবিধা দূর করিয়া একজন আদর্শ জমিদার বলিয়া পরিচিত হন। উচ্চপদস্থ বহু রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। তিনি বহুবিধ লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কত হিন্দু-বিধবা তাঁহার অর্থ সাহায্যে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াছে এবং কত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে তিনি অকাতরে অর্থ দান করিয়াছেন তাহা ভাবিতে গেলে বাস্তবিকই তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তিনি দরিদ্রব্যক্তিগণের জন্য মাসিক প্রায় ২০০০৲ টাকা স্থায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি প্রায় কোটী টাকা লোক-হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। মহামান্য গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহার এবম্বিধ সৎকার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ১৯২৪ সংবতে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি

দানে সম্মানিত করেন। রায় বাহাদুর উপাধি তৎকালে বিশেষ কৃতী-ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেওয়া হইত না। তাঁহাকে বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয় অস্ত্র রাখিবার অধিকারও প্রদান করা হইয়াছিল।

রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুর ১৯২৪ সংবতে খৃষ্টাব্দ ১৮৬৭ আজিমগঞ্জ নিবাসী রায় বুধ সিংহ বাহাদুর ও বিষণ চাঁদ বাহাদুরের ভগ্নীর সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু ছত্রপৎ সিংহ দুগড়ের বিবাহ দেন। এই বিবাহ এত ধুমধাম ও আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে মুর্শিদাবাদ জিলায় এরূপ বিবাহ আর কখনও কেহ দেখে নাই। প্রায় লক্ষ কাঙ্গালী ব্যক্তি এই বিবাহ উপলক্ষে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়াছিল। নৃত্য, গীত, প্রসেসন, প্রভৃতির কথা বহুদিন পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদবাসিগণের মনে জাগ্রত ছিল। এই বিবাহে বাঙ্গালার সমস্ত নৃপতিগণ, প্রধান প্রধান জমিদারগণ এবং মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুর বহুটাকা ব্যয় করিয়া নশীপুর রাজ বাটীর পূর্ব্ব দিকে কাঠগোলা নামক একটী সুরম্য উদ্যান বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাতে শ্বেত মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত একটি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ সুরম্য বাগান বাটী বঙ্গদেশে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। বহু দূর দেশ হইতে এই বাগান দেখিবার নিমিত্ত প্রতিবৎসর বহুলোকের সমাগম হয়। বাগানে অসংখ্য শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। বাগানের সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই দর্শন যোগ্য।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রায় লছমী পৎ সিংহ বাহাদুর একমাত্র পুত্র বাবু ছত্র পৎ সিংহকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

বাবু ছত্রপৎ সিংহ খুব স্বাধীনচেতা, নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় নানাবিধ সৎগুণে অলঙ্কৃত ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ Jain

Defamation case বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া ভারতীয় জৈন সমাজে বিশেষ স্মরণীয় হইয়াছিলেন। তিনি বহু দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার দানের বিষয় অন্ত কেহ জানিতে পারিতেন না। তিনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি শ্রীযুক্ত শ্রীপৎসিংহ ও শ্রীযুক্ত জগৎ পৎ সিংহ পুত্রদ্বয়কে উত্তরাধিকারী রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারাই ছত্রপৎ সিংহ বাবুর বিপুল সম্পত্তির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা উভয় ভ্রাতাই শিক্ষিত, বিনয়ী, উদার ও দয়াবান। পরোপকারব্রত ইহাঁদের বংশগত প্রথা। ইহারা সর্ব্ব বিষয়েই বিশেষ কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতেছেন। উচ্চ শিক্ষার প্রতি ইহাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে। রাজমহালের জমাহের কুমারী হাইস্কুলের জন্ম ইহাঁরা এককালীন ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত স্কুলে মাসিক সাহায্যও করিতেছেন। অনেক দাতব্যচিকিৎসালয়ের ব্যয় ভার ইহাঁরা অকাতরে বহন করিতেছেন। ১৩২৬ সালের ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অন্ন কষ্টের সময় ইহারা বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ইহারা উচ্চ মূল্যে অনেক চাউল খরিদ করিয়া তাহা নাম মাত্র মূল্য লইয়া দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন; তাহাতেও বহু নিঃস্ব ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপৎসিংহ দুগর অনেক সভাসমিতির সভ্য, তিনি মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর নমিনেটেড্ কমিশনার। তিনি বড়ই অমায়িক ও শান্ত প্রকৃতির লোক। যে কোন ভদ্র লোক একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার ব্যবহারে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়স বর্ত্তমানে প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছে। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স প্রায় ৩৪ বৎসর হইবে।

নিম্নে ইহাদের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—'

মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ।

বঙ্গদেশের এডভোকেট জেনারেলের পদ সম্মানে ও মর্য্যাদায় সমুচ্চ। প্রতিপত্তি ও প্রভূত অর্থ এই পদের পুরস্কার। এ পর্য্যন্ত এই উচ্চ সম্মানজনক পদে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বসিয়াছিলেন, আর সম্প্রতি বসিয়াছেন মাননীয় শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয়। সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয় সাধারণতঃ মিঃ এস্, আর, দাশ বলিয়াই পরিচিত। হাইকোর্টে যিনি বড় ব্যারিষ্টার, আইন ও যুক্তিতর্কে যাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি এই পদের অধিকারী হন।

ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার তেলির বাগ গ্রামে। এই বংশ চিরদিনই বদান্যতা ও সহৃদয়তা গুণে সুপরিচিত। দাশ মহাশয়ের পিতা ৺দুর্গামোহন দাশ স্বগ্রামে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। দাশ মহাশয়ের পিতামহ ৺কাশীশ্বর দাশের তিন পুত্র ছিল। (১) কালীমোহন (২) দুর্গামোহন (৩) ভুবনমোন। দুর্গামোহনে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে বরিশালের সরকারী উকিল হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ পদ্ধতির তিনি সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। এই কারণে তত্রত্য হিন্দু সমাজ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করে এবং দীর্ঘ ছয় মাসের মধ্যে তিনি ভৃত্য, পাচক, পাচিকা প্রভৃতি না পাওয়ায় অতিকষ্টে কাটাইয়াছিলেন। দুর্গামোহন অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন, তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন প্রাণান্তেও তাহা হইতে বিচলিত হইতেন না। হিন্দু সমাজ তাঁহার উপর কঠোর হইতে কঠোরতর অত্যাচার করিতে লাগিল, দুর্গামোহন তথাচ তাঁহার স্থির মতের পরিবর্ত্তন করিলেন না। তাঁহার উদারতা

শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ।

এ মহানুভবতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার যাঁহারা পরম শত্রু তিনি তাঁহাদিগেরও অকাতরে উপকার করিতেন। বরিশালে অবস্থানকালে তত্রত্য অনেকেই তাঁহার উপর কঠোর সামাজিক অত্যাচার করিত, তিনি কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্ত কাহারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করিতেন না। বরিশালের তদানীন্তন উকীল বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয় তাঁহার পরম শত্রু ছিলেন, তিনি একবার কঠিন ব্যাধিতে পড়েন। দুর্গামোহন বাবু তাঁহার শত্রুর এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত বরিশালের সিভিল সার্জ্জনকে লইয়া তাঁহার চিকিৎসা করান এবং বিশ্বেশ্বর বাবুর অজ্ঞাতসারে সিভিল সার্জ্জনকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করেন। বিশ্বেশ্বর বাবু আরোগ্য হইয়া সিভিল সার্জ্জনকে টাকা দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলেন যে তিনি দুর্গামোহন বাবুর নিকট হইতে টাকা পাইয়াছেন। বিশ্বেশ্বর বাবু দুর্গামোহন বাবুর এরূপ উদারতা দেখিয়া তাঁহার বন্ধু হইয়া পড়েন।

বরিশালের একটি জমিদার তাঁহার পরম শত্রু ছিলেন। একবার এই জমিদার-পুত্র একটি খুনী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়। দুর্গামোহন বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই জমিদার পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাকে ফাঁসীর হাত হইতে উদ্ধার করেন। তদবধি এই জমিদার বংশ দুর্গামোহন বাবুর পরম বন্ধু হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের এই রূপ আরও অনেক উদারতার উদাহরণ আছে, তাহা এইরূপ ক্ষুদ্র জীবনীতে সম্যক আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। বরিশাল হইতে দুর্গামোহন বাবু ভবানীপুর আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই ভবানীপুরেই ১৮৭২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সতীশরঞ্জন ভাবীজীবনে যে একজন ভারতবিখ্যাত লোক হইবেন তাহার চিহ্ন তিনি অতি শিশুকাল হইতেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

দুর্গামোহনও পুত্রকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে বিরত ছিলেন না। তিনি নিজে বিদ্যোৎসাহী, কাজেই কি প্রকারে পুত্রকে বিদ্যা বুদ্ধিতে দেশবরেণ্য করিবেন এই চিন্তা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরিত থাকিত শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে, তিনি বালক সতীশরঞ্জনকে রাখেন। অঘোরনাথ বিখ্যাত অধ্যাপক, শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার পদ্ধতি তৎকালে সর্ব্বজনবিদিত ছিল, তাঁহার নিকট বাল্যজীবনে শিক্ষালাভ করিয়া সতীশরঞ্জনের বাল্যজীবন অতি সুন্দরভাবে গঠিত হইয়াছিল—দেশবিখ্যাত অধ্যাপকের চরিত্র তাঁহার চিত্তে বেশ প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে সতীশরঞ্জন ইংলণ্ডে যাইয়া ম্যাঞ্চেষ্টারে গ্রামার স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সহপাঠী বালকগণের বিস্ময় জন্মাইয়া ইংরাজীভাষায় বিশেষ অধিকার ও কৃতীত্বের পরিচয় দিতে থাকেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বালক সতীশরঞ্জন স্যার ওয়াল্টার স্কট, ডিকেন্স প্রমুখ বড় বড় বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের উপন্যাস সমূহ পাঠ করিয়া শেষ করেন। বস্তুতঃ সতীশরঞ্জন পুস্তক অধ্যয়নে এতাদৃশ অনুরক্ত যে, এখনও তিনি অবসর পাইলেই সাহিত্যের অনুশীলনে সময় ক্ষেপণ করেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সতীশরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু নানা কারণে তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। বোধ হয় উত্তরকালে তিনি যে উচ্চপদ অধিকার করিবেন, সেই উচ্চ পদ প্রাপ্তিতে পাছে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, সেই কারণে ভগবান্ তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হইতে দেন না। কাজেই সতীশরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। তদবধি এই দীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসর কাল তিনি যে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে কতদূর যোগ্যতা, কর্ম্মকুশলতা ও ব্যবহার শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার পরিচয়

দিয়াছেন তাহা তাঁহার বর্ত্তমান পদোন্নতি দেখিয়াই বেশ বুঝা যাইতেছে। যত বড় জটিল মোকদ্দমা হস্তগত হউক না কেন সতীশরঞ্জন অসীম সাহসিকতার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে বিন্দু মাত্র ভীত কিংবা সন্ত্রস্ত হন নাই। তাঁহার শ্রম করিবার শক্তিও অসাধারণ। এক একদিন দীর্ঘ দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত তিনি অকাতরে কার্য্য করিয়া যান—বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য কিংবা আলস্য তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁহার যুক্তি তর্কের সারবত্তা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি দেখিয়া সময়ে সময়ে বিস্মিত ও গুম্ভিত হইয়া পড়েন। যেমন সুন্দর সুশ্রাব্য স্বর, তেমনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ! ইংরাজী ভাষায় এরূপ বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অনেক বাঙ্গালীকে প্রায় দেখা যায় না। গভর্ণমেণ্ট চিরদিনই গুণগ্রাহী। সতীশরঞ্জনের বাক্‌পটুতা ও অসাধারণ আইন-জ্ঞানের কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইতে বড় বেশী দিন লাগিল না। কাজেই ১৯১৭ সালে গভর্ণমেণ্ট সতীশরঞ্জনকে ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিলের পদে নিযুক্ত করিলেন। মানুষের মধ্যে সত্য, সততা ও শ্রমকুশলতা থাকিলে মানুষ যে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই সফলতা লাভ করিতে পারে, সতীশরঞ্জন তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। একদিকে যোগ্য ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিলরূপে তিনি যে গভর্ণমেণ্টের প্রশংসাভাজন হইলেন, তাহা নহে। দেশের সর্ব্ব সাধারণেও এক বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সিটি কলেজ যখন অর্থাভাবে টলমল, তখন সতীশরঞ্জন কলেজের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া কলেজটিকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া উহাকে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর করেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সতীশরঞ্জন রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার মিঃ পি, সি, সেনের জ্যেষ্ঠ দুহিতাকে বিবাহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে

সেই সতী সাধ্বী ললনা কোন সন্তানাদি না রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন, তখন সতীশরঞ্জন ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে কেবল উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর সতীশরঞ্জন আর দারপরিগ্রহ করেন না। পরে আত্মীয় স্বজনের অনেক অনুরোধে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বর্গীয় বিচারপতি মিঃ বি এল, গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বনলতা দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী বনলতা দেখিতে যেমন সুশ্রী, গুণপনায়ও তেমনি—যেন সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়ের সমবায়ে তাঁহার দেহ গঠিত। শ্রীমতী বনলতা দান ও আতিথেয়তা গুণে সুপ্রতিষ্ঠ। শ্রীমতী বনলতার গর্ভে সতীশরঞ্জনের দুইটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এক্ষণে ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতেছে এবং কনিষ্ঠটি বাটীতে পিতামাতার নিকটে রহিয়াছে।

সতীশরঞ্জন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব, আইন ব্যবসায়েই সর্ব্বদা নিমগ্ন, কিন্তু তাহা বলিয়া সংবাদপত্রের সেবা করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গালা দেশে আদর্শ, নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের অভাব দেখিয়া তিনি সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়ে "স্বরাজ" পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'স্বরাজ' সারগর্ভ প্রবন্ধ, নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রভৃতি গুণে যে আজ বাঙ্গালার সংবাদপত্র ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে, বোধ হয় তাহা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে সতীশরঞ্জন ধীরপথাবলম্বী। শুধু বাজে হুজুক না করিয়া যাহাতে বিধিসঙ্গত উপায়ে দেশে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তজ্জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকিয়া বিধিসঙ্গত উপায়ে আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়া ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসন লাভ করাই তাঁহার মত। এই জন্য মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে নূতন ব্যবস্থাপক সভায় যাহাতে যোগ্য প্রতিনিধি সমূহ প্রেরিত হয়, এজন্য তিনি চেষ্টা

করিয়াছিলেন এবং বহু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণের অনুরোধে নিজেও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সম্প্রসারিত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হন। নাম জাহির করিতে—গলাবাজি করিতে সতীশরঞ্জন চিরকাল অনিচ্ছুক হইলেও কর্ত্তব্যের আহ্বানে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। বড়বাজারের অ-মুসলমান ভোটদাতাগণ তাঁহাকে আগ্রহের সহিত এক বাক্যে ভোট দেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার মতামত প্রকাশ্য ভাবে এই সময় হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে।

নূতন শাসন সংস্কারের দ্বারা আমাদের হাতে—দেশের লোকের প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের হাতে বিন্যস্ত বিষয় সমূহের মীমাংসার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি নূতন শাসনপদ্ধতির পক্ষপাতী। এই শাসন-সংস্কারের দ্বারাই দেশে স্বরাজ লাভ হইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয়।

সতীশরঞ্জন দরিদ্রের বান্ধব—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আসামের চা-বাগানের কুলীরা যখন চাঁদপুর ষ্টেশনে আসিয়া বিপন্ন হইয়া পড়ে—বিসূচিকায় তাহারা যখন এক একজন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে, তখন তিনি ১০০০০৲ টাকা সেই কুলীদের সাহায্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল পদে সতীশরঞ্জন নিযুক্ত হন। এই পদে লর্ড সিংহ স্থায়ীভাবে ও একবার স্যার বিনোদবিহারী মিত্র অস্থায়ীভাবে কাজ করিয়াছিলেন মাত্র —আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এই উচ্চ পদ প্রাপ্তি ঘটে নাই। ১৯২২ সালের ৩রা নভেম্বর তাঁহাকে এই পদে একেবারে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়।

বর্ত্তমান সময়ে সতীশরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবগণের অগ্রণী ও নেতা। এডভোকেট জেনারেল বলিয়া তাঁহাকে ব্যব-

স্থাপকসভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়ায় তিনি আবার ব্যবস্থাপক সভায় বড়বাজার অ-মুসলমান সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত হন। উকিল-ব্যারিষ্টার সমাজেও সতীশরঞ্জনের অপ্রতিহত সম্মান। এডভোকেট জেনারেল হইবামাত্র হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ীগণ তাঁহাকে একটি প্রীতি-ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সতীশরঞ্জন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ সম্মিলনীর সভাপতির কাজ গত চারি বৎসর কাল করিয়া আসিতেছেন। এই সম্মিলনীর জন্য তিনি নিজের অমূল্য সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন না। তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি।

সতীশরঞ্জন দেশমাতৃকার সুসন্তান। সতীশরঞ্জন ব্যারিষ্টারী করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন তাহা কেবল নিজের ভোগবিলাসেই ব্যয় করেন না। অনেক দরিদ্র ছাত্র, দুঃস্থ, অসহায়, অসহায়া তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। তিনি যাহা কিছু দান করেন তাহা অতি সংগোপনেই করিয়া থাকেন। অর্থোপার্জ্জনও যেমন তিনি করেন, তাহা দান করিতেও তিনি তেমনি মুক্তহস্ত। এ বিষয়ে তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বনলতা দেবী তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। তাঁহার দ্বারা বঙ্গ জননীর মুখ আরও উজ্জ্বল হইবে। তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কর্ম্ম-কুশলতায়, বদান্যতায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ।

খুলনা—সাতক্ষীরা মহকুমার মদনপুর গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশকুল-তিলক ৺যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। আনন্দচন্দ্র গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে মোক্তারী করিতেন। আনন্দচন্দ্র আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙ্গালা ১২৪৪ সালে মদনপুর গ্রামে যদুনাথের জন্ম হয়। তখন মদনপুর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছিল।

প্রথমে এক গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরে আনয়ন করেন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তিনি কৃতীত্বের সহিত বৃত্তি পাইয়া জুনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহার পর তিনি ১৮৫৫-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ একজিবিসন স্কলারসিপ ১০৲ টাকা প্রাপ্ত হন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের কার্য্যে পারদর্শিতা নির্দ্ধারণ জন্য যে পরীক্ষা সমিতি গঠিত হয়, তিনি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এতদূর সন্তুষ্ট হন যে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। কিছুদিন তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকতা করেন, সেই সময়ে কৃষ্ণনগরের ভূতপূর্ব্ব সবজজ হরিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। সেই বৎসর নিয়ম হইয়াছিল যে বি-এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সেই জন্য তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যদুনাথ সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সসম্মানে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

যদুনাথের পিতামাতা অতিশয় গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। পাছে কোন রাঁধুনে বামুনের হাতে খাইতে হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার পিতামাতা প্রথমে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে দিতে রাজি হন নাই। কিন্তু যদুনাথ পিতামাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কিছুতেই কোন বেতনভোগী পাচক ব্রাহ্মণের হাতে খাইবেন না। যদুনাথ আজীবন এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আজীবন আদর্শ হিন্দু ব্রাহ্মণের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, কোচবেহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, ভাগলপুরের সূর্য্য-নারায়ণ সিংহ, বর্দ্ধমানের উকিল তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সবজজ নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ঐ সকল বন্ধুদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত তিনি হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেনে একটি মেসে বাস করিতেন। সেখানে তিনি আপন হাতে রন্ধন করিতেন এবং রন্ধন করিতে করিতে মৃণ্ময় প্রদীপের ধারে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিতেন, যদুনাথ প্রতিজ্ঞানুসারে আপন হাতে রাঁধিতেছেন কি না?

বি-এল পাশ করিবার পর যদুনাথ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতী করিতে করিতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি বাখরগঞ্জ জেলার মেন্দিগঞ্জ নামক স্থানে মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তদানীন্তন ছোটলাট তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি মুন্সেফী পদে কার্য্য করেন। তিনি ভোলা মহকুমা হইতে আসিবার সময়

স্বর্গীয় হরি প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

তাঁহার নৌকা জলে ডুবিয়া যাওয়ায় তিনি সে যাত্রা প্রাণে রক্ষা পান বটে, কিন্তু তাঁহার অনেক জিনিষপত্র নষ্ট হইয়া যায়। এই ঘটনায় পুত্রের ভাবী বিপদাশঙ্কায় যদুনাথের পিতা তাঁহাকে মুন্সেফী পরিত্যাগ করিতে বলেন। পিতৃভক্ত যদুনাথ মুন্সেফী ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতী আরম্ভ করেন। শীঘ্র তিনি কৃষ্ণনগরের বারের একজন শ্রেষ্ঠ ও গণ্য-মান্য উকিলে পরিণত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নদীয়ার সরকারী উকিল, গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সৎকার্য্যের জন্য বড়লাটের নিকট হইতে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী ওকালতী পরিত্যাগ করেন। যদুনাথ পূর্ব্ব হইতেই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, পূজা আহ্নিক প্রভৃতি নিয়মিত করিতেন। কর্ম্মত্যাগের পরে তিনি পূজা-পার্ব্বণ এবং আহ্নিকে আরও অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। তিনি ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে ৭৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ৺কাশীধামে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রতি শোকপ্রকাশের জন্য কৃষ্ণনগরের সমস্ত আদালত বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার একখানি নূতন চিত্র সহরবাসীরা তাঁহার মৃত্যু অন্তে স্থানীয় টাউন হলে সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং উকিলগণও তাঁহার একখানি চিত্র উকিল লাইব্রেরীতে রক্ষা করিয়াছেন।

যদুনাথ ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থক্ষেত্র পর্য্যটন করিয়াছিলেন। যদুনাথ বড় অমায়িক, শিষ্টাচারী ও দরিদ্রের প্রতি সদয় ছিলেন। স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অকপট ও অচলা ভক্তি ছিল। বহু দিন যাবৎ তিনি দেবনাথ স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি দুইবার কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন এবং তিনবার মিউনিসি পালিটীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তিনি সদর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

স্বগ্রামের উন্নতিসাধনের জন্য যদুনাথ প্রভূত কষ্ট করিয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি যশোহর জেলা বোর্ডের সভ্য ছিলেন, তখন রাস্তা ঘাটের উন্নতিকল্পে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সাধারণ স্বাস্থ্য ও জলাভাব দূর করিবার জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণের সুবিধার জন্য তিনি স্বগ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন।

যদুনাথ অতিশয় পিতৃমাতৃ ভক্ত ছিলেন। তিনি আজীবন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পরোপকার ও দান এত বেশী ছিল যে তাঁহার দানের সম্বন্ধে একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, তিনি দানের নিমিত্তই ও পরের উপকারের জন্যই অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার গোয়াড়ীর বাড়ীতে তিনি এত লোককে অন্ন দান করিতেন যে তাঁহার বাড়ীকে লোকে যদু বাবুর হোটেল বলিত। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং অনেক সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিত। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা, উন্নতহৃদয়, পরোপকারী, দাতা ও নিষ্ঠাবান হিন্দু বেশী দেখা যায় না। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম ছিল, শ্রীমতী মঙ্গলক্ষ্মী দেবী—তিনিও অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন এবং স্বামীর চরণতলে ৺কাশীধামে ছয় মাস পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহারা দুই কন্যা ও সাত পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পুত্রদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

হরিপ্রসাদ ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯১৭ সালের ১৪ই জুলাই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বাল্যকাল হইতে লেখা পড়ায় অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নকালে প্রফেসার Rowe সাহেবের এবং Prof Gough সাহেবের ও Prof Booth সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন ও ক্রিকেট খেলায় এবং

৺হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জিমন্যাষ্টিকে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। হরিপ্রসাদের ন্যায় তাঁহার যমজ ভ্রাতা হরপ্রসাদও জিমন্যাষ্টিকে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই হরিপ্রসাদ তাঁহার পিতা ৺যদুনাথের দানশীলতা ও পরোপকার প্রবৃত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হরিপ্রসাদ বৃত্তিলাভ করেন, কিন্তু তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী একটী বালক বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাহার শিক্ষাও বন্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া হরিপ্রসাদ ঐ বালকটীর সুবিধার জন্য বৃত্তি গ্রহণে অস্বীকার করেন। যে বালক এরূপ উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনও যে তদ্রূপ মহৎ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে যথাক্রমে সসম্মানে এফ্-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৭ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি কৃষ্ণনগর জজকোর্টের তাঁহার সময়কার প্রধান উকিল হইয়াছিলেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় আইনেই বিশেষ ধী-শক্তি সম্পন্ন দক্ষ আইন-ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার মত প্রত্যুৎপন্নমতি লোক অতি অল্পই দেখা যায়। রাজনীতিক্ষেত্রে এদেশে ইদানীং তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পরোপকার ও আশ্রিত প্রতিপালন ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বংশগত ধর্ম্ম পালন প্রভৃতির জন্য তিনি সকলেরই মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গত ১৯১৫ সালে কৃষ্ণনগরে যে প্রাদেশিক সমিতির (Provincial conference) অধিবেশন হইয়াছিল তাহা তাঁহারই যত্নে, তাঁহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং আজকাল ঐ সকল সমিতির অধিবেশন বিশেষ ব্যয়সাধ্য হইলেও তৎকালে তৎকর্ত্তৃক এত অধিক টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল যে ঐ সমিতির সমুদয় ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াও ১৫০০৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। রাজদ্বারেও তাঁহার

বিশেষ সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, স্বাধীনচেত স্পষ্টবক্তা ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁহার বিশেষত্ব আরও এই ছিল যে তিনি সর্ব্বদা মিষ্টভাষী ছিলেন ও তাঁহার কখনও ক্রোধ বা প্রায়ই দেখা যাইত না। তাঁহার প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট দান ছিল। অনেক সময় এমন দান করিতেন যে তাঁহার বন্ধুবর্গেরা বা তাঁহার আত্মীয়েরা পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিতেন না। তিনি কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। সদ্‌গুণে তিনি অনেক বিষয়ে তাঁহার পিতার অনুবর্ত্তী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরের ২টি বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎকালীন নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি লেখেন—"His loss must be a great loss to the town...He was universally popular."—তৎকালীন জেলার জজ Mr. R. E. Jack লেখেন—Hari Babu will be a great loss to the town and the Bar.

হরি বাবু একটী সেসনের খুনী মোকদ্দমায় বিখ্যাত স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার Mr. Eardly Norton সাহেবের সহিত কাজ করেন। সেই সময়ে নর্টন সাহেব তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্যের দ্বারা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া হরি বাবুকে প্রশংসা করিয়া এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি লেখেন—"I understood at first hand the confidence you have won as advocate and adviser······Your countrymen need more men like yourself." আজ কৃষ্ণনগরের লোক হরিবাবুর অভাব অনুভব করিতেছেন।

হরিপ্রসাদ বাবুর একমাত্র পুত্র সতীজীবন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এক্ষণে কৃষ্ণনগরে ওকালতী করিতেছেন। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে

-তাঁহাবন পিতা ও পিতামহের অনুরূপ। ইঁহার এক কন্যা ও দুই পুত্র।

ইনি এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠ ৺হরিপ্রসাদ উভয়ে যমজ ভ্রাতা। উভয়েই ই° ১৮৬৬।২৯শে জানুয়ারি তারিখে তাঁহাদের মাতামহ হুগলীর তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার রামরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মাতামহ রামরতন মুখোপাধ্যায় আরবী ও পার্শী ভাষায় এত ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে লোকে তাঁহাকে মৌলবি সাহেব বলিত। উভয় ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিপ্রসাদ মাত্র এক ঘণ্টা পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু যত দিন হরিপ্রসাদ জীবিত ছিলেন ততদিন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় এত সমাদর ও ভক্তি করিতেন যে তাদৃশ ভক্তি, সমাদর ও সৌভ্রাত্র সাধারণতঃ বিরল। বাল্যকালে উভয় ভ্রাতা একত্র অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু এফ্-এ পরীক্ষার পূর্ব্বে মধ্যম হরপ্রসাদের একবার কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি ২।১ বৎসর পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই উত্তম cricketers ও gymnast ছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা সেই সময় বেশ সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। উভয় ভ্রাতার আকারগত এত সাদৃশ্য ছিল যে অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইত। এ সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ গল্প প্রচলিত আছে। হরপ্রসাদও ভ্রাতার অনুপযুক্ত ছিলেন না, তিনিও অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। হরপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে অতি সম্মানের সহিত ১৮৮৮ সালে এম এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে উত্তীর্ণ হন। হরপ্রসাদের ইংরাজী ভাষায় বিশেষ অধিকার, ঐ ভাষায় লিখিবার ও বলিবার শক্তিও অসাধারণ। ১৮৯০ সালে তিনি বি-এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৺মনমোহন ঘোষ মহাশয় ও সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺শ্রীনাথ দাস উভয়েই হরপ্রসাদকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার আইন জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেন। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের, দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিভাগে বেশ সুনাম ও পসার প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর হইতে ভগ্ন-হৃদয় ও ব্যথিত চিত্ত হইয়া পড়ায় ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ায় কিছুদিন ব্যবসা কার্য্যে বিরত ছিলেন আবার তিনি ব্যবসা কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে করিতেছেন। হরপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ল" কলেজের একজন অধ্যাপক এবং "ল" পরীক্ষার পরীক্ষক। তাঁহার ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল, স্নেহপরায়ণ, কোমল হৃদয় লোক সচরাচর দেখা যায় না। ছাত্রগণ তাঁহাকে অতিশয় ভাল-বাসে ও ভক্তি করে। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত দেশহিতকর অনেক কার্য্যে যোগদান করিতেন ও কংগ্রেসের একজন উদ্যোগী ছিলেন।

৺রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় এম-এ।

ইনি ৺ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ত্তব্যানুরাগ, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদীত্বে ও বালক সুলভ সরলতায় ও অমায়িকতায় রাখাল দাস অতুলনীয় ছিলেন। পিতামহীর আদরে বর্দ্ধিত বালক রাখাল দাসের লেখা পড়ায় তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। শুনা যায় যে জ্যেষ্ঠ হরিপ্রসাদের নিকট এজন্য একদিন তিনি তিরস্কৃত হইয়া সেই দিন হইতেই অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পাঠে মনোযোগ দেন ও ইংরাজী ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। কথিত আছে যে তাঁহার পাঠে অসাধারণ মনোযোগ ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তি দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলেন যে এফ্-এ পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্য হইতে হইবে। তাহাতে তিনি বলেন

স্বর্গীয় রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ

মফঃস্বল কলেজ হইতে ওরূপ হওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু ১৮৮৬খৃঃ অব্দে শ্রীযুত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার পর হইতে রাখাল দাসের উচ্চ স্থান অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয় ও স্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন ও ২৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়িতে আসেন ও তৎকালে ১০নং ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীটে মেসে বাস করেন। নিতান্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ রাখালদাস কখনও ভুলেন নাই যে কলিকাতায় তিনি পাঠের জন্যই আসিয়াছিলেন। অধ্যয়নকেই একমাত্র ব্রত করিয়া রাখালদাস নিজ সময় অতিবাহিত করিতেন। নিজের নির্দ্ধারিত সময় ব্যতীত কাহারও সহিত গল্প করিতেন না। ফলে ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজী, দর্শন ও সংস্কৃত এই তিন বিষয়েই অনার লইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও দর্শন শাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইহার পর হালিসহর নিবাসী ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী শেতাঙ্গিনী দেবীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। তখন ইনি দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ পড়িতেছিলেন। কথিত আছে এম্-এ পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার শ্বশুর মহাশয় ইহাকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন ও পাথেয় স্বরূপ টাকা পাঠাইয়া দেন; কিন্তু পাছে এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে না পারেন এই জন্য ইনি শ্বশুর মহাশয়কে সে টাকা ফিরাইয়া দেন। ইহাতে ইহার শ্বশুর মহাশয় মনঃক্ষুণ্ণ হন বটে, কিন্তু সত্য সত্যই যখন রাখালদাস ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে এম্-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন, তখন

তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। এম্-এ পাশ করিবার পর কিছুদিন ইনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা কার্য্যে রাখালদাস প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন ও অধ্যাপনা করিতে করিতেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইয়া পদত্যাগ করিয়া আসা কালীন তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার পদত্যাগে শোক প্রকাশ করেন। রাখালদাস ইং ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন ও স্বীয় কর্ত্তব্য নিষ্ঠার বলে ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ১৯১৪ সালের শেষভাগে ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ সত্বেও অক্লান্তকর্ম্মী রাখালদাস কিছুতেই ছুটী লইতে স্বীকার করেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুঞ্জয় এই সময়ে বি-এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। পুত্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি ডাঃ ব্রাউন সাহেবকে দিয়া চিকিৎসিত হন। ব্রাউন সাহেব ইঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন –"Mr. Chatterjee, you ougbt to take leave রাখালদাস উত্তর করেন কেন? আমি তো কাজ করিতে কোনই কষ্ট অনুভব করি না। তাহাতে ব্রাউন সাহেব বলেন "you have more energy than strength, you are really over drawing your account in the Bank. If you go on in this way, you will soon be bank rupt." ইহা সত্বেও তিনি অবসর গ্রহণ করিতে রাজী হন না। কিন্তু ১৯১৫ সালের মে মাসের শেষে এক দিন আদালতে কাজ করিতে করিতে হাত হইতে কলম পড়িয়া যায় ও অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধে বাটী ফিরিয়া আসিয়া তিন মাস ছুটীর দরখাস্ত করেন। মে মাসের বাকী কয় দিন চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইন্‌হোক সাহেবের অনুমতি লইয়া নিজ বিচারাধীন

মোকদ্দমাগুলি বাটীতে বিছানায় শুইয়াই বিচার করেন। সর্ব্বজনপ্রিয় রাখালদাসের অসুস্থতার জন্য পুলিশকোর্টের উকীলগণ এই কয়দিবস তাঁহার বাটীতে আসিয়া মোকদ্দমা করিয়া যাইতে কিছুমাত্র অসুবিধা প্রকাশ করেন নাই। ন্যায়বিচারে প্রতিভাবান রাখালদাস যখন চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে স্থায়ী হন, তখন তৎকালীন সংবাদ পত্র "Telegraph ইংরাজী ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে লেখেন—

"The news is sure to be received with pleasure by the people, for amiable but withal strong independent and careful in dispensing justice. Babu Rakhaldas has acquired a reputation second to none among his brother magistrates. What is most important is that the word of the all powerful Police is not law with him. We congratulate Babu Rakhaldas on behalf of the inhabitants of Calcutta on his confirmation."

১৯১৫ সালের ১লা জুন হইতে রাখালদাসের ছুটী মঞ্জুর হয়; স্বাধীনচেতা রাখালদাস মাত্র কুড়িদিন অবসরের পর ইংরাজী ১৯১৫ সালের ১৯শে জুন রাত্রি ১২॥০টার সময় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ৪৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার পুলিসকোর্ট একদিন বন্ধ হইয়াছিল এবং তৎকালীন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কীস্ (keays) বলিয়াছিলেন :—

"I was very grieved to hear this morning of the death of Mr. Chatterjee. The Police Court has suffered no small loss by his premature death, and many of us feel a personal bereavement. As for myself, I know I

have lost an esteemed colleague and a personal friend. No more pains-taking or industrious Magistrate ever sat in law Courts, and I cannot help thinking that had he spared himself a little more, he would have been spared to us for many years." তাঁহার সম্বন্ধে ২১শে জুন তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান লেখেন—"He was very popular among the members of the legal profession, and was much liked by those with whom he came in contact. In the trial of criminal cases, he displayed sound judgement which won for him the esteem of the Government and the public.

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কমিশনার মিঃ জে, এন্‌, গুপ্ত, এটর্নী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺রাজ চন্দ্র চন্দ্র, ৺বিনয়েন্দ্র নাথ সেন, ৺মোহিত কুমার সেন, এটর্নী প্রমথচন্দ্র কর, ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, প্রফেসার শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র লাল মজুমদার ইঁহার সহধ্যায়ী ও সমসাময়িক ছিলেন।

রাখালবাবুর দুই পুত্র:—মৃত্যুঞ্জয় ও দুর্গাদাস এবং দুই কন্যা স্নেহলতা ও কণকলতা। জ্যেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে এম্‌-এ পরীক্ষায় এবং বি, এল্‌, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৪ খৃঃ অঃ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে খ্যাতির সহিত ওকালতী করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস সম্মানের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

যদুনাথের চতুর্থ পুত্র আশুতোষ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন বাঁকীপুর কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। পরে সেখানে ওকালতী করেন,

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল

তৎপরে মুন্সেফ হইয়া বহু জেলায় ঘোরেন। ক্রমশঃ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সবজজ হয়েন ও এসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

এক্ষণে ইনি দারভাঙ্গার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ। কর্ম্মজীবনে তাঁহার সুখ্যাতি আছে। ইনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

যদুনাথের পঞ্চম পুত্র লালবিহারী সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণনগরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতী করিতে করিতে নদীয়ার তৎকালীন

লালবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ইঁহাকে সাময়িক মুন্সেফ পদে নিযুক্ত করেন ও সেই সময় হইতে তিনি চাকরীতে থাকিয়া যান। ইনি এক্ষণে ঢাকায় সবজজ। সবজজ বলিয়া ইঁহার সুনাম আছে।

বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়

যদুনাথের ষষ্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী রাঁচী গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েটে কার্য্য করিতেছেন।

যদুনাথের সপ্তম পুত্র ক্ষীরোদবিহারী। ইনি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর বাটীতে বাংলা ১২৮৭ সালের (ইংরাজী ১৮৮০) ৮ই শ্রাবণ তারিখে জন্মগ্রহণ

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ বিহারী চট্টোপাধ্যায়।

করেন। বাল্যকাল হইতে ইনি বুদ্ধিমান ও মেধাবী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্কুল হইতে তিনি প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরে ১৮৯৭ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে ২০ টাকা বৃত্তি পাইয়া এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেই কলেজ হইতে ১৮৯৯ সালে ইংরাজী ও সংস্কৃতে অনার পাইয়া এবং সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্য একটি রৌপ্য পদক, (বিদ্যাসাগর রৌপ্যপদক) ও সাধারণ পারদর্শীতার জন্য ৫০ টাকা বৃত্তি পাইয়া বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০০ সালে

ঐ কলেজ হইতে ইংরাজী ভাষায় এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে ইঁহার ওকালতি করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে ইনি কিছুকাল Albert Collegeএর অধ্যাপক হয়েন। ঐ সময়ে ইনি তৎকালীন এফ এ পরীক্ষায় পাঠ্য-পুস্তক Tennyson's Enoch Ardenএর একখানি সুন্দর ব্যাখ্যা-পুস্তক লিখেন ও প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকখানির খুব আদর হইয়াছিল। ১৯০২ সালে তিনি বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ স্বনামখ্যাত উকিল বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্যার পানি গ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে রিপণ কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৪ সাল হইতে ইনি বর্দ্ধমানে ওকালতি করিতেছেন। ইনি হাইকোর্টের Article Clerk ছিলেন। ১৯০৯ সালে ইনি হাইকোর্টের Vakil শ্রেণীভুক্ত হন। ১৯০৭ (বাং ১৩১৪) সালে ইনি "মেঘদূত কাব্যে বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়" নামক একখানি সুচিন্তিত পুস্তিকা লেখেন ও প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকা ব্যতীত ইনি সময় সময় বর্দ্ধমান সঞ্জীবনীতে ও "ভারত-বর্ষ", "শাশ্বতী" ও "মানসী মর্ম্মবাণী" নামক মাসিক পত্রে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রকাশ করেন। ইনি এখনও সাহিত্যের চর্চ্চা করেন ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। ইঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ অধ্যাপক পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে "বাণী বিনোদ" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। ইনি সভা সমিতিতে যোগদান করেন ও বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন। ইনি এক্ষণে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" অন্যতম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য। উক্ত সাহিত্য পরিষদের বর্দ্ধমান শাখা সমিতিরও অন্যতম সম্পাদক। ইহা ভিন্ন ইনি বর্দ্ধমান বিদ্যাসাগর দাতব্য সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিরও একজন বিশেষ সভ্য এবং ঐ সমিতির একজন

প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইনি পূর্ব্বে কয়েক বৎসরের জন্য বর্দ্ধমান মিউনিসি-প্যালিটির অনৈক কমিশনর ছিলেন এবং বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাসমিতির সভ্য ও ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইনি একজন স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল, ওকালতিতে তাঁহার সুখ্যাতি ও পসার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। ইনি পিতার ন্যায় পরোপকারী ও দাতা। ইঁহারও অন্নদান যথেষ্ট। অতিথি অভ্যাগতদের আদর যত্ন করিয়া থাকেন। অনেকগুলি দরিদ্র স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছেন ও অনেক ছাত্রকে মানুষ করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন ইনি অনেক দুঃস্থ পরিবারকে মাসিক সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি কাশী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেও সাহায্য করেন ও কাশীর রামকৃষ্ণ আশ্রমেও মাসিক সাহায্য করেন।

ইহা ভিন্ন ইনি অনেক দান করিয়াছেন। ১৩২০ সালে যখন বর্দ্ধমানে বাণ আসিয়া ভাসিয়া যায় ও অনেক লোক আশ্রয়হীন হয়, সেই সময় ইনি অনেক দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আহার্য্য, বস্ত্র ও স্থান দান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অনেকের বাসস্থান নির্ম্মান করাইয়া দিয়াছিলেন ও নিয়মিতভাবে তাঁর বন্ধু স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়ের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া বহু দুঃখী ব্যক্তিদিগকে বস্ত্র ও আহার্য্য দিয়াছিলেন। ইঁহার সহধর্ম্মিনীও স্বামীর ন্যায় পরোপকার, দান ও অতিথি অভ্যাগতের আদর যত্ন করিয়া থাকেন। ইঁহার এক কন্যা শ্রীমতী চারুমতি দেবী ও এক পুত্র শ্রীমান বিমানবিহারী চট্টোপাধ্যায়। সন ১৩২০ সালে ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ স্থানীয় কুমীরকোলার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দিয়াছেন। ঐ বিবাহে বরপক্ষ হইতে কোনও যৌতুক না পাওয়া

সত্ত্বেও ইনি ১০০০০৲ দশহাজার টাকার যৌতুক দিয়াছেন এবং সেই বিবাহ উপলক্ষে ইনি স্বীয় পিতামহ ৺ আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে কাশীর রামকৃষ্ণ মিশনে দান করিয়া আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক ফণ্ড করিয়া দিয়াছেন—ঐ ফণ্ডের উপস্বত্ব হইতে দরিদ্র-দিগকে সাহায্য করা হইয়া থাকে এবং স্বীয় পিতামহী ৺ ব্রহ্মময়ী দেবীর স্মৃতিকল্পে বর্দ্ধমান বিদ্যাসাগর দাতব্য সমিতিতে একশত টাকা দান করিয়া "ব্রহ্মময়ী দেবী" নামে এক ফণ্ড স্থাপনা করিয়াছেন। তাহার উপস্বত্ব হইত বর্দ্ধমান জেলার দরিদ্র বিধবাদের সাহায্য করা হইয়া থাকে এবং আরও স্বীয় মাতাপিতার স্মৃতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিয়াছেন। ঐ কাগজের সুদ হইতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ও গত প্রতি বৎসরে বাংলা সাহিত্যে যে ছাত্র এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে এবং কোনও সরকারি মেডেল (পদক) প্রাপ্ত হইবে না সেই ছাত্রকে "যদুনাথ মহালক্ষ্মী" নামক এক রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। ক্ষীরোদা বাবু অমায়িক, দাতা, পরোপকারী ও লোকপ্রিয় এবং সাহিত্যানুরাগী। তাঁহার পুত্র শ্রীমান বিমান বিহারী ১৯২২ সালে বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে I Sc পড়িতেছেন এবং জামাতা শ্রীমান্ শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২১ সালে প্রথম বিভাগে Scottish Church কলেজ হইতে I Sc পাশ করিয়া ঐ কলেজে B Sc পড়িতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ বি-কে লাহিড়ী ও কলিকাতার Small Cause Courtএর জজ মিষ্টার নির্ম্মল কুমার সেন ও জার্ম্মানী হইতে প্রত্যাগত সুপণ্ডিত মিঃ শরৎচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ইঁহার সহাধ্যায়ী ও সমসাময়িক।

নিম্নে এই বংশের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল—

(১) দক্ষ উপাধ্যায়
|
(২) সুলোচন
|
(৩) মহাদেব
|
(৪) হলধর
|
(৫) কৃষ্ণদেব
|
(৬) বরাহ
|
(৭) শ্রীধর বা শ্রীকর
|
(৮) বহুরূপ (বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রথম কৌলিন্য প্রাপ্ত হয়েন)
|
(৯) গাহি
|
(১০) সর্ব্বেশ্বর (অবসথ যজ্ঞ করিয়া অবসথী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন)
|
(১১) দোকড়ি
|
(১২) গোবর্দ্ধন
|
(১৩) তপন
|
(১৪) সত্যবান্
|
(১৫) শুভাই
|
(১৬) মধুসূদন (অবসথ যজ্ঞ করিয়া অবসথী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন) ইহার বংশধরেরা মধু চাটুয্যের সন্তান বলিয়া খ্যাত। ইনি খড়দহ মেলের প্রধান পুরুষ।
|

(১৭) অনন্ত
(১৮) দেবীদাস
(১৯) হরিরাম
(২০) রাজেন্দ্র
(২১) রুদ্রদেব
(২২) মধুসূদন
(২৩) রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ (পূর্ব্ব বাসস্থান রামনগর ছিল। মদনপুর গ্রামের ভট্টাচার্য্যগণ ইঁহাকে কন্যাদান করতঃ মদনপুরে আনিয়া ভূমিদান করেন। মদনপুর পূর্ব্বে ২৪ পরগণার অন্তর্গত ছিল। এখন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন)।
(২৪) কালিশঙ্কর বা হারানন্দ

(২য় পত্নী)
(২৬) আনন্দচন্দ্র পত্নী ব্রহ্মময়ী
অক্ষয়কুমার
উত্তমচন্দ্র
বামা (কন্যা)
(২৭) যদুনাথ (মহালক্ষ্মী)
হরিপ্রসাদ — হরপ্রসাদ যমজ, রাখালদাস, আশুতোষ, লালবিহারী, কালিমতী, বিনোদবিহারী, ক্ষীরোদবিহারী, ইন্দুমতী
সতীজীবন
মৃত্যুঞ্জয়
দুর্গাদাস
১ম পত্নী ২য় পত্নী
শোভন
বসন্তবিহারী
চারুমতী
বিমানবিহারী
স্বামী
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কুমিরকোলার জমিদার
রমারাণী
কন্যা
দেবপ্রসাদ
পুষ্পরাণী
শিবরাণী
সন্তোষ
বিশ্বনাথ
শম্ভুনাথ
পার্ব্বতী
কন্যা
নন্দরাণী
দেবরাণী
কৃষ্ণ
বিষ্ণু

মিত্র বংশ।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মূলাজোড় নামক স্থানে মিত্র বংশের আদি নিবাস। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের কোথায় বসতি ছিল তাহার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। নন্দ নন্দন মিত্র হইতে মিত্র বংশের ইতিহাস স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বিবাহের সময় ভাটেরা আসিয়া বিবাহ বাসরে গান গাহিতেন। পূর্ব্ব পুরুষগণের যশঃসুধা তাহার সন্ততি-গণকে পান করাইয়া তাঁহারা তৃপ্তি লাভ করিতেন। সেই যশোগানের আদি নাম নন্দ নন্দন মিত্র। ইহাঁর বাসস্থান মূলাজোড় নামক স্থানে। অধুনা বিবাহের সময় সেই গান আর শুনিতে পাওয়া যায় না, কারণ সেই সমস্ত 'ভাট' আর নাই।

নন্দ নন্দন মিত্রের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। নিজের জমির ধান, গোয়ালের গরু আর পুকুরের মাছ। তাহা ছাড়া অন্যান্য জমির আয় হইতে তাঁহার সংসার বেশ সুখে চলিয়া যাইত।

নন্দ নন্দন মিত্রের পুত্র কৃষ্ণ চরণ মিত্র প্রথম কলিকাতায় আসিয়া জমি ক্রয় করেন। কালক্রমে সেই স্থানে গৃহও নির্ম্মাণ করেন। তখন কলিকাতা সহরে পরিণত হয় নাই। ইংরাজের প্রতাপও তখন এত বদ্ধমূল হয় নাই। কলিকাতা তখন অরণ্যানী বিশেষ ছিল এবং ইহারই মধ্যে মধ্যে কতিপয় গ্রাম দেখা যাইত।

কৃষ্ণচরণের পুত্র রামশরণ মিত্র কলিকাতা বাসের তত ভক্ত ছিলেন না। পল্লীগ্রামের শান্ত ছবিখানি তাঁহার চক্ষে বেশ সুন্দর লাগিত; সকাল বেলায় সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে অবগাহন স্নান করিয়া প্রাতঃসমীরে হরি নাম ভাসাইয়া দাওয়া তাঁহার যেন নিত্য কর্ম

ছিল। সুতরাং তিনি কলিকাতায় তত আসা যাওয়া করিতেন না। কিন্তু তাঁহার পুত্র বনমালী মিত্র কলিকাতার আফিসে কর্ম্ম লইয়া কলিকাতা বাসে মনস্থ করেন।

রাম শরণ মিত্রের জীবিত অবস্থায় বনমালী মিত্র কলিকাতায় চলিয়া আসেন, সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর জমি চাষ অপেক্ষা অফিসের কর্ম্মই তাঁহার ভাল লাগিল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি রাসলীলা ও দোললীলা খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করেন।

বনমালী মিত্র মনিকতলা ষ্ট্রীটের উপর একখানি বাড়ীতে বাস করিতেন। কৃষ্ণ চরণ মিত্রের বাটী ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এই বাড়ী নূতন আকারে গঠিত হয়। সে বৎসর রাসলীলা বেশ সুখে সম্পন্ন হইল, কিন্তু দোললীলার সময় তাঁহার ভাগিনেয়ের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। তাহার পর হইতেই একটির পর একটি করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইতে লাগিল। শেষে তাঁহার বসত বাটিও গঙ্গাপারের বাগান খানি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। কিছুদিন বাদে মাণিকতলার বাটিখানি অবধি বিক্রয় হইয়া গেল। কাজে কাজেই বিডন ষ্ট্রীটে কিছু জমি ও তাহার সংলগ্ন একখানি বাটি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া বনমালী মিত্র আবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বনমালী মিত্রের পুত্র মাধব চন্দ্র মিত্র কলিকাতাবাসী হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার আদরের পৈত্রিক ভিটাখানি কুল পুরোহিতকে দান করিয়া জন্মের মতন কলিকাতাবাসী হন। বাগানের আয় হইতেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। তবে তাঁহার টানাটানির সংসার ছিল বলিতে হইবে। টানাটানির সংসার ছিল বলিয়া তাঁহার মনের অবস্থার কোনও টানাটানি হয় নাই। সেবার ৺কাশীধামে পুণ্য কার্য্য করিবার ইচ্ছায় তিনি সপরিবারে যাত্রা করেন; কিন্তু হাতে টাকা ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার বাগানখানি রমানাথ ঘোষের নিকট

গচ্ছিত রাখিয়া চলিয়া যান। কিন্তু আসিয়া শুনিলেন রমানাথ ঘোষ তাঁহার বাগান খানি বিক্রয় করিয়া তাহার টাকা তুলিয়া লইয়াছেন। মাধব মিত্র চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। একে অভাবগ্রস্থ সংসার, তাহার উপর বাগানের আয় আবার কমিয়া গেল। কাজে কাজেই তিনি তাঁহার পুত্রকে লেখা পড়া ছাড়াইয়া আফিসের 'মুচ্ছদি' করিয়া দেন।

মাধব মিত্রের ছয় পুত্র ছিল। তাঁহারই জীবিত অবস্থায় দুই পুত্র মারা যায়। বাগানখানি বিক্রয় হইবার পর তিনি তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীনাথ মিত্রকে অফিসের কর্ম্মে যোগদান করিতে বলেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র কালীনাথ মিত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই তাঁহার পিতা তাহাকে সিম্সাহেবের অফিসে ব্যবহারাজীবির ব্যবসা অবলম্বনের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সিমসাহেবের একান্ত যত্নে ও চেষ্টায় কালীনাথ মিত্র মহাশয় একজন খুব বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব হইয়া উঠেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেসনের কমিসনার হন ও তাঁহার কল্পিত কর্পোরেসন প্রণালী অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তিনি ব্যবস্থাপক সভার (Lagislative Council) সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি সেই সভায় দেশের মঙ্গলার্থে প্রাণপণে অনেক সুনিয়ম প্রণালীবদ্ধ করেন। এই সমস্ত নিপুণতার জন্য রাজ প্রতিনিধি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম ভাগেতেই প্লেগের আবির্ভাব হয়। সেই প্লেগ নিবারণার্থে তিনি এক সমিতি গঠন করেন। সেই সদাশয় মহাশয়গণের অনুগ্রহে স্থাপিত প্লেগনিবারণার্থ বাসস্থানে আসিয়া অনেক বিপন্ন প্লেগ রোগী জীবন লাভ করিত। বৃদ্ধ অবস্থায় অসমর্থতা প্রযুক্ত সাধারণ হিতকার্য্য সকল হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল এই ছুটি হইতে তিনি এখনও অবসর লইতে পারেন নাই।

শ্রীযুত কালীনাথ মিত্র সি, আই, ই

তিনি এখনও ব্যবহারাজীব সমিতির সভাপতি আছেন (incorporated law society) ও তাঁহার বাস ভবনের সমীপস্থ Friend's Clubএর সভাপতি হইয়া অদ্যাপি উহাদের উৎসাহ দিতেছেন।

তিনি বাল্য বয়স হইতে এতদূর কর্ম্মবীর ছিলেন যে অদ্যাপি তিনি তাঁহার বাল্যাবস্থার সৎকর্ম্মগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে পালিত বলিয়া তিনি দারিদ্র্যের কঠোর তাড়না উপলব্ধি করিতে জানেন; সেইজন্য আজ অবধি কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিমুখ হয় না।

হিন্দু ধর্ম্মের উপর তাঁহার এত ভক্তি যে আর্য্য ধর্ম্মের নিয়মগুলি পালন করাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সুপ্রণালীরূপে ও সমারোহে সেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন—সাধনার ফলও তিনি পাইয়াছিলেন।

তিনি কেবল যে বদান্য ও কর্ম্মবীর তাহা নহে, স্বভাবও অতি মধুর, মিষ্টভাষী, শান্ত স্বভাব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং সর্ব্বজনপ্রিয়। তাঁহার নিকট উপকারপ্রার্থী বিপন্ন ব্যক্তিগণ প্রার্থনা পূরণ করিয়া অদ্যাপি যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার এই সদ্গুন গুলির রক্ষার নিমিত্ত তিনি সহস্র বিপদেও পশ্চাদপদ হন না।

নন্দ নন্দন মিত্র
কৃষ্ণচরণ মিত্র
রামশরণ মিত্র
বনমালী
রাজীবলোচন
মাধব
কমললোচন
রাজেন
ত্রৈলক্য
শ্রীনাথ
কালীনাথ
অমরনাথ
কৃষ্ণনাথ
ভূতনাথ
বিশ্বেশ্বর
সুরেন্দ্র
জ্ঞানেন্দ্র
যতীন্দ্র
সতীন্দ্র
ধীরেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
অতীন্দ্র
মন্মথ
অনাথ
খগেন
হেমেন্দ্র
মনীন্দ্র
দ্বিজেন্দ্র
সমরেন্দ্র
সুশীল, হরেন, সুবোধ, সুধীর, শচীন, রবিন, সুনীল, নির্মল, সরোজ,
অরুণকুমার
অতুল
প্রতুল
সত্যচরণ
সত্যকিরণ
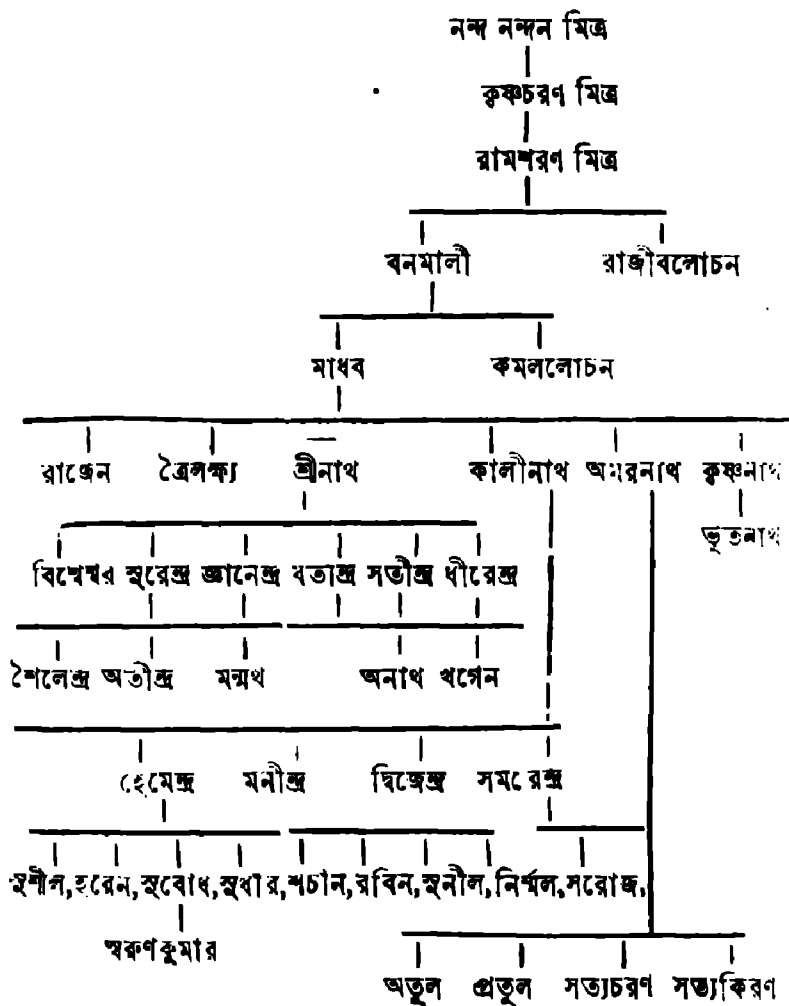
বিক্রমপুর পাইকপাড়ার গুহবংশ।

স্বর্গীয় হরিমোহন গুহ ও স্বর্গীয় মদন মোহন গুহ।

মহারাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় করিয়া সৎকুল হইতে কীর্ত্তিবন্ত, সুকৃত, যজ্ঞবিঘ্নকারিগণের নিহন্তা, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বেদজ্ঞ, দ্বিজকুল জাত দশজন ব্যক্তিকে পাঠাইবার জন্য কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলে বঙ্গেশ্বরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য কান্যকুব্জাধিপতি দশজন উপযুক্ত দ্বিজ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

গুহ বংশের পরিচয়।

বঙ্গেশ্বরো মহারাজো পুত্রেষ্টিং সমনুষ্টিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশঃ॥

এই দশজন দ্বিজ কি প্রকারে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তাহা ঘটকবর ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁহাদের কুলজী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানা রোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ

কায়স্থগণ হস্তী, অশ্ব, পাল্কীতে এবং ব্রাহ্মণগণ গোযানে পত্তিব্যূহ রচনা করিয়া আসিয়াছিলেন। পত্তি শব্দে পঞ্চ পদাতিক।

গোযানে গতা বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিক ত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠ নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

ব্রাহ্মণগণ গোযানে, ঘোষ, বসু, মিত্র অশ্বে, কুলশ্রেষ্ঠ দত্ত হস্তীতে, এবং কায়স্থবর গুহ নরযানে অর্থাৎ পাল্কীতে আসেন।

ভট্ট, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দর ও বেদগর্ভ এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম

দত্ত এই পাঁচজন কায়স্থ আদিশূরের যজ্ঞে আনীত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু পুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে সূর্য্যবংশে অগ্নিবর্ণ নামে এক রাজা ছিলেন। গুহ বংশ সূর্য্যবংশীয় অগ্নিবর্ণ হইতে উদ্ভব হইয়াছে বিরাট গুহ সেই অগ্নিকুলোদ্ভব সূর্য্যবংশীয় সন্তান।

"অয়মাগ্নি কুলোদ্ভবো গুহ বংশাভিধানোমহান্।
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্য পুঞ্জান্বিতঃ॥
বিরাট পুরুষ সমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্।
সুতাপশোঃ মহা বাহুঃ কাশপ্য গোত্র সম্ভূতকঃ।
স শ্রীহর্ষ শিষ্যঃ কালীকায়াশ্চ ভক্তঃ।
বিদ্যৎসু বিপ্রেসু সদাচারানুরক্তঃ॥
সদাচার যুক্তঃ সুহৃদ্যং শরেণ্যঃ।
দ্বিজাতি পালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ঃ॥

অর্থাৎ ইনি অগ্নি কুলম্ভবো মহান্ গুহ বংশধর। মধুব্রত অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞ যাজ্ঞিক, বহু পুণ্য সমন্বিত বিরাট পুরুষের ন্যায় আকৃতি এবং শ্রেষ্ঠ বিরাট নামধারী ইনি সুতাপস, মহাবাহু, গরিয়ান্ কাশ্যপ গোত্র সম্ভব শ্রীহর্ষ শিষ্য, কালিকাদেবীর ভক্ত, বেদজ্ঞ বিপ্রগণে অনুরক্ত ও দ্বিজগণের প্রতিপালন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য।

আদিশূরের মৃত্যুর বহু পর মহারাজ বল্লাল সেন তদীয় রাজত্বকালে বঙ্গীয় কায়স্থগণের কুল বন্ধন করেন। তৎসময় নবগুণ সম্পন্ন

পাইকপাড়ার গুহ বংশ

দশরথ গুহ গুহ বংশের প্রধান ছিলেন ও মহারাজ কর্তৃক সম্মানিত হন। উক্ত দশরথ গুহের বংশধর আশগুহ। পাইক পাড়ার গুহ বংশ উক্ত আশ গুহের বংশোদ্ভব শিবানন্দ গুহের ধারা। শিবানন্দ গুহের বংশধর গোবিন্দ রাম গুহ যশোহর হইতে আনীত হইয়া বিক্রমপুর কাঠালিয়া দত্ত বংশের পুঁইদত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তথায় স্থাপিত হন। এই গুহ বংশের বীজ

ভদ্র গুহ বিক্রমপুরের সোনার দেউলের মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া পুরষ্কার গ্রাম যৌতুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ডাম্লদি গ্রামে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বসত বাস করিতে থাকেন। বীরভদ্র গুহের পুত্র রামকানু গুহ নবাব সরকারে বিক্রমপুরের তহশীলদারি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ গুহ সামসিদ্ধির মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। রঘুনাথ গুহের বংশধরগণ বর্ত্তমান সময় ঐ গ্রামেই বাস করিতেছেন। রামকানু গুহের অপর পুত্র গোপীনাথ গুহ ডাম্লদি গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। গোপীনাথ গুহের পুত্র রাম কেশব গুহ। রাম কেশব গুহের দুই পুত্র—রাম মোহন ও রাম বল্লভ। ডাম্লদি গ্রাম খরস্রোতা পদ্মানদী সিকস্ত হওয়ার পর ইহাদের বংশধরগণ ১২৮০ বাং সনে মুন্সীগঞ্জের অধীন পাইকপাড়া গ্রামে আসিয়াছেন। এই পাইকপাড়ার গুহ বংশ বিক্রমপুরে ডাম্লদির গুহ বলিয়া এখন খ্যাত।

হরিমোহন গুহ ১২৪৭ বাং সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ডাম্লদির গুহ বংশে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার জন্মস্থান ওলাইন। বাঙ্গালার নবাবের দেওয়ান শ্রীরাম বসুর বংশধর ওলাইনের বসু বংশীয় ৺ রামহরি বসু ইঁহার মাতামহ ছিলেন।

হরিমোহন গুহ

হরিমোহন গুহের পিতা রাম নারায়ন গুহ সচ্চরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি বখি মোকামে এক জমিদারের অধীনে সামান্য বেতনে কার্য্য করিতেন। তাঁহার যে আয় হইত তদ্দ্বারা কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন মাত্র; কিন্তু কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। রাম নারায়ণ গুহের দ্বিতীয় পুত্র মদন মোহন গুহ ১২৫০ সালের আষাঢ় মাসে ডাম্লদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতার যেরূপ

ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, মাতারও তেমনি আগ্রহ ছিল। শিশু হরিমোহন প্রথমতঃ পার্শী পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভাগ্যলদীর পার্শ্ববর্ত্তী কাউলিপাড়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কাউলিপাড়া অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, এই গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদারগণ এক সময়ে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। কাউলিপাড়া হাইস্কুল বিক্রমপুরে সর্ব্ব প্রথম স্থাপিত ইংরেজী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ৺গুরুপ্রসাদ সেন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ শিক্ষালাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গে মদন মোহনও এই স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। ইঁহারা ভাল ছাত্র বলিয়া প্রথম হইতেই অবৈতনিক ছাত্র স্বরূপ পড়িবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। হরিমোহন ১৮৫৯ ইংরেজী সনে কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন এবং তৎপর ঢাকা কলেজে একত্র পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন। কিন্তু পিতা রামনারায়ণ গুহ কতক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাত ব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম হওয়ায়, পড়িবার প্রবল আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও হরিমোহন নিজ মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভরণ পোষণের জন্য বাধ্য হইয়া এফ এ পরীক্ষা পাশ করিবার পূর্ব্বেই পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেন এবং ঢাকা কাপাসিয়া থানার সব ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। কলেজে পড়িবার সময় তিনি বঙ্গ ভাষায় এক রচনা লিখিয়া কুচবিহারের মহারাজার প্রদত্ত রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাকুরী গ্রহণ করিলেও হরিমোহন বাবুর আইন পড়িবার ঐকান্তিক বাসনা ছিল। মদন মোহন বাবু ইংরেজি ১৮৬২ সনে প্রবেশিকা পাশ করিবার পরেই, পুলিসের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এই সময় মদন বাবু কাউলিপাড়া স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ এবং

বৃদ্ধ পিতা, মাতার ভরণ পোষণাদি ও অন্যান্য সাংসারিক খরচ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আইন পড়িবার খরচ চালাইতে থাকেন। হরিমোহন বাবু ইংরাজি ১৮৬৪ সালে ওকালতী পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করেন. এবং কিছুকাল ঢাকাতে ওকালতী করিয়া ইংরেজি ১৮৬৫ সালের অক্টোবর মাসে কুমিল্লায় ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি কুমিল্লাতে জজ কোর্টের সর্ব্ব প্রথম ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ উকীল বিধায় ও নিজের প্রতিভা থাকায় অল্পকাল মধ্যেই যশোলাভ ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ওদিকে হরিমোহন বাবুর কুমিল্লা ওকালতী আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে মদন বাবু কাউলীপাড়া স্কুলের শিক্ষকতার কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কুমিল্লা আসিয়া পুলিশ আফিসে এক কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছুকাল চাকুরী করার পর মদন বাবু আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী পাশ করিয়া তিনি কুমিল্লা মুন্সেফকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। মদন বাবুও মুন্সেফী আদালতে ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ প্রথম উকীল ছিলেন এবং নিজের প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মদন বাবু ঐ আদালতের জন্য সরকারী উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুমিল্লার ৺ রায় মোহিনীমোহন বর্দ্ধন বাহাদুর ও বাবু শিবচন্দ্র আইচ হরিমোহন বাবুর সমসাময়িক ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। অন্যান্য জিলা কোর্টের ন্যায় কুমিল্লায় তৎকালে মৌলবী, মুন্সী প্রভৃতি উপাধি সংযুক্ত মুসলমান ও হিন্দু প্রধান উকীলগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব ছিল। তাঁহারা উপরোক্ত তিনজন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ উকীল বাবুগণকে স্বভাবতঃই একটু ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন এবং অনেক সময় হরিমোহন বাবু, মোহিনী বাবু ও শিববাবুকে ঠাট্টা করিয়া "Law Point three men" বলিতেন।

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মৃত্যুর পর ত্রিপুরা রাজসিংহাসন তদীয় ভ্রাতা মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর প্রাপ্ত হন, এই উপলক্ষে রাজ্যে নানা বিপ্লব ঘটে এবং বৃটিশ আদালতে নানা প্রকার মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দেব বর্ম্মণ বাহাদুর রাজ সিংহাসন লাভের জন্য খুল্লতাত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের বিরুদ্ধে কুমিল্লা জজ আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। তাহার পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার হরি মোহন বাবুর উপর ন্যস্ত ছিল। মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষে জিলা কোর্টের অন্যান্য প্রবীণ উকীল ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ কৌন্সলী (Advocate General) স্যার চার্লস পল (তখনকার Paul) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হরি মোহন বাবু ঐ মোকদ্দমা পরিচালনে বিশেষ দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাহা রাজকৌন্সলী মিঃ পল সাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

এক সময় ত্রিপুরা রাজবংশ ক্ষত্রিয় কি অক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদিজাতির স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। ১৮৮১—১৮৮২ সালে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার সরকারী উকীল ও পরিষদ-বর্গের পরামর্শে "জল আচরণীয়" হওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রমপুরের ও পুর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় নিমন্ত্রণ করেন। অর্থের লোভে অনেক পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মহারাজকে "পাতি" দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই উপলক্ষে হরিমোহন বাবু তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদন বাবুর ও পরম বন্ধু কুলীন শ্রেষ্ঠ বজ্রযোগিনী নিবাসী ৺কালী কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় যে ভীষণ আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। মদন বাবু নিজব্যয়ে ত্রিপুরা সম্বন্ধে নানা

পুস্তিকা প্রণয়ন ও "ত্রিপুরা দর্পন" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া দেশের লোককে সকল অবস্থা অবগত করাইয়াছিলেন। যে সকল পণ্ডিতগণ আগরতলা উপস্থিত হইয়া বহু অর্থ ও পারিতোষিকাদি লাভ করিয়াছিল তাহাদিগকে দেশে ফিরিয়া নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল। এমন কি তাহারা যে অর্থ লাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেককে তাহার চতুঃগুণ অর্থব্যয়ে প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া সমাজে উঠিতে হইয়াছিল।

হরিমোহন বাবু পাঠ্যাবস্থায় হাঁসার ঘোষ বংশে ৺রামগোপাল ডেপুটীর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহার ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করার পূর্ব্বেই ভাস্থলদীর বাড়ী পদ্মানদীতে ভাঙ্গিয়া যায় এবং কতক বৎসর হরিমোহন বাবুর পিতা মাতা ও পরিবারবর্গ বিপন্ন অবস্থায় নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া নানা স্থানে বাস করিয়াছেন। কুমিল্লাতে ওকালতী আরম্ভ করার একবৎসর পর তিনি তাঁহার পিতা, মাতা ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দমোহন গুহ প্রভৃতিকে কুমিল্লা আনেন। রাম নারায়ণ গুহ কুমিল্লাতে ১২৭৭সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পরলোক গমন করেন। ভাস্থলদির গ্রাম নদী কুক্ষিগত হওয়ার পর গুহগণ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। হরিমোহন বাবু ও মদন বাবু বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে পাইকপাড়া গ্রামে ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে এক তালুক বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন। তদনন্তর সকল জ্ঞাতি বর্গ ও পুরোহিত প্রভৃতিকে একত্রিত করিয়া পাইকপাড়া বসত বাড়ী প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করেন।

হরিমোহন বাবুর স্বাস্থ্য অত্যন্ত পরিশ্রমে, ত্রিপুরার রাজকীয় মোকদ্দমার সময় হইতে ভগ্ন হইয়া পড়ে। তিনি মাত্র ৫১ বৎসর ৮ মাস বয়সের সময় ১২৯৯ বাং ১৬ই ফাল্গুন তারিখে পরলোক গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর কুমিল্লা District Bar এর উকীল বাবুগণ স্মৃতি-লিপিতে নিম্নলিখিতরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন :—

"On the 26th February 1893 a Senior Pleader of this Bar Babu Harimohan Guha breathed his last after a distinguished career of about 26 years. He came to Comilla with Rs. 6. in his pocket and left property fetching an income of over Rs. 10,000 a year."

হরিমোহন বাবু বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও অর্থের বশীভূত হইয়াছিলেন না। যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন তাঁহারা দেখিয়াছেন হরিমোহন বাবু সংসারে থাকিয়া নিষ্কামভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় ইংরাজি ও বাংলা গ্রন্থাদি পাঠে তিনি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি ছাত্রের ন্যায় অধ্যবসায়ের সহিত ঐ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন। হরিমোহন বাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার বাক্সে "শ্রীকৃষ্ণের জীবনী" সম্বন্ধে একখানা অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছিল।

হরিমোহন বাবুর মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদন বাবু কুমিল্লা শ্মশানে যে স্মৃতি মন্দির নির্ম্মান করাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে শ্মশান বন্ধুদের একটী বিশ্রামের স্থান হইয়াছে এবং কুমিল্লা সহরবাসিগণের এক বৃহৎ অভাব দূর হইয়াছে। হরিমোহন বাবুর আদ্য শ্রাদ্ধ পাইকপাড়ার বাড়ীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিক্রমপুরের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। মদনবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মোক্ষ কামনা করিয়া নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগকে "মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র" উপহার দিয়াছিলেন।

হরিমোহন বাবুর সুমিষ্ট স্বভাবে ও অমায়িকতায় সর্ব্ব সাধারণ
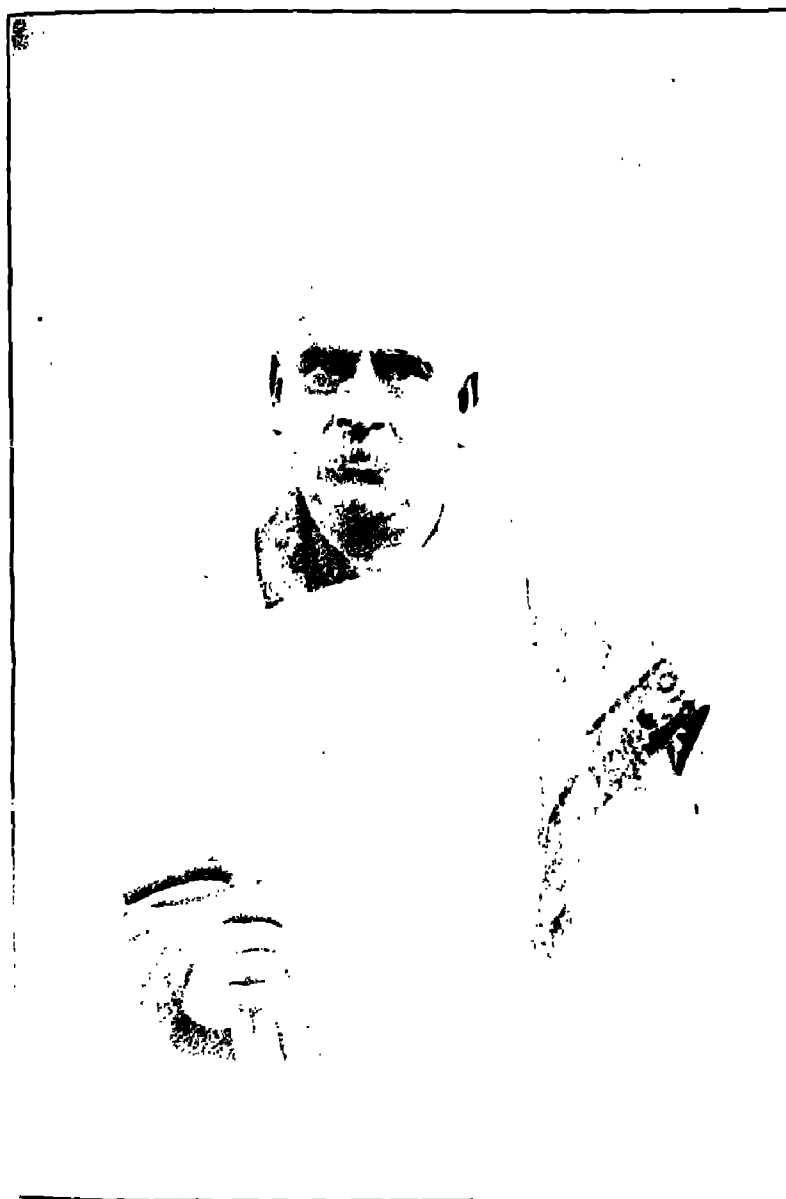
স্বর্গীয় মদনমোহন গুহ

বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন। তিনি অর্থের প্রতি লোভ না করিয়া উকীল স্বরূপে অনেক সময় অনেক গরীবের উপকার করিয়াছেন। ইনি প্রকৃত পক্ষে আত্মনির্ভরশীল (Selfmade 'man) ও আদর্শ স্থানীয় পুরুষ ছিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ওকালতী করিয়া ১৩২৩ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে মদনমোহন গুহ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি অত্যন্ত প্রতিভার সহিত নিজের পসার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ওকালতী করিয়াছেন। কি উকীল, কি হাকিম, কি জন সাধারণ সকলেই মদন বাবুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকিতেন। নিজের ওকালতী ব্যবসা নিয়া ব্যস্ত থাকিলেও মদন বাবু সামাজিক নানা বিষয়ের উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। বঙ্গদেশে কায়স্থ-গণের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন হয়, মদন বাবু তাহার মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ১৩২১ সালে তিনি "কায়স্থ" নামক পুস্তক সকলন ও প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে তাহা ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলকে বিতরণ করিয়াছেন এবং ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণের অধিকারী। গুহবংশ পরিচয়ের প্রারম্ভে ইহা দেখান হইয়াছে যে কায়স্থগণ দ্বিজ ক্ষত্রিয়, সুতরাং ইহারা যে উপবীত গ্রহণের অধিকারী তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

হরিমোহন বাবু ও মদনমোহন বাবু ত্রিপুরা ও ঢাকা জিলায় বিস্তর ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ঢাকা জিলায় মিরকাশিমের প্রসিদ্ধ হাট, কমলাঘাটের বন্দর ইহাদের জমিদারীর অন্তর্গত। গুহ বংশের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা হরিমোহন বাবুর সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। বিক্রমপুর, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি সকল স্থানের কুলীন কায়স্থগণের সহিত ইহাদের পরিবার বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ।

হরি মোহন বাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত রাজ কুমার গুহ বি, এল,

কুমিল্লাতে জজ আদালতের উকীল। মদন বাবুর এক পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন গুহ কুমিল্লাতে ডাক্তারী করিতেছেন। মদন বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতি ফলকে নিম্নলিখিতরূপ লিপি করা হইয়াছে।

"উদ্যাপ্য কর্ম্মব্রতমক্রমেন।
প্রেম্না সমালিঙ্গিত বিশ্বলোক॥
সুখস্থিতিং নিবৃত্তিমজ্ঞ্যী মূলে।
কৃষ্ণস্ত দাক্ষিণ্যনিধে লভস্ত॥"

হরিমোহন বাবুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দমোহন গুহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের যত্নে বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি বি,এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কতককাল শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করেন এবং যোগ্যতার সহিত ঢাকার East নামক পত্রিকার সম্পাদন করেন। তৎপর তিনি পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেন। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর এই বিভাগে চাকুরী করিয়া শেষে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হন। গবর্ণমেণ্ট হইতে আনন্দ বাবুর কার্য্য (Service) ত্রিপুরা রাজ্যে ধার দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রায় ১০ বৎসর তিনি স্বাধীন ত্রিপুরায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Police Superintendent) এর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৩২৬ বাং সনের ১৭ আষাঢ় তারিখে তিনি পটুয়াখালিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তথায় ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Deputy Superintendent) ছিলেন।

আনন্দ বাবুর এক পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন গুহ বি, এল কুমিল্লার জজ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন।

পাইকপাড়া গুহ বংশের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া কেহ গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ দেশে, কেহ বা দূরে ব্রহ্মদেশে যশের সহিত ওকালতী করিতেছেন। এই বংশের ৺গোলকচন্দ্র গুহের পুত্র রায় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুহ বাহাদুর ময়মনসিংহে
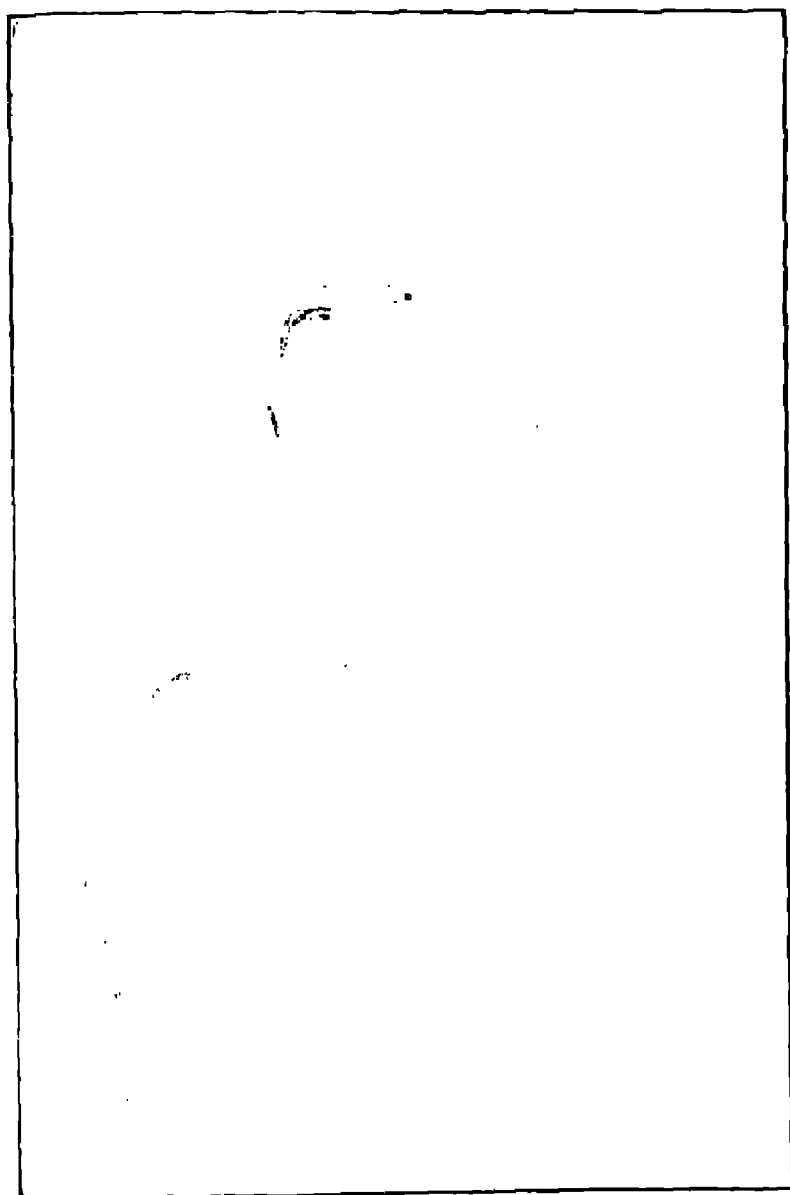
স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু ভৌমিক বাহাদুর।

পাটের ব্যবসা করিয়া বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি তথাকার মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইঁহার অধ্যবসায় এবং কারবারে উন্নতি আদর্শ স্থানীয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুহের একপুত্র মিঃ হেমচন্দ্র গুহ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। জগদীশ বাবুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাপান প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র গুহ কলিকাতা লাকিসোপ ফেক্টরীর প্রোপ্রাইটর।

পাইকপাড়ার গুহ বংশ বিক্রমপুরের অন্যান্য প্রধান প্রধান কায়স্থ-বংশের ন্যায় সামাজিক বিষয়ে উদারনীতির পক্ষপাতী। সমুদ্র যাত্রায় ইঁহারা কোন দিন বাঁধা দেন নাই। ইঁহাদের বংশে কেহ কেহ ও ইঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে অনেকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রায় দীনবন্ধু ভৌমিক বাহাদুর।

কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ কুলে ইঁহার জন্ম। ইনি কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সন্তান। উদয়ণাচার্য্যের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পশুপতির বংশ। দীনবন্ধুর বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন ভাদরা গ্রামে। ইঁহাদের তৎপূর্ব্ব বাসস্থান পদ্মাতীরবর্ত্তী আলুকদিয়া নামক স্থানে ছিল। দীনবন্ধুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামনাথ ভৌমিকের সময় হইতে ভৌমিক উপাধি দেখা যায়। শুনা গিয়াছে বিশিষ্ট

ভূম্যধিকারী বলিয়া তৎকালে নবাব কর্ত্তৃক এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৌলিক উপাধি ভাদুড়ীই ছিল। ইহারা কাপ। দীনবন্ধুর পিতামহ রবিলোচন ভৌমিক ভাদরায় চৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়া সেই পরিবারেই বাস করেন। চৌধুরী বংশ তৎকালে এতদঞ্চলে বিশেষ প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন।

দীনবন্ধু ১৮৫৩ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন। দীনবন্ধুর পিতার সময় হইতেই চৌধুরী বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। পিতা শ্যামসুন্দর রংপুর জেলায় জমীদারের আম্‌মোক্তার তৎপরে কিছুকাল পুলীশের দারোগা এবং শেষে পাবনায় জজের রেকর্ড কিপার ছিলেন। দীনবন্ধু বাল্যকাল হইতেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অভ্যাস করেন এবং তৎফলে তিনি শেষ সময় পর্য্যন্ত অতি সাদাসিধে সাধারণ রকমে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা পাবনায় এক পণ্ডিতের বাসায় থাকিতেন; দীনবন্ধুও সেইখানে থাকিয়া এণ্ট্রান্স পড়িতেন। প্রথমবার তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি কিছুমাত্র না দমিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করেন। এবার পাবনা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া London Missionary School এ ভর্ত্তি হন। তথা হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি পান। তৎপরে Metropolitan College হইতে F. A. এবং Free Church Institution হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পাশ করেন। মেট্রোপলিটনে পাঠকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় দীনবন্ধুকে তাঁহার সরলতা ও চরিত্রের জন্য বিশেষ স্নেহ করিতেন। পঠদ্দশায় দীনবন্ধুর পিসতুত অগ্রজ ভারেঙ্গাবাসী কুচবিহারের জজ রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সাহায্য না পাইলে তাঁহার কলেজে পড়া হইত কিনা সন্দেহ। বি, এ, পাশ করিয়া দীনবন্ধু আইন ক্লাশে ভর্ত্তি হইলেন বটে, এদিকে

পীড়িত পিতা এবং সংসারে অনটন বশতঃ আইন পাঠ ও ব্যবসায়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর বোধ হইল না। তৎকালে মনুরো সাহেব পুলিশের ইন্স্পেক্টর জেনারেল ছিলেন। তিনিই প্রথমে উচ্চ-শিক্ষিত লোক পুলিশ বিভাগে ভর্ত্তি করিতে সংকল্প করেন। দীনবন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারই উৎসাহ পাইয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সবইন্সপেক্টারের পদ গ্রহণ করেন। যতদূর জানা গিয়াছে তিনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম গ্রাজুয়েট সবইন্স্পেক্টার। অনেকে এই সময়ে দীনবন্ধুকে এই সামান্য কার্য্য লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন গ্রাজুয়েটের মূল্য এখন অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল; কিন্তু দীনবন্ধুর আত্মবলে বিশ্বাস ছিল, তিনি বলিয়াছিলেন Napoleon rose from a Common soldier; I shall also rise to the highest rank by dint of merit.

তিনি রাজসাহী জেলার কয়েক থানায় দারোগাগিরি করার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই অস্থায়ী ইনস্পেক্টর হইয়া কার্সিয়াঙ্গে যান এবং তৎপরে রাজসাহীতে পাকা ইন্স্পেক্টর হন। প্রথম হইতেই দীনবন্ধু সরকারী কার্য্যে প্রাণপন ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে খাঁটী (Strictly honest) পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্রই সাধারণের ও উপরিতন কর্ম্মচারীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজসাহী ও দিনাজপুরে ইন্স্পেক্টারি করার পর কয়েক বৎসর Detective Branch এ কাজ করেন। এই রাজসাহী অবস্থানকালে জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারী নটজাতীয় এক দল ধরিয়া ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। অন্যান্য বহু মোকদ্দমা আস্কারা করিয়া অনেক পুরস্কার ও প্রশংসা পাইয়াছিলেন। উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত ডাকাইত সর্দ্দার মোহর খাঁকে বহু চেষ্টার পর তিনি গ্রেপ্তার করেন।

পুলিশ সবইন্সপেক্টার ও এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগকে সম্যক শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৫ সালে ভাগলপুরে পুলীশ ট্রেনীং স্কুল স্থাপন করেন। গভর্ণমেণ্ট দীনবন্ধুকে উক্ত স্কুলের প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে তিনি দশ বৎসরের অধিককাল নিয়োজিত ছিলেন এবং বহুসংখ্যক পুলিশ কর্ম্মচারীকে আইন, পুলীশ কার্য্য প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছেন। পুলীশ বিভাগে উৎকোচ গ্রহণের অত্যধিক প্রাবল্যে তিনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেন এবং ভাবী পুলীশ কর্ম্মচারীদিগের চরিত্র ও অভ্যাস গঠন করাইবার এই সুযোগ পাওয়াতে তিনি অনেকটা শান্তি অনুভব করিতেন। এই কার্য্যে তিনি অসীম উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন। ট্রেনিং স্কুলের কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দেন। ভাগলপুর হইতে তিনি যশোহরে অল্প সময়ের জন্য পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া যান। এই সময়ে পুলীশ কমিশনের রিপোর্টের ফলে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডের পদ সৃষ্ট হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পান। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত পুর্ণিয়া, সিংহভূম ও হুগলীতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করেন। হুগলীতে ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখে কলেরা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দীনবন্ধু বাবুর মাতুল বংশ ঢাকা জিলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পঞ্জিকাকার রৌহার ভট্টাচার্য্য বংশ। তাঁহার মাতামহ ছিলেন—স্বর্গীয় রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। এই বংশ তেজস্বীতা ও নির্ভীকতার জন্য বিখ্যাত এবং দীনবন্ধুর মাতা বরদেশ্বরী এই গুনটী অনেক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। দীনবন্ধু চরিত্র বলের জন্য তাঁহার মাতার নিকট ঋণী। পিতামাতাকে তিনি দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার পিতার ১৮৮১ সালে মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা তাঁহার মৃত্যুর পরও সাড়ে তিন বৎসর জীবিতা ছিলেন। দীনবন্ধু প্রাতে ও সায়াহ্নে ৬টার ভিতরে মাতার

পদধুলি গ্রহণ করিতেন। মাতা কোনও কারণে কুপিত হইলে তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না।

অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রতি তিনি সর্ব্বদা স্নেহশীল ছিলেন। তিনি প্রথমে ঢাকার নিকট মীরপুর গ্রামের সিদ্ধ শ্রোত্রীয়বংশের পণ্ডিত গঙ্গাগোবিন্দ সিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা অন্নদা সুন্দরীর পানিগ্রহণ করেন। অন্নদা সুন্দরীর ৪ ভ্রাতার মধ্যে ২ ভ্রাতা এখন বিদ্যমান আছেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতাই রায় সাহেব মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য I. S. O. বাংলার Surgeon generalএর Personal assistant এবং মীরপুরের সিদ্ধান্ত হাইস্কুল স্থাপয়িতা। অন্নদা সুন্দরী ১ কন্যা ও ২ পুত্র রাখিয়া অকালে ১৮৮৫ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার প্রথম কন্যা গিরিবালাকে টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ রায় বিবাহ করেন। ১ম পুত্র ব্রজবন্ধু একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। দ্বিতীয় পুত্র ...নবন্ধু পাটনার পুলিশ ইন্স্পেক্টর। ১৮৮৭ সালে দীনবন্ধু টাঙ্গাইলের মাক্তার ৺ দুর্গানাথ বিশ্বাসের প্রথমা কন্যা শ্রীযুক্তা কুসুম কামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভের ৪ পুত্র ও ১ কন্যা এখন বর্ত্তমান আছেন। কন্যা বিনাপাণির সহিত পাথরাইন নিবাসী ৺ উমেশচন্দ্র লাহিড়ীর পুত্র শ্রীমধুসূদন লাহিড়ীর সহিত বিবাহ হইয়াছে।

দীনবন্ধু চাকুরী উপলক্ষে বিদেশে অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন বটে, কিন্তু সুবিধা পাইলেই দেশে যাইতেন। অবসর পাইলেই দেশের কি কি কাজ করিবেন তাহা লইয়া বিশেষ আবেগের সহিত আলোচনা করিতেন। দেশে গিয়া প্রথমেই বাড়ী বাড়ী গিয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতেন এবং বহু দুস্থ পরিবারকে গোপনে সাহায্য করা তাঁহার এইরূপ সাক্ষাতের এক উদ্দেশ্য ছিল।

প্রলোভনপূর্ণ পুলিশ বিভাগে তাঁহাকে সর্ব্বদা সত্য ও ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। তিনি কত প্রলোভন ও সহকর্ম্মীদিগের

অন্যায় অনুরোধ ও বিদ্রূপ নীরবে উপেক্ষা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি শেষ পর্য্যন্ত অটল অচল ছিলেন—ক্ষণকাল তরেও সত্য ও ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হন নাই। তাঁহাকে আদর্শ পুলিশ কর্ম্মচারী বলা হইত এবং তাঁহার মৃত্যুর পর Inspector General of Police সেই কথা লিখিয়াই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন —

"By his untimely death all ranks loose a sincere friend, and the force, an able, loyal and sympathetic officer. He will long be looked upon and hold up to others as a model to follow."

তিনি যেখানেই থাকিতেন, সমাজের আদর্শ চরিত্র ব্যক্তির সহিত মিশিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং পঠদ্দশায় পরিচিত কোন বালক কুপথে যাইতেছে বুঝিলে মিষ্ট কথা ও উপদেশ দ্বারা তাহাকে সৎপথে আনিতেন। তিনি কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তাঁহাকে কোন দিন তাশপাশা খেলিতে বা বৃথা গল্পগুজবে ও পরনিন্দায় সময় কাটাইতে দেখা যায় নাই।

তিনি ভাগলপুর অবস্থানকালে "How to Prevent Dacoity" নামক একখানি পুস্তিকা ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীতে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে লোকে কিরূপে নিজেরাই চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিতে পারে এবং আইনে শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার কতটা অধিকার দিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট লোকের এইরূপ চেষ্টাকে কতটা উৎসাহিত করেন ইত্যাদি বিষয় উদাহরণ ও গভর্ণমেণ্টের মন্তব্য দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি ট্রেণীং স্কুলের তদানীন্তন সুযোগ্য শিক্ষক আনন্দ মোহন গুহের সঙ্গে একত্রে "An Aid to the Detection of crime" এবং "miscellaneous Acts" নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৯৩ শকাব্দার ২০শে আষাঢ় রবিবারে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "নাচন" গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে হেরম্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। হেরম্ব নাথ পিতা মাতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান।

এক বৎসর বয়সের সময় হেরম্বনাথের কঠিন পীড়া হইয়াছিল, ইনি সমৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া সমৃদ্ধিসুলভ বিষয় ভোগে পরিবর্দ্ধিত হন নাই, পরন্তু দারিদ্র্য ও অভাবকে ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া কঠোর সহিষ্ণুতা, অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় বলে অতুল বৈভবের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ পরিশ্রম-প্রসূত অগণিত অর্থরাশির মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও তিনি হৃদয়ের যে বিশালতা প্রদর্শন করিতেছেন তাহা বিরল।

মহারাণী হরসুন্দরী হেরম্বনাথের পিতার "ভিক্ষা মা" ছিলেন। তিনি হেরম্বনাথকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন এবং সেই প্রাতঃস্মরণীয়া ও পরিহিতব্রতা রমণীর আশ্রয়ে থাকিয়াই হেরম্বনাথ লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রামস্থ নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালায় হেরম্বনাথের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি যে বিনয়, সৌজন্য, সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতার পরিচয় প্রদান করিতেন তাহা শিক্ষকবৃন্দ ও গ্রামবাসী সকলেরই যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের কারণ হইত। কৃতিত্বের সহিত গ্রামস্থ নিম্ন প্রাথমিক পাঠ সমাপনান্তর তিনি মহারাণী হরসুন্দরীর যত্নেই কলিকাতাস্থ নর্ম্মাল-

স্কুলে পড়িয়া ত্রয়োদশবর্ষে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপর হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করিয়া হেরম্বনাথ অদম্য উৎসাহ ও প্রবল চিত্ত সংযমের সহিত অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় হেরম্বনাথ পিতৃহীন হইলেন। তাঁহার বয়স তখন সবে অষ্টাদশ বৎসর।

স্বদীয় পিতা রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখিতে ও আচার ব্যবহারে সেকালের তেজস্বী আর্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত ছিলেন। তিনি প্রকৃতই পূত চরিত্রসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, যাবতীয় ব্রাহ্মণোচিত হোমচণ্ডীপাঠ সম্পন্ন, ত্রিসন্ধ্যান্বিত ব্রাহ্মণের আদর্শস্থল ছিলেন।

হেরম্বনাথের পিতা দুইটি দারপরিগ্রহ করেন। তন্মধ্যে প্রথমার গর্ভে হেরম্বনাথ প্রভৃতি চারি সহোদর ও তিন ভগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ৮ বৎসর বয়সে তাঁহার জেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ দেহ ত্যাগ করেন। অপর দ্বিতীয়ার গর্ভে দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

পিতার জীবদ্দশায় তাঁহাকে সংসারের গুরুভার বহন করিতে বা তদ্বিষয়ে অনুমাত্র চিন্তা করিতে হয় নাই। কিন্তু যে বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থান করিয়া হেরম্ব নিবিষ্টচিত্তে সরস্বতীর বিনোদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই ছায়া অপসারিত হইলে সংসারের প্রদীপ্ত কিরণ জাল তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। পরমুখাপেক্ষী হইব না, পরের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব না এই বলবতী হৃদয়ভাব পোষণ করিয়া তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের শরণাপন্ন না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার জীবন-সমুদ্রে প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইল—তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

বাল্যকাল হইতেই চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য হেরম্বনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কলেজে

শ্রীযুত হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞানানুশীলনান্তর মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার প্রবল আশা বাধা হইয়া ত্যাগ করিতে হইল। অনন্যোপায় হইয়া ক্যাম্বেল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া আগ্রহের সহিত তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

বিশেষ পারদর্শিতার সহিত ক্যাম্বেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার মানসে তিনি ৺কাশীধামে আগমন করিলেন।

সেই সময় ৺কাশীধামে কাশিমবাজারের মহারাজা লোকনাথ কুমারের সহধর্ম্মিণী, রাজা কৃষ্ণনাথ কুমারের জননী ধর্ম্মপ্রাণা দানৈকব্রতা মহামহিমান্বিতা শ্রীযুক্তা মহারাণী হরসুন্দরী জীবন সন্ধ্যায় কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি বিবিধ কার্য্যে হেরম্বের অধ্যবসায়, কার্য্যতৎপরতা ও সত্যবাদীতার পরিচয় পাইয়া ১২৯৮ সনের চৈত্র মাসে তাঁহাকে স্বীয় এষ্টেটের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। তখন হেরম্বের বয়স মাত্র ৩০ বৎসর। এই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া তিনি এরূপ সুচারুরূপে ও পারদর্শিতার সহিত কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন যে মহারাণী তাঁহাকে অধিকতর বাৎসল্যের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অনারেবল মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই যখন কাশিমবাজারের রাজসিংহাসন লাভ করেন তখন তাঁহার সেই সম্পত্তিলাভে নানাবিধ অন্তরায় ঘটে। এই সময় হেরম্বনাথ যে সাধুতা ও তেজস্বীতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে অতি দুর্লভ। ফলতঃ তাঁহারই চেষ্টা, অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতাগুণে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও মহারাণী হরসুন্দরী উভয়ই হেরম্বনাথের প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। মহারাণীর তাঁহার উপর এত স্নেহ মমতা ছিল যে জগতে তাহা দুর্লভ।

হেরম্বনাথের বয়স যখন ৩৪ বৎসর তখন সেই প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী হরসুন্দরী ১৩১১ সালের কার্ত্তিক মাসে ৺কাশীধাম প্রাপ্ত হন।

যখন ১৩০৪ সালের ৯ই ভাদ্র, মহারাণী স্বর্ণময়ী পরলোক গমন করেন তখন মহারাণী হরসুন্দরী কাশীমবাজার রাজষ্টেটের উত্তরাধিকারিণী হইয়া বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত ৺ কাশীধাম ছাড়িয়া কাশিমবাজার যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া স্বায় একমাত্র দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্রকে ষ্টেট দান করেন। তখন মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে নয় লক্ষ টাকা প্রণামী বাবদ দিয়াছিলেন। মহারাণী ঐ টাকা হইতে হেরম্বনাথের দুই সহোদর রমানাথ ও সুরথনাথ প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার করিয়া টাকা দিতে আজ্ঞা দেন এবং মৃত্যুকালে হেরম্বনাথের সেবা শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া স্বদীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও ঐ নয় লক্ষ টাকা তাহাকে দান করিয়া যান। হেরম্বনাথ কিন্তু ঐ ৯ লক্ষ টাকা তিন ভাইয়ের মধ্যে তুল্যাংশে বণ্টন করিয়া লইলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রও হেরম্বনাথের ব্যবহারে ও পরিশ্রমে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লক্ষ টাকা দান করেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া শত্রুতাচরণ করিতে প্রয়াস পাইত, কিন্তু তিনি তাঁহাদের অনিষ্ট চিন্তা করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদের অভাব মোচন করে প্রত্যেককে প্রকারান্তরে মহারাণী দ্বারা ৩ লক্ষ টাকা দান করাইয়া নিজের মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

হেরম্বনাথের বিবাহিত জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখময় নহে। বিংশতি বৎসর বয়সে নিতি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। কিন্তু এক বৎসর পরেই তাঁহার পত্নী বিয়োগ ঘটে। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রাণীগঞ্জের অন্তর্গত তামরাগ্রামে উচ্চবংশ

সম্ভূত জনৈক ভদ্র মহোদয়ের কন্যার সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে একটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়, তাহারা অতি শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হয়। তৎপর অপর একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। পুত্রের নাম শ্রীমান হরশঙ্কর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কন্যার নাম শ্রীমতি রাজলক্ষ্মী দেবী। হরশঙ্কর প্রসাদ বর্ত্তমানে বঙ্গবাসী কলেজে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হেরম্বনাথের দ্বিতীয় পত্নী ১৩০৮ সালের ৯ অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যুর পর ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ১৩১০ সালের মাঘ মাসে কলিকাতার অন্তর্গত বরানগরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশে তৃতীয়বার বিবাহ করেন। কিন্তু বিধির ইচ্ছায় সে বিবাহ শান্তিপ্রদ হইল না। কিছুদিন পরেই ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে পত্নীও ইহলোক হইতে অনন্ত পথের পথিক হইলেন। অনন্তর তিনি আর বিবাহ করিবেন না সংকল্প করিলেন। কিন্তু তিনি জননীর আজ্ঞাক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। বিশেষতঃ একমাত্র কন্যা রাজলক্ষ্মী ও পুত্র হরশঙ্কর তখন অতিশয় শিশু। তাহাদের ভার আর কে বহন করিবে? এই স্ত্রীই এখন হেরম্বনাথের গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা।

হেরম্বনাথ বাল্যকাল হইতেই স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠাবান। সনাতন ধর্ম্মের আচার ব্যবহার রীতি নীতির সারতত্ত্ব তিনি সম্যক-রূপে অবগত আছেন, তাই ভক্তিভাবে তৎসমুদয় যথাযথ পালন করিয়া থাকেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেলেও নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সমাপন ও মাতৃ পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। ফলতঃ তিনি তাঁহার পিতারই উপযুক্ত হইয়াছেন। জাতীয় চিকিৎসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জন্য তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত।

হেরম্বনাথের বন্ধুপ্রীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর

পূজার পর খ্যাতনামা বন্ধুবর্গ তাঁহার কাশীর বাড়ীতে অতিথি হইয়া অভিনন্দিত হইয়া থাকেন।

সকল অবস্থাতেই তাঁহার জ্ঞান পিপাসা প্রবল। তিনি দেওয়ানি কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু অর্থব্যয় করিয়া হোমিওপ্যাথি পুস্তক ক্রয় করিয়া অবসরমত নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেন এবং উক্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া অজস্র অর্থব্যয়ে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে ঔষধ আনাইয়া দুঃস্থ রোগীদিগকে বিনামূল্যে দান করিতেছেন। কতলোক যে তাঁহার দয়াশীলতায় মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে কে বলিবে ?

বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও হেরম্বনাথ নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করেন। ন্যায়পথে তিনি অচল অটল। কাশিমবাজারের অনারেবল মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই হেরম্বনাথকে সোদরোপম স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তিনি যখন কাশীতে আসেন তখন হেরম্বনাথই তাঁহার দেওয়ানি কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে হেরম্ব বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন এবং রাজ-পরিবারের সকলেই নিজজন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন।

এ সংসারে যাঁহারা দানশীল তন্মধ্যে অধিকাংশই যশের জন্য দান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ দাতা বিরল। কাশীতে সাধু সন্ন্যাসী দণ্ডী বৈষ্ণব প্রতিপালন ও তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত। তিনি যাহাকে দান করেন বা অর্থ সাহায্য করেন সে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারে তৎপ্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে। সেই জন্য নিজ নাম উল্লেখ না করিয়া ডাকের পত্রে নোট পাঠাইয়া বিপন্নকে সাহায্য করেন। কে বিপন্ন জানিবার জন্য তিনি অনেক সময় রাত্রিকালে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ান এবং অদৃষ্টভাবে সেই বিপন্ন পরিবারের অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

কোন্নগর মণিবাটী।

কোন্নগর মণিবংশের আদিপুরুষ ৺ কমল লোচন বসু মণি ১১০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর ইঁহাকে ডাকের কণ্ট্রাক্ট দেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে ইনি ঐ কার্য্য উপলক্ষে ৫০ উষ্ট্র, ১০০ ঘোড়া ও ৫০০ শত কর্ম্মচারী রাখেন। এই কার্য্যে ইনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন ও কোন্নগরে যশঃও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ মহা সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। কোম্পানি বাহাদুর ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন ও গ্রামের পণ্ডিতবর্গ ইঁহার তপস্যা ও দানশীলতার জন্য ইঁহাকে মুনি উপাধি দেন। ইঁহার ৬ পুত্র—৺ রামনারায়ণ বসু, ৺ গঙ্গানারায়ণ বসু, ৺ প্রেমনারায়ণ বসু, ৺ বীরনারায়ণ বসু, ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ও ৺ জয়নারায়ণ বসু। ৺ রাজা দিগম্বর মিত্র সি, আই, ই, ইঁহার দৌহিত্র। বাল্যকালে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় রাজা দিগম্বর মিত্র মাতামহগৃহে উপরোক্ত মুনি বাটীতেই প্রতিপালিত। রায় বাহাদুর কমল লোচন বসু তদীয় ডাকের কার্য্যে তাঁহার পুত্রদিগকে প্রধান প্রধান জেলাগুলিতে (পাটনা, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি) নিযুক্ত রাখেন। তৃতীয় পুত্র ৺ প্রেমনারায়ণ বসু সরকার বাহাদুরের সৈন্যের রসদের কণ্ট্রাক্ট লয়েন। ইনি ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র ৺ জয়নারায়ণ বসু বহরমপুরের কুমার কৃষ্ণ নাথ বাহাদুরের ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহারই সুপারিসে ৺দিগম্বর মিত্র (রাজা) উক্ত কুমার বাহাদুরের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইনি ৬৭৩ বৎসর বয়সে ৺ কাশীলাভ করেন।

৺ রামনারায়ণ বসুর দুই পুত্র—৺ ভুবনেশ্বর বসু ও ৺ কৈলাস চন্দ্র

বসু। মণিবাবুদের কলিকাতার চড়কডাঙ্গা ভবানীপুরের বাটী ইঁহারই ছিল।

৺ গঙ্গানারায়ণ বসুর পুত্র ৺ মহেন্দ্রনাথ বসু (রায়বাহাদুর) ইনি মুন্সেফ ও পরে সবজজ হয়েন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। অবশেষে ঝিনাদহ, মাগুরা ও নড়াইলে প্রধান ছোট আদালতের জজ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজা দিগম্বর মিত্রের মৃত্যুর পর ইনি তাঁহার ষ্টেটের একজিকিউটার হয়েন। মহেন্দ্রনাথ বসু ৺ কাশীধামের চৌখাম্বার ৺রাজেন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র ৺ বরদা দাস মিত্রের জামাতা। রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ বসুর ৩ পুত্র ৺ যতীন্দ্রনাথ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও মণিন্দ্রনাথ বসু।

৺ প্রেমনারায়ণ বসুর ৩ পুত্র ৺ ক্ষেত্রনাথ বসু, সাগরনাথ বসু জমজ ও রায় সাহেব হারাণচন্দ্র বসু। ৺ ক্ষেত্রনাথ বসু, সদর দেওয়ানী আদালতের ও পরে হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। পরে কলিকাতার স্মলকজ কোর্টের জজ, অবশেষে নিম্ন আদালতের বিচার-পতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার দুই পুত্র রাজেন্দ্র নাথ বসু ও গোপালচন্দ্র বসু। ৺সাগর বসুর অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। তিনি পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের হেড একাউণ্টেট ছিলেন। ইঁহার পুত্র নগেন্দ্রনাথ বসু। ইনি সুন্দর বনে আবাদ করিয়াছেন। রায় সাহেব ৺ হারাণচন্দ্র বসু বর্দ্ধমান মেদিনীপুর জিলায় ইন্‌জিনিয়ার ছিলেন। ইনি চৌখাম্বা ৺ রাজেন্দ্র মিত্রের মধ্যম পুত্র ৺ সারদা দাস মিত্রের জামাতা ছিলেন, ইঁহার চারি পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, এল-এল বি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, জিতেন্দ্রনাথ বসু বি, এ ও শিবেন্দ্রনাথ বসু বি, এ। ইঁহারা মাতামহ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ৺কাশীধামে চৌখাম্বা মিত্র বাটীতেই বাস করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু।

উপেন্দ্র বাবু ১৮৩২ সালের জুন মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এম্-এ এল্ এল্-বি। উপেন্দ্র বাবুর তিন পুত্র ও ছয় কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র এম্-এস্ সি পাশ ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। সম্প্রতি জার্ম্মানীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। উপেন্দ্রবাবু কাশী জীব দয়া বিস্তারিণী সভার আরম্ভ হইতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯২—১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বেনারস ষ্ট্যাণ্ডিং কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৫—১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (Theosophical society) তত্ত্ব বিদ্যা সমিতির ভারতীয় শাখার সম্পাদক ছিলেন। কাশীস্থ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৮—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত অর্থাৎ সেণ্টাল হিন্দু কলেজ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ট্রাষ্টি বোর্ডের সহকারী সভাপতি ও ম্যানেজিং কমিটির সহকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। "সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ম্যাগেজিন" ও "পিলগ্রিম্" নামক দুইখানি মাসিক পত্র তিনি আট বৎসরকাল দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন। এখনও তিনি Independent League বা স্বাধীন তত্ত্ববিদ্যা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী আছেন। সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে তিনি এখন এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী আনি বেসান্তের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে কিছুকাল ওকালতী করিয়া ৩৩ বৎসর বয়সে তত্ত্ববিদ্যা অনুশীলনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন।

ইনি বেনারস জজ কোর্টে ও হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। এবং স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটির ইণ্ডিয়ান সেক্সনের অবৈতনিক

জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি খ্যাতনামা সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজের সহ সভাপতি ছিলেন।

শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, ভিজার ও দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটের কিছুকাল ম্যানেজার ছিলেন। ইনি অযোধ্যার অন্তর্গত বহরাইচ জেলায় মিউনিসিপাল কমিশনর ও ৺কাশীধামে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। উপস্থিত ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মন্ত্রী ও নবপ্রতিষ্ঠিত বারাণসী বঙ্গীয় সমাজের সম্পাদক।

শ্রীযুত বাবু জিতেন্দ্রনাথ বসু বি-এ, সম্প্রতি বরহর রাজষ্টেটে ম্যানেজার ছিলেন।

শ্রীযুত বাবু শিবেন্দ্রনাথ বসু সঙ্গীতাচার্য্য। ইনি ভারতীয় সঙ্গীত মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। সঙ্গীত শাস্ত্রে—বিশেষতঃ বীণা বাদ্যে ইনি বিলক্ষণ নিপুণতা ও যশোলাভ করিয়াছেন।

শান্তিপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ।

নদীয়া জেলার শান্তিপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ শুধু যে শান্তিপুর ও নদীয়া জেলার একটি প্রধান বংশ তাহা নহে, তাহার খ্যাতি পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্রই আছে। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলছোবা মণ্ডলাই গ্রামে বাস করিতেন। ফুলিয়া মেল অন্তর্গত ৺জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় বংশের রাজবল্লভ নামে একটি যুবক শান্তিপুরের মদনগোপাল পাড়ায় ভট্টাচার্য্য বংশে বিবাহ করিয়া

কুলভঙ্গ করেন। ইহা খ্রীষ্টীয় ১৭০০ সনের নিকটবর্ত্তী সময়ের কথা। সেই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুতা ও বস্ত্র ব্যবসায়ে বিশেষ মনোযোগ দেন। তখন শান্তিপুরে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনেক তন্তুবায়ের বসতি ছিল এবং শান্তিপুরের মস্‌লিনের খ্যাতিও বিলক্ষণ ছিল। কোম্পানী এই সূত্রে শান্তিপুরে একটি বড় কারখানা (factory) স্থাপন করেন। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত থাকায় নৌকাযোগে শান্তিপুর হইতে কলিকাতায় কাপড় রপ্তানী করার খুব সুবিধা ছিল। দুই শত বৎসরে ভাগীরথীর গতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং পূর্ব্বে শান্তি-পুরের পশ্চিমে যেখানে গঙ্গা বহিত এখন সেখানে কেবল একটি জীর্ণ খাল দেখিতে পাওয়া যায়। সে খালকে এখন শান্তিপুরের লোকে নেজোর (নির্ঝর) বলিয়া থাকেন। অদ্যাবধি এই নেজোরের নিকটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধ্বংসাবশেষ factoryর চিহ্নও বর্ত্তমান আছে। পাঠকের বোধ হয় জানা আছে যে ১৮১২ সালের charterএ ইং ইং কোম্পনীর ভারতবর্ষে ব্যবসায় রহিত করা হইয়াছিল। সেই সময় শান্তিপুরের factoryও বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল factoryতে সে সময় একজন কিংবা দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারী থাকিতেন। বেশীর ভাগ কাজ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর দ্বারাই সম্পন্ন হইত।

রাজবল্লভ চট্টোপাধ্যায় কুলভঙ্গ করিয়া শান্তিপুরেই বাস করেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত factoryতে কর্ম্ম পান। নিজ পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সততার গুণে তিনি ক্রমে factoryর দেওয়ান অথবা প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হন। পরে তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ ও পৌত্র রামসুন্দর factoryর দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠি এই অঞ্চলে "দেওয়ান চট্টুজ্জ" নামে বিখ্যাত হন।

শান্তিপুরের কুঠির সাহেবরা অনেক সময় কলিকাতার কোম্পানীর উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতেন। চট্টোপাধ্যায় বংশের কার্য্যে তাঁহারা এতদূর

সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁহাদের অনেককে কলিকাতার অন্য মহকুমায় কর্ম্ম দেন। এইরূপে রামসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্র রামমোহন কলিকাতার তখনকার প্রধান পুলিশ কমিশনর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের দেওয়ান ছিলেন। ইহা খ্রীষ্টীয় ১৭৭০ সালের নিকটবর্ত্তীর কথা। রামসুন্দরের চতুর্থ পুত্র কাশীনাথ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলোকনাথ এবং অপর তিন পুত্র শান্তিপুরের কুঠিতে কর্ম্ম করিতেন এবং নিজেদের জমিদারীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এবং লণ্ডনে প্রকাশিত Twining's Travels In India পুস্তকে ইহাদের উল্লেখ আছে।

রামমোহন কলিকাতায় বেশ ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন এবং তাঁহার ১১১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এখনও চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠির এক শাখা বাস করেন। দেশেও এই সময় চট্টোপাধ্যায়েরা অনেক জমিদারী ক্রয় করেন এবং দেবালয়, পুষ্করিণী ইত্যাদি স্থাপন করেন। শান্তিপুরের অধুনাতন M .nicipal আফিস ইঁহাদের জমিতে অবস্থিত এবং নিকটবর্ত্তী চোরপুকুরও চট্টোপাধ্যায়দের কীর্ত্তি। কথিত আছে যে, একজন চট্টোপাধ্যায় পুলিশের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া এক সময়ে এতগুলি চোর ধরিয়া আনিয়াছিলেন যে, তাহাদের দ্বারা একরাত্রে এই পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল। সেইজন্য ইহার নাম "চোর পুকুর" এই বৃহৎ পুষ্করিণীই এখন শান্তিপুরের পানীয় জলের অভাব অনেক পরিমাণে দূর করে। চট্টোপাধ্যায়দিগের শান্তিপুর বাটীতে রঘুনাথ জীউর বিগ্রহ স্থাপিত ছিল এবং বিশেষ সমারোহের সহিত রথযাত্রা হইত। উক্ত বিগ্রহ এখন শান্তিপুরের বড় গোস্বামীদের বাড়ীতে আছে, এবং চট্টোপাধ্যায়দের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে এখনও এই বিগ্রহের সেবা হয়।

চট্টোপাধ্যায়েরা সে সময়ে কখনও শান্তিপুরে কখনও কলিকাতায়

থাকিতেন। তাঁহাদের শান্তিপুরের বসত বাটী, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সুনিপুণ কারুকার্য্য খচিত পূজার দালান ও আঠারো মহল দ্বিতল ও ত্রিতল বাটী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেরও একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। যাবতীয় পূজাপার্ব্বণ, কাঙ্গালীভোজন, দান দাক্ষিণ্যের জন্য তাঁহারা নদীয়া জেলায় সুবিখ্যাত ছিলেন।

দুঃখের বিষয় শান্তিপুরের অপর জমীদার বংশ রায় পরিবারের সহিত চট্টোপাধ্যায়দের বংশানুক্রমে জমীদারী সংক্রান্ত বিবাদে বিস্তর ব্যয় হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোম্পানীর কাপড়ের কুঠি বন্ধ হওয়াতে চট্টোপাধ্যায়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সময় নিজেদের জমীদারীতে নীলের চাষ আরম্ভ করেন এবং তাহাতেও অনেক লোকসান দিতে হইয়াছিল। এই সকল কারণসত্ত্বেও পূজা-পার্ব্বণ, দান-ধ্যান পূর্ব্বের মত চলিয়াছিল। কাজেই অনেক জমীদারী এই সময় বিক্রয় হইয়া যায়।

গোলোক নাথের তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীহরিমোহন পার্শী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং মুন্সেফ পদে বহুদিন কর্ম্ম করেন। দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন কিছুদিন কলিকাতার Custom house এ কার্য্য করেন। পরে কলিকাতায় এবং শান্তিপুরে জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং উলার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় গোষ্ঠীতে বিবাহ করেন। ১৮৭২ সালে শান্তিপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। গোপী-মোহনই সর্ব্বপ্রথমে শান্তিপুরে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন।

গোপীমোহনের পাঁচ পুত্র ছিল, (১) পার্ব্বতীচরণ, (২) উমেশচন্দ্র (৩) হেমচন্দ্র (৪) অবিনাশ (৫) ত্রৈলোক্য। তন্মধ্যে উমেশচন্দ্র ও অবিনাশ যৌবনেই অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ পার্ব্বতীচরণ ও কনিষ্ঠ ত্রৈলোক্য বহুকালাবধি গবর্ণমেণ্টের অধীনে সুখ্যাতির সহিত

কার্য্য করিয়া পেন্সন গ্রহণান্তে মারা যান। পার্ব্বতীচরণের সত্যচরণ নামে এক পুত্র ছিলেন, তিনিও গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন এবং তৎপরে গত ১৯০৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রী ও দুই পুত্র এক্ষণে জীবিত আছেন। তাঁহারই পূর্ব্বোক্ত আহিরীটোলাস্থিত চট্টোপাধ্যায়দিগের পুরাতন বাটীতে বাস করিতেছেন। ত্রৈলোক্যের একটী মাত্র পুত্র সত্যরঞ্জন জীবিত আছেন। তিনিও কলিকাতার বাগবাজারে বাস করেন। গোপীমোহনের তৃতীয় পুত্র হেমচন্দ্র ও তদীয় পুত্রেরাই এই বহু পুরাতন বনিয়াদী বংশের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছেন।

হেমচন্দ্র ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন এবং তথায় কর্ণেল চেস্নীর (যিনি পরে বড়লাটের কাউন্সিলের মেম্বর হন) অধীনে অধ্যয়ন শেষ করিয়া ১৮৬২ সালে এল্ সি, ই (L. C. E.) পাশ করিয়া পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি শান্তিপুরে মদনগোপাল পাড়ার ৺রামানন্দ চূড়ামণির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সততা ও সদ্‌গুণের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৯ সালের ৯ই জুলাই তিনি ছয়টী পুত্র ও ছয়টি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গ বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন, বিশেষতঃ তৎকালে তাঁহার একটি পুত্রও তখন উপার্জ্জনক্ষম হন নাই। কিন্তু করুণাময় জগদীশ্বরের অসীম কৃপায় এবং স্বর্গীয় পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদের বলে পুত্রেরা সকলেই কৃতী ও যশস্বী হইয়াছেন এবং তাঁহারা বংশের মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম সম্যকরূপে বজায় রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু দেশের ও

দশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষচন্দ্রের যৌবনেই অপত্নীকাবস্থায় মৃত্যু হয়। অপর পাঁচ পুত্র (১) শরৎচন্দ্র, (২) চারুচন্দ্র, (৩) অতুলচন্দ্র, (৪) অমূল্যচন্দ্র ও (৫) শিশির চন্দ্র বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই যথার্থ আকাশের নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিঃ বিকাশ করিতেছেন। একাধারে পাঁচটী ভ্রাতাই সুযোগ্য ও উচ্চ পদাভিষিক্ত; এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গে বিরল। সেইজন্য ইহাঁদের পূজনীয় মাতৃদেবী শ্রীমতী নিস্তারিণীকে লোকে রত্নগর্ভা বলে। শরৎচন্দ্র রংপুরের সরকারী উকিল (গবর্ণমেণ্ট প্লীডার)। সমগ্র উত্তর বাঙ্গালায় তিনি সম্মানিত ও সমাদৃত। তিনি সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রিয়। ১৯১০ সালে তিনি "রায়বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। চারুচন্দ্র বর্ত্তমানে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ডেপুটী চেয়ারম্যান; পূর্ব্বে এই পদ কেবল ইংরাজ সিবিলিয়ানদিগেরই এক চেটিয়া ছিল। বাঙালীর মধ্যে চারুচন্দ্রই প্রথমে এই পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনিও "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বনামখ্যাত অতুলচন্দ্রের নাম ভারতবর্ষে কেন সমগ্র সভ্যজগতেই জানা আছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে বি, এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ষ্টেট-স্কলারশিপ লইয়া তিনি বিলাত গমন করেন এবং তথায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনরায় সুখ্যাতির সহিত বি-এ ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়া তিনি সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ভারতে আসিয়া যুক্ত প্রদেশে তিনি অতিশয় দক্ষতা ও নির্ভীকতার সহিত কার্য্য করিয়া ক্রমোন্নতি সহকারে ঐ প্রদেশে চীফ্ সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এক্ষণে তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর পদে অভিষিক্ত আছেন। এই দুই পদই অদ্যাবধি দেশীয়দিগের মধ্যে তিনি ভিন্ন অন্য কেহই পান নাই। বিগত দুই বৎসর তাঁহাকে ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ আমেরিকা ও ইউরোপে শ্রমজীবিদিগের উৎকর্ষ

বিধানের নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবীর সভ্য জগতের যে বৈঠক বসিয়াছিল তথায় যাইতে হইয়াছিল। তিনিও গবর্ণমেণ্ট হইতে C. I. E. উপাধি পাইয়াছেন। অমূল্যচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ সরবরাহকারক এসোসিয়েটেড্ প্রেসের বোম্বাই নগরস্থ আফিসের কর্ত্তা। বোম্বাই সহরে তিনি সর্ব্বজনপরিচিত ও আদৃরিত এবং তাঁহার বোম্বাইয়ের বাটী বিলাতযাত্রীর ও বিলাত প্রত্যাগতদিগের বিশ্রামস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশির চন্দ্র এডিনবরা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল সুখ্যাতির সহিত ইংলণ্ডেই কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তৎপরে বিগত যুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে কার্য্য করিয়াছিলেন। এখন তিনি G. I. P. Railway এর একজন প্রধান ডাক্তার।

জোড়াসাঁকো দাঁ বংশ।

জোড়াসাঁকো দাঁ বংশ ধনে মানে সদনুষ্ঠানে কলিকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। এই বংশের উজ্জ্বলরত্ন ৺ গোকুলচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের নাম এখনও লোকমুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রথম জীবনে গোকুলচন্দ্র অতি নিঃস্ব ও সামান্ত লোক ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম তাঁহার আদি বাসস্থান। সপ্তগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি লৌহের বা হার্ডওয়ারের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইংলণ্ড জর্ম্মনি প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁহার মালপত্র আমদানী হইত। বার মাসে তের পার্ব্বণ গোকুলচন্দ্রের বাটীতে বাঁধা ছিল। তিনি দুর্গোৎসবে

স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র দাঁ।
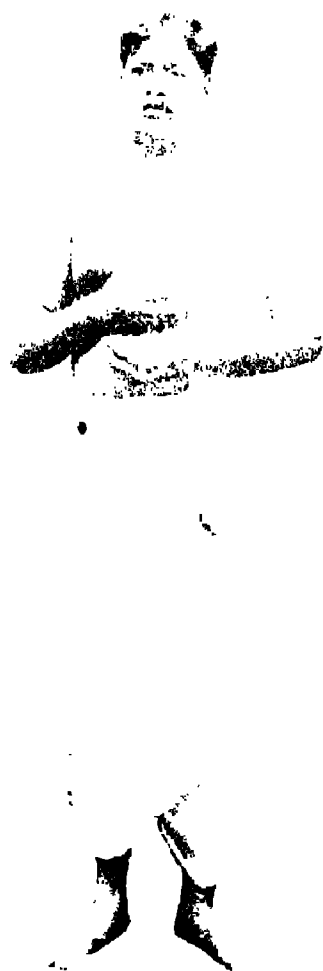
মহাসমারোহ ও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন। দুর্গোৎসবের সাজ তিনি বহু ব্যয়ে সুদূর জর্মণ দেশ হইতে আনয়ন করিতেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন; কাজেই তিনি তাঁহার আত্মীয় ৺হলধর দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র শিবকৃষ্ণ বাবুকে পোষ্য গ্রহণ করেন। শিবকৃষ্ণ দাঁ মহাশয় পরে নিজনামে বড়বাজারে লৌহ ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত কোম্পানীর তখন হইতে নাম হয়—"শিবকৃষ্ণ দাঁ এণ্ড কোম্পানী"। তাঁহার মত লৌহ ও হার্ডওয়ায়ের ব্যবসায়ী তৎকালীন বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিল না। তিনি ই-আই ও ই-বি রেলওয়ে কোম্পানীর মালসরবরাহের কণ্টাক্টার ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়লার খনি ছিল। শিবপুর হইতে আসানসোল পর্য্যন্ত তিনি সাত মাইল রেল রাস্তা কলিয়ারি কাজের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি মাত্র ৩৯ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, তবুও এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রভূত ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র (১) পূর্ণচন্দ্র দাঁ (২) হরিদাস দাঁ। ইঁহারা দুই সহোদর পৈতৃক ব্যবসায় অতি কৃতীত্বের সহিত পরিচালনা করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিদাস দাঁ মহাশয় মাত্র ২২ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয়ও মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ঐ নবীন বয়সে বালীবারাকপুরে ভাগীরথী তীরে ঠাকুর বাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাতে ৺রাধাচরণ জিউ ও ৬টি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়। প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীরাস পূর্ণিমার সময় ঐ ঠাকুর বাড়ীতে মেলা বসে এবং তথায় বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীকীর্ত্তি চন্দ্র দাঁ। তিনি ইং ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আপন সৎ কীর্ত্তিতে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তিনি এক্ষণে পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্ত অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। তিনি এখনও মহাসমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব পূজা করিয়া থাকেন এবং

দুর্গাপূজার সময় অকাতরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, স্বজাতি, কাঙ্গালী, কাঙ্গালিনীগণকে ভোজন করাইয়া থাকেন। এখনও জর্ম্মণ দেশ হইতে সাজ আনিয়া ইনি মায়ের অঙ্গ সুশোভিত করিয়া থাকেন। ইনি অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তন্মধ্যে বালি বারাকপুরস্থ ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে সাধারণের হিতার্থে ইনি নিজ ব্যয়ে একটি ৩৩ ফুট রাস্তা চওড়া করিয়া দিয়াছেন এবং সেই রাস্তাটি বালি মিউনিসিপালিটীকে বিনা সর্ত্তে দান করিয়াছেন। কীর্ত্তিচন্দ্র সঙ্গীতরসজ্ঞ এবং যন্ত্র সঙ্গীতে ইনি পারদর্শী। কীর্ত্তিচন্দ্রের দুইপুত্র ও তিনটি কন্যা। পুত্র দুইটির মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুলিনচন্দ্র ও কনিষ্ঠ অনিলচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ ১৯১৪ সালে ও কনিষ্ঠ ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ তালিকা।
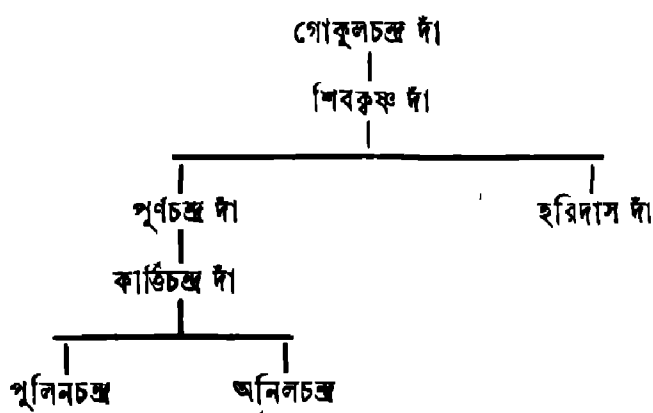
শ্রীযুত অমূল্য ধন আঢ্য।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য

বি-এ, এম্-এল্-সি।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয়ের পিতামহ গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য হুগলী জেলার খানাকুল নামক গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামেই মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর পূর্ব্ব পুরুষগণ বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহের বয়স যখন সবে ৭ বৎসর মাত্র তখন তাঁহার প্রপিতামহ রামসুন্দর আঢ্যের মৃত্যু হয়। অমূল্য বাবু বাল্যকালে তাঁহার মাতুলের সংসারে প্রতিপালিত হন, সেখানে তিনি চাণক্যশ্লোক পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। বাঙ্গালা হিসাবপত্র রাখাও তিনি এই সময়ে শিক্ষা করেন। পিতামহ গোবিন্দচন্দ্র অল্প বয়সে বিবাহ করেন এবং তাহাতে ২০০৲ শত টাকা পণ পান। এই দুইশত টাকা পণ মূলধন লইয়া তিনি ব্যবসায় করিয়া পরে বিপুল ধনরত্নের অধিকারী হন। অতি অল্প বয়সেই তিনি সাধুতা ও অধ্যবসায়ের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে পোদ্দাররূপে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে খিদিরপুরের বৃন্দাবন চন্দ্র দত্তের সহিত চাউলের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিকরা তাঁহার প্রতি এতদূর বিশ্বাস সম্পন্ন ছিলেন যে, তাঁহারা গোবিন্দবাবুর দোকান হইতেই চাউল কিনিতেন। এই চাউলের ব্যবসায় করিবার জন্য গোবিন্দবাবুকে চেতলায় থাকিতে হইত। প্রতি বৎসর তিনি চেতলাতে জমি ক্রয় করিতেন, কারণ তখন জমি বিশেষ সস্তা ছিল। তাঁহার পাঁচ পুত্র (১) অধরচন্দ্র আঢ্য (২) রাখাল দাস

আঢ্য (৩) আশুতোষ আঢ্য (৪) বিজয়কুমার আঢ্য (৫) অশ্বিনীকুমার আঢ্য।

অধরচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ই অমূল্যবাবুর পিতা। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি আদর্শ পুরুষ ও জনপ্রিয় ছিলেন। যখন তিনি মারা যান তখন অমূল্যবাবুর বয়স মাত্র চারি বৎসর। এখনও এমন অনেক লোক আছে যাহারা তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, সদাশয় ব্যবহার, দরিদ্রের প্রতি দয়া, আদর্শ স্থানীয় সততা, পিতার প্রতি ভক্তি ও দেশ প্রীতির প্রশংসা ও উল্লেখ করিয়া থাকেন। পিতা অধর চন্দ্রের মৃত্যুর পর অমূল্যবাবুর খুল্লতাত রাখাল দাস আঢ্য ইঁহাকে লালনপালন করেন এবং যথাযোগ্য শিক্ষা দেন। অমূল্যবাবু ভবানীপুরের সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত অতি নিকৃষ্ট বালক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইঁহার পিতৃব্য ইঁহার উপর সমস্ত বিশ্বাস হারান। অমূল্য বাবু পাঠে আদৌ মন দিতেন না বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য অন্তরে তাঁহাকে ভালবাসিলেও মুখে বড় একটা আমল দিতেন না। অমূল্য বাবু সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পোদ্দারী দোকানে যোগদান করিলেন, তখন দোকানের মাসিক ৩৲ টাকা বেতনের একটা হীন চাকর অমূল্যবাবুকে বলিল "বাবু লেখাপড়া না শিখিলে জীবনে মহা দুঃখ পাইবে।" ভৃত্যের এই কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি পড়াশুনা করিতে আবার সঙ্কল্প করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার পিতৃব্যকে বলিলেন যে, তিনি পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ করিবেন। পিতৃব্য তাঁহার সঙ্কল্প শুনিয়া সেদিন কি পরিমাণে যে সুখী হইয়াছিলেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন এবং এরূপ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন যে সে বৎসর ষষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর বাকী পাঁচ ক্লাসে তিনি বার্ষিক পরীক্ষায়ও

প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার ও মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এফ্-এ পরীক্ষায়ও তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি বি কোর্স গ্রহণ করেন এবং ইংরাজী, গণিত ও বিজ্ঞানে অনার লন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি "অনার" ত্যাগ করিয়া পাশ কোর্স গ্রহণ করেন। বি-এ পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে তিনি রেজিষ্ট্রারের নিকট পাশ কোর্সের বইএর তালিকা চান, কিন্তু রেজিষ্ট্রার বলেন যে এখন আর বই কিনিয়া তাহা পড়িবার সময় নাই। তবে তিনি ইহাও বলিলেন যে কলেজের লেক্‌চার যদি তাঁহার শুনা থাকে, তবে তিনি পরীক্ষা দিলে নিশ্চয়ই পাশ করিতে পারিবেন। তিনি পরীক্ষা দিলেন এবং পাশ কোর্সে পাশও করিলেন। তাহার পর তিনি রিপণ কলেজে যোগদান করিয়া "আইন" অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মেসার্স রালিব্রাদার্স কোম্পানী চেতলাতে চাউলের একটি এজেন্সী খুলেন, সেই সময়ে আমাদের রাখাল দাস আঢ্য এজেণ্ট নিযুক্ত হন। যখন জন রালি চেতলার ফার্ম্ম দেখিতে আসেন তখন অমূল্যবাবু শিক্ষানবিশী করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। রালি বলিলেন, যতক্ষণ না তোমার মন হইতে এই অহঙ্কার না যাইবে যে তুমি একজন গ্রাজুয়েট এবং যতক্ষণ না তুমি গোড়া হইতে কাজ আরম্ভ করিবে ততক্ষণ তুমি কিছুতেই ব্যবসায় শিখিতে পারিবে না। তাঁহার কথা শুনিয়া অমূল্যবাবু রালিব্রাদার্সের অধীনে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সামান্য ভৃত্যের ন্যায় কাজ সুরু করিলেন। ক্রমে পদোন্নতি হইতে হইতে তিনি সহকারী একাউণ্ট্যাণ্ট ও সহকারী

ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। অমূল্যবাবু আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া চাউলের ব্যবসায়েই মনোনিবেশ করিলেন। এই চাউলের ব্যবসায়েই তাঁহার পিতামহ গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য সৌভাগ্যশালী ও লক্ষ্মীবান্ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে চেতলার অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে ভবানীপুরের অধিবাসীরাই কর্পোরেশনে সভ্য নির্ব্বাচিত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা চেতলার অধিবাসীদের জন্য যতটা না খাটিতেন, তদপেক্ষা অধিক খাটিতেন—ভবানীপুরের জন্য। ১৮৯৪ সালে চেতলায় ম্যালেরিয়া জ্বর হয় এবং ভয়ানক আকার ধারণ করে, চেতলার এমন কোন পরিবার ছিল না যেখানে এই ব্যারামে একটি না একটি লোক শয্যাশায়ী না ছিল। চেতলার অধিবাসীদিগের অনুরোধে অমূল্যবাবু মিউনিসিপালিটীর নির্ব্বাচনের জন্য দণ্ডায়মান হন। তদবধি তিনি ২৩নং ওয়ার্ডের পক্ষ হইতে অর্থাৎ চেতলা ও আলিপুরের পক্ষ হইতে কর্পোরেশনের সভ্য হইয়া আসিতেছেন। যে ওয়ার্ডের পক্ষ হইতে তিনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সেই ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার নির্ব্বাচনাবধি কতকগুলি রাস্তা কাটা হইয়াছে। সমস্ত রাস্তাতে পরিস্কৃত ও অপরিস্কৃত জল সরবরাহ করা হইতেছে এবং প্রত্যেক রাস্তাতেই গ্যাসের আলো জ্বালা হইয়াছে। ৭ বিঘা জমি লইয়া একটি পার্ক সৃষ্টি হইয়াছে। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কলিকাতা কর্পোরেশন তাহা প্রতিপালন করিতেছে। ঐ ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় দুর্গাপুর নামক গ্রামটি যাহা পূর্ব্বে মাত্র কয়েকখানি কুঁড়ে ঘর ও ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল তাহা আজকাল শ্বেতাঙ্গগণের বাসের রমণীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে। অনেকবার কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ অমূল্যবাবুকে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজেরা কর্পোরেশনের সভ্য হইবার

জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অমূল্যবাবু আপন নিঃস্বার্থ কার্য্যের দ্বারা জনসমাজের কাছে এরূপ প্রিয় হইয়াছেন যে করদাতারা কিছুতেই তাঁহার বিপক্ষে ভোট দেয় নাই।

হাওড়ার সরকারী উকিল রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর অমূল্যবাবুর মাতুল ছিলেন। হাওড়ার মধ্যে তিনি একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তদানীন্তন সময়ে হাওড়া জেলায় তাঁহার মত জনপ্রিয় আর কেহ ছিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর এল দত্ত এম্ ডি, আই এম্ এস্ অমূল্যবাবুর নিকট আত্মীয়। অমূল্যবাবু ভবানীপুরের ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের বোর্ড অব ডিরেকটারের সভাপতি ছিলেন। অমূল্যবাবু যখন উক্ত করপোরেশনের ডিরেক্টার পদ গ্রহণ করেন, তখন কোম্পানীর মূলধন মাত্র এক লক্ষ টাকা। কিন্তু অমূল্যবাবুর সেই চেষ্টায় ঐ ব্যাঙ্ক এখন এরূপ সমৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে মূলধন ১০ লক্ষ টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে।

অমূল্যবাবু ৯ বৎসর যাবত আলিপুর বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, এখন তিনি সে পদ পরিত্যাগ করিলেও চেতলাবাসী সম্পর্কীয় কোন ফৌজদারী মকদ্দমা হইলেই তাঁহার নিকট অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা হয়। অমূল্যবাবু উভয় পক্ষকে ডাকিয়া যাহাতে একটা মীমাংসা হয় সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

অমূল্যবাবু বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের প্রতিনিধি স্বরূপ কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টে দুই বৎসর কাজ করেন। চেতলায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টের ষ্টেশন চেতলাতে খোলা হয়।

অমূল্যবাবু চেতলা দাতব্য সমিতির অন্যতম কার্য্যনির্ব্বাহক, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য, বেঙ্গল

ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সেরও একজন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য। তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের একজন সভ্য। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও একজন সভ্য। বাঙ্গালা দেশে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হয়—যাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের কয়েকটি স্থানে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছেন।

তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে কলিকাতা কর্পোরেশন গর্ভবতী গাভী ও বাছুর হত্যা কলিকাতায় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে কর্পোরেসন গাভী হত্যাও একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন. উদ্দেশ্য খাটীদুগ্ধ খাইয়া শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাইবে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপাল এক্ট অনুসারে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে বাধা প্রতিবন্ধক থাকায় এই প্রস্তাবটী এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অমূল্যধন বাবু বাঙ্গালার কাঁচা মাল হইতে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কেমিকেল কোম্পানী লিমিটেডের ডিরেক্টর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল ক্যানিং ও কন্‌ডিমেণ্ট ওয়ার্কসেরও ডিরেক্টর। চেতলায় কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। অমূল্যধন বাবুর খুল্লতাত রাখাল দাস আঢ্য চেতলায় একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৫ হাজার টাকা দান করেন। তাহা ছাড়া নাম মাত্র ভাড়ায় তিনি একখণ্ড জমি দীর্ঘকালের জন্য লীজ দেন, সেই জমিতে স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হয়। অমূল্যধন বাবু উক্ত স্কুলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি। তিনি প্রতিবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যে ছাত্র ঐ স্কুল হইতে প্রথম

স্থান অধিকার করে তাহাকে মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি দেন। তাহা ছাড়া শিল্প ও কৃষি বিষয়েও উৎকর্ষতার জন্য তিনি দশটাকার মাসিক দুইটা বৃত্তি দিয়া থাকেন। মেদিনীপুরে যে সুবর্ণ বর্ণিক কন্‌ফারেন্স হয় সেই কন্‌ফারেন্সে অমূল্যধন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার বিভিন্ন সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। সুবর্ণ বণিক ছাত্রদিগের মধ্যে যদি ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তিনি ৫০৲ টাকা মাসিক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে তিনি গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডের একজন সভ্য।

৺ এল্‌, ভি, মিত্র।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ৺ এল্‌, ভি, মিত্রের নাম কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার পুরা নাম লালবিহারী মিত্র। ১৮৪৬ খৃঃ জানুয়ারী মাসে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নেবুতলা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নেবুতলার মিত্রবংশের আদি নিবাস কলিকাতার সন্নিকট বরিষা গ্রামে ছিল। আদি পুরুষ ৺কালীদাস মিত্র হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ ৺জটাধর মিত্রের বাসভূমি (বরিষা গ্রাম) অনুকরণে তাঁহাদিগকে "বরিষার মিত্র" বলে। পরে তাঁহাদের একটী শাখা—৺ রায় মিত্র (চতুর্দ্দশ পর্য্যায়), কোন্নগরে গিয়া বসবাস করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য "পণ্ডিত রায়" নামে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত ৺রায় মিত্র মহাশয় ("পণ্ডিত রায়)" নেবুতলা মিত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ৺বসন্ত মিত্র মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ৺বসন্ত মিত্র মহাশয় ৺কালীদাস মিত্র হইতে অষ্টাদশ পুরুষ। তিনি কোন্নগর হইতে নিজ বাসস্থান যশোহর জেলার নেবুতলা গ্রামে উঠাইয়া লইয়া যান। লালবিহারী বাবুর পিতামহ ৺শম্ভূচন্দ্র মিত্র ৺বসন্ত মিত্র মহাশয়ের বৃদ্ধপ্রপৌত্র এবং সেই হিসাবে লালবিহারী বাবু ২৪ শের পর্য্যায়।

নেবুতলার মিত্রবংশ ধনে ও ঐশ্বর্য্যে বিখ্যাত না হইলেও বিদ্যানুশীলন ও শীলতা গুণে সর্ব্বজনাদৃত ছিল। এমন কি তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কর্ণওয়ালীশ বাহাদুরেরও এই মিত্র পরিবারের বুদ্ধিমত্তার বিষয় অবিদিত ছিল না। দশ-শালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন সংকলন সময়ে লালবিহারী বাবুর পিতামহগণ লাট দরবারে বন্দোবস্ত বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন জন্য আহূত হইয়াছিলেন। লালবিহারী বাবুর এক খুল্লপিতামহ ৺গৌরচন্দ্র মিত্র মহাশয় দেশের একজন স্ব-নামধন্য প্রাতঃ-

স্বর্গীয় লাল বিহারী মিত্র।

স্মরণীয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺কৈলাসচন্দ্র মিত্র দেশে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। দাতব্যচিকিৎসালয়, অবৈতনিক বালক-বালিকা স্কুল, শ্রমজীবিদের শিক্ষার্থে নৈশ বিদ্যালয়, গৌর নগর পোষ্ট আফিস প্রভৃতি ৺কৈলাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জনসেবা ও পিতৃ পরায়ণতার কীর্ত্তি। যৌবনে লালবিহারী বাবু ঐ সকল পর-হিত ব্রতানুষ্ঠানের একজন শুধু যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তাহা নহে—প্রৌঢ় পিতৃব্য-পার্শ্বে থাকিয়া যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র, হোতা সম্মুখে তন্ত্রধারকের ন্যায় উল্লিখিত নৃ-যজ্ঞ সম্পাদনে কায়মনোবাক্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। লালবিহারী বাবুর অন্য এক খুল্ল-পিতামহ ৺ ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় সেকালের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। কথিত আছে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সস্ত্রীক তুলা দানকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

লালবিহারী বাবুর পিতা ৺পিতাম্বর মিত্র মহাশয় গ্রাম্য মুন্সেফী আদালতে ওকালতী করিতেন। তিনি ধর্ম্মভীরু, হৃদয়বান ও পরোপকারী ছিলেন। অতিথি অভ্যাগতদিগকে নিজে নিকটে বসিয়া ভোজন না করাইয়া এবং তাঁহাদের যথাযোগ্য সেবার বন্দোবস্ত না করিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আর্ত্ত ও পীড়িতজনের সেবা তাঁহার ব্রত ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র লালবিহারী পিতার অনেক গুণগ্রামের অধিকারী হইয়াছিলেন।

লালবিহারী বাবুর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺মাধবচন্দ্র মিত্র মহাশয় সেকালের একজন প্রসিদ্ধ স্কুল মাষ্টার ছিলেন। তিনি ও তাঁহার এক খুল্লতাত ৺ বিষ্ণুচরণ মিত্র মহাশয় জেলা ২৪ পরগণার বারুইপুর স্কুলে বহুদিন যাবৎ সুনামের সহিত শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণ তখনকার দিনের Senior scholar ছিলেন এবং সে সময়কার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা (Library Examination) সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া-

ছিলেন। লালবিহারী বাবুর অগ্রজ ৺বঙ্কুবিহারী মিত্র মহাশয় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন কৃতী গ্রাজুয়েট ছিলেন, পরে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান চিকিৎসক হন।

যশোহর জিলা স্কুলে লালবিহারী বাবু তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত বাল্য-শিক্ষা প্রাপ্ত হন। পিতার অবস্থার অস্বচ্ছলতা-হেতু শিক্ষার জন্য পরে তাঁহাদিগকে মাতুল ৺ কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের (চৌগাছার ঘোষ বংশীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) উপর নির্ভর করিতে হয়। কালীচরণ বাবু তাঁহাদিগকে কৃষ্ণনগরে রাখিয়া তত্রত্য কলেজে শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সে সময় ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। লালমোহন ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, প্রভৃতি লালবিহারী বাবুর সমসাময়িক কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলেন। স্বভাবগুণে ও প্রতিভার জন্য লালবিহারী বাবু কৃষ্ণনগর কলেজে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের এবং উমেশচন্দ্র দত্তের প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠেন। দারিদ্র্য প্রযুক্ত লালবিহারীকে শীঘ্রই পড়াশুনা ছাড়িয়া জীবিকার জন্য অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হয়। কলেজ হইতে বাহির হইয়াই তিনি গৌরনগর হাই স্কুলে মাষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। শিক্ষকতা করিবার সময় তাঁহার অর্থ-চিন্তার অনেকটা লাঘব হয় ও সেই অবকাশে তিনি তাঁহার অত্যুৎকট জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়া ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ফেলেন। পরে স্কুল মাষ্টারী ছাড়িয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে আইসেন। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহার সহিত ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺ রাজেন্দ্র দত্ত এবং ৺ কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির সহিত আলাপ হয়। ইঁহারা তিনজনেই হোমিওপ্যাথী ঔষধের প্রতি বশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ইঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে

স্বর্গীয় লাল বিহারী মিত্রের নেবুতলাস্থিত আদি বসত বাটী।

াবিহারী বাবুর হোমিওপ্যাথির প্রতি বিশ্বাস গাঢ় হইতে থাকে।
নী মেডিক্যাল কলেজ ত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে গিয়া হোমিওপ্যাথি
ৎসা স্থরু করেন এবং শীঘ্রই হানিমান হোমিওপ্যাথি মতের
ন স্থচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার স্থনাম প্রচার হয়।

১৮৭০ খৃঃ অব্দে তিনি তাঁহার শুভানুধ্যায়ী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র
াগর এবং মাতুল ৺ কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শে কলি-
য় আসেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ
িওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। পরে তিনি নিজ
একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ঔষধালয়
ীন্তন কালে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা
। খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার
্র দত্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ উক্ত ডাক্তারখানার
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন, এমন কি সে সময়ের বড়লাট লর্ড রিপণ
ী ডাক্তারখানার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। লালবিহারি বাবু
েবলমাত্র একজন নামজাদা হোমিওপ্যাথ ছিলেন তাহা নহে,
ভারতময় হোমিওপ্যাথিক প্রচার কার্য্যে হোমিওপ্যাথির প্রবর্ত্তক
্র দত্তের পরে তাঁহার আসন দিলে কোনরূপ অতিরঞ্জন বা
ক্ত হয় না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাস্ত্রে তিনি একজন অসাধারণ
ছিলেন। তাঁহার সংগৃহিত ও সংরক্ষিত হোমিওপ্যাথিক
সমূহ চিকিৎসার্থীদের নিকট এক অমূল্য রত্ন। বঙ্গের অনেক
ামা চিকিৎসক তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন
ষ পর্য্যন্ত অনেক জটিল রোগ ও তাহার ঔষধ সম্বন্ধে তাঁহার
পরামর্শ করিতেন।

ালবিহারী ধনে, মানে, কুলে, শীলে সর্ব্বপ্রকারে উচ্চপদস্থ হইলেও
ীবনে সাংসারিক শান্তি আদৌ ভোগ করিতে পান নাই।

তাঁহার দেহান্তের প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিপত্নীক হন। তাহার পর কয়েকটী সন্তানের ও তাঁহার বড় জামাতা, পৌত্র ও দৌহিত্রদের অকাল মৃত্যুতে পরিণত বয়সে তিনি বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। মঙ্গলময় বিধাতার বিধান তিনি অম্লান বদনে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া শান্ত ও ধীরভাবে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। সাংসারিক জীবনে তিনি অতি অমায়িক, অক্রোধ, সরল, উদার, ধর্ম্মপরায়ণ ও সন্তান বৎসল ছিলেন। তিনি দারিদ্র্য-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সারাজীবন দরিদ্র, নিঃসহায় ও আতুরকে দয়া করিতে শৈথিল্য বা কৃপণতা করেন নাই। তবে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিত বাম হস্ত তাহা জানিতে পাইত না। তিনি রোগী দেখিতে গিয়া আজকালকার ডাক্তারদের মত নাড়ী টিপিয়াই ফি পকেটস্থ করতঃ উঠিয়া পড়িতেন না। কখন কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি পীড়িতের সহিত নিতান্ত বন্ধুর ন্যায় আলাপ করিতেন। দুঃস্থ অসমর্থ রোগীকে অনেক সময়ে নিজ ব্যয়ে পথ্যাদি কিনিয়া দিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। বিনা দর্শনীতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তিনি যে কত রোগী দেখিতেন ও ঔষধ বিতরণ করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিজগুণে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺ কালীকৃষ্ণ মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, ৺ রাজেন্দ্র দত্ত, ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি সেকালের মনীষিগণের সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং নিজ নাম জাহির না করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে অনেক দেশ ও জনহিতকর কার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ তৎকালীন অনেক ইংরাজী সংবাদপত্র স্তম্ভে ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত।

প্রায় ৭৭ বৎসর বয়সে ইংরাজী ১৯২২ সালের ২৭শে আগষ্ট

রবিবার বেলা ১০ দশ ঘটিকার সময় তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে একজন দারিদ্র বৎসল চিকিৎসক এবং সেকালের একজন খাটী স্বনামধন্য পুরুষ অন্তর্হিত হইয়াছে।

তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, বি, এল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এটর্ণী। তিনি স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মধ্যম জামাতা।

৺ লালবিহারি মিত্র মহাশয়ের কুলচিনামা।

কালিদাস মিত্র (১)
|
শ্রীধর মিত্র (২)
|
শুক্তি মিত্র (৩)
|
সৌভরি মিত্র (৪)
|
হরি মিত্র (৫)
|
সোম মিত্র (৬)
|
কেশব মিত্র (৭)
|
মৃত্যুঞ্জয় মিত্র (৮)
|
ধুই মিত্র (৯)
|
চক্রপাণি মিত্র (১০)
|
দিবাকর মিত্র (১১)
|
পীতাম্বর মিত্র (১২)
|

জটাধর মিত্র (১৩)
(সাং বরিষা)
|
"পণ্ডিত রায়" (১৪)
|
বিষ্ণুদাস (১৫)
|
কালীনাথ (১৬)
|
জগৎ (১৭)
|
বসন্ত মিত্র (১৮)
(সাং নেবুতলা)
|
রত্নেশ্বর মিত্র (১৯)
|
জনার্দ্দন মিত্র (২০)
|
রামমোহন মিত্র (২১)
|

ভৈরব মিত্র | শম্ভু মিত্র (২২) | হর মিত্র | তিলক মিত্র | গৌর মিত্র | ঈশ্বর মিত্র

শম্ভু মিত্র (২২) → পীতাম্বর মিত্র (২৩)

ঈশ্বর মিত্র → ভগবান মিত্র

পীতাম্বর মিত্র (২৩) →

মাধব মিত্র | প্রসন্ন মিত্র | বঙ্কুবিহারী মিত্র | বিপিনবিহারী মিত্র | লালবিহারী (২৪)

লালবিহারী (২৪)
|
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র
(২৫)

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র

মাননীয়

রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

আসাম গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মন্ত্রী মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত বাহাদুর প্রসিদ্ধ বৈদ্যক শাস্ত্র প্রণেতা চক্রপাণি দত্তের বংশধর। চক্রপাণি "চক্রদত্ত" নামধেয় অতি দুর্লভ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। লক্ষণ সেনের সমকালে কিংবা পরে চক্রপাণি প্রাদুর্ভূত হন। চক্রপাণি শৈব ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। চক্রপাণি "দত্ত" হইলেও বল্লাল ও লক্ষণ সেনের কুলবিধি প্রবর্ত্তিত হইবার পুর্ব্বে বৈদ্য বংশীয় কুলীন ছিলেন। চক্রপাণি দত্ত রাঢ় দেশের সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, পরে এই চক্রপাণির বংশধরগণ শ্রীহট্টে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই জীবনীর আলোচ্য নায়ক শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই চক্রপাণি দত্তের বংশেই ১২৭৬ সালের ২০শে আশ্বিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। চক্রপাণি হইতে প্রমোদচন্দ্র সপ্তদশ পুরুষ। প্রমোদ বাবু জমিদার বংশসম্ভূত। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদক ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এফ এ পরীক্ষাতেও তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি, এল পাশ করিয়া ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটার ও হাইকোর্টের "উকীল" শ্রেণীভুক্ত হন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীহট্টের সরকারী উকীল পদে নিযুক্ত হইয়া গত বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত সেই পদে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ইহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে "সম্মানসূচক সার্টিফিকেট" প্রদান

করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। শ্রীহট্ট সহরের যাবতীয় স্কুল ও কলেজ ইঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার যত্ন ও চেষ্টায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের যাবতীয় সদনুষ্ঠানে ইনি ব্রতী ছিলেন এবং এখনও শ্রীহট্টের যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। শ্রীহট্ট কলেজে পূর্ব্বে মাত্র এফ-এ পর্য্যন্ত পড়ান হইত, ইঁহার ও অন্যান্য সভ্যগণের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট ১৮০০০৲ হাজার টাকা প্রদান করায় কলেজে বি-এ ক্লাস খোলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাডলার কমিশনে ইনি একজন সভ্য ছিলেন। রেলওয়ে কমিশনে ইঁহার সাক্ষ্য অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইনি ঢাকা ইউনিভার্সিটী কোর্ট, প্রাদেশিক রেলওয়ে বোর্ড প্রভৃতির সভ্য। ইনি ঢাকা জেলার সোণার খাঁ নিবাসী ৺কালীমোহন গুপ্ত মহাশয়ের কন্যার (নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগ্নী) পাণি গ্রহণ করেন। ইঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত পৃথ্বিশচন্দ্র দত্ত দ্বিতীয় পুত্র শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত। ক্ষিতীশচন্দ্র ঢাকা ইউনিভার্সিটী কলেজে বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়িতেছেন। প্রমোদ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত বর্ত্তমানে শ্রীহট্টে ওকালতী করিতেছেন। ক্ষীরোদ বাবুর দুইটী শিশু পুত্র ও তিনটী কন্যা। প্রমোদ বাবু Work man's breach of Contract Act ও The Provincial Small Cause Court Act নামক দুইখানি পুস্তকের টীকা লিখিয়াছেন।

প্রমোদ বাবু আসাম গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিম্নে ইঁহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :—

মাননীয় রায় প্রমোদচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সান্ধিবিগ্রহিক।
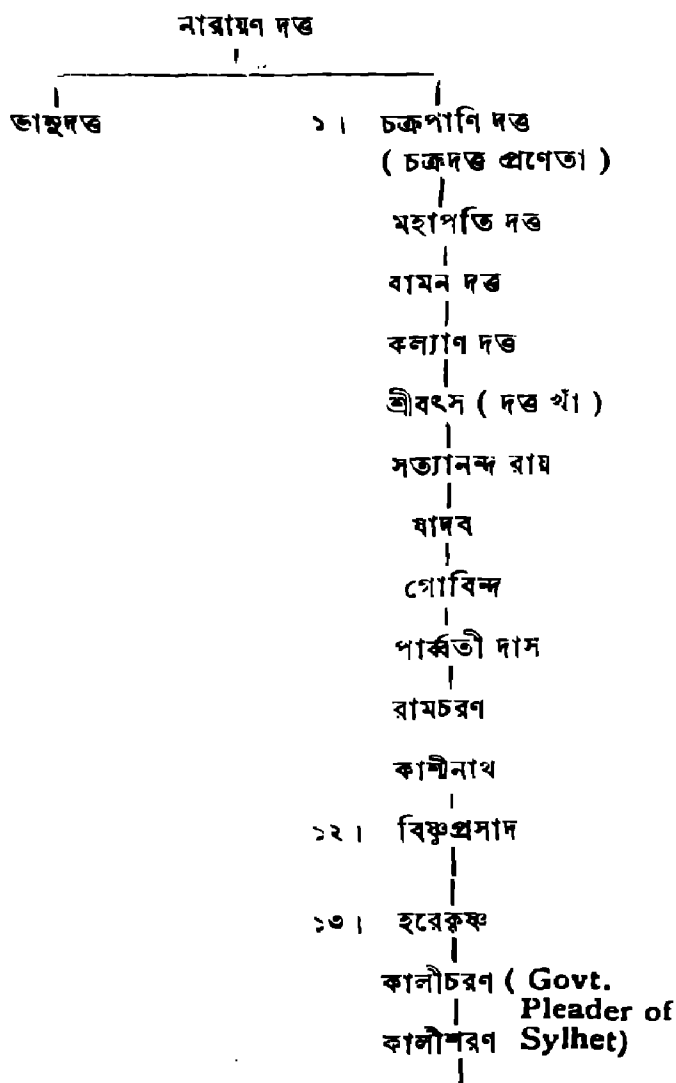
১৬। ভারতচন্দ্র

১৭। প্রমোদ চন্দ্র ক্ষীরোদচন্দ্র বসন্ত (কন্যা)

পৃথ্বীশ ক্ষিতীশ জ্যোতিশ অমিয়া অমলা

রায়বাহাদুর বনোয়ারিলাল হাতি

রায় বনয়ারিলাল হাটী বাহাদুর।

বর্দ্ধমানের অনুমান ৮ ক্রোশ পশ্চিম আধরা গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয় কুলে বাঙ্গলা সন ১২৬৪ সালের ২০শে ফাল্গুন তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার খুল্ল পিতামহ ৺ ক্ষেত্রমোহন হাটি পার্শি ও আরবি ভাষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অনেকদিন সিউড়ির জজ আদালতে সুখ্যাতির সহিত ওকালতি করিয়া মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণও ওকালতি করিতেন। ইঁহার পিতামহ জেলা মুর্শিদাবাদের অধীন কান্দি মহকুমায় মুন্সেফ থাকাকালে ১৮৬৯ সালে তথায় গিয়া ইনি কান্দির ইংরাজি-স্কুলে ভর্ত্তি হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ বিহারিলাল হাটি ডাক্তার ছিলেন, তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইং ১৮৭২ সালে শেষ পরীক্ষায় পাশ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতঃ স্বর্ণপদক (gold medal) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি হাবড়ায় ডাক্তরী আরম্ভ করেন। খুল্ল পিতামহ মহাশয় ঐ সময় মুন্সেফী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায় ইনি অগ্রজের নিকট যাইয়া হাবড়া জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই অগ্রজ মহাশয় হাবড়া হইতে বদলি হওয়ায় ইনি পুনরায় কান্দি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৭৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হন এবং বৃত্তি পান; পরে কলিকাতার তৎকালীন জেনারেল এসেমব্লী ইনষ্টিটিউসন হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় ১৮৭৭ সালে ও ১৮৭৯ সালে বি, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৮১—৮২ সালে আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন। পিতামহ মহাশয় মুনসেফী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি জেলা মুর্শীদাবাদের

অন্তর্গত জামুয়া রাজের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও সেই সূত্রে তিনি সময়ে সময়ে বহরমপুরে থাকিতেন। তাঁহার আদেশানুসারে তিনি ১৮৮২ সালে প্রথমতঃ বহরমপুরে জজ আদালতে ওকালতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২৮৯ সালে ফাল্গুন মাসে পিতামহ মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি বহরমপুর পরিত্যাগ করিয়া নিজ জেলা বর্দ্ধমানে আসিয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানেই ওকালতি করিতেছেন। ইহার মধ্যে তিনি ১৮৮৮ সালের প্রথম ভাগে মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত পিঙ্গনা চৌকিতে চাকরি করিয়াছিলেন।

তিনি, ১৮৯৯ সালে জেলা বর্দ্ধমানের ফৌজদারী বিভাগের সরকারী উকিল (Public Prosecutor) পদে নিযুক্ত হইয়া একাল পর্য্যন্ত সেই পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি ১৯০৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয় স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত হইলে ইনি ১৮৯২ সালে বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়া সেই অবধি এ পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের মেম্বর আছেন এবং ১৮৯২ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ২৭ বৎসরকাল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ইঁহার উপর অর্পিত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কার্য্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করায় তৎকালীন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ (অর্থাৎ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটগণ) ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরগণ ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহার জন্মস্থান আধরা গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে সাধারণের উপকার ও সুবিধার জন্য একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন ও নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন গলসী হইতে আধরা গ্রাম পর্য্যন্ত ৫ মাইল একটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের জন্য আবশ্যকীয় গৃহাদি ইনি নিজ ব্যয়ে তৈয়ার

করাইয়া দিয়াছেন এবং রাস্তার জন্য আবশ্যকীয় জমি নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

ইঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য সরকার বাহাদুর হইতে ইনি প্রথমতঃ ১৯০৩ সালে ও পুনরায় ১৯০৮ সালে সম্মানসূচক সার্টিফিকেট (certificates of Honour) এবং ১৯১৭ সালে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পাঁচ সহোদর ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৺বিহারীলাল ডাক্তার ছিলেন এবং কনিষ্ঠ রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমান জজ আদালতে ওকালতি করেন। ইঁহার ৪ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র গত ১৯১২ সালে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মধ্যম পুত্র রাধা গোবিন্দ বি, এল পাশ করিয়া হাইকোর্টের উকিল শ্রেণীভুক্ত হইয়া সম্প্রতি বর্দ্ধমান জজ আদালতে ওকালতি করিতেছেন। তৃতীয় জগদীশ্বর বৈষয়িক কার্য্যাদি ও ব্যবসায় করেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ রামগোবিন্দ বি, এ পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইনি ১৯২১ সাল হইতে বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটীর অন্যতম কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি-এল ভারতী-বিদ্যাবিনোদ।

রাজকুমার বসুর পিতা ৺নবকুমার বসু। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ৺কালীকমল বসু এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ৺হরকুমার বসু। হরকুমার ভূতপূর্ব্ব "বান্ধব" প্রকাশক ও ঢাকা জজ কোর্টের উকীল। তাঁহাদের দুই ভগিনী—৺নয়নতারা, তাঁহার স্বামী ৺জগতচন্দ্র ঘোষ সাং গাভা দারোগাবাড়ী জিঃ বরিশাল। তাঁহাদের আর এক ভগিনী প্রসন্নময়ী; তাঁহার স্বামী রায় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুর সি-আই-ই।

রাজকুমারের বয়স প্রায় ৫০বৎসর, ফরিদপুর জেলার আয়নাকাঠিতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইঁহাদের বর্ত্তমান নিবাস বেজনীসার গ্রামে। থানা গোসাইর হাট পোঃ গোসাইরহাট জিঃ ফরিদপুরের অন্তর্গত ;পর্য্যায় ২২ বাইশ, বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ, পৃথ্বিধর বসুর সন্তান। গঙ্গাদাসের দ্বারা শিক্ষা। শৈশবে পিতা খুড়া জেঠা দ্বারা বাড়ীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তৎপর মাতুলালয় বানড়িপাড়া জিঃ বরিশাল মাইনর স্কুলে পাঠ, তৎপর নিজ দেশে গোসাইর হাট মাইনর স্কুলে পাঠ, তৎপর কিছুদিন ঢাকায় পিসা বান্ধব-সম্পাদক ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাসায় থাকিয়া কিছুদিন জগন্নাথ স্কুলে পাঠ, তৎপর বরিশাল বড় মাতুল বানড়ীপাড়া নিবাসী ডাক্তার কামিনীকুমার গুহ ঠাকুরতা মহোদয়ের সাহায্যে বরিশাল জিলা স্কুলে ৭ম শ্রেণী হইতে এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পাঠ। প্রত্যেক ক্লাস পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ ; এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস, সরকার হইতে মাসিক ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্তি, তৎপর পিসে ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বান্ধব-সম্পাদক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে ঢাকা কলেজে বি-এল পর্য্যন্ত অধ্যয়ন।
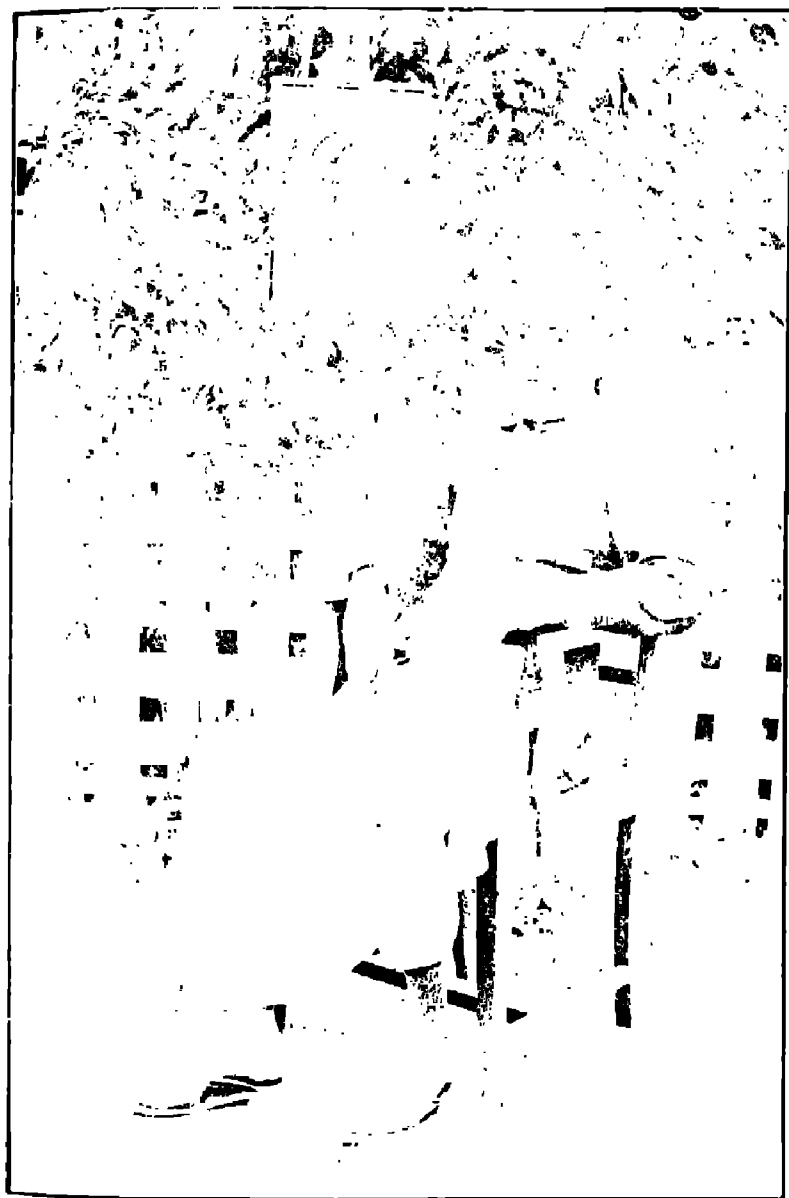
শ্রীযুক্ত রাজ কুমার বসু

তৎপর কিছুদিন দেশস্থ অন্যান্য যুবকের সহ মিলিত হইয়া দেশে গোসাইরহাট স্কুল নামক একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপন ও তাহার মাষ্টারি করা। তাহাই এখন ইদিলপুর এইচ-ই স্কুল নামে খ্যাত।

তৎপর বি-এল পাশ করিয়া পিতা ৺নবকুমার বসু নোয়াখালীতে মোক্তার থাকাবস্থায় নোয়াখালিতে ওকালতী। তৎপর ইং ১৯০১ সনে প্রথম মুন্সেফী পদ প্রাপ্তি, ১৯১০ সনে মালদহ জেলায় মুন্সেফী কার্য্যে অবস্থানকালে স্ত্রী বিয়োগ, মাতৃবিয়োগ ও একটি কন্যা বিয়োগ। ইদিল-পুর দাসের জঙ্গল নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার ৺মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের দ্বিতীয় কন্যা বিবাহ করা হয়। ইতিমধ্যে ২।৩ বার অস্থায়ী-ভাবে সব জজের কাজ করা হইয়াছে। অধুনা ইনি ঢাকা দ্বিতীয় সব জজ পদে আছেন।

সন্তান। ইঁহার দুইটী পুত্র (১) শ্রীমান পঙ্কজকুমার বসু; বয়স ১৮।১৯ ও (২) শ্রীমান পবিত্রকুমার বসু; বয়স ১৪।১৫। ইঁহার দুইটি কন্যারই বিবাহ হইয়াছে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যকুমার বসু ময়মনসিংহ জজকোর্টের উকীল। ইঁহার এক কনিষ্ঠ ভগ্নির গাভা ঘোষ বংশে বিবাহ হইয়াছিল, এখন সেই বিধবা ভগ্নীর পাঁচটি পুত্র বর্তমান।

গ্রন্থ রচনা। স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতেই ইনি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম "রামায়ণ-কাহিনী" তৎপর "কবি কালিদাস"। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে বিশ্বকোষ আফিস হইতে ১৯১৪।১৫ সনে ক্রমিক বাহির হয়। "রামায়ণ-কাহিনী" লিখিতে ও তৈয়ারি করিতে প্রায় ছয় বৎসর লাগে, মুদ্রন ও প্রকাশে তিন বৎসর লাগে।

তৎপর ইনি অভিনব ও অত্যুৎকৃষ্ট তিনখানি নীতিজ্ঞান পূর্ণ সর্ব্বজন প্রশংশিত উপন্যাস বাহির করেন।

উপন্যাসঃ—১। গুরুদক্ষিণা

২। বস্ত্রহরণ

৩। সরোবর মন্থন

অধুনা ইনি নবদ্বীপ কৃষ্ণনগরস্থ বিশ্বমানব মণ্ডল হইতে অযাচিত-ভাবে ভারতী-বিদ্যাবিনোদ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কবিরঞ্জন ৺ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত।

সুকবি ৺ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত কবিরঞ্জন

চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত বাঙ্গালা ১২৫৭ সালের ১লা কার্ত্তিক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রামতারণ রক্ষিত। তিনি ৩৫ বৎসরকাল বুলক ব্রাদার্সের অধীনে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। এই বংশ দক্ষিণ রাঢ় দেশ হইতে চট্টগ্রামের দুর্গাপুরে আসিয়া প্রথমে বাস করেন, তৎপরে তথা হইতে উঠিয়া জোয়ারা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। জমিদারী ও তেজারতি ইহাঁদের বৃত্তি।

ক্ষেমেশচন্দ্র উচ্চ ইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইহাঁর কোন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নাই বটে, কিন্তু ইহার কবিত্ব গুণে মুগ্ধ হইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দিয়াছেন। ইহার তিন পুত্র—(১) শ্রীনগেন্দ্রকুমার রক্ষিত (২) ৺ব্রহ্মকুমার রক্ষিত (৩) শ্রীজীতেন্দ্রকুমার রক্ষিত। চারিটী কন্যা (১) শ্রীমতী বিনোদিনী (২) সুধারাণী (৩) আমোদিনী (৪) অনাবতী। নিম্নে ইহাদের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল—

ক্ষেমেশ বাবু নিজ গ্রামে পুকুর-খনন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, পোল প্রস্তুত ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিজ ব্যয়ে করিয়াছেন। ৺কাশীতে সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার্থ এক বৃহৎ চৌ-তালা দালান খরিদ করিয়া দিয়াছেন। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডেও নিজ ব্যয়ে একটি দ্বিতল বাড়ী সর্ব্ব সাধারণের বাসের সুবিধার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। ক্ষেমেশ বাবুরই চেষ্টায় প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীর সময় দুরারোহ চন্দ্রনাথ

পাহাড়ের শিখর দেশে অসংখ্য যাত্রীদিগকে জল দান করা হয়। ক্ষেমেশবাবু অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে (১) আমার খেয়াল (২) মানস কুসুম (৩) ভগবৎ গীতা (৪) ভগবতী-গীতা (৫) জগৎ-রহস্য (৬) পাপ-রহস্য (৭) ইসলাম ধর্ম্ম (৮) বঙ্গবাসী (৯) উত্তরগীতা (১০) স্তোত্রাবলী (১১) জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র (১২) পাণ্ডব গীতা (১৩) ভারত-সাবিত্রী (১৪) বৌদ্ধ-নীতি (১৫) আত্ম-কথা। ক্ষেমেশ বাবু ১৩২৯।২৮ আশ্বিন পরলোক গমন করেন।

বংশ তালিকা।

ভবানন্দ রক্ষিত
|
বলরাম (জোয়ারা আবাদকারী)
|
সফলদাস
|
কলিকাপ্রসাদ
|
শম্ভুরাম—
|
রাধাচরণ—(মুন্সেফ)

গিরীশচন্দ্র তস্য ভ্রাতা রামচরণ—
(কবিরাজ)
রামতারণ—
|
ক্ষেমেশচন্দ্র (৺গিরীশচন্দ্র রক্ষিত হইতে পোষ্য)
|
নগেন্দ্রকুমার | ৺ব্রহ্মকুমার | জীতেন্দ্র

নগেন্দ্রকুমার →
মনোমোহন | মোহিনীমোহন | জ্যোৎস্নাকুমার | সচ্চিদানন্দ | অচ্যুতানন্দ
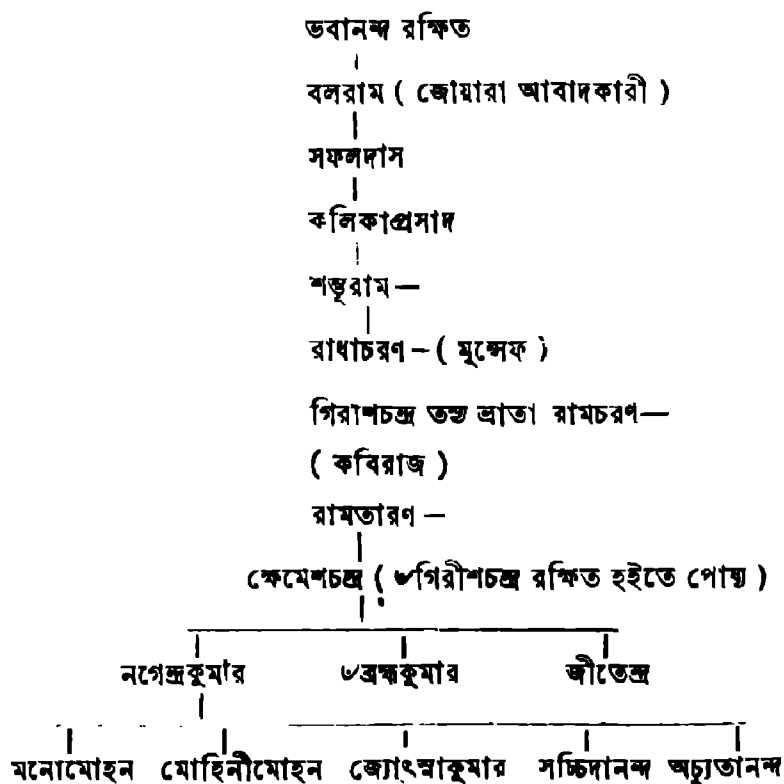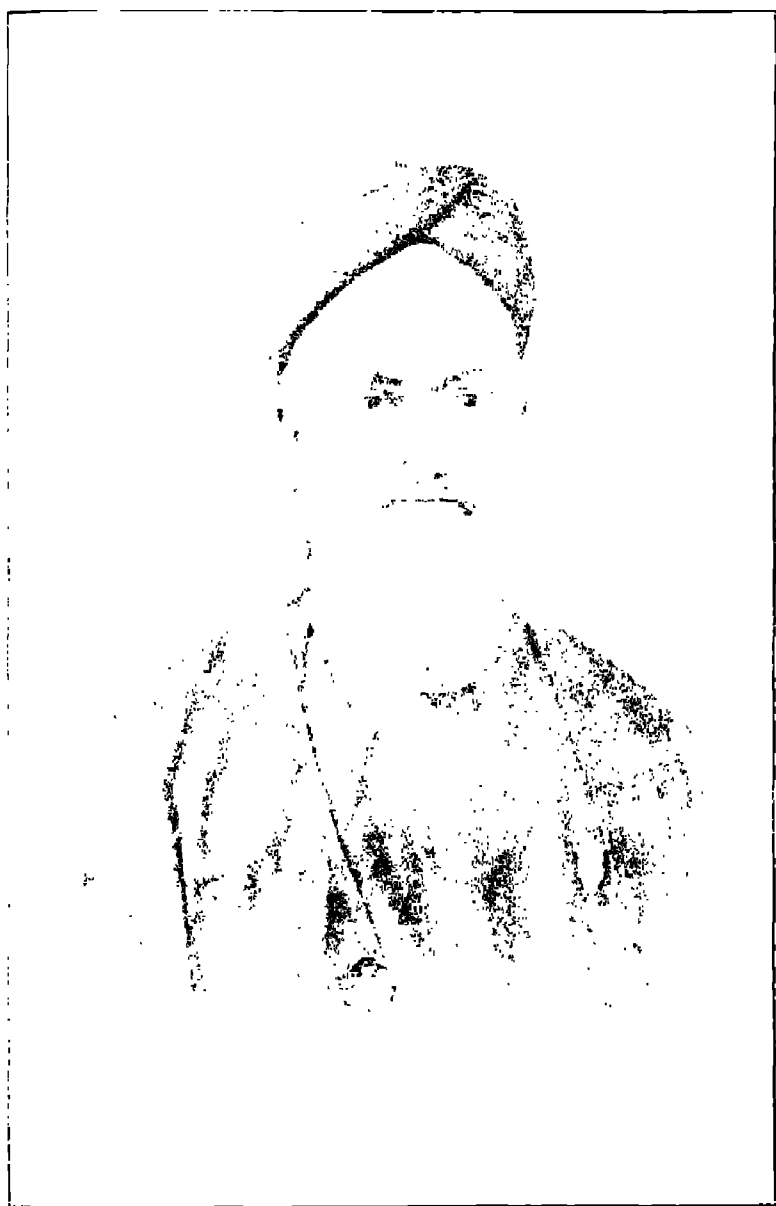
শ্রীযুত কামিনীকুমার দাস, বি-এল, এম-বি-ই,

চট্টগ্রাম জিলার পটীয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে ১৮৭০ খৃঃ অঃ ১লা ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺প্রসন্নকুমার দাস এবং মাতার নাম শ্রীমতী গঙ্গাকালী। তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় কায়স্থবংশোদ্ভব। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ৺হরিনাথ ঠাকুর যশোহর জিলার অন্তর্গত শেখরাইল মৌজা হইতে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে আসিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র কন্দর্প রায়, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং তেজস্বী লোক ছিলেন। চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকের গুরু ভট্টাচার্য্য চক্রশালা গ্রামে বাস করিতেন এবং এই গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া গঙ্গাসদৃশ পুণ্যতোয়া শ্রীমতী নদী প্রবাহিত হয় বলিয়া এই গ্রামটীকে তীর্থরাজ কাশীর সহিত এবং এই বংশের আদিপুরুষ কন্দর্পরায়কে সাক্ষাৎ ভৈরবের সহিত তুলনা করা হইত। কথিত আছে, "চক্রশালা পুরীকাশী শ্রীমতী মণিকর্ণিকা চক্রবর্ত্তী নন্দন ব্যাস কন্দর্প কালভৈরব।" কন্দর্প রায়ের রাজার মত খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং চাল-চলন ছিল বলিয়া তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ রায় উপাধিতে ভূষিত হন। এই বংশের একজন কৃতী পুরুষ, অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে এবং দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন, অদ্যাবধি এই বংশের কেহ কেহ বিশ্বাস পদবী লিখিয়া থাকেন। চক্রশালা গ্রামে এই বংশের যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা কায়স্থ জাতির কুলক্রমাগত সৌজন্য বশতঃ গুরুভট্টাচার্য্যগণের দাস বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে

গৌরব মনে করিতেন, সেইজন্য "দাস" ইঁহাদিগের কৌলিক উপাধি হইয়াছে।

কামিনী বাবুর প্রপিতামহ রামজয় সরকার স্বনামখ্যাত লোক ছিলেন। সরকার ইঁহার কৌলিক উপাধি না হইলেও, তিনি জনসাধারণের নিকট সরকার নামে অভিহিত হইতেন। এই সরকার উপাধিটী দেওয়ান-প্রদত্ত ছিল। অদ্যাবধি তাঁহার বাড়ীকে সরকার বাড়ী, তাঁহার খনিত পুকুরকে সরকারের পুনি বলা হইয়া থাকে। তাঁহার নির্ম্মিত বিষ্ণুমণ্ডপের কারুকার্য্য এবং শিল্পনৈপুণ্য দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে অনেক লোক আসিত। কিম্বদন্তী আছে, তিনি পুকুর খনন করাইবার সময় পুকুরের মধ্যস্থলে কষ্টিপাথরনির্ম্মিত সূর্য্য ঠাকুরের একমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেবা-পূজার সৌকর্য্যার্থে ঐ মূর্ত্তিটী গুরু ভট্টাচার্য্যকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার খনিত পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ে এখন পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর সূর্য্যব্রতের দিনে সূর্য্য-ঠাকুরের পূজা এবং প্রকাণ্ড মেলা হয়। কামিনীবাবু বৎসর বৎসর বহু টাকা ব্যয় করিয়া উক্ত মেলার অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, এখন অনেকে তাহাকে কামিনীবাবুর সূর্য্য মেলা বলিয়া থাকে।

রামজয় সরকারের পুত্র তারিণীচরণ পটীয়া মুনসেফি আদালতে ওকালতী করিতেন। তৎকালে উকিলকে মুন্সী বলা হইত। সেইজন্য তিনি তারিণীচরণ মুন্সী নামে খ্যাত ছিলেন। এখন পর্য্যন্ত অনেক বৃদ্ধ-লোকের নিকট তাঁহার ওকালতী বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। মুন্সী তারিণীচরণের দুই পুত্র ৺প্রসন্নকুমার দাস ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস। অগ্রজ প্রসন্নকুমার চা বাগানে এবং অস্থায়ীভাবে কতিপয় গবর্ণমেণ্ট-চাকরী করার পর স্থানীয় এক সাহেব কোম্পানীর হেডক্লার্ক এবং ম্যানেজার নিযুক্ত হন, সেই অবস্থায় তিনি দেশে যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, দেশের অনেক মামলা-

মোকদ্দমা তিনি আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন এবং দেশের অনেক লোককে চাকরীতে এবং কারবারে প্রবেশ করাইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য দেশের যাবতীয় লোক তাঁহাকে যুগপৎ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিত। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস স্থানীয় কালেক্টরী অফিসে সুখ্যাতির সহিত চাকরী করিয়া অবসর গ্রহনান্তে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ ব্রহ্মচারী হইয়া (নবীনানন্দ ব্রহ্মচারী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক) পরিব্রাজকরূপে নানা স্থান ও তীর্থ পর্য্যটন করেন। তিনি "হরিহরানন্দস্বামী" নাম পরিগ্রহ করিয়া কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য আশ্রম পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে। তাঁহার ২ পুত্র ও দুই কন্যা এখন বর্ত্তমান আছেন। চট্টগ্রামের মধ্যে প্রায় ২০ বৎসর আগে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করতঃ যথাবিহিত শাস্ত্রমতে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উপনীত হইতেছেন।

৺ প্রসন্নকুমার দাসের ৪ পুত্র। সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস ২য় শ্রীযুক্ত শশীকুমার দাস, ৩য় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল দাস ও ৪র্থ ৺যোগেন্দ্র-লাল দাস। কামিনী বাবু চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে এফ এ, এবং কলিকাতার মেট্রপলিটান কলেজ হইতে বি এ,এবং বি-এল পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৪ ইংরাজি সাল হইতে চট্টগ্রাম জজ আদালতে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ওকালতী করিতেছেন। চট্টগ্রাম জেলার ডিষ্ট্রীক্টের বাহিরে ফেণী, চাঁদপুর, নোয়াখালি, কুমিল্লা, শিলচর প্রভৃতি জায়গায় তিনি সময় সময় ওকালতী করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

২য় পুত্র শশীবাবু একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, তিনি কণ্ট্রাক্টরের কাজও করিয়া থাকেন। ৩য় মহেন্দ্রবাবু ১৮৯১ সালে চট্টগ্রাম জেলার

মধ্যে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করায় তদানীন্তন ছোটলাট প্রদত্ত মেডেল পাইয়াছিলেন। তিনি রিপণকলেজ হইতে বি-এ, এবং বি-এল পরীক্ষা পাশ করিয়া ওকালতীতে হাজির হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি না হওয়ায় তিনি ওকালতী পরিত্যাগ করতঃ এখন স্বানাম এণ্ট্রান্স স্কুলে হেড মাষ্টারী করিতেছেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রবাবু স্থানীয় জজ কোর্টে সুখ্যাতির সহিত ওকালতী করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। কামিনীবাবুর একমাত্র জামাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বি-এল পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৯১৮ সাল হইতে চট্টগ্রাম জজ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের ৺নীলকমল দাস কবিরাজ ইহাদের অতি নিকট-সম্পর্কিত জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। তিনি ১০৪ বৎসর বয়সে বেশ সুস্থ শরীরে আজ ৬।৭ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। এই বয়সেও তাঁহার দাঁত অটুট ছিল এবং দৃষ্টিশক্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। নাড়ীজ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তিনি শুধু হাতের নাড়ীর পরীক্ষা করিয়া রোগীর কি কি ব্যারাম হইয়াছে এবং কোন কোন রোগে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে এবং পাইবে এবং রোগের উৎপত্তির কারণ কি তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া দিতেন এবং রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার মুষ্টিযোগ অব্যর্থ ফলপ্রদ ছিল। অনেক সাহেব রোগীও সিবিল সার্জ্জনের চিকিৎসা পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে ভালবাসিতেন। বড় বড় ডাক্তারেরাও তাঁহার নাড়ীজ্ঞান এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। তাঁহার বিশেষ কোন উপাধি ছিল না, "বড়বৈদ্য" বলিলে কেবল তাঁহাকেই বুঝাইত, এবং সাধারণ লোকে তাহাই "বড়বৈদ্য" 'ভিষকশ্রেষ্ঠ' তাঁহার উপাধি বলিয়া মনে করিত। এক কথায় তিনি চট্টগ্রামের ধন্বন্তরি ছিলেন।

কামিনী বাবু উকিল হওয়ার অল্পদিন পরেই অস্থায়ীভাবে কয়েক মাসের জন্ম তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটস্থ পটীয়া মুন্সেফি আদালতে মুনসেফির কার্য্য করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন, পরে ফৌজদারী আদালতে তাঁহার পশার বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া শেষে ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়।

উকিল হওয়ার কয়েক বৎসর পর হইতেই তিনি দেশহিতকর যাবতীয় কার্য্যে অগ্রণীস্বরূপ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। জনসাধারণ সম্পর্কিত অথবা গবর্ণমেণ্ট অনুষ্ঠিত চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত বিষয়েই তিনি অক্লান্তভাবে বিশেষ প্রশংসার সহিত এ যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছেন। কার্য্য করাতেই যেন তাঁহার আনন্দ, কাজ না করিয়া তিনি একদণ্ডও বসিয়া থাকিতে পারেন না। তাস পাশা প্রভৃতি সময় নষ্টকর খেলা কেহ কখনো তাহাকে খেলিতে দেখেন নাই; অথচ কোন মক্কেল কিম্বা সাধারণের কোন কাজে তাহাকে কখনো অবহেলা করিতে দেখা যায় নাই।

তিনি বার বৎসরের অধিক কাল নিয়মিতরূপে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররূপে সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছিলেন এবং ১৯১৫—১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ভাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী কমিটীর সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়া জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন এবং চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত গুরুতর কার্য্যে তিনি এখনও লিপ্ত আছেন:—

১। ১৮৯৭ খ্রীঃ অঃ চট্টগ্রাম ব্যাত্যাপীড়িত সাহায্য কমিটীর সম্পাদক (Secretary of Cyclone relief Fund 1897.)

২। ১৯১১ খ্রীঃ অঃ চট্টগ্রাম করোনেশন ফণ্ডের সম্পাদক (Secy. of Coronation Fund) উক্ত উৎসব কার্য্য বিশেষ সুখ্যাতির সহিত

সম্পাদন করাতে গভর্ণমেণ্ট ১৯১২ সালে তাঁহাকে Coronation Medal দিয়াছেন।

৩। চট্টগ্রাম প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের সেক্রেটারী।

(৪) চট্টগ্রামস্থ শিক্ষা পরিষদের Educational Conferenceএর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রশংসার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

(৫) চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজ, মিউনিসিপাল হাই ইংলিস স্কুল এবং চট্টগ্রাম হাই ইংলিস স্কুলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া তিনি উচ্চ স্কুল-সমূহের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন, এখন তিনি Municipal H. E. Scoolএর প্রেসিডেণ্ট এবং Chittagong H. E. Schoolএর সেক্রেটারী রূপে বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

(৬) গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর চট্টগ্রামে যে বেঙ্গল কায়স্থ কনফারেন্সের অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সম্পাদকের কার্য্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন, এতদুপলক্ষে দেশে ও বিদেশে সমস্ত কাজকর্ম্মে তাঁহার দ্রুত উন্নতি দেখিয়া কেহ কেহ ঈর্ষা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

১৯১৪ ইং আগষ্ট মাসে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কামিনীবাবু নূতন উৎসাহ উদ্যমের সহিত যুদ্ধঋণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং ১ম এবং ২য় ঋণ ফণ্ডের সম্পাদক (Secy. to 1st & 2nd War Loan) রূপে অনেক টাকা সংগ্রহ করেন।

চট্টগ্রামে সৈন্য সংগ্রহের কমিটির তিনি সেক্রেটারী ছিলেন এবং আশাতিরিক্ত কাজ করিয়া গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর, চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট হইতে মাসিক ১১০ সৈন্য চাহিয়াছিলেন, কামিনীবাবুর বিশেষ চেষ্টা এবং উদ্যোগে একা চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রীক্ট হইতে মাসিক ১১৪ পর্য্যন্ত সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল,

এবং ভবিষ্যতে আরো অধিক পাঠান যাইত, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট নিষেধ করার পরে আর সৈন্য পাঠান হয় নাই। এই সমস্ত কার্য্যে কামিনী বাবু ডিভিশনাল কমিশনার মিঃ কে-সি-দে সি-আই-ই, আই-ই-এস মহোদয় কর্ত্তৃক যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যাবলীতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া "যুদ্ধঋণ" এবং "সৈন্য সংগ্রহ" বিষয়ক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে পৃথকভাবে ২ খানি Honour Certificates প্রদান করিয়াছেন ও তাঁহাকে এম-বি-ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। পুনরায় গত ১৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মহামান্য ভারত সম্রাট কর্ত্তৃক Recruiting badge পাইয়াছেন। কামিনীবাবু পুনরায় স্থায়ী সেনা-সংগ্রহ কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি চট্টগ্রাম সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্টরূপে চট্টগ্রামে কো-অপারেটিভের সমস্ত কার্য্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

সম্প্রতি ঢাকা এবং ফরিদপুরের বাত্যাপীড়িত লোকের সাহায্য কল্পে চট্টগ্রামে যে Relief ফণ্ড হইয়াছে কামিনী বাবু তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন।

কামিনী বাবুর জমিদারীর আয় বার্ষিক প্রায় ২০০০৲ টাকা। তাঁহার মাতা এখন জীবিতা আছেন। ৪টি ছেলে ভিন্ন তাঁহার আর কোন পুত্র কন্যা নাই।

কামিনী বাবুর পিতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর কখনো বসিয়া থাকিতেন না, কিম্বা তাস পাশা প্রভৃতি খেলায় অনর্থক সময়াতিবাহিত করিতেন না। সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা ও সাধুসঙ্গ করিতেন এবং জমিদারী কাজ প্রভৃতি নিজে দেখিতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন; ৬৫ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, আত্মীয় স্বজন, ব্রাহ্মণ

পুরোহিতকে ডাকাইয়া নিজে তুলসীতলায় অন্তিম শয্যা প্রস্তুত করতঃ রুদ্রাক্ষের মালা জপিতে জপিতে ১৯০৫ সালে তিনি ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

খাঁটুরার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত।

কলিকাতা হইতে সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনে ৩৫ মাইল যাইয়া গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে পৌছান যায়। গোবরডাঙ্গা ২৪ পরগণার অন্তর্গত; ইচ্ছামতীর শাখা যমুনা তীরে অবস্থিত। যমুনার উপর দিয়া যখন ট্রেণ যায় তখন বামদিকে গোবরডাঙ্গার জমিদারদের বৃহৎ অট্টালিকা দেখা যায়। গোবরডাঙ্গার সংলগ্ন খাঁটুরা গ্রাম। ষ্টেশনটী এই গ্রামেই অবস্থিত। খাঁটুরা গ্রামের পূর্ব্বদিকে একটী বাঁমোড় বা হ্রদ আছে। তাহার স্বচ্ছ জল হীরকাঙ্গুরীয়ের ন্যায় এক খণ্ড ভূমিকে প্রায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ইহা কোনও রাজার পরিখা বেষ্টিত গড় ছিল। এই বাঁমোড়ের তীরে একটী বট গাছ আছে, তাহার মূল ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ও সোপানাবলী-শোভিত। ইহা চণ্ডীদেবীর অধিষ্ঠান বলিয়া বিখ্যাত। বাঁমোড়টী বলয়াকার বলিয়া ইহা চণ্ডীদেবীর কঙ্কন পড়িয়া খোদিত এইরূপ প্রবাদ আছে; এবং সেই জন্য ইহা "কঙ্কন" বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্থানটী অনেক প্রাচীন স্মৃতি-বিজড়িত ও প্রাকৃতিক শোভায় কবি কল্পনার লীলা ভূমি।

এই গ্রামটী যদিও এখন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইহা বহুজন পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল এবং গ্রামস্থ একটী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ কতকগুলি কৃতী সন্তানের জন্ম হওয়াতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেই বংশ আজও খাঁটুরার বড়বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ আছে।

রামরাম তর্কালঙ্কার—রামরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ই খাঁটুরার বড়বাড়ীর আদিপুরুষ। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইনি খুব ব্যুৎপন্ন

ছিলেন ও উহার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহার বিষয়ে একটী গল্প প্রচলিত আছে—

কোনও এক সভাতে রামরাম তর্কালঙ্কার মহাশয় মহারাজ শম্ভুচন্দ্রের নিন্দাবাদ করেন। উহা মহারাজের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড দেন। সৌভাগ্যক্রমে মহারাজের পুত্র এই সময় বিষম রোগে আক্রান্ত হন। রাজবৈদ্য সকল তাহার রোগ আরাম করিতে পারিলেন না। তর্কালঙ্কার মহাশয় উৎকৃষ্ট চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে কারাগার হইতে আনাইয়া পুত্রকে দেখাইলেন। তিনি পুত্রের অসুখ সারাইয়া দিলেন। মহারাজও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া ২৫০ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর এবং ৫০০০৲ টাকা পাথেয়স্বরূপ দান করিলেন। সেই হইতে ইঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিল। বার্দ্ধক্যে রামরাম কাশী যাত্রা করিলেন।

রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি—রামরামের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রাম প্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি পরে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। ইনি বড়ই দুরন্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইঁহাকে পিতা রামরাম বিরক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বাধ্য হন।

তিনি তখন দুঃখিত মনে রঙ্গপুর গমন করিলেন এবং তথায় চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার সুযশঃ হইল। তিনি সেখানকার কালেক্‌টার সাহেবের পত্নীকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করেন। ইহাতে সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার করিলেন ও চলিয়া যাইবার সময় সেখানকার সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিয়া গেলেন। তিনি সে সকল বিক্রয় করিয়া অনেক ধন লইয়া দেশে ফিরিলেন। খাঁটুরায় আসিয়া তিনি বাঁমোড়-তীরে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সেখানে একটী

কালীবাড়ীও স্থাপন করিয়া যান। গ্রামের মধ্যস্থিত পৈত্রিক বাটীতেও তিনি রাধাকান্ত দেবের বিগ্রহ শিব মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন।

রামপ্রাণের সুখ্যাতি শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইল এবং তিনি কালে একজন মহাপ্রতিপত্তিশালী লোক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনেক সদ্ব্যয় ছিল। দান ধ্যানে ও ক্রিয়া কর্ম্মে তিনি বিশেষ যশস্বী ও সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রাণ পাঁচপুত্র রাখিয়া কাশীযাত্রা করেন ও সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পুত্রদের মধ্যে রামধন ও কেদার নাথের আমরা পরিচয় দিব।

রামধন তর্কবাগীশ—রামধন তর্কবাগীশ রামপ্রাণের তৃতীয় পুত্র। ইনি ভট্টপল্লীতে যাইয়া বাল্যকালে সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কৃতবিদ্য হন ও এক টোল খুলিতে উদ্যোগ করেন। এই সময় তিনি একদিন গুরুর চতুষ্পাঠীতে বসিয়া আছেন এমন সময়ে দ্বিতীয় ভ্রাতা কেদারকে পাল্কি আরোহণে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার সহিত স্বীয় অবস্থার তারতম্য দেখিয়া গুরুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। গুরুও তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কথকতা বৃত্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন।

তিনি তদনুসারে কথকতা শিক্ষা করিবার জন্ম চক্রদ্বীপের অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে রাম ও শ্যাম নামক দুই প্রসিদ্ধ কথকের নিকট উপস্থিত হন ও স্বীয় রচনাবলী তাঁহাদের শুনান। তাঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার রচনা কৌশল ও ভাষা লালিত্যের সবিশেষ প্রশংসা করেন; কিন্তু পদাবলীর ছটার অনুরূপ স্বর-মাধুর্য্য না দেখিয়া তাঁহাকে সংগীত শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। তিনি তদনুসারে এক হিন্দুস্থানী গায়কের নিকট দুই বৎসর গান শিক্ষা করেন।

তৎকালে গদাধর শিরোমণি ও কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য নামক দুই ব্যক্তি

কথকতায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পণ্ডিতই শ্রেষ্ঠ। রামধনের কিন্তু তাঁহাদের কথকতা প্রণালী আদৌ ভাল লাগিল না। তাঁহারা যে কথকতা করিতেন তাহা মহাভারতের ও ভাগবতাদির পুনরাবৃত্তি মাত্র, এবং ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের উপর আস্থা থাকার জন্যই লোকে উহা শুনিত। রামধন এ সকল আখ্যায়িকা সরস ও সাধারণের চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য সুললিত বর্ণনা, ভাষাবিন্যাস ও সঙ্গীত সমাবেশ করিয়া তাহা লোক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ আমোদের এক অব্যর্থ অস্ত্র করিয়া তুলেন। ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব এবং ইহার জন্যই তিনি কথকতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। ফলে কথকতার দ্বারা তিনি লোক শিক্ষার যে পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা দেশের এক মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছিল। এখন আমরা Mass education এর নাম শুনিতেছি, কিন্তু কাজে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার বহু পূর্ব্বেই কথকতার দ্বারা বাঙ্গলা দেশে বাস্তবিক Mass education প্রচলিত হইয়াছিল। কথকদের মুখে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির উপদেশ সকল শুনিয়া বাঙ্গালার নিরক্ষর চাষা হইতে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এরূপ প্রাচীন উপাখ্যান, ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে শিক্ষালাভ করিত। লোক শিক্ষা ছাড়া কথকদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কথকরাই বাংলা গদ্য রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁহারাই প্রথমে রামায়ণ মহাভারতাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাংলা গদ্যে রচনা করিয়া ব্যবহার করিতেন। এই গুলিকে "চূর্ণী" বলে ; এই গুলিই সর্ব্বপ্রাচীন বাংলা গদ্যের নমুনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত ইহা মুদ্রিত করার কোনও চেষ্টা হয় নাই এবং কোনও বাংলা ভাষার বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের উল্লেখ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

রামধন কথকতা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অর্থের

সদ্ব্যয় তিনি যথেষ্ট করিতেন। স্বজন প্রতিপালন ও ক্রিয়া কর্ম্ম দ্বারা তিনি পিতা রাম প্রাণের নাম বজায় রাখিয়াছিলেন। এই সকল করিয়াও তিনি মৃত্যুকালে কলিকাতায় অনেকগুলি বাড়ী ও লক্ষাধিক নগদ টাকা রাখিয়া যান।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—শ্রীশচন্দ্র কথক রামধনের পুত্র। ইনি বাল্যকালে নিজ গ্রামে ভগবানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু পরে ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন শ্রীশচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। কলেজের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র একজন প্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য হন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগের পর ইনি ঐ কলেজের সহকারী সেক্রেটারী ও পরে ৯০৲ বেতনে ঐ স্থানে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছু পরে ১৫০৲ বেতনে মুর্শিদা-বাদের জজ পণ্ডিতের পদ পান। এই পদে কিছুকাল কাজ করার পর ছোটলাট স্যার হ্যালিডে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন, ইনি তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি মুর্শিদাবাদে যখন জজ পণ্ডিত ছিলেন, তখন তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। তৎপরে তিনি দেশাচারের প্রভাবে অন্ধ দেশবাসীকে বালবিধবার দুঃখ বিমোচনের পথ দেখাইতে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধবা বিবাহ করেন। ইংরাজি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে অগ্রহায়ণ বঙ্গদেশে এই সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে বঙ্গের গণ্যমান্য লোক সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এমন কি ছোটলাট সাহেবও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হন।

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় দিন বলিতে হইবে। তখন হইতেই বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম অন্ধ বিশ্বাস ও অস্থিমজ্জাগত সংস্কারকে দূরে ঠেলিয়া সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের অনুসরণ করিতে শিখিল। সেই দিন হইতেই হিন্দুর সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত। বঙ্গীয় সামাজিক ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় শ্রীশচন্দ্রের নামও চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিবে। বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী কালীমতী দেবীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাহা হইলেও তাঁহাকে বিধবা বিবাহ করার জন্য অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি সমাজে উঠিবার জন্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অনেক অর্থব্যয় করিয়া মাতার নামে খাঁটুরা বামোড়-তীরে একটী বিস্তৃত ঘাট ও শিবমন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে সমাজের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে মহাসমারোহে নিমন্ত্রণ করিয়া তৈজস ও অর্থ দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঘাট ও মন্দির এখনও তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। এই সকল ব্যয় করিয়াও শ্রীশচন্দ্র পিতার অতুল সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সে কীর্ত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে। তিনি ১৮৮১ অব্দে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে তাঁহার মাসিক ৫০০৲ টাকা অবধি বেতন হইয়াছিল।

প্রথম বিধবা বিবাহ করেন বলিয়াই শ্রীশচন্দ্রের খ্যাতি নহে। তিনি সাহিত্যে ও অলঙ্কারে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীশচন্দ্রের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন।

"সাহিত্য সবিতা শ্রীশ সুমিষ্ট পাঠক।
বিধবা সধবা করা পথ প্রদর্শক॥

শ্রীযুত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎকার।
কবিতার পুরস্কার একায়ত্ত তার॥"

সুরধনী কাব্য ২য় ভাগ ৩৩ পৃষ্ঠা।

কেদারনাথ কবিকণ্ঠ—কেদারনাথ কবিকণ্ঠ রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতির দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত সাহিত্যাদি শিক্ষার পর চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে নিবিষ্ট হন এবং তাহাতে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া কবিরাজ হন। এই ব্যবসায়ে তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করেন। ইনি বিশেষ বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। দুষ্ট লোকে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। যৌবনেই বিসূচিকা রোগে অকালে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।

ধরণীধর শিরোমণি—কেদারনাথ কবিকণ্ঠের পুত্র ধরণীধর। অনুমান, ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ইহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। বাল্যকালে তিনি ভগবান চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পিতৃব্য রামধনের নিকট তিনি কথকতা শিক্ষা করেন। যদিও শাস্ত্র ও সঙ্গীত শিক্ষায় তাঁহার তাদৃশ সুযোগ ঘটে নাই, তথাপি তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে অতি অল্প আয়াসেই পুরাণাদি ও সঙ্গীত বিদ্যার আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কথকতা কার্য্যে ধরণীধরের তুল্য ব্যক্তি আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, রাগ রাগিনী সমন্বিত সঙ্গীত শক্তি ও মনোহারিণী বক্তৃতা সকলেরই মন মুগ্ধ করিত। তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজ আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিতেন। তিনি যেখানে বক্তৃতা করিতেন সেখানে লোকে লোকারণ্য হইত, তাঁহার স্বরজালে মুগ্ধ হইয়া লোকে অবাক্ হইয়া তাঁহার কথা শুনিত এবং তাহারা মুক্ত হস্তে যথা-সাধ্য অর্থ প্রদান করিত। বাস্তবিকই তাঁহার কথকতার মধ্যে কি যেন এক মোহিনী-শক্তি ছিল—তিনি যেন কথক হইয়াই সৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ভগবানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের কথা কিছু বলিব। ভগবানচন্দ্রের জন্ম থাঁটুরা গ্রামে। তিনি জন্মের পূর্ব্বেই পিতৃহীন হন। সুতরাং তিনি নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজ অধ্যবসায় ও স্বাভাবিক গুণেই ভবিষ্যতে বড় হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাল্যে গ্রামস্থ চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, পরে ভাটপাড়ায় যাইয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরেন এবং সেখান হইতে আবার বিক্রমপুরে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নার্থে গমন করেন। কিছুকাল পরে তিনি থাঁটুরায় আসিয়া একটী টোল খুলেন ও অধ্যাপনা বৃত্তি আরম্ভ করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ও আরম্ভ করেন এবং তাহাতে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এইরূপে ভগবানচন্দ্র তখন ঐ স্থানে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া দাঁড়ান ও তাঁহার কীর্ত্তিশ্রী সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিখ্যাত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার মাতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা ছিলেন এবং ভগবানচন্দ্রের টোলেই তিনি সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন।

ভগবানচন্দ্রের কন্যা জগত্তারিণী দেবী। ধরণীধর যদিও অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি ক্রিয়াকর্ম্মে ও আমোদ প্রমোদে তাহা সমস্তই ব্যয় করিতেন, প্রায় কিছুই সঞ্চয় করেন নাই। তিনি ১৮৭৫ অব্দে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার পত্নী ও একমাত্র শিশু পুত্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁহার ঐ শিশু পুত্রের নাম মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৮৬৫ অব্দে ২৪শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। বাল্যকালে মাতার তত্ত্বাবধানে বাড়ীতে কিছুদিন সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তাহাতে তাঁহার সংস্কৃতে বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ভাল

করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার আশায় নিজ ইচ্ছায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসেন। সেখানে তাঁহার পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ১৮৭৯ অব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। কলিকাতায় তাঁহার শিক্ষার সুবিধা হইল বটে, কিন্তু অভিভাবকের অবিবেচনায় তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির একটি গুরুতর ব্যাঘাত ঘটিল। পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই তাঁহার বিবাহ হওয়া গেল। ঐ ঘটনায় তাঁহার মনে একটা গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল এবং জীবনের উপর একটা ঘোরতর অবসাদ আসিয়াছিল। জ্ঞান উপার্জ্জনের এই আকস্মিক ব্যাঘাতের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি ২৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আপনাকে দাম্পত্য সম্বন্ধ হইতে পৃথক রাখিয়াছিলেন ও কোনও প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বাধা ও দুঃখের সহিত এরূপ সংগ্রামে সাংসারিক উন্নতির পথে ব্যাঘাত হইলেও বোধ হয় ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের কিছু সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং তিনি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যতটুকু প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকাদির আলোচনায় ততটুকু মাত্র সময় দিয়া অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মপুস্তক ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। ১৮৮৯ অব্দে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৮৯০ অব্দে এম্ এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও সুবর্ণ পদক পান। বিদেশে যাইয়া পাশ্চাত্যদর্শন আলোচনায় তাঁহার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও পরিবার প্রতিপালনের ভার এখন তাঁহার উপর পড়াতে তিনি আর অধিক দূর অধ্যয়নের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৮৯১ অব্দে তিনি কটকে রেভেন্‌সা কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। সেখানে প্রায় বার বৎসর ধরিয়া ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকের কাজ করিয়া ১৯০৩ অব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেও তাঁহাকে ইংরাজি, সংস্কৃত

ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপকের কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ১৯০৮সালের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত চারমাস তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন অধ্যাপকের কার্য্যে যতটুকু নিজের স্বাধীনতা ও জ্ঞানানুশীলনের সুযোগ আছে, অধ্যক্ষের কাজে তাহা নাই। বরং কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ছুটাছুটি করিতে অনেক সময় নষ্ট হয় ও তাঁহাদের খুসী রাখিতে অনেক সময় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হয়। এই জন্য তিনি যখন মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবসর গ্রহণ করেন ও ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ খালি হয়, তখন ঐ পদ পাইতে আদৌ চেষ্টা করেন নাই। ১৯২০ অব্দে জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পীড়িত হওয়ায় পুনরায় অধ্যক্ষের পদ খালি হয়। সুতরাং তাঁহাকে পুনরায় প্রিন্সিপালের কার্য্য করিতে হয়। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসের ২৫শে স্থায়ী অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু হয় এবং ঐ দিবসেই অধ্যাপক মুরলীধরের পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পূর্ণ হয় ও পেন্‌সন লইবার সময় আসে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আদেশে তাঁহাকে আরও ছয় মাস প্রিন্সিপালের কার্য্য করিতে হইয়াছিল এবং তিনি ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের সময় তাঁহার বেতন ৮০০৲ টাকা হইয়াছিল। ইহার পরেই শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদের ও কলেজের অধ্যক্ষদের উন্নতির ব্যবস্থা হয়। তাহার ফল তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি প্রচলিত শিক্ষার ও সামাজিক আচারের সংস্কারে সময় দিয়াছেন। কেননা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী থাকিয়া এ সকল বিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার তিনি পূর্ব্বে অবসর পান নাই। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকিতেই ১৯২০ অব্দের এপ্রিল মাসে গুড্ ফ্রাইডের ছুটীর সময় মেদিনীপুরে বঙ্গীয়

প্রাদেশিক সামাজিক সম্মিলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। ঐ সময় তিনি সভাপতির অভিভাষণে সমাজ সংস্কার বিষয়ে নিজের মত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করেন। ইহাতে তিনি অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে এবং তাহা হিন্দু সমাজের রক্ষার জন্য প্রচলিত হওয়া আবশ্যক এই মত সমর্থন করেন। বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতির সেক্রেটারী ও পরে সহকারী সভাপতিরূপেও তিনি কার্য্য করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কা-রের তিনি নিতান্ত পক্ষপাতী। তাঁহার মতে পাশ্চাত্যজ্ঞান প্রাচীন জাতীয় জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহা মাতৃভাষার মধ্য দিয়া প্রচার হওয়া দরকার। প্রচলিত উচ্চ শিক্ষায় ইহার বিপরীত ব্যবস্থা থাকাতে আমাদের জাতীয় মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়াছে এবং এই প্রণালীর সংস্কার যতদিন না হয় ততদিন এই শিক্ষার কুফল হইতে অন্ততঃ স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করি-বার জন্য স্বতন্ত্র স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিনি পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্যে একটী স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় কমিটী গঠিত হইয়াছে ও তিনি তাহার সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু এ সকল কাজ তাঁহার পক্ষে বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। যে আধ্যাত্মিকতত্ত্বের আলোচনার জন্য তিনি অবসর খুঁজিতেছিলেন তাহাই তাঁহার জীবনে প্রধান লক্ষ্য; সেই উদ্দেশ্য সাধনের তিনি চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও তাহার ফল সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র।

শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র কলিকাতা ভবানীপুরে ১৮৭৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺গঙ্গাচরণ মিত্র ২৪ পরগণার সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তিনি ওকালতী ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু দান ব্রত অবলম্বন করিয়া মৃত্যুকালে কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সদাশিব শ্রেষ্ঠ মুখ্য কুলীন, কিন্তু জাতি গৌরবে নিজেকে গৌরবন্বিত মনে না করিয়া নীচ ও পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া থাকেন। ভবানীপুর লণ্ডন মিশন কলেজে এফ, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় ও সংসারের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৯৫ সনে পাইকপাড়ার রাজকুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের গৃহ শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। উক্ত কার্য্য করায় সময় ইঁহার প্রতিভা কুমার শরৎচন্দ্র সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুমার শরৎচন্দ্র অতি সত্বরই ইঁহাকে তাঁহার যুক্ত-প্রদেশের বিশাল জমিদারীর প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশে ইনি একজন কর্ম্মবীর বলিয়া খ্যাত। মথুরা ও বুন্দেলখন্দ জেলায় কুমার শরৎচন্দ্র সিংহের জমিদারী ও স্বর্গীয় মহাত্মা লালাবাবুর শ্রীবৃন্দাবনে বিরাট দেবসেবা সুদক্ষতার সহিত পরিচালন করিতে করিতে অবকাশ সময়ে দেশ হিতৈষণা ব্রতে ইনি ব্রতী থাকিতেন। ইনি বৃন্দাবন মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান, মথুরা জেলাবোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। মথুরায় তদনীন্তন কালেক্টার সাহেব ইঁহার সততার ও কার্য্য দক্ষতার সম্যক পরিচয় পাইয়া কলিকাতার ৺ কাশীনাথ মল্লিক ও ব্রজমণি দাসীর যে

মথুরা জেলায় এক বিরাট দাতব্যভাণ্ডার আছে তাহার মেম্বর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে ইনি নিজব্যয়ে মথুরা, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, রাধাকুণ্ড, গোকুল প্রভৃতি স্থানে যাইয়া দাতব্যভাণ্ডারের টাকা গরীব, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতিকে মাস মাস বিতরণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত বৃন্দাবন অনাথ আশ্রমের ভাইসচেয়ারম্যান ও বৃন্দাবন প্রেম মহাবিদ্যালয় নামক যে একটী উচ্চ শ্রেণীর টেক্‌নিকাল কলেজ আছে, ইনি তাহার ডাইরেক্টর ছিলেন। স্বদেশের কার্য্যে ইনি সতত তৎপর, ইনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের মথুরা জেলার ডিষ্ট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি এত পরদুঃখকাতর যে, মথুরা জেলায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব সময়ে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া প্লেগাক্রান্ত রোগীদের গৃহে যাইয়া চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিতেন। মথুরা জেলায় ১৯০৭ সনে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়, সেই সময়ে ইনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট প্লেগের ও দুর্ভিক্ষ সময়ে ইঁহার পরহিতব্রত কার্য্যের জন্য ইঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে উচ্চ অঙ্কের সার্টি-ফিকেট দিয়াছিলেন। এক কথায় ইনি বাঙ্গালী হইয়া মথুরা জেলার প্রধান নেতা ছিলেন। মথুরা জেলায় ইঁহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কার্য্য হইত। ইনি গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও বিশ্বস্ত থাকায় গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের মধ্যে সম্মিলন-সূত্র স্বরূপ ছিলেন। ম্যানেজারি পদে ইনি যে বেতন পাইতেন, দীন-দরিদ্র সেবাতেই তাহার সমস্তই ব্যয় করিতেন। নিজে অর্থ কষ্ট সর্ব্বদাই ভোগ করিতেন। এমন কি পরার্থে সমস্ত ব্যয় করিয়া নিজে অশন-বসনের জন্য অর্থ কষ্ট পাইতেন। পাবনা জিলার অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর বৃন্দাবনে বাস করিয়া রাধাবিনোদ সেবা করিতেন। ইঁহার সচ্চরিত্রতা ও কার্য্যদক্ষতা লক্ষ্য করিয়া ১৯১০ সনে তিনি ইঁহাকে নিজ ষ্টেটের ম্যানেজার

পদে নিযুক্ত করেন। তখন ইনি যুক্তপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর ১৯১৫ সনে রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া ষ্টেটে সদর ম্যানেজারি করার জন্য ইঁহাকে পুনরায় অনুরোধ করেন। ইনি ছাত্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে তাড়াস ষ্টেটের কুমার বাহাদুরগণ ইঁহাকে অবসর দিতে কোন মতে চাহিলেন না। পরে অক্লান্ত পরিশ্রমে উভয় ষ্টেটেরই ম্যানেজারি করিতে থাকিলেন। ১৯১৮ সনে রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর ইনি পাইকপাড়া রাজষ্টেটের ম্যানেজারি পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। উক্ত অবসর গ্রহণের দৃশ্যটী প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। পাইকপাড়া ষ্টেটের অমাত্য ও প্রজাবর্গ ইঁহাকে দশখানি বিদায়োচ্ছ্বাস পত্র দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি তাড়াস ষ্টেটের প্রধান অমাত্যের কার্য্য করিতেছেন। জমিদারী কার্য্য পরিচালনা করিয়া অবকাশ সময়ে ইনি এখনও দেশহিতৈষণা কার্য্যে ব্রতী থাকেন। বালকগণ ইঁহার বড় প্রিয়। মথুরা জেলায় অবস্থানকালে তদানীন্তন মথুরা জেলার কালেক্টরগণ তত্রত্য যাবতীয় বিদ্যালয়ের পর্য্যবেক্ষণের ভার ইঁহার উপরে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গদেশে আসিয়া ইনি পাবনা জেলার বনোয়ারি নগরের করোনেশন বনমালী হাইস্কুলের ভাইসচেয়ারম্যানের ও সিরাজগঞ্জ বি,এল, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বরের কার্য্য করিতেছেন। ইনি ইঁহার আয়ের এক চতুর্থাংশ নিজের ও নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রগণের জন্য ব্যয় করেন এবং এক চতুর্থাংশ ঔষধ বিতরণে ও অর্দ্ধাংশ দুঃস্থ বালকগণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন।

বালিয়াটীর জমিদার বংশ।

জিলা ঢাকা, মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামে ৺ঘনেশ রাম রায় নামে জনৈক বৈশ্য বারেন্দ্র শ্রেণীর লোক ছিলেন। গোবিন্দ রাম প্রভৃতি তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। উক্ত গোবিন্দ রাম বালিয়াটী গ্রামে বিবাহ করিয়া বালিয়াটীতেই বাস করেন। গোবিন্দ রামের অপর তিন ভ্রাতার মধ্যে একজন ময়মনসিংহ জেলার আটীয়া পরগণাধীন ছাওয়ালী গ্রামে ও অপর একজন নাগপুর গ্রামে বিবাহ করিয়া ঐ ঐ স্থানে বাস করিতে থাকেন। এক ভ্রাতা বিনোদপুর গ্রামেই অবস্থিতি করেন; তাঁহার বংশের এখন কেহই বর্ত্তমান নাই।

আনন্দ রাম, দধি রাম, পণ্ডিত রাম ও গোলাপ রাম নামে গোবিন্দ রাম রায়ের ৪ পুত্র। এই চারিজন প্রথমতঃ একত্রে, পরে পৃথক পৃথক রূপে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। এই চারি ভ্রাতা হইতে বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ গোলাবাড়ী, পূর্ব্বপশ্চিম বাড়ী, মধ্য বাড়ী ও উত্তর বাড়ী নামে চারিটী জমিদার বাড়ীর সৃষ্টি হয়। আনন্দ রামের বংশধরগণ গোলা-বাড়ীর জমিদার নামে খ্যাত। ঢাকা, ময়মনসিং ও বাখরগঞ্জ জেলায় ইঁহাদের বিপুল জমিদারী আছে। উক্ত গোলাবাড়ীর জমিদারগণ মধ্যে এখন বাবু সুখলাল রায় চৌধুরী, বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বাবু সখিলাল রায় চৌধুরী ও বাবু বীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ বর্ত্তমান আছেন।

৺দধিরাম রায়ের নিত্যানন্দ রায় ও রায় চান্দ রায় নামে দুই পুত্র জন্মে। নিত্যানন্দ রায় বালিয়াটীর পশ্চিম বাটীর এবং রায় চান্দ রায় বালিয়াটীর পূর্ব্ব বাড়ীর জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। প্রথমতঃ

উক্ত দুই ভ্রাতা এজমালীতে লবণের কারবার আরম্ভ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকেন। পরে পৃথক পৃথকরূপে সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নলচিটী, ঝালকাটী, ললিতগঞ্জ প্রভৃতি তৎকালীন পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে লবণ, সুপারী, চাউল ইত্যাদিতে বহুবিধ জিনিষের কারবার করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। উল্লিখিত স্থানে এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের কারবারের সুবৃহৎ ইষ্টকালয়াদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রমে যখন তাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী হন, সেই সময় জমিদারী ও তালুকাদি খরিদ করিতে আরম্ভ করেন। নিত্যানন্দ রায়ের বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী ও জগন্নাথ রায় চৌধুরী নামে বিশেষ প্রতিভান্বিত ও সৌভাগ্যশালী দুই পুত্র জন্মে। তাঁহারা ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা জিলায় অনেক জমিদারী ক্রয় করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের জমিদার-শ্রেণী ভুক্ত হন। ৺রায় চান্দ রায়ের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রাজচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, ভগবানচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী নামে ৪ পুত্র ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে গিরিশচন্দ্র, মহিমচন্দ্র, অক্রূরচন্দ্র রায় চৌধুরী নামে ৩ পুত্র জন্মে। বাবু রাজচন্দ্র রায় চৌধুরীর ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান ও সদাচার লোক প্রায় দেখা যায় না। ইহারাও উপরোক্ত ৫টী জিলা মধ্যে বৃন্দাবন ও জগন্নাথ রায় চৌধুরীর সঙ্গে এজমালীতে ও পৃথক ভাবে বহু জমিদারী ও তালুকাদি খরিদ করিয়া জমিদার-শ্রেণীভুক্ত হন। বৃন্দাবন রায় চৌধুরীও জগন্নাথ রায় চৌধুরী এই উভয় ভ্রাতা মধ্যে সাবশেষ ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ্য বর্ত্তমান ছিল। বৃন্দাবন রায় চৌধুরীর শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। পঁচিশ ত্রিশজন বলিষ্ঠ শ্রমজীবী লোক একত্রে যে জিনিষ উত্তোলন করিতে সমর্থ হইত না, বৃন্দাবনচন্দ্র একাকী অনায়াসে তাহা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইতেন। এরূপ শুনা যায়, এক সময় ৺বৃন্দাবনধাম গমন উপলক্ষে পথে কোন এক নদীতীরে তাঁহার সঙ্গীয় লোকদের সঙ্গে এক নীলকুঠীর লোকজনের বিবাদ উপস্থিত

হইলে নীলকুঠীর সাহেব তাহাদের নৌকা আটক করিবার জন্য দুইশত বা ততোধিক সংখ্যক লোক পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু বৃন্দাবনচন্দ্র একমাত্র যষ্টি সহায়ে ঐ দুইশত কি ততোধিক লোককে ঐ কুঠী পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নীলকুঠীর সাহেব তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবন চন্দ্রকে গুলি করিবার জন্য বন্দুক বাহির করিলে মেম সাহেব এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া সাহেবকে বলিলেন, "যে ব্যক্তি একা একখানা যষ্টি সহায়ে এতগুলি লোককে এরূপভাবে তাড়াইয়া আনিয়াছে সেই বীর পুরুষকে এরূপভাবে গুলি করা ভীরুতার কার্য্য।" সাহেব মেম সাহেবের এই কথা শুনিয়া নিজে নিকটে আসিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রকে বহু সমাদরপূর্ব্বক কুঠীতে লইয়া যান এবং নানারূপে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া বহু উপঢৌকনাদি প্রদান করেন। বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র ও জগন্নাথ রায় চৌধুরী পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারা নিজেদের বাড়ীর নিকট মনোহর কষ্টিপাথর-নির্ম্মিত উভয় পার্শ্বে রাধিকা ও ললিতা সখীমূর্ত্তিসমন্বিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি, রাধাবল্লভ বিগ্রহ নামকরণে প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু টাকা আয়ের সম্পত্তি বিগ্রহসেবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাবধি তথায় নিয়মিতরূপে দুই বেলা বিগ্রহের সেবা হইতেছে; এবং নানাশ্রেণীর অতিথি তাঁহার প্রসাদ পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব বাড়ীর সহিত একত্রে ৺বৃন্দাবনধামে ৺গোপাল জিউর মন্দির ও কুঞ্জ-স্থাপন করিয়া তথায় নিয়মিতরূপে তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এতদঞ্চলের ধর্ম্মপিপাসুব্যক্তিগণ বৃন্দাবনধাম দর্শনে গেলে উক্ত গোপালজীউর কুঞ্জে আশ্রয় ও প্রসাদ পাইয়া থাকেন। ৺পুরীধামে ও ৺কাশীক্ষেত্রেও ইঁহাদের অনেক কীর্ত্তি অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব বাড়ী পশ্চিম বাড়ীর বহু অর্থব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ ৺নরসিংহ জিউর একটী আখড়ার স্থাপিত আছে এবং ঐ আখড়ার সেবার জন্য উপযুক্ত বৃত্তিও বন্দোবস্ত আছে।

বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ওরফে দিগুবাবু নামে ৺বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরীর সাতিশয় তেজস্বী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এক পুত্র জন্মে। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী নিজ প্রতিভাবলে পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারগণের অগ্রণী হইয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসনের" কর্ম্মিষ্ঠ মেম্বর হইয়াছিলেন। স্বায়ত্ত শাসনবিধি প্রচলন জন্য সুপ্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনেরল মহামতি লর্ড রিপণ বাহাদুরকে তাঁহার কার্য্যাবসানে ভারত ত্যাগ কালে বোম্বাই নগরে নিখিল ভারতের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, সেই অভিনন্দন সভায় পূর্ব্ববঙ্গের জমিদার-গণ মধ্যে অন্যান্য জমিদারসহ ল্যাণ্ড হোলডার্স সভার পক্ষ হইতে বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী সাতিশয় পরদুঃখকাতর লোক ছিলেন। কেহ কখন অপর কর্ত্তৃক নির্য্যাতন-ভয়ে তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইলে তিনি তাহাকে রক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদা বালিয়াটীর সমীপবর্ত্তী জনৈক মুসলমান তালুকদারের লোলুপ দৃষ্টি একটী বিধবা ব্রাহ্মণ-ললনার প্রতি পতিত হয়। উক্ত দুষ্ট ব্যক্তি তাহাকে হস্তগত করার জন্য প্রথমতঃ নানারূপ প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে পরে তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের প্রতি নানারূপ অমানুষিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। উক্ত বিধবা ললনা অনন্যোপায় হইয়া বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইয়া সমস্ত বিবরণ অবগত করান। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া উক্ত দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিকে নানারূপে পীড়ন ও মামলা মোকদ্দমা করতঃ একেবারে উৎসন্ন করিয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করেন। এই কার্য্যে বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল; সৎকার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। বাং ১২৮৬ সালে

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী

যখন এতদ্দেশে খাদ্য শস্যের দুর্ম্মূল্যতা প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি নিজ বাটীতে এক অন্ন-ছত্র খুলিয়া কয়েক মাস পর্য্যন্ত দৈনিক প্রায় দ্বিসহস্রাধিক লোককে আহার করাইয়াছিলেন। তাঁহার জমিদারীর অধীন সুপ্রসিদ্ধ ধামরাই অঞ্চলে ঐ দুর্ভিক্ষ সময়ে বাজার মূল্য হইতে অনেক কম দরে বহু লোককে ধান্য দিয়াছিলেন এবং নিতান্ত গরীব দুঃখীকে বিনামূল্যে ধান্য বিতরণ করিয়াছিলেন। কোন এক সময়ে উড়িষ্যা ও বিহারের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণকেও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কৃষ্ণকামিনী চৌধুরাণী মহাশয়া অন্যূন দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে পূর্ব্বোক্ত ৺রাধাবল্লভ বিগ্রহের জন্য বিশেষ কারুকার্য্যখচিত একখানা রৌপ্য সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পোষ্যপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, তেজস্বী, বিদ্যোৎসাহী ও পরদুঃখকাতর। তিনি নিজে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অনেক গরীব প্রতিভাবান ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষায় সাহায্য দান করিয়া আসিতেছেন। ভিন্ন স্থান নিবাসী নিঃসম্পর্কীয় একটী নিতান্ত গরীব বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণসন্তান তাঁহার অর্থসাহায্যে কলেজে প্রবেশকাল হইতে এম-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করতঃ বিশেষ যোগ্যতার সহিত এম এ পরীক্ষা পাশ করিয়া এখন শিক্ষাবিভাগে উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আরও বহু ছাত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য মাসিক সাহায্য করিতেছেন। বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি এইরূপ সাহায্যদানে কোনরূপ জাতিবিচার করেন না। বাবু সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ঢাকা সদরে কতিপয় বৎসর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ও মিউনিসিপালিটীর কমিসনরের কার্য্য করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

বাবু জগন্নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাবু কানাইলাল রায় চৌধুরী,

বাবু রাধিকালাল রায়চৌধুরী, বাবু কিশোরীলাল রায়চৌধুরী, বাবু যশোদালাল রায় চৌধুরী নামে ৪ পুত্র জন্মে। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ কলেজ ও জুবিলী স্কুল যতদিন বিদ্যমান থাকিবে ততদিন বাবু কিশোরী লাল রায়চৌধুরী মহাশয়ের নাম সঞ্জীবিত থাকিবে। জগন্নাথ কলেজের স্থাপন ও উন্নতিকল্পে তাঁহার সর্ব্বস্ব তিনি ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারও বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের অর্থে স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে। বাবু কিশোরীলালের ন্যায় দানশীল ও উদারচেতা লোক অতি বিরল। বাবু যশোদালাল রায় চৌধুরী মহাশয় নিজ ব্যয়ে বালিয়াটী গ্রামে বহুদিন যাবৎ একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া এতদঞ্চলবাসী সর্ব্বসাধারণের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বাবু কিশোরী লালের দুই পুত্র :—বাবু কুমুদলাল ও বাবু কুঞ্জলাল। বাবু যশোদালালের দুই পুত্র—বাবু যামিনীলাল ও যোগেন্দ্র লাল এইক্ষণ বর্ত্তমান আছেন।

বাবু রাজচন্দ্র রায়চৌধুরীর বাবু জগচ্চন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে চারি পুত্র ছিলেন, ইহারা সকলেই বিশেষ শিক্ষিত লোক ছিলেন। বাবু শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী বিষয় কার্য্য পরিচালন উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ থাকা সময় বহুকাল সিরাজগঞ্জে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য যোগ্যতার সহিত করিয়া গিয়াছেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র বাবু গুরুপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করতঃ ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করিতেছেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র বাবু হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বিশেষ বিদ্যোৎসাহী, বিনয়ী, সদা-

রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী বাহাদুর

লাপী ও বুদ্ধিমান লোক। ইনি নিজে এতদঞ্চলের সর্ব্ব সাধারণের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার সুবিধার জন্য বালিয়াটী গ্রামে পঞ্চাশ সহস্রাধিক মুদ্রাব্যয়ে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য বহু টাকা ব্যয়ে তিনি একটী সুদীর্ঘ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং উহার দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ সুদৃশ্য বিদ্যালয় আর নাই। বাবু ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুত্র—বাবু রাইমোহন ও বাবু রেবতীমোহন রায় চৌধুরী। রেবতী বাবু একজন শিক্ষিত, সদালাপী, বুদ্ধিমান লোক। বাবু ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের চারি পুত্র, তন্মধ্যে এখন কেবলমাত্র বাবু নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় জীবিত আছেন। ইহারা বালিয়াটীর পূর্ব্ব বাড়ীর ॥৶৹ আনীর জমিদার নামে প্রসিদ্ধ।

বাবু ভগবানচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র ও হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ১২৮৬ সালে যখন পূর্ব্ববঙ্গে অন্নকষ্ট হইয়াছিল তখন বালিয়াটীতে অন্নছত্র করিয়া বহুদিন বহু লোককে অন্নদান করিয়াছিলেন এবং বহুদিন গত হইল একবার বালিয়াটী গ্রামে আগুন লাগিয়া বহু দরিদ্র লোকের বাটী ঘর পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইলে এই সময় তাঁহারা উহাদের বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুত্রের মধ্যে এখন কেবল বাবু নরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জীবিত আছেন। বাবু মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের চারি পুত্র—বাবু মুণীন্দ্রমোহন, সুরেন্দ্রমোহন, শচীন্দ্র মোহন ও ভূপেন্দ্রমোহন। বাবু অক্রূরচন্দ্র রায় চৌধুরীর বাবু অক্ষয় কুমার, অপূর্ব্ব কুমার, অবিনাশ চন্দ্র ও অমূল্যচন্দ্র নামে চারি পুত্র আছেন। তন্মধ্যে বাবু অবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা জজ আদালতে কয়েক বৎসর যাবত

ওকালতী করিতেছেন। বাবু অমূল্যকুমার রায় চৌধুরীও বিশেষ শিক্ষিত ও সুবক্তা। ইহারাও বালিয়াটী পূর্ব্ব বাড়ীর ।৵০ আনীর জমিদার নামে খ্যাত। বালিয়াটী পূর্ব্ববাড়ীর ॥৵০ আনা ও ।৵০ আনীর জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় রায় চান্দ রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধামে ৺শ্যামসুন্দর জিউ বিগ্রহ স্থাপন করতঃ একটী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, এই দেবালয়ই শ্রীনবদ্বীপ ধামে বড় আখড়া নামে অভিহিত। এই আখড়াতে বহু অভ্যাগত লোক স্থান পাইয়া থাকেন।

সম্প্রতি পূর্ব্ব বাড়ীর ॥৵০ আনীর বাবুগণ এই আখড়ার মন্দিরটি সংস্কার করতঃ নূতন নির্ম্মাণ করিয়া শ্বেত প্রস্তর দ্বারা শোভিত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু রেবতীমোহন রায় চৌধুরী ৺শ্যামসুন্দরজীউ বিগ্রহের জন্য একখানি রৌপ্য নির্ম্মিত সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

বালিয়াটীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাড়ীর অপর কীর্ত্তি ঢাকা জিলার অন্তর্গত ধামরাই নগরের সুপ্রসিদ্ধ ৺যশোমাধব দেবের সুদৃশ্য কারুকার্য্যখচিত সুবৃহৎ উচ্চ রথ। এরূপ শুনা যায় ভারতের কুত্রাপি এত উচ্চ ও এরূপ সুদৃশ্য রথ বিদ্যমান নাই। পনর কুড়ি বৎসর পরেই এই রথ পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে নূতন নির্ম্মিত হইতেছে। এই রথ উপলক্ষে ধামরাই যাত্রা বাড়ীতে যে সুবৃহৎ মেলা পক্ষাধিককাল ব্যাপিয়া হয় তাহার যাবতীয় উপস্বত্ব যশোমাধব ঠাকুরের সেবায় প্রদত্ত হয়। বাবু ভৈরবচন্দ্রের পুত্র স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে যশোমাধব দেবের সুদৃশ্য রৌপ্য সিংহাসন প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

বাবু পণ্ডিত রামের বংশধরগণ বালিয়াটীর মধ্যবাড়ীর জমিদার নামে খ্যাত। উক্ত বাড়ীর মধ্যে বাবু শাম্বিকাচরণ, গোপালচরণ,

শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসন্ন রায় চৌধুরী।

মতিচাঁদ, পুলিনবিহারী, নিকুঞ্জবিহারী, শশধর, ফণীভূষণ ও মাধবেন্দ্র রায় চৌধুরী জীবিত আছেন। এই বংশে বাবু গোষ্ঠবিহারি রায় চৌধুরী স্বকীয় প্রতিভা ও ব্যবসায়বুদ্ধিবলে পাটের কারবার করিয়া বিপুল অর্থশালী হইয়া পুত্র সুরেশকুমারকে বর্ত্তমান রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

গোলাপ রাম রায়ের বংশধরগণ বালিয়াটীর উত্তর বাড়ীর জমিদার নামে খ্যাত। ইঁহাদেরও এক সময় বিপুল জমিদারী ছিল। এই বংশে এখন বাবু সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও বাবু মাখনচন্দ্র রায় চৌধুরী জীবিত আছেন।

বালিয়াটীর জমিদার বংশ চিরদিন বিশেষ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। প্রতি বৎসর পশ্চিম বাড়ীর ও গোলাবাড়ীর জমিদারগণ মহাসমারোহে তাঁহাদের স্থাপিত কুলদেবতার ঝুলনোৎসব করিয়া থাকেন, তদুপলক্ষে পাঁচদিন অহোরাত্রব্যাপী নৃত্যগীতাদি আমোদ ও দরিদ্রভোজন হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বাড়ী ও মধ্যবাড়ীর জমিদারগণও মহাসমারোহে শারদীয়োৎসব সম্পন্ন করেন এবং তদুপলক্ষে তিন চারিদিন ব্যাপী নৃত্যগীতাদি ও ব্রাহ্মণভোজন ও অন্যান্য বহু লোক ভোজন হইয়া থাকে।

বালিয়াটীর জমিদার বংশ তালিকা।
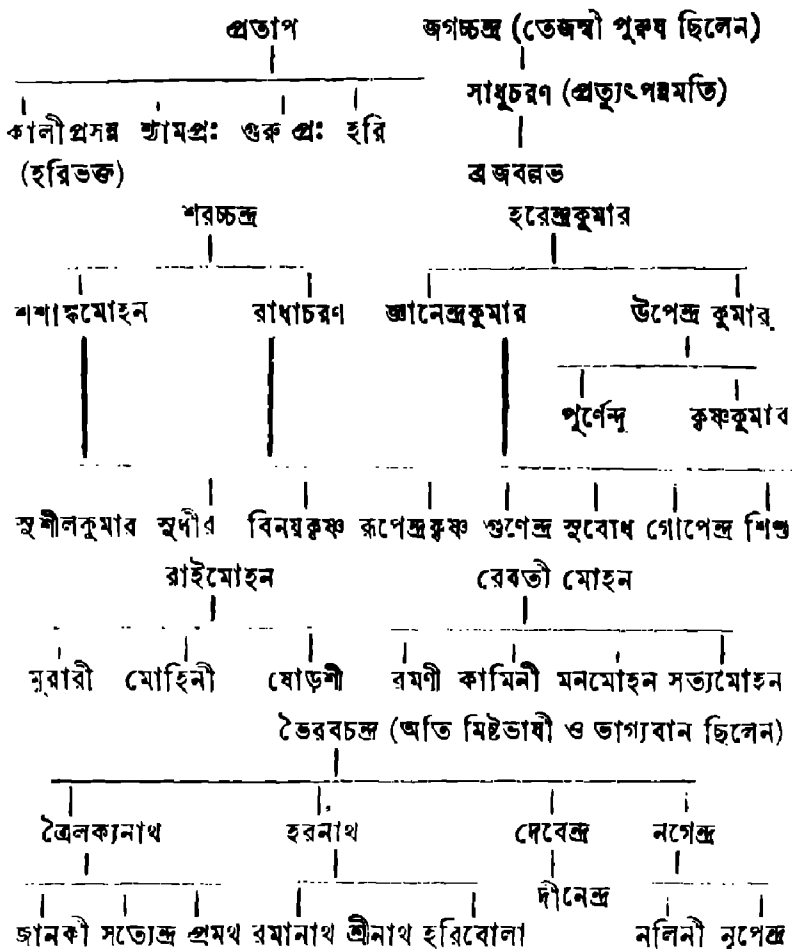
ডাক্তার ইউ,

ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[ডাঃ ইউ ব্যানাৰ্জ্জী এল্-আর্-সি-পি,
এম্-আর-সি-এস্ (লণ্ডন)]

—— ०:०:० ——

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব পুরুষগণ রাজা বল্লালসেনের সময় হইতে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

উপক্রমণিকা

বল্লালসেনের সভায় ইহাঁর আদি পুরুষের নাম মকরন্দ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দাসু কাঁটাদিহি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দাসুর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ গঙ্গাপতি হইতে দেবগ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের উৎপত্তি। ইঁহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন— মধুসূদন। ইহার বাস ছিল ইছাপুর গোবরডাঙ্গা গ্রামে। বহরমপুর হইতে বাটী আসিবার কালে পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া দেবগ্রামে উপস্থিত হইলে জনৈক মজুমদারের শুশ্রূষায় আরোগ্যলাভ করিয়া ইনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ উক্ত মজুমদারের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি স্বভাব ছিলেন। এই বিবাহসূত্রে তিনি ভঙ্গ হইলেন। তাঁহার পুত্র মহাদেব। ইনি মজুমদার কন্যার গর্ভসম্ভূত। ইহার বাস দেবগ্রাম। মহাদেবের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র। ইনি উমাদাসের জনক। গিরিশচন্দ্র জমিদার ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করার জন্য গভর্ণমেণ্ট ইহাকে অনেক সুখ্যাতি করিয়া এক পত্র দেন। ইহার ছয় পুত্র; তন্মধ্যে উমাদাস সর্ব্বকনিষ্ঠ।

বংশ-কথা

উমাদাসের প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়—দেবগ্রামের বঙ্গ বিদ্যালয়ে। পরে তিনি দুই বৎসর কাল কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে পড়িতে থাকেন। তার পর তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় এল,আর,সি, পি, এম্ আর সি এস্ হন এবং কিছুদিন মেও হাঁসপাতালে দক্ষতার সহিত চিকিৎসা করিতে থাকেন। পরে জর্ম্মনীতে গমন করিয়া তথাকার হাসপাতালেও এক বৎসর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে।

তদনন্তর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

বিবাহ ও কর্ম্মক্ষেত্র

উমাদাস চারি বৎসর কাল মেও হাসপাতালে কার্য্য করিয়াছিলেন।

উমাদাস এখন কলিকাতাবাসী হইলেও তাঁহার স্বগ্রাম দেবগ্রামকে তিনি ভুলেন নাই। তথাকার বিদ্যালয় এবং হাসপাতালে তিনি প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন।

উমাদাসের দুই পুত্র। একজন লণ্ডনে এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছেন এবং অন্যটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সন্তান সন্ততি।

চিকিৎসা ব্যাপারে তিনি কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

নিম্নে ইঁহাদের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :—

মকরন্দ।
|
দামু।
|
বনমালী।
|
ভীম।
|
আদিত্য।
|
মাধব।
|
পীতাম্বর।
|
গঙ্গাগতি।
|
দেবানন্দ।
|
দেবাই।
|
ভুবনানন্দ।
|
জগন্নাথ।
|
গোপাকান্ত
|
মধুসূদন
|
মহাদেব
|
সন্তোষ
|
রামলোচন
|
গিরীশচন্দ্র
|

ষষ্ঠীদাস | চণ্ডীদাস | বিপ্রদাস | তারিণী দাস | তারাদাস | উমাদাস

উমাদাস — হরদাস, শঙ্কর দাস

রায় বাহাদুর সারদা চরণ ঘোষ।

জন্মভূমি।

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী গাভা নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে রায় সারদা চরণ ঘোষ বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ ৺ ঘনশ্যাম ঘোষ মহাশয় ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে গাভা হইতে বরিশাল সহরের নিকট কাশীপুর নামক গ্রামে বাস স্থাপন করেন।

পূর্ব্ব পরিচয়।

তিনি পাঁচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রায় বাহাদুরের পিতামহ ৺ ভুবনেশ্বর ঘোষ মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি বরিশাল আদালতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাই ব্যয় করিতেন। কাজেই শেষ জীবনে তিনি দারিদ্র্য কষ্ট পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। রায় বাহাদুরের পিতা ৺রামগঙ্গা ঘোষ মহাশয় আজীবন দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার মহচ্চরিত্রের জন্য গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তাঁহার আট পুত্র ও এক কন্যা; তন্মধ্যে রায় বাহাদুর জ্যেষ্ঠ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে রায় বাহাদুর জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রায় বাহাদুরের বিবাহ হয়। শ্বশুরের আর্থিক সাহায্যে তিনি অধ্যয়ন করিতে পারিবেন এই আশায় এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ করেন। যখন তিনি বরিশাল জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁহার শ্বশুরদেব স্বর্গারোহণ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুতে আর্থিক সাহায্যের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তিনি ছাত্র পড়াইয়া অগত্যা নিজের খরচ

জন্ম।

ডাক্তার ইউ, ব্যানার্জি

সঙ্কুলান করিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইবার পর তাঁহার জীবনের উপর দিয়া একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার বাতাস বহিয়া যায়। এক দিন রাত্রিতে একটি ভদ্রলোকের বাটিতে যাত্রার অভিনয় হইতেছিল। সেই গানের সময় একটা গোলযোগ হয়। বাড়ীর কর্ত্তা উপস্থিত ছাত্রগণকে গোলযোগের মূল কারণ মনে করিয়া তাহাদিগকে ভৎর্সনা করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত ছাত্র একযোগে সে স্থান পরিত্যাগ করে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ছাত্র পথিমধ্য হইতে ফিরিয়া আসে এবং অন্ধকারের মধ্যে সামিয়ানার দড়ি কাটিয়া দেয়।

যাত্রা গানে বিপত্তি।

ফলে আলোগুলি নিবিবার এবং সামিয়ানা আসরের সকলের উপর পড়িবার উপক্রম হয়। যাত্রাগান তখনই থামিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে কাহারও অঙ্গে আঘাত লাগে না। গৃহস্থ ইহাতে রাগান্বিত হইয়া "পুলিশ" "পুলিশ" বলিয়া চীৎকার করেন; অচিরে একটা কনষ্টেবল আসিয়া একটা বালককে গ্রেপ্তার করে। বালকটা জুতা খুঁজিতেছিল, তাই অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে পলাইতে পারে নাই। এই সংবাদ শুনিবামাত্র কয়েকজন বালক তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কনেষ্টবলের হাত হইতে বালকটীকে উদ্ধার করে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এ সম্বন্ধে মোকদ্দমা রুজু হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ অনুসন্ধানের জন্য ও দোষী ছাত্রকে শাস্তি দিবার জন্য হেড মাষ্টারকে জানান। হেড মাষ্টার তখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "তোমরা বিবেকের সহিত বিচার করিয়া স্বীকার করিয়া বল গত কল্যকার রাত্রির ঘটনায় কে কে কি করিয়াছিলে?" ছাত্রদের মধ্যে সারদা চরণ সমেত পাঁচজন তখন তাঁহার নিকট দোষী সাব্যস্ত হন। হেড মাষ্টার দুইজনের বেত্র দণ্ড ও অপরাপরগণের প্রতি তাহা অপেক্ষা একটু লঘুতর শাস্তির বিধান করেন। সারদাচরণের

প্রতি সাত দিন যাবত বেঞ্চের উপর দাঁড়াইবার হুকুম হয়, কিন্তু সারদা চরণ পূর্ব্ব রাত্রের কোন ঘটনাতেই উপস্থিত ছিলেন না; কাজেই তাঁহার বিবেকে বড়ই আঘাত করিল। তিনি নির্দ্দোষী, তাঁহাকেও শাস্তি পাইতে হইল। এ অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি চিরদিনের জন্য স্কুল ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সারদাচরণ তেজস্বী বালক হইলে কি হয়? তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী অর্থ সামর্থ্য ছিল না। কাজেই তিনি ভরণ-পোষণ চালাইয়া পড়িতে পারেন এমন একটি স্কুলের সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে একমাস ঘুরিতে ঘুরিতে জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলেন। জয়দেবপুর ঢাকা জিলার প্রসিদ্ধ ভাওয়াল জমিদার বংশের রাজধানী। তথাকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় রায় বাহাদুরের সমস্ত কাহিনী শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। শুধু তাহাই নহে, ছাত্র বৎসল প্রধান শিক্ষক মহাশয় রাজা ৺ কালী নারায়ণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এখানে তাঁহার জন্য কিছু মাসিক বৃত্তিরও ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল। ঢাকা হইতে East নামে তখন একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। সারদা চরণ সেই পত্রের এক জন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার রচনা পড়িয়া রুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সেই বৎসরের অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দিলেন না। অবশেষে পূর্ব্ববঙ্গের তদানীন্তন স্কুল ইনস্পেক্টর মিঃ রবসন আদেশ করিলেন, ৫৲ টাকা জরিমানা দিলে সারদা চরণ পরীক্ষা দিতে পারিবেন। পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশিত হইল তখন দেখা গেল যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে চতুর্থস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইন্স্পেক্টর মিঃ রবসন

স্কুল ত্যাগ।

নূতন বিপদ।

বৃত্তি বাজেয়াপ্ত।

তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি বৃত্তিও লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্স্পেক্টর তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সারদাচরণের সহিত স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের পরিচয় হয়।

তিনি এফ্ এ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন এবং ঢাকা কলেজ হইতে যথাক্রমে বিএ ও এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের সহিত পরিচয় হইবার সময় হইতেই তিনি তাঁহার বান্ধব পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তিনি আজীবন সাহিত্য সেবা করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয্যে তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা কলেজ হইতেই বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতা

ওকালতী।

স্বর্গারোহণ করেন এবং পিতৃকৃত ঋণ ও একটা বৃহৎ সংসারের প্রতিপালন ভার তাঁহার দুর্ব্বল স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। প্রথমে তিনি ঢাকাতে এক বৎসর ওকালতী করিয়া বরিশালে চলিয়া আসেন। বরিশালে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রসার-প্রতিপত্তি হয়। বরিশালে ওকালতী করিতে করিতে তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে ময়মনসিংহের কালেক্টর কর্ত্তৃক তত্রত্য সরকারী ওকালতী

উপাধি লাভ

গ্রহণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। তিনি সেই অনুরোধ অনুযায়ী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে সরকারী ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে নানা গুণের জন্য "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন।

দুহালিয়ার রাজবংশ।

দুহালিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা শ্রীমন্ত রায় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়াধিপতি সুবুদ্ধি রায়ের সহায়তা করায় বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হুসেন সাহের কোপানলে পড়িয়া রাজ্য ভার ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্ট জেলার পুটীজুরী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত কয়েক জন ব্রাহ্মণ ও বহু সৈন্য সামন্তও পুটীজুরিতে যায়। রাজা শ্রীমন্ত রায় সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে রাজনগর নামক স্থানে এক রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু সুরমা নদীর ভীষণ স্রোতে তাঁহার রাজধানী নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে রাজা শ্রীমন্ত রায় দুহালিয়ায় নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। রাজধানী নানকার ও থানেবাড়ী নামেই প্রসিদ্ধ হয়। আজিও রাজা শ্রীমন্ত রায়ের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন হিস্যায় থানেবাড়ীতে বাস করিতেছেন।

শ্রীমন্ত রায়ের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার একমাত্র পুত্র নরোত্তম রায় রাজা হন। নরোত্তম রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম রায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সম্রাট আকবর তাঁহাকে আপন দরবারে মনসবদারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীশ্বর আকবরের অধীনে বক্সীগিরি করিয়া বহু যশ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কয়েকজন প্রজা বিদ্রোহ হইয়া উঠে এবং পুরুষোত্তমকে রাত্রিকালে হত্যা করে।

পুরুষোত্তম রায়ের মৃত্যুর পর পৃথ্বীধর পিতার সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং যাহারা তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল তাহাদিগকে উচিত মত শাস্তি দেন। তখন দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট আকবর সমাসীন ছিলেন। তিনি পৃথ্বীধর রায়কে দিল্লী ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু

দেওয়ান শ্রীযুত মোহাম্মদ আজক সাহেব

তিনি দিল্লীতে না যাওয়ায় আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। পৃথ্বীধর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আকবরের নিকট ক্ষমা চাহেন। সদাশয় সম্রাট আকবর পৃথ্বীধর রায়কে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে দুহালিয়া পরগণার জমিদার করিলেন এবং জানাইলেন মৌজা জায়গীর স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

পৃথ্বীধর রায় স্বর্গারোহণ করিলে তাহার পুত্র জিতামৃত রায় তাঁহার সিংহাসনের অধিকারী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জিতামৃত রায় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি সিংহরায় ও শিবচন্দ্র রায় নামক দুই পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন সিংহরায় নিজ অংশের জমিদারী অন্যকে দিয়া রাজা শ্রীমন্ত রায়ের পূর্ব্ব নিবাস পুটীজুরীতে চলিয়া যান। কাজেই শিবচন্দ্র রায় দুহালিয়ার অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনিও আবার ধর্ম্মনারায়ণ, রাজেন্দ্র রায় ও যশোবন্ত রায় নামক তিন পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

যশোবন্ত রায়ের পুত্র প্রেমনারায়ণ রায় ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় মহম্মদ ইস্লাম্। ইঁহার দেওয়ান উপাধি ছিল। ইঁহার পুত্র দেওয়ান মহম্মদ বাছির সুনাম-গঞ্জ মহকুমায় ৯টী পরগণার অধিকারী হন এবং ঢাকা পর্য্যন্ত নিজের জমিদারী বিস্তৃত করেন।

তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য অমান্য করিয়া নিজেকে স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সুর্ম্মানদী দিয়া যে সমস্ত জাহাজ ও নৌকা যাতায়াত করিত তাহার আরোহীদিগের নিকট হইতে রীতিমত শুল্ক আদায় করিতে লাগিলেন। নবাব দেওয়ান মহম্মদ বাছিরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেওয়ান মহম্মদ আসরফ পিতার জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইলেন বটে, কিন্তু তিনি বড়ই ভীত ও ক্ষমতাহীন ছিলেন, কাজেই দুহালিয়া ব্যতীত অন্যান্য পরগণা তাঁহার

হস্তচ্যুত হয়, তাঁহারই সময়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ শালা বন্দোবস্ত হয়।

দেওয়ান মহম্মদ আসরফের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র দেওয়ান মহম্মদ আজগড় ও দেওয়ান মহম্মদ আফজল জমিদারী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লন। দেওয়ান মহম্মদ আফজলের কোন পুত্র সন্তানাদি ছিল না। কাজেই তাঁহার ভ্রাতা দেওয়ান মহম্মদ আজগর তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। দেওয়ান মহম্মদ আজগরের নাম এখনও লোকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। কেননা তিনি বহুদেশে বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। দেওয়ান মহম্মদ আজগর সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র দেওয়ান মহম্মদ আছফ সাহেব সমুদয় জমিদারীর অধিকারী হন। দেওয়ান মহম্মদ আছফ সাহেব ১৮৮৯ সাল হইতে অনেকবার সুনামগঞ্জ লোকাল বোর্ডের মেম্বর হইয়া আসিতেছেন। গত মণিপুর যুদ্ধের সময় তিনি নৌকা ও লোকজন দিয়া ভারত সম্রাটকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেন্সাস বা লোক গণনার সময় তিনি কয়েকবার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুনামগঞ্জ সহরে যে অসংখ্য আলোক স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারই কীর্ত্তি। দুহালিয়ার লোকাল বোর্ডের ডাক্তার খানা, মধ্য ইংরাজী স্কুল, লোকাল বোর্ডের রাস্তা, দুহলিয়ার স্থানে স্থানে পুষ্করিণী, সুনাম গঞ্জ জুবিলী হাই স্কুলের মুসলমান বোর্ডিং তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। দেওয়ান মহম্মদ আসফ সাহেব প্রত্যেক বৎসর সুনামগঞ্জে শিক্ষা প্রদর্শনীতে, করোনেশনে ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফণ্ডে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের অঙ্গচ্ছেদ হইলে যখন চারি দিকে তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, তখন দেওয়ান মহম্মদ আসফ সাহেব অনেক সভাসমিতি করিয়া সরকারের অনুরাগ ভাজন হন। ইহা ছাড়া বিগত যুদ্ধের সময় তিনি নানা রকমে বৃটিশ

সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। * তিনি এখনও জীবিত থাকিয়া অনেক জনহিতকর কার্য্য করিতেছেন।

নিম্নে ইহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :—

রাজা শ্রীমন্ত রায়
|
রাজা নরোত্তম রায়
|
রাজা পুরুষোত্তম রায় মনসবদার
|
পৃথ্বীধর রায় চৌধুরী জমিদার
|
জিতামৃত রায় চৌধুরী জমিদার
|
শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
|
যশোমন্ত রায় চৌধুরী জমিদার
|
দেওয়ান মোহাম্মদ ইছলাম চৌধুরী জমিদার
|
নবাব দেওয়ান মোহাম্মদ বাছির চৌধুরী জমিদার
|
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ চৌধুরী জমিদার
|
দেওয়ান মোহাম্মদ আছগর চৌধুরী জমিদার
|
দেওয়ান মোহাম্মদ আছফ চৌধুরী জমিদার
|

দেওয়ান আহমদ | দেঃ আর্শদ | দেঃ আহনফ | দেঃ আনছফ | দেঃ আজরফ | দেঃ আছজদ

স্বর্গীয় অতুল্যচরণ বসু বি, এ, বি-এল্।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ৺অতুল্যচরণ বসু-বাঙ্গালা ১২৭০ সালে ১৩ই বৈশাখ তারিখে শিবপুরে তাঁহার মাতামহের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে তিনি গ্রাজুয়েট হন। তাহার পর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের নিকট ওকালতী শিক্ষা করিতে থাকেন। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ তখন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলে অতুল্যচরণ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরীর নিকটে শিক্ষানবীসি করিতে থাকেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে অতুল্যচরণ হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন।

অতুল্যবাবুর পিতার নাম স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ বসু। ইনিও কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় ইহার প্রভূত পারদর্শিতা ছিল। বাঙ্গালা ১২৯৮ সালে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে অম্বিকাচরণের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইহার বয়স ৫১ বৎসর ৭ মাস ছিল। অম্বিকাচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সরকারী বৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ডে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভিভাবকবর্গ তাঁহার ইংলণ্ড গমনে আপত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ইংলণ্ড যাওয়া হয় নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাত গমন করেন। অম্বিকাচরণ স্বাধীনচেতা, তেজস্বী, মেধাবী, স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার

স্বর্গীয় অতুল্যচরণ বসু।

অনুরাগ ছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থে তাঁহাদের স্বগ্রাম খোড়পে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি একটি শিব-মন্দিরও স্থাপিত করিয়াছিলেন; এই অনুষ্ঠানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও সাহায্য করিয়াছিলেন।

অম্বিকাবাবু শিবপুরের গুরুচরণ দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। গুরুচরণ বাবু স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ ঠাকুরের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। অম্বিকাবাবুর শ্যালকের নাম শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ দত্ত; ইনি মেদিনীপুরের উকীল।

অতুল্যচরণ কলিকাতার রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯১৪খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নী-বিয়োগে হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স্ সমবেদনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। অতুল্যচরণ ব্যবহার শাস্ত্রে প্রভূত পারদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ফৌজদারী আইন সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান রাজ ষ্টেটের ও অন্যান্য বিখ্যাত জমিদারদের ষ্টেটের উকীল ছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। হাইকোর্টে মামলা হইলে তিনি ষ্টেটের পক্ষ হইতে মামলা পরিচালনা করিতেন। ফৌজদারী মামলা পরিচালনে ইঁহার বিশিষ্ট দক্ষতা ছিল। মামলায় বক্তৃতা করিবার সময় তিনি যে রসাভাষ ও কৌতুকের অবতারণা করিতেন তাহা বস্তুতঃ উপভোগের বিষয় ছিল। অতুল্যচরণ শিষ্টাচারের আদর্শ এবং অতীব বিনয়ী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সমানভাবে মিশিতেন। গভর্ণমেণ্টকে আইন সংক্রান্ত সাহায্য প্রদান করায় ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অতুল্যচরণকে সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

অতুল্যচরণের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ সুরেশচন্দ্র হাইকোর্টের এটর্ণি এবং কনিষ্ঠ নরেশচন্দ্র ব্যারিষ্টার। ইঁহার একমাত্র কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত বীরভূষণ দত্তের বিবাহ হইয়াছে; বীরভূষণ হাইকোর্টের উকীল।

অতুল্যচরণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা খোড়পের বসু বংশ বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশ খোড়প গ্রামে প্রায় দেড় শত বৎসরের উপর বাস করিতেছেন; এই বংশের আদি নিবাস মাহিনগরে ছিল। এই বংশের মহাদেব বসু মাহিনগর হইতে আসিয়া খোড়পে বসবাস স্থাপন করেন। তিনি বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে জাইগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতুল্যচরণের প্রপিতামহ কাশীনাথ বসু মহাশয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার নীলের ও রেশমের কুঠি ছিল। তিনি বসু বংশের জমিদারী খুব বাড়াইয়া গিয়াছিলেন।

ফৌজদারী সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে তিনি গবর্ণমেণ্ট পক্ষে উকীল ছিলেন। এমন কি হাইকোর্টে তিনি ফৌজদারী আইনে "অথরিটী" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

তিনি আইন জ্ঞানের এত পরিচয় দিয়াছিলেন যে বিচারপতি টিউনন (Justice Twenon) তাঁহাকে Wabing law journal বলিয়া ডাকিতেন। বিচারপতি মিঃ ফ্লেচার তাঁহাকে ফানিম্যান বলিয়া ঠাট্টা করিতেন।

১৯২২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে অতুল্য বাবু পরলোক গমন করেন। পরদিবস শ্রীযুত দাশরথী সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার মৃত্যু সংবাদ হাইকোর্টে জ্ঞাপন করেন। তাহা সত্ত্বেও বন্ধের পর হাইকোর্ট পুনরায় খুলিলে প্রধান বিচারপতি স্যার ল্যান্সলট স্যাণ্ডারসন বলেন—

His long standing experience of the profession and his legal knowledge gave his opinion a way which I

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বসু।

৩

মিঃ এন-সি বসু।

believe was always used in the best interest of the profession. He was highly respected by all who knew him. I personally desire to acknowledge my indebtedness for the courtesy and assistance which I always receive from him. অর্থাৎ তিনি বহুকাল ওকালতী করিয়া একজন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে যে শিষ্টাচার ও সহায়তা পাইয়াছি এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অতুল্যবাবুর মৃত্যুতে হাইকোর্টের উকিলগণ একটি শোক সভা করিয়াছিলেন এবং সেই শোক সভায় তাঁহারা বলেন—His unfailing courtesy, ability and high common sense, sauvity of manner and genial temper won the heart of the members of the Vakil's Assciation and the public."

অর্থাৎ তাঁহার অসামান্য শিষ্টাচার, ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য উকিল সভার সভ্যগণ ও জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

অতুল্যচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশবাবুর একটি শিশু কন্যা ও নরেশ চন্দ্রের একটি শিশুপুত্র ও একটি শিশুকন্যা।

চট্টগ্রামের মৌলবী এস্ নাদের আলী বিএ, বিএল সাহেবের বংশপরিচয়।

চট্টগ্রাম সদরের অনতিদূরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে পাহাড়তলী ষ্টেসনের এক মাইল পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরোপকূলে "কাট্টলী" গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের অপর নাম "সাধনপুর"। কথিত আছে, যখন গৌড়রাজ্য ধ্বংসাভিমুখে পতিত হয় আবুলস্কর নামক জনৈক সৈনিক-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সপরিবারে চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার অন্তর্গত সাধনপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বাবুলস্কর, তৎপুত্র হোচাইনী লস্কর এবং হোচাইনি লস্করের পুত্র বরবত খাঁ এবং তৎপুত্র পরবত খাঁ এবং পরবত খাঁর পুত্র ইলিয়াছ খাঁ। তথায় পাঁচ পুরুষকাল বসবাস করার পর শেষোক্ত ব্যক্তি সেই স্থান হইতে আসিয়া স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ স্থানে বসতি স্থাপন করতঃ স্বীয় পৈতৃক গ্রামের নামে ঐ স্থানকে সাধন পুর বলিয়া অভিহিত করেন। সে কালে এই গ্রামের লোকজন একমাত্র শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া লোকে ইহাকে কাত্‌টুলী অর্থাৎ শিক্ষিত স্থান বলিত। এখন ঐ কাত্‌টুলীর অপভ্রংশই "কাট্টলী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত ইলিয়াছ খাঁর চারি পুত্র ছিল। কালাগাজি চৌধুরী, নেয়াজ মহব্বৎ চৌধুরী, নছরত আলি চৌধুরী ও রুস্তমচৌধুরী। নেয়াজ মহব্বৎ চৌধুরীর পুত্র বকশা আলী চৌধুরী এবং বকশা আলী চৌধুরীর পুত্র হাজী আমজাদ আলি চৌধুরী এবং হাজী আমজাদ আলী চৌধুরীর পুত্র মৌলবী এস্ মরহামত আলী চৌধুরী। এই বংশতালিকার আলোচ্য মৌলবী এস্ নাদের আলি বিএ, বি এল্ শেষোক্ত চৌধুরী সাহেবের প্রথম পুত্র। বিদ্যা, ধন সম্পত্তি এবং জমীদারী পূর্ব্ব পুরুষ হইতেই

তাঁহাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মৌলবী সাহেবের পিতা একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা ভাল জানিতেন। তাঁহার রচিত মূল্যবান পদ্যগুলি এখনও তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাঁহার ছয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে একমাত্র পুত্র রাখিয়া তাঁহার পিতা আমাদ আলী চৌধুরী পুণ্য স্থান মক্কা নগরীতে হজ্জব্রতে গমন করিয়া তথায় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় এবং যত্নে নানা ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া ধর্ম্ম এবং চরিত্র বলে সর্ব্বপরিচিত ও সকলের আদরণীয় হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী, দয়াবান ও বিনয়ী ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান আবাল বৃদ্ধ সকলেরই তিনি প্রিয় ছিলেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া জুরার ছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম সদর বেঞ্চের অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। পঞ্চাইতি কার্য্যে পারদর্শিতার জন্য ১৯১১ সালে পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট হইতে তিনি স্বর্ণাঙ্গুরী পুরস্কার ও সনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া সরকার ও দেশবাসীর নানাপ্রকার হিতকর কার্য্যে বিশেষ সম্মান ও যশ লাভ করিয়া ১৯১৯ খ্রীঃ ১৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে ৫টা ৫ মিনিটের সময় ৬৫ বৎসর বয়সে অত্যন্ত সুখ ও সম্পদের মধ্যে নিজ ভবনে হেমারেজ রোগে আক্রান্ত হইয়া ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার মিঃ কে, সি, দে সি, আই, ই, আই সি, এস, মৌলবী সাহেবের নিকট নিম্ন মর্ম্মে শোকপ্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন :—

My dear Nadir Ali.

I am very sorry to hear of the lamented death of your father. He was serving Goverment till the end. His courtesy and kindness endeered him to all classes

of people. His death will be felt as a general loss to the District.

Yours Sincerely.
(Sd) K. C. De
22. 12. 1919.

চট্টগ্রাম জেলার পশ্চিমভাগে উত্তরে ফেণী নদী হইতে দক্ষিণে কর্ণফুলী নদী পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ মাইলের মধ্যে উক্ত মৌলবী সাহেবই সর্ব্ব প্রথম মুসলমানের মধ্যে বিএ,এবং বিএল পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রাম জিলার মুসলমানের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের সহিত চট্টগ্রাম কলেজ হইতে ১৯১২ খ্রীঃ বিএ, পাশ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ইংলিশে এম্ এ, এবং বিএল্ কোর্স শেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইবার এম্ এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাস্থ্যহানির দরুণ এম এ, পাশ করিতে পারেন নাই। তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে কয়েক মাস সিনিয়ার মেথিমেটিক্যাল টিচার এবং এসিসটেন্ট হেড-মাষ্টারের কার্য্য করিয়া ১৯১৬ খৃঃ ৬ই জুলাই তারিখে চট্টগ্রাম সদরে ওকালতীতে হাজীর হইয়া ব্যবসায়ে বেশ প্রসার করিয়াছেন। তাঁহার সরলতা, সৌজন্য, স্বদেশপ্রেম, শিক্ষা ও চরিত্রের অমায়িকতায় তিনি দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের নিকট যশ এবং প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তিনি খুব মিষ্টভাষী এবং একজন ভাল বক্তা। ১৯১৯ খৃঃ রিক্রোট কার্য্যে সহায়তা করার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি নিম্নোদ্ধৃত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন :—By Command of His Excellency. The Governor in Council, this certificate is granted

মরহামত আলী

to Moulavi S. Nader Ali Pleader, Chittagong, in recognition of his Services in connection with Recruitment in the Army during the war.

(Sd.) G H Ker,
Chief Secretary
To the Government of Bengal.

The 15th August 1919.

বর্ত্তমানে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর, সদর লোকালবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান, "কাট্টলী গ্রামের" প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ, ইসলাম আবাদ টাউন ব্যাঙ্ক ও সেণ্ট্রাল কো-পারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের ডাইরেক্টর, হজকমিটীর সেক্রেটারী, এবং নেশানাল লিবারেল লিগ, ইসলাম এসোসিয়েসন, চট্টগ্রাম এসোসিয়েসন, চট্টগ্রাম ট্রেডস্ এশোসিয়েসন, এমেলেটিক্ এসোসিয়েসন, চট্টগ্রাম ইনসটিটিউট, চট্টগ্রাম নাইটস্কুল কমিটী ও জোয়ারগঞ্জ বয়ন বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বর এবং বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুরের চট্টগ্রাম ভিজিটের সময় তিনি প্রাইভেট ইণ্টারভিউ পাইয়া থাকেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা এস্ মহব্বৎ রুহল আমিন চৌধুরী স্থানীয় উত্তলকার পঞ্চাইত। তিনিও একজন অমায়িক লোক এবং তাঁহার সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য গ্রামবাসী সকলের নিকট তিনি আদরণীয়। তিনি A. B. Ry র D. T. S. office এ কেরাণির কার্য্য করেন। মৌলবী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এস্ আমির হোসেন চৌধুরী মৌলবী সাহেবের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী এবং পৃষ্ঠপোষক ও তাঁহার শ্বশুর পাটনার মৌলবী এম্ আবদুলগণি চৌধুরী সাহেবের কারবারে থাকিয়া সওদাগরি ব্যবসায় শিক্ষা করিতেছেন। মৌলবী

সাহেবের মাতার নাম শ্রীমতী কুলচুমা বিবি। তিনি হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নিবাসী মৌলবী ইছুপ আলী চৌধুরীর কন্যা এবং স্বনামখ্যাত জমিদার হাজী মৃত ফজল নরহমান চৌধুরীর ভগ্নি। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাজী মগুফিজুরবহ মান চৌধুরীও জমীদার এবং উত্তলকার পঞ্চায়েৎ। মৌলবী সাহেব ১৯০৭ খ্রীঃ স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া তাঁহার নিজ বংশের সদাগর ও জমীদার শ্রীযুত আমির আলী চৌধুরীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মেহের আকজুন বিবিকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা। ১ম পুত্রের নাম শ্রীমান সামশুল হুদা, ২য় পুত্রের নাম শ্রীমান নালদ্দিন আহাম্মদ এবং তৃতীয় পুত্রের নাম শ্রীমান সমসর রহমান। ১ম কন্যার নাম শ্রীমতী ছুফিয়া খাতুন, এবং ২য় কন্যার নাম শ্রীমতী ছাজেদা খাতুন।

আনন্দলস্কর
|
বাবুলস্কর
|
হোসাইনীলস্কর
|
বরবত খাঁ
|
পরবত খাঁ
|

এস, নাদের আলী

ইলিয়াছ খাঁ
কালা গাজী
নাছেরত আলি
নেয়াজ মহম্মদ
আজম
কুসুম
মাহাদ আলি
জীবন
বকসা আলী
মহম্মদ হাসীম
হাজী আমজদ আলী
মরহামত আলী
মৌলবী এস নাদের আলী
এসমহম্মদ রুহল আমীন
এস্ আমির হোচেন
কামদর আলী
আবদুলগণী
কমরআলী
মুজাফর
কাছিম
মুন্সিআবদুল্লা
সফর আলী
হায়দার আলী
গোঃছোবান
গোঃরহমন
আবদুলরহমন
আঃকাদের
আমানুল্লা
আহামদ আলী
আবদুল বারী
৪ পুত্র
৮ পুত্র
আছাদ আলী
মনসুর আহমদ
হেদাএত আলী
মৌলবী ছাদত আলী
মোঃ ওসমনগণী (B. A, B. T.)
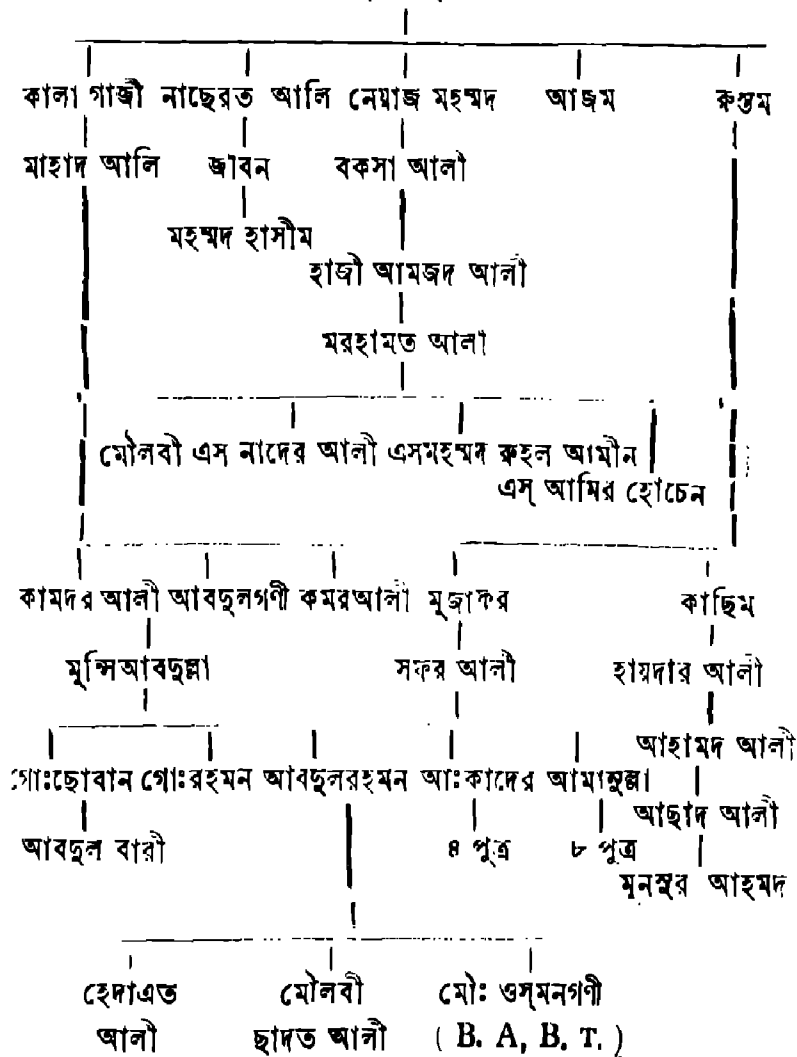
শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী।

চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থ ভারত বিখ্যাত তীর্থ। রামায়ণাদি প্রাচীনগ্রন্থেও এই তীর্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই তীর্থ চট্টগ্রাম হইতে ১২ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে পর্ব্বতদেশে অবস্থিত। স্থানটী সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। এই তীর্থের লবনাক্ষকুণ্ড ,ব্রহ্মকুণ্ড, সহস্র ধারা, বাড়বানল, কুমারীকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, স্বয়ম্ভূনাথ, মন্দাকিনী, বিরূপাক্ষ, হরগৌরী, শিব চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ যাত্রীর নিকট অতি পবিত্র ও আদরের বস্তু। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হিন্দু তীর্থযাত্রী এইস্থানে দেবদর্শন মানসে যাইয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থানের মত এই তীর্থেও পাণ্ডা আছেন। এই পাণ্ডাদের মধ্যে চন্দ্র নাথ তীর্থের কলঙ্ক মোচন ও তীর্থ যাত্রিগণের অভাব অসুবিধা মোচন সেবায়েত বংশধর ৺শরচ্চন্দ্রের আজীবনব্যাপী ব্রত ছিল। ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শরচ্চন্দ্রের জন্ম হয়। শরচ্চন্দ্র কৈশোরে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক বেশে ভারতের নানা তীর্থ গমন করেন। তৎপর চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তার ৺মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞান সভায় প্রায় ৬ বৎসর কাল সহকারীর কাজ করেন। কিন্তু পরাধীন চাকুরী ভাল না লাগায় তিনি দেশে আসিয়া তীর্থের কলঙ্ক মোচনে আত্ম নিয়োগ করেন। তাঁহার চেষ্টাতে চন্দ্রনাথ তীর্থের অনেক কলঙ্ক ক্ষালন হয়। কবিবর ৺নবীন চন্দ্রসেন, ৺রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি-আই-ই প্রভৃতি তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শরচ্চন্দ্রের আদিপুরুষই এই তীর্থের আবিষ্কারক। চট্টগ্রামে এই পাণ্ডা-দিগকে "অধিকারী" বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই অধিকারী বংশে

শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী।

৺গোপীনাথ অধিকারীর ঔরসে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৩শে মাঘ শ্রীহর কিশোর অধিকারী জন্মগ্রহণ করেন।

ইহার মাতার নাম দয়াময়ী দেবী। ইহারা রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য গোত্র। ৺চন্দ্রনাথ দেবের সেবা পূজার ভার ইহাদের পুরুষানুক্রমিক। ইহার পূর্ব্বপুরুষই এই মহাতীর্থের আবিষ্কার কর্ত্তা। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শরচ্চন্দ্র অতি উচ্চশ্রেণীর লোক ছিলেন। ১৩০৮ সালে তিনি যতীন্দ্রনাথ ও মধুসূদন নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহারা একান্নভুক্ত পরিবার। সেবায়েত মণ্ডলীর মধ্যে এই পরিবারই একমাত্র শিক্ষিত পরিবার। হরকিশোর অধিকারী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও পাণ্ডা সম্প্রদায়ে ইহার মত সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, চরিত্রবান, দেশহিতৈষী, দয়ালু লোক এই যুগে বিরল। ইনি ৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন ও বন্ধু ছিলেন। সুদীর্ঘকাল হইতে ইনি অনেকগুলি খবরের কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং একজন ভাল সমালোচক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার আজীবন ব্যাপী চেষ্টার ফলে ৺মহাতীর্থ চন্দ্রনাম ধ্বংশ মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। চন্দ্রনাথ তীর্থে পূর্ব্বে দেবদর্শনার্থী প্রত্যেক যাত্রীকে ১৵ একটাকা দুই আনা হিসাবে টেক্স দিতে হইত। হরকিশোর বাবুর চেষ্টায় এই টেক্স গ্রহণ প্রথা দূর হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ তীর্থের যাহা কিছু উন্নতি, তাহার একমাত্র মূল হরকিশোর বাবু। তীর্থের সংস্কার ও যাত্রিগণের অভাব অসুবিধা মোচন তাঁহার জীবনের ব্রত। ইহার তীর্থ সেবাদি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে প্রীত হইয়া মাননীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ আগষ্ট তারিখে এক সনন্দ প্রদান করিয়াছেন, এবং বঙ্গের প্রায় সকল রাজা, মহারাজা, জমিদার শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে সনন্দাদি প্রদানে

গৌরবান্বিত করিয়াছেন। চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান হইলেও কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রকার উচ্চ সম্মান লাভ ঘটে নাই।

"চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য" নামে একখানি বৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন, ২০ বৎসর মধ্যে গ্রন্থখানির ৪টী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথ তীর্থের যাবতীয় বিবরণ, ইতিহাস,শাস্ত্রের কথা, তীর্থকৃত্য প্রভৃতি এই গ্রন্থে দক্ষতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ৫ বার মুদ্রিত হইয়া হিন্দুসমাজে বিতরিত হইয়াছে।

ইনি বহুকাল হইতে স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক ও মেলা কমিটীর (Lodging House Act মতে গঠিত) অন্যতম মেম্বর আছেন। চন্দ্রনাথ তীর্থের যাহা কিছু সংস্কার ও উন্নতি তাহা ইঁহারই হাতে হইয়াছে। ইঁহার ৬টী ছেলে ও ৩টী মেয়ে। বড় ছেলেটী চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। ইঁহার বংশতালিকার একাংশ এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

১। রামশঙ্কর
|
২। দেবীপ্রসাদ
|
৩। কৃষ্ণপ্রসাদ
|
৪। শিবদাস
|
৫। রাধাবল্লভ
|
৬। ঘনশ্যাম
|
৭। বলরাম
|
৮। নন্দরাম
|
৯। কালীচরণ
|

১০। অযোধ্যারাম
১১। ৺গোপীনাথ—(জন্ম ১২০২ বঃ)
(মৃত্যু ১২২৪ বঃ)
৺শরচ্চন্দ্র
(জন্ম ১২৬৫ বঃ)
(মৃত্যু ১৩০৮ বঃ)
শ্রীযতীন্দ্রনাথ
শ্রীমধুসূদন
১২। শ্রীহরকিশোর (জন্ম ১২৮০ বঃ
২৩ মাঘ বুধবার,
শ্রীবিনোদ
শ্রীবীরেন্দ্র
শ্রীধীরেন্দ্র
শ্রীমণীন্দ্র
শ্রীবিমল
শ্রীশান্তিময়
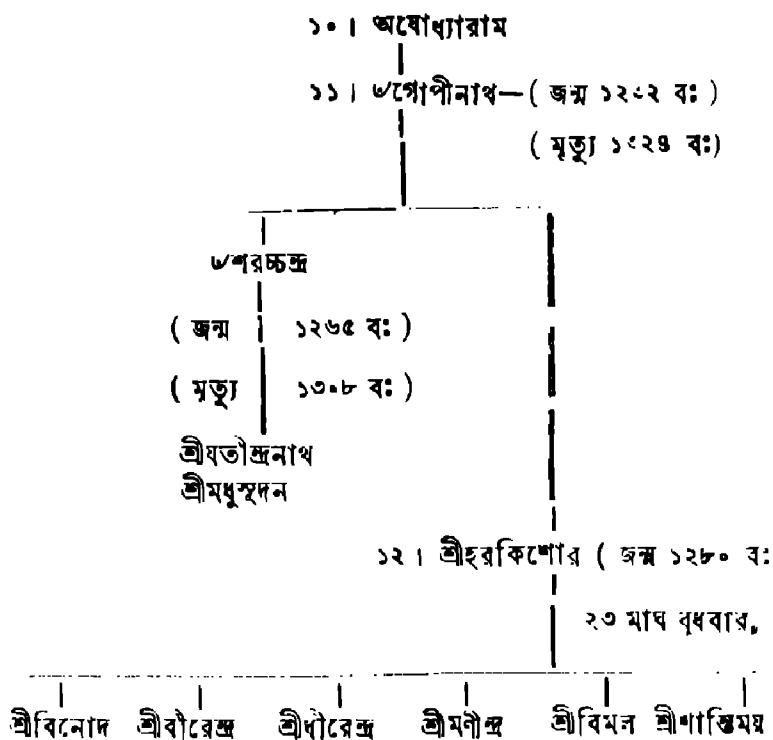
ঠনঠনিয়ার মিত্রবংশ

রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর ঠনঠনিয়ার মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। কালিদাস মিত্রের অধঃস্তন বংশধর রাম নারায়ণ মিত্র হইতে এই বংশের বংশক্রম আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহারা বড়িশা সমাজভুক্ত, ইঁহাদের আদি নিবাস জেজুর গ্রাম। রাম নারায়ণ চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণবল্লভ, মধ্যম রামজীবন, তৃতীয় কেনারাম ও কনিষ্ঠ বলরাম। প্রাণবল্লভ দুইপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ খেলারাম ও কনিষ্ঠ বিনোদরাম। খেলারাম নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। বিনোদ রামের তিন পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ রামগোপাল, মধ্যম রাধাকান্ত ও কনিষ্ঠ প্রভুরাম। রামগোপালের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচরণ, মধ্যম কৃষ্ণ চন্দ্র, তৃতীয় কেবলরাম ও কনিষ্ঠ বাবুরাম। রাধাকান্তের ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৌতুকরাম, মধ্যম দাতারাম, তৃতীয় নন্দকিশোর, চতুর্থ জগ-মোহন, পঞ্চম ভগবানচন্দ্র ও কনিষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দ। কৌতুকরামের কোন সন্তানাদি হয় নাই। দাতারাম কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং ঠনঠনিয়ায় বৃহৎ ভবন নির্ম্মাণ করেন। দাতারামের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ মদনমোহন, মধ্যম চন্দ্রশেখর ও কনিষ্ঠ ভোলানাথ। মদনমোহন শিক্ষিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সহিত অনেক পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি কোন সন্তানাদি না রাখিয়া পরলোক গমন করেন। চন্দ্রশেখর মেরিন বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। তিনিও এই কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ ঈশ্বর চন্দ্র, মধ্যম নবীনচন্দ্র, তৃতীয় গোপাল চন্দ্র, চতুর্থ তারাচাঁদ, কনিষ্ঠ গোকুলচন্দ্র।

রাজা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর

ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৭৪ সালে পাঁচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথ, মধ্যম মহেন্দ্রনাথ, তৃতীয় উপেন্দ্রনাথ, চতুর্থ সুরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ। এই ঈশ্বরচন্দ্রই রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের জনক। রাজেন্দ্রনাথ আপন কৃতীত্ববলে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি বেথুন সভার সম্পাদক ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ ই-আই রেলওয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ঢাকা কলেজের আইন অধ্যাপক ও ঢাকার সরকারী উকিল ছিলেন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক ও হাইকোর্টের উকিল হন। তাঁহার প্রণীত "লিমিটেসন একট" আইনজীবিদের নিকট এখনও সমাদৃত। ইঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রনাথ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার, মধ্যম গিরীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ বীরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের এটর্ণী।

সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী। ইনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্সিয়াল বিভাগে অণ্ডার সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়া এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি বহুদিন যাবত মিউনিসিপ্যালিটীর মনোনীত সদস্যরূপে অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের ট্রেজারার।

ঈশ্বরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ মুন্সেফী করিয়া শেষে সেসন জজের পদে পর্য্যন্ত উন্নীত হন। তিনি গুণের পুরস্কার স্বরূপ রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পেন্সন ভোগ করিতেছেন।

- রামনারায়ণ মিত্র
  - প্রাণবল্লভ
    - খেলারাম
    - বিনোদরাম
      - রামগোপাল
        - কৃঃ চরণ
        - কৃষ্ণচন্দ্র
        - কেবলরাম
        - বাবুরাম
      - রাধাকান্ত
        - কৌতুকরাম
        - দাতারাম
          - মদনমোহন
          - চন্দ্রশেখর
            - ঈশ্ব ন্দ্র
            - নবীনচন্দ্র
            - গোপালচন্দ্র
            - তারাচাঁদ
            - গোকুলচন্দ্র
              - যতীন্দ্র
              - মহেন্দ্র
          - ভোলানাথ
            - জয়কৃষ্ণ
            - কালীকৃষ্ণ
        - নন্দকিশোর
        - জগমোহন
        - ভগবানচন্দ্র
          - ভোলানাথ
          - লক্ষ্মণচন্দ্র
          - শিবনারাম
        - গঙ্গাগোবিন্দ
      - প্রভুরাম
  - ামজীবন
  - কেনারাম
    - কেবলরাম
      - সহস্ররাম
        - রামধন
  - বলরাম
    - দয়ারাম

ঈশ্বরচন্দ্র
রাজেন্দ্রনাথ
মহেন্দ্রনাথ
উপেন্দ্রনাথ
সুরেন্দ্রনাথ
যোগেন্দ্রনাথ
ভূপেন্দ্র
নৃপেন্দ্র
বিপেন্দ্র
দীপেন্দ্র
জ্ঞানেন্দ্র
অমরেন্দ্র
জিতেন্দ্র
বারীন্দ্র
বিজয়েন্দ্র
বিমলেন্দ্র
হরিদাস
কানাইলাল
নিতাইচন্দ্র
হেমেন্দ্র
গিরীন্দ্র
বীরেন্দ্র
তপেন্দ্র
শচীন্দ্র
শৈলেন্দ্র
সৌরেন্দ্র
সত্যেন্দ্র
ভুজেন্দ্র
শৈলে
কমলেন্দ্র
কনকে

ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দেব বংশ।

যে দেববংশীয়গণ বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে জড়িত ইহারা তাঁহাদেরই অধঃস্তন পুরুষ। উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র সর্ব্বত্রই কি রাষ্ট্রাধিকারে, কি সমাজগঠনে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে অতুলনীয়। এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস টাকিনিবাসী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার "শাশ্বতী" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁহার "যশোহর খুলনার ইতিহাসে" এই বংশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা উক্তবংশীয় হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত বটুভট্ট রচিত সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থ দৃষ্টে এবং উক্ত ঐতিহাসিকগণের প্রবন্ধাদি হইতে এই প্রসিদ্ধ বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম।

উপক্রমণিকা।

পুরাকালে দেবগণ হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী শাণ্ডিল্য হ্রদকূলে (বর্ত্তমান আযুদ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের শাণ্ডিল্য ষ্টেসনের অনতিদূরে) শাণ্ডিল্য ঋষির গোত্রে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। শকাধিকারের সময় ইহারা ক্ষত্রপ উপাধি ধারণ করিয়া ক্রমে রাজ্যলিপ্সু হইয়া উঠেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চতুর্থ শতাব্দী
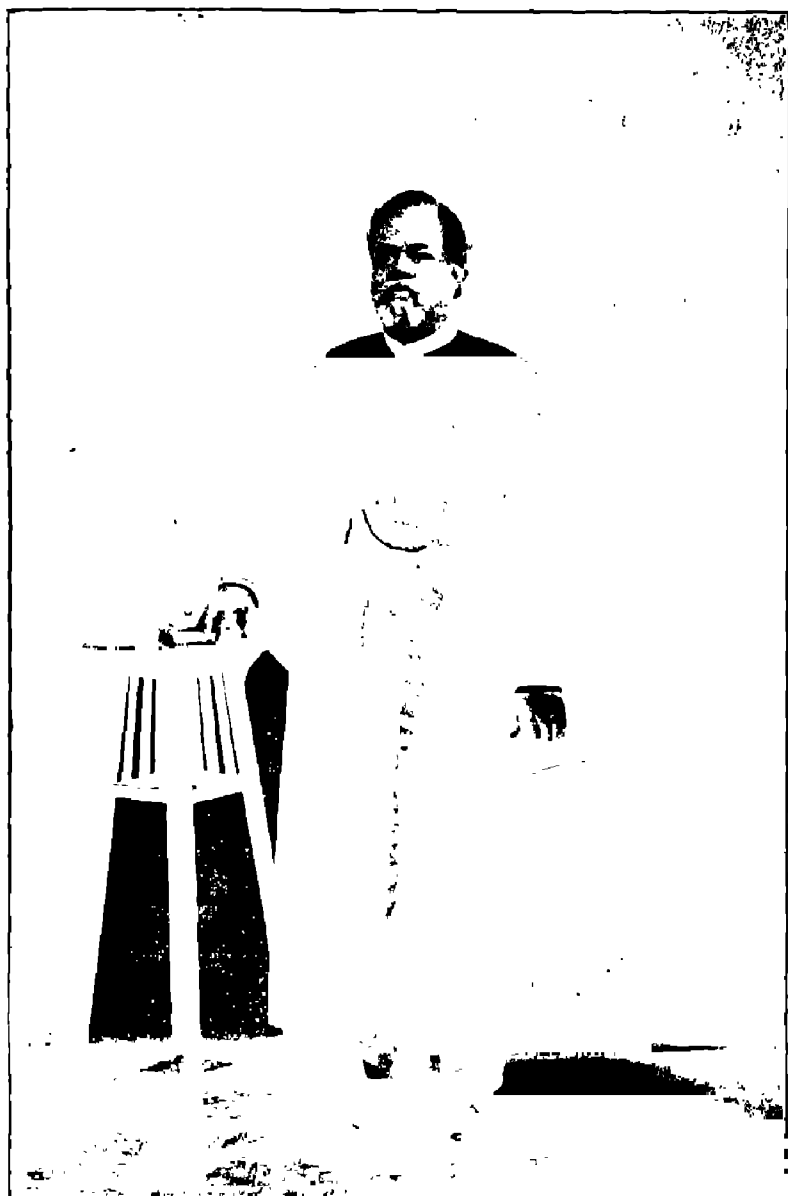
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেব রায়

পর্য্যন্ত আর্য্যদেববংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণ হিমালয়ের উপত্যকা হইতে আমুগঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত আপনাদের রাজত্ব করিয়া লয়েন। ইহাঁরা দেব উপাধি বিশিষ্ট হইলেও আপনাদের মুদ্রাদিতে এবং সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থে নামের শেষে 'সেন' শব্দ ব্যবহার করিতেন এরূপ দৃষ্ট হয়। গুপ্তসম্রাট সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত আর্য্য নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রুদ্রদেবের নাম পাওয়া যায়। রুদ্রদেব রুদ্রসেন নামেও পরিচিত ছিলেন। সুলতানগঞ্জের নিকট তাঁহার দুইটী মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন (৩৪৮ খৃঃ—৩৯৯খৃঃ)। রুদ্রদেব সমুদ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত বা নিহত হইলে তৎপুত্র (সম্ভবতঃ পৌত্র) বঙ্গদেশে পলাইয়া আসেন এবং কর্ণস্বর্ণ রাজ্য ও উক্ত নামীয় বঙ্গের আদি কায়স্থসমাজ স্থাপন করিয়া কুলগ্রন্থে কর্ণসেন নামে পরিচিত হন। এখনও বাঙ্গালার বিশিষ্ট দেববংশীয়গণ কর্ণস্বর্ণ বা কানসোণার দেব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া গর্ব্বানুভব করেন। কর্ণসেন নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও দেববংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরিচয় কুলগ্রন্থে উজ্জ্বলভাবে বিবৃত হইয়াছে। কুলগ্রন্থে যে লঙ্কেশ্বর বিভীষণের প্রসঙ্গ আছে, কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস, রাজতরঙ্গিনী ও সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিনীর লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে এই বিভীষণ ৪৪০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোনও সময় বিদ্যমান ছিলেন। দেববংশীয়গণের একটী বিশেষত্ব এই ইহারা পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। বৌদ্ধরাজগণের অক্ষুন্ন প্রতাপ ইহাদের দ্বারা কতকটা খর্ব্ব হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে শাণ্ডীল্য গোত্রীয় দেববংশে মহারাজ কর্ণসেন প্রাদুর্ভূত হন। তিনি প্রবল পরাক্রমে বঙ্গদেশ

কর্ণস্বর্ণ—বাঙ্গালার আদি কায়স্থসমাজ (উত্তর রাঢ়ীয়)

শাসন করিতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী নামক স্থানে ভাগীরথী ও কর্ণ নদীর (বর্ত্তমান ময়ূরাক্ষীর) সঙ্গম স্থলে কর্ণপুর নামক এক বিচিত্র নগরী নির্ম্মাণ করিয়া মহারাজ কর্ণসেন তথায় বাস করিতেন। নগরটী সৌধমালা সমাকীর্ণ, ধন ও জনে পরিপূর্ণ ছিল এবং সতত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ক্রমে দুর্ভেদ্য হইয়া উঠে। কালক্রমে মহারাজ কর্ণসেনের দেবসেন নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন; তিনি বৃষকেতু নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কুমার বৃষকেতুর অন্নপ্রাসনের সময় লঙ্কেশ্বর বিভীষণ নিমন্ত্রিত হইয়া কর্ণপুরে আগমন করেন। এই উপলক্ষে মহারাজ কর্ণসেন ব্রাহ্মণ ও অভ্যাগতদিগকে এত স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন যে কুলগ্রন্থকার তৎকালে কর্ণপুর নগরীতে স্বরলোক হইতে স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময় হইতেই উক্ত প্রদেশ কর্ণস্বর্ণ বা কর্ণস্বর্ণ নামে পরিচিত হয়। অতঃপর মহারাজ কর্ণসেন এক অভিনব সমাজ গঠনে কৃতসঙ্কল্প হন; তিনি বিভিন্ন গোত্রীয় দেবগণকে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কর্ণপুর নগরীতে আহ্বান করিয়া আনেন এবং গোত্রানুসারে তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। শাণ্ডীল্য গোত্রীয় দেবগণ কর্ণস্বর্ণ সমাজের কুলনায়ক হন, এবং মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক ও আলিম্যন গোত্রীয় দেবগণ পর্য্যায়ক্রমে মর্য্যাদা লাভ করেন। কর্ণস্বর্ণ সমাজ সপ্তগোত্রীয় দেবের সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। কালক্রমে কাশ্যপ, গৌতম এবং অন্যান্য গোত্রীয় দেবগণও অপরাপর পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ উক্ত সমাজের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। এই কর্ণস্বর্ণ সমাজের ধ্বংসাবশেষ হইতেই বর্ত্তমান উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজ গঠিত হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয় বাৎস্য ও ভরদ্বাজ-সিংহ, সৌকালীন ও শাণ্ডিল্য-ঘোষ, বিশ্বামিত্র-মিত্র, কাশ্যপ-দত্ত, মৌদ্গল্য ও

কাশ্যপ-দাস, মৌদ্গল্য-কর, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ণস্বর্ণ সমাজেই প্রথমতঃ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা এখনও আপনাদিগকে শ্রীকর্ণবংশ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। সম্ভবতঃ এই সকল বংশেই নৃপতি সূর্য্য ঘোষ ও মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে,— কর্ণসেন বাঙ্গলার ব্যবসায়ী বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যেও গোত্রানুসারে কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন। তাম্বূলীন প্রভৃতি বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যে এখনও কর্ণসেনী থাক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় হইতেই দেবগণ আপনাদিগকে কর্ণসেনী দেব বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। যুগযুগান্তর বহিয়া গিয়াছে, কর্ণসেনের সেই বিচিত্র নগরী এখন আর নাই, আজ কেবল কতকগুলি লুপ্তপ্রায় চিহ্ন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রাঙ্গামাটীর চতুর্দ্দিকে ষোল ক্রোশ ব্যাপিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রাঙ্গামাটীর এমন স্থান নাই যেখানে দুই চারিখানি ইষ্টক বা মৃৎপাত্র পড়িয়া নাই। আবার এই সমস্ত মৃৎপাত্র চূর্ণের সহিত এখনও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, অঙ্গুরি ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থানে অদ্যাপি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। যেস্থানে কর্ণসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রবাদ, এখনও দর্শকগণ চর্ম্ম পাদুকা লইয়া তথায় আরোহণ করেন না। ১৮৫৩খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব এইস্থান দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন —"রাঙ্গামাটী পূর্ব্বকালে কানসোনাপুরী নামেই প্রসিদ্ধ ছিল ; গৌড়পতি কর্ণসেন এই নগরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহুতর প্রবাদ এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। এখনও লোকে "রাক্ষসের ডাঙ্গী" ও কর্ণসেনের রাজবাড়ী দেখাইয়া থাকে। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ নিদর্শন এখনও তিনদিকে বিদ্যমান। অপরদিক নদীগর্ভে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজবাটীর পূর্ব্বদিকে কিছুদিন পূর্ব্বপর্য্যন্ত একটী সুপ্রাচীন তোরণ ও তাহার পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ বৃক্ষ

বিদ্যমান ছিল, অল্পদিন হইল সমস্তই ভাগিরথীর গর্ভশায়ী হইয়াছে”।

কর্ণসেনের পর এই বংশে মহারাজ শশাঙ্কসেন জন্ম গ্রহণ করেন। রোটাসগড়ের মোহরায় তিনি “মহাসামন্ত শ্রীশশাঙ্ক দেব” নামে পরিচিত হইয়াছেন। প্রাচ্য ভারতের ইতিহাসে মৌর্য্য সম্রাট অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের পর এই শশাঙ্কদেবের ন্যায় বোধ হয় আর কোনও নৃপতি তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁহাকে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গয়াক্ষেত্রে যে বোধীবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, মহারাজ শশাঙ্কদেব সেই বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিয়া অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ করেন এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মন্দির মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া তদুপরি শিবমন্দির স্থাপন করেন। ইঁহার রাজত্ব কালে বাঙ্গালায় সুখসমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছিল। অতঃপর কর্ণস্বর্ণের বিভিন্ন গোত্রীয় রণপরায়ণ দেবগণ অঙ্গ বঙ্গের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়েন। ইঁহারা বঙ্গের অনেকস্থলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কর্ণসুবর্ণ নাম লোপ পায় এবং মুর্শিদাবাদ হইতে হুগলী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ রাঢ় নামে অভিহিত হয়।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দেবগণ বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কণ্টকদ্বীপ বা বর্ত্তমান কাটোয়ায় এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগিরথী অজয় ও বড় খালের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ ইঁহাদের কর্ত্তৃক শাসিত হইত। দক্ষিণে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত ইঁহাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। এই বংশে সুরদেব নামে এক সুপ্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য ও দেবগণের মধ্যে যেরূপ ইন্দ্র দেববংশেও মহামতি

বল্যাবটি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ।

সুরদেব তদ্রূপ ছিলেন। তিনি নানা গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রক্ষক ও দুর্জ্জনগণের ভীতিপ্রদ ছিলেন। ইঁহার ক্ষাত্রতেজে বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীভূত হইয়াছিল এবং সুব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সনাতন ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়।

সুরদেবের পুত্র দনুজারি দেব। বটুভট্ট ইহাঁকে কর্ণফুলে জাত ও নানাগুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তাঁহাকে সেন রাজগণের সম্পর্কীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা বুঝা যায় না। বল্লালচরিত প্রণেতা আনন্দ ভট্ট সেন রাজগণকেও কর্ণ বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লালসেনের তাম্র শাসন হইতে জানা যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা অনেক কীর্ত্তিদ্বারা রাঢ় দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন। বটুভট্ট দেবরাজগণকে ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সেন রাজগণও আপনাদিগকে অনেক স্থলে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই— স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে এই সেন রাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণকে সৌমিনী দেবতা উক্ত শাণ্ডিল্য নামক ঋষির গোত্রীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় বঙ্গের সেন রাজগণ ও দেবরাজগণ আদিতে একই বংশোদ্ভব ছিলেন। সে যাহা হউক, দনুজারি দেব হইতে ঐতিহাসিক পরিচয় উত্তমরূপেই অবগত হওয়া যায়। দনুজারি দেবকে সেনরাজ লক্ষ্মণের ও বন্দ্য মকরন্দ-সুত দাশরথীর সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কুলগ্রন্থ সমূহের আলোচনা দ্বারা স্থির হয় যে ষড়বন্দ্যো জোবলখ্যা মহেশ্বরো উদারধী। দেবলো বামনো ধীমানীশানো মকরন্দকঃ। (জোবাল, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন বন্দ্য বংশীয়)। এই ছয়জন বল্লাল সেনের নিকট হইতে মুখ্য কুলীন বলিয়া অর্চ্চনা লাভ করিয়াছিলেন। এই মকরন্দ-পুত্র দাশরথীকে দনুজারি দেব কণ্টকদ্বীপ বা কাটোয়ায় স্থাপিত করেন। দাশরথী সাগ্নিক, ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মণ্যলক্ষণযুক্ত ও শ্রীশ্রীচণ্ডি পরায়ণ ছিলেন। এই

চণ্ডী পরায়ণ বন্দ্যবংশের শিষ্য হওয়ায় দেববংশীয়েরা শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ নারায়ণ উপাধি লাভ করেন। আমরা পরে তাহা উল্লেখ করিব। দাশরথী বন্দ্যঘটী নামক জনপদে বাস করিতেন এবং তাঁহার প্রতিভায় বন্দ্যঘটী ক্রমে সুপরিচিত হইয়া উঠে। দনুজারিদেব দাশরথী বন্দ্যোর পাঁচ পুত্রকে ভাগিরথীর নিকটস্থ হরিকোটী, নৈহাটী, লাটগ্রাম, শৈড় ও নবচর নামে পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তিনি অগ্রদ্বীপ ও নবদ্বীপে দুইটী মহাকাল শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বটুভট্ট তাঁহাকে লক্ষ্মণ সেনের মিত্র এবং সামন্ত বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেন যখন বরেন্দ্র ভূমিতে পাল রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন দনুজারি স্বীয় বাহুবলে সমগ্র বরেন্দ্র ভূমি সেন রাজগণের করায়ত্ব করেন।

দনুজারি দেবের সময়েই দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ উত্তমরূপে বিধিবদ্ধ হয়। অজয় নদের উভয় কুলে দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপনিবেশ ছিল। ভাগিরথী কুলবর্ত্তী বন্দ্যঘটী—দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল। উজানী, মঙ্গলকোট, বটগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি এই সময় হইতেই দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ স্থান বলিয়া গণ্য হয়। লক্ষ্মণ সেনের সময় রাঢ়ীয় কুলীনগণের প্রথম ও দ্বিতীয় সমীকরণ হয়। দনুজারি দেবই এই সমীকরণের প্রবর্ত্তক।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন। এই সময় খিলিজি পাঠান বংশীয় বক্তিয়ার নামক সেনাপতির অধিনায়কত্বে মুসলমানগণ নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। দেববংশকারের মতে এই সময় ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছিল এবং গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ যবনদিগের কর্ত্তৃক সর্ব্বথা আক্রান্ত এবং অমাত্য ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া যান। তাঁহার পুত্র মাধব সেনও সসৈন্য দনুজারিদেব দীর্ঘকাল সগর্ব্বে

মুসলমানদিগের গতিরোধ করেন। এই সময়ে দনুজারিদেব ও মাধব সেন সম্ভবতঃ যবনকবলগত রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে বঙ্গের কোনস্থানে অবস্থান করিয়া পিতৃভূমি রাঢ়দেশের উদ্ধার কামনায় যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। দনুজারি ও মাধব দীর্ঘকাল যাবত একত্রে এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করেন, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাঁহারা দনৌজামাধব নামে উক্ত হইয়াছেন। দনুজারি দেবের জীবিত কাল পর্য্যন্ত মাধব সেন বঙ্গদেশে (ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে) তাঁহার প্রতি-পত্তি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ এই সময় হইতেই দলে দলে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে দনুজারি ও মাধবের শাসিত প্রদেশে অর্থাৎ বর্ত্তমান নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশে, যশোহর খুলনায় ও পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশ হইতে জানা যায় যে দনুজারি মাধবের সভায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই চারিটী সমীকরণ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহাদের সভায় বঙ্গজ কায়স্থগণেরও দুইবার সমীকরণ হইয়াছিল।

এই মহাবীর মহাকৃতি দেবরাজ অবশেষে ভাগীরথী সলিলে কলেবর পরিত্যাগ করেন এবং কণ্টকদ্বীপ সম্পূর্ণরূপে যবন কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। মাধব সেনও বন্দ্যকুলাচার্য্যগণ কহ বরেন্দ্রভূমে প্রস্থান করেন।

পাণ্ডুনগর-বারেন্দ্রসমাজ

দনুজারিদেবের দেহত্যাগের পর বন্দ্যাচার্য্যগণ তাহার শিশু পুত্রকে লইয়া বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত পাণ্ডুনগরে গমন করেন। দনুজারির শিশুপুত্র হরিদেব ও মাধব সেনের বরেন্দ্রদেশাভিমুখে চলিয়া যাওয়ায় ইহাই বুঝা যায় গৌড়ের নিকট অপেক্ষা নবদ্বীপের নিকটই যবনদিগের অধিকার প্রথমে বিস্তৃত হইয়া-ছিল। গৌড় বা লক্ষণাবতী নবদ্বীপ অধিকারের পর বক্তিয়ারের রাজ-ধানী হইয়া উঠে। এই জন্য দেখা যায় যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ রাঢ়-

দেশ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বা কায়স্থগণ একেবারে আপনাদের স্থান পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডু নগর মালদহ হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। হাণ্টার সাহেব অনুমান করেন এই সময় উক্ত প্রদেশ দুর্গম জঙ্গলময় অবস্থায় ছিল। সেই সময়ে পাণ্ডুনগর বোধ হয় কোন প্রাচীন নগরের (পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের) ভগ্নাবশেষরূপে অবস্থিত ছিল। সুতরাং সেরূপ নির্জ্জনস্থানে শিশু হরিদেবকে লইয়া বন্দ্যাচার্য্যের যাওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক সমসাময়িক তাম্রশাসনাদি পর্য্যালোচনা দ্বারা বুঝা যায়, বিক্রমপুরে এই সময় সেনদিগের কোন রাজধানী ছিল না। বরেন্দ্রভূমের কোন স্থলে তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। নারায়ণদেব নামে হরিদেবের এক পুত্র জন্মে। নারায়ণ দেব ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপালক ছিলেন, কিন্তু রাজ্যশ্রী হইতে বিমুখ হন। তাঁহার পুরন্দর ও পুরুজিৎ নামে দুই পুত্র জন্মে। পুরন্দর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া স্বামী উপাধি লাভ করেন। পুরুজিৎ হইতে মহাতপা আদিত্য দেবের জন্ম হয়। তপপ্রভাবে দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র নামে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রণচণ্ডীর প্রসাদে তাঁহারা দুইজন পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র ও পৌত্র দনুজমর্দ্দন যে পাণ্ডুনগরের স্বাধীন নরপতি হইয়াছিলেন তাঁহাদের মুদ্রা হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। এক্ষণে দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্রের পাণ্ডুনগরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। বাংলার ইতিহাসে দেখা যায় এই সময়ে রাজা গণেশ বা কংস পাণ্ডুয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। ঐতিহাসিকেরা কংসকে ভাতুরিয়ার জমিদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন রাজা সামস উদ্দীনকে নিহত করিয়া পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। রিয়াজে লিখিত আছে সামসউদ্দীন স্বাভাবিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া অথবা রাজা কংসের

ষড়যন্ত্রে মানবলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং কংস কর্ত্তৃকই যে সামস উদ্দীন নিহত হইয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে যে দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র সামসউদ্দীনের মৃত্যুর পর অথবা তাহাকে হত্যা করিয়া প্রথমে পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। পরে রাজা কংসকে পরাক্রান্ত জানিয়া তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে লেখা আছে যে গণেশ পাণ্ডুয়ায় উপস্থিত হইলে হিন্দুরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। সুতরাং গণেশের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বে পাণ্ডুনগর দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্রের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল এবং তাহারা অন্যান্য হিন্দু অধিবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া গণেশকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন; এই সময় কিছু কালের জন্য গৌড়মণ্ডলে আবার স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হয়। রাজা গণেশ রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে দত্ত খান নামে পরিচিত। ১৩৮৫ খৃঃ তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। এই দত্ত রাজের অভ্যুদয় কালে মুসলমানগণের অধীনতা হইতে গৌড়রাজ্য মুক্ত করিবার জন্য পূর্ব্বতন সামন্ত বংশধর দেবেন্দ্র দেব ও তৎপুত্র মহেন্দ্র দেব তাহার সহায় হইয়াছিলেন এবং গণেশ দত্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা প্রথমে তাঁহার সামন্ত নৃপতি বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকিবেন। রাজা গণেশ ও সামন্ত দেবগণ এই সময়ে তাহাদের সভায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ দিগের আবার অভিনব কুল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুসলমান প্রভাবান্বিত গৌড়মণ্ডলে তাহাদের যত্নেই আবার দেবতা ব্রাহ্মণের সমাদর এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সমাজেই তাঁহারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজা গণেশ বাহিরে মুসলমানী ভাবাপন্ন হইলেও তিনি যে অন্তরে চণ্ডী ভক্ত ছিলেন তাহা তাঁহার হিন্দু বংশধরগণের কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। তিনি তাঁহার আধিপত্যকালের বহুপূর্ব্ব হইতেই সমাজ সম্মানিত কর্মসেনী দেবেন্দ্র ও তৎপুত্র মহেন্দ্র দেবকে

গৌড়ের প্রধান সামন্ত বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ দত্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দিন নামে পরিচিত হন এবং ক্রমেই অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ও হিন্দুবিদ্বেষী হইয়া উঠেন। তাহার ফলে ১৪০৯ খৃঃ দুইজন ক্রীতদাসের হস্তে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হন। সেই সময়ে গৌড়ের হিন্দু ও মুসলমান রাজ কর্ম্মচারিগণ মধ্যে যথেষ্ট দলাদলি চলিতেছিল। এই সুযোগে হিন্দুগণ রাঢ়ের বহু প্রাচীন রাজবংশধর বীরবর মহেন্দ্র দেবকে গৌড়ের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মুসলমানগণও রাজা গণেশের বংশধরগণকে গৌড় সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। জালালুদ্দিনের পুত্র আহাম্মদ শাহের সহিত মহেন্দ্র দেবের কিছুকাল যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহের পর মহেন্দ্র দেব কালকবলে পতিত হন। মালদহ হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার রৌপ্য মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি ১৩৩৬ শক ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু প্রজা সাধারণ তৎপুত্র দনুজমর্দ্দন দেবকেই পাণ্ডুনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিও স্বাধীন নৃপতিরূপে পাণ্ডুনগর হইতে স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিতে থাকেন। মালদহ হইতে তাঁহার ৩৩৯ শক বা ১৪১৭ খৃঃ অঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। আবার বরিশাল জেলাস্থ চন্দ্রদ্বীপ হইতেও তাঁহার ১৩৩৯ শকাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের মুদ্রার এক পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেব ও তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ১৩৩৯ ও চন্দ্রদ্বীপ এবং অপর পৃষ্ঠে শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ অঙ্কিত আছে। এই অবস্থায় বলিতে পারা যায় তিনি তিন বর্ষ মাত্র পাণ্ডুনগরের আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং ঐ বর্ষেই চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া মহারাজা দনুজমর্দ্দন দেব বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য মধুমতির পূর্ব্ব হইতে লৌহিত্যের পশ্চিম পর্য্যন্ত এবং ইচ্ছামতী হইতে সমুদ্রকুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমাদের বিবেচনায় তিনি কিছুকালের জন্য সমগ্র বঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। সুদূর চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। দেববংশকার চন্দ্রদ্বীপে দেবরাজ্য সংস্থাপন সম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—"দনুজমর্দ্দন যবনদিগকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পাণ্ডুনগর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র উপকূলে গমনকরতঃ রণচণ্ডী ও কালিকাকে পূজাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া একটী নবোত্থিত দ্বীপে দেবরাজ্য স্থাপন করেন।" ইহা হইতে বুঝা যায় মহেন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর পাণ্ডু নগরে ক্রমে মুসলমান প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং দনুজমর্দ্দন মুসলমানের অধীনতা স্বীকারে অসম্মত হইয়াই স্বাধীন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য চন্দ্রদ্বীপে গমন ও তথায় স্বনামে মুদ্রা প্রচার করেন। দেববংশকার বলেন—যবন নিধনের জন্য লোকবিখ্যাত দেবরাজ্য চন্দ্রদ্বীপ রাজা দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক সমুদ্র কূলে স্থাপিত হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সজ্জিত, দেবসেনার দ্বারা সুরক্ষিত, দুর্ভেদ্য দুর্গ-বেষ্টিত এবং নৌকা সমূহে পরিবৃত হইয়া উঠে। দেশ বিদেশ হইতে দেবদ্বিজেরা সমাগত হইয়া রাজাজ্ঞায় চন্দ্রদ্বীপে সুখে বাস করিতে থাকেন। বন্দ্য কুলাচার্য্যেরা বন্দ্যঘটী হইতে আগমন করেন, দেবরাজ তাহাদিগকে পূজা করিয়া চন্দ্রদ্বীপে স্থাপন করেন। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজি সার সংগ্রহে লিখিত আছে,—

চন্দ্রদ্বীপ—বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ

দনুজমর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপ পতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি।

দেব পদ্ধতিতে তার মহিমা অপার।
সমাজ করিতে রাজা হৈলা চিন্তাপর॥
গৌড় হইতে আনিলা কায়স্থ কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি॥

উচ্চ পদস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সহায়তায়ই মহারাজা দনুজমর্দ্দনদেব রাজ কার্য্যাদি পরিচালনা করিতেন। তিনি বঙ্গজ কুলীনগণের মধ্যে বংশবিশুদ্ধি রক্ষা করিবার জন্য কুলাচার্য্য বা ঘটক এবং স্বর্ণামাত্য নামক দুইটী পদ সৃষ্টি করেন। রাজ নিমন্ত্রণে ভোজন পংক্তিতে মর্য্যাদা-নুসারে কে কোন স্থানে বসিবেন তাহা স্বর্ণামাত্যগণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। ঘটক এবং স্বর্ণামাত্যগণ প্রত্যেক কুলের পরিচয় লিখিয়া রাখিতেন। দনুজমর্দ্দনদেব রাজপ্রসাদের যে স্থলে কায়স্থ কুলীনগণসহ উপবেশন করিয়া ভোজন করিতেন তাহার নাম ছিল "চিলছত্র"। মধ্যস্থলে সমাজপতি মহারাজার আসন ছিল এবং তন্নিকটে কুলীনগণ ও তাহার পর কুলজ, মধ্যল্য, মহাপাত্র প্রভৃতি সামাজিকগণ চক্রাকারে রাজার চতুষ্পার্শ্বে ভোজন করিবার জন্য উপবেশন করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ মাত্রকেই তাহাদের পুত্র কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে রাজার বা সমাজ-পতির অনুমতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজমাধ্যস্থ নামক কর দিতে হইত। বিনা অনুমতিতে কোন্ ক্রিয়া করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার নিয়ম ছিল। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি দেবরাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে— "নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ" এবং কুলীন কায়স্থদিগকে—"শ্রী—সানুগ্রহ মিদং কার্য্যঞ্চাগে" এই পাঠ লিখিতেন। আবার কায়স্থগণ রাজাকে পত্র লিখিবার সময় লিখিতেন—"আর্দ্দাশ শ্রী—নিবেদনঞ্চ বিশেষ।" মুসলমান রাজসভার প্রচলিত নিয়মের আদর্শে সামাজিকদিগকে সংবর্দ্ধনাসহকারে রাজসমীপে উপস্থিত হইবার বিধান ছিল।

দনুজমর্দ্দণদেব বঙ্গজ কায়স্থগণের কয়েকটী সমীকরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য বহু সামাজিক বিধি প্রণয়ন করেন। চন্দ্রদ্বীপের এই সকল রাজবিধি পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ছোট বড় সকলেই শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেন। দনুজমর্দ্দন দেবের পর ক্রমান্বয়ে তাঁহার বংশধর রমাবল্লভ দেব, কৃষ্ণবল্লভ দেব, হরিবল্লভ ও জয়দেব দের চন্দ্রদ্বীপ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জয়দেব নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র বসুবংশীয় পরমানন্দ চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। দেববংশকার বলেন—"ইহা কুলাচার বিরুদ্ধ হওয়ায় দেব-বংশীয়েরা কুপিত হন; তাহাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজা ভীত হইয়া পড়েন। তাহার পর সেই দৌহিত্র এক রাত্রিতে নিষ্ঠুর গুপ্তঘাতক-গণের দ্বারা দেববংশীয়দিগকে নিহত করিয়াছিলেন।" পরমানন্দের বংশধরগণের মধ্যে যথাক্রমে জগদানন্দ, কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র, বাসুদেব, প্রতাপনারায়ণ ও প্রেমনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে কন্দর্পনারায়ণ বাঙ্গালার বারভূঞার অন্যতম ছিলেন। তাঁহার রাজধানী মাধবপাশায় অবস্থিত ছিল। রামচন্দ্র, রায় স্বনামখ্যাত বীর প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন। তৎপর প্রেমনারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার দৌহিত্র মিত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। উদয় নারায়ণের বংশধরগণ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছেন।

বঙ্গীয় সমাজ

উপসংহার।

মহাবীর মহেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর গৌড়মণ্ডলে হিন্দু ও মুসলমান-গণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতে থাকে। ক্রমে মুসলমানদিগের শক্তি প্রবল হইয়া উঠিলে দনুজমর্দ্দন দেব পাণ্ডুনগর পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করেন। এই সময়ে মহেন্দ্রের খুল্লতাত "অমিত তেজস্বী" ক্ষিতীন্দ্র দেবও পুনরায় পৈত্রিক রাজ্য কণ্টকদ্বীপে আগমন করেন এবং তথাকার হিন্দু অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যঘটীর দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের গোষ্ঠীপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্ষিতীন্দ্রদেব সম্ভবতঃ এই সময়ে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে কণ্টকদ্বীপে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ দনুজ মর্দ্দনদেব স্বীয় খুল্ল পিতামহের উপর রাঢ় দেশের শাসন ভার অর্পণ করিয়া নিজে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নৈহাটী প্রভৃতি অঞ্চল যে তৎকালে দেববংশীয়গণের শাসনাধীনে ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীজীবগোস্বামী কৃত "লঘু তোষিণী" হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে রূপ সনাতন গোস্বামীর পিতামহ পদ্মনাভের গঙ্গাতটের বসতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

"স্ফুরৎ সুরতরঙ্গিনীতট নিবাস পর্য্যুৎসুকঃ
ততো দনুজমর্দ্দন ক্ষীতিশ-পূজ্যপাদঃ ক্রম
দুবাস নব হট্টকে সকিল পদ্মনাভঃ কৃতী"

অর্থাৎ পদ্মনাভ গঙ্গাতটে বাস করিতে সমুৎসুক হইয়া রাজা দনুজ-মর্দ্দন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া গঙ্গাতীরে নৈহাটী গ্রামে বসতি করেন ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে এই ঘটনা হইতে পারে। পদ্ম-নাভ প্রথমতঃ পাণ্ডুনগর হইতেই মহারাজা দনুজমর্দ্দন দেবসহ চন্দ্রদ্বীপে

আগমন করেন। অতঃপর চন্দ্রদ্বীপ হইতে তিনি গঙ্গাবাস হেতু বৃত্তি-স্বরূপ নৈহাটী প্রাপ্ত হইয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। চন্দ্রদ্বীপেও তাঁহার অন্য এক বাড়ী ছিল। তাঁহার বংশধরেরা কেহ গৌড়ে কেহ বঙ্গে বাস করিতেন। রূপসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামী সম্বন্ধে ভক্তি রত্নাকরে আছে—

শ্রীজীব—

অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপ যাত্রা কৈল
চন্দ্রদ্বীপ বাসী লোক বিচারিল মনে,
অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে
শ্রীজীব সঙ্গের লোক বিদায় করিয়া
ফতেয়া হইতে চলে এক ভৃত্য লইয়া।

যাহা হউক ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় মহারাজা দনুজমর্দ্দন দেবের অভ্যুদয় কালে রাঢ়, দক্ষিণ বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মুসলমান প্রাধান্য একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল। ক্ষিতীন্দ্র দেবের বংশধরগণ যে তদ্বংশীয় মহারাজা সুবুদ্ধি দেবের সময় পর্য্যন্ত গৌড়ের মুসলমান বাদসাহগণের সহিত সৌহৃদ্য রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে রাঢ়দেশ শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ হইতেও তাহার বেশ আভাষ পাওয়া যায়। আমরা পশ্চাৎ তাহার উল্লেখ করিব। ক্ষিতীন্দ্র দেবের শ্রীকণ্ঠ, মাধব, সোমনাথ ও ক্ষিতীশ নামে সর্ব্বগুণযুক্ত ও সর্ব্বাচার সমন্বিত 'মহামানী' চারিটী পুত্র জন্মে। কালক্রমে শ্রীকণ্ঠ, মাধব, ও সোমনাথের বংশধরেরা রাঢ়ের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। তন্মধ্যে মাধবের বংশধরেরা সিংহগ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। এই ধারায় বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতকার মহামতি "কাশীরামদাস" জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া দেববংশকে অমর করিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্র দেবের বংশধরেরা বন্দ্যঘটী সমাজেই গোষ্ঠীপতিত্ব করিতে থাকেন। ঐ ধারায়

ক্রমান্বয়ে দেবীবর, জনার্দ্দন, বামন ও চিত্রদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা সকলেই স্বাধীন গৌড়াধিপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। চিত্রদেব বন্দ্যঘটী সমাজে দেবকুলের নায়ক ছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনে নবদ্বীপে ভীষণ যবন বিপ্লব উপস্থিত হয়। বুঝা যায় মুসলমানগণ পুনরায় নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। এই সময়ে নবদ্বীপে দেবালয়, বিগ্রহ ও ব্রাহ্মণগণের নিগ্রহের এক শেষ হয়। অনেক সুধীলোক ধর্ম্মরক্ষার্থ দেশান্তরে প্রস্থান করেন। এই বিপ্লবের কথা অনেকানেক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" ও ফুলশ্রী নিবাসী বিজয় গুপ্তের "চৈতন্য ভাগবত" উল্লেখযোগ্য। এই ঘোরতর আপদকালে মহামানী চিত্রদেব শোকসন্তপ্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। চিত্রদেবের চারিটী পুত্র ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুবুদ্ধি খাঁন এই বিপ্লবের পূর্ব্বে গৌড়ের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই যশ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গৌড়ের রাজদরবারেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতকার তাঁহাকে গৌড়াধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ গৌড়ের বাদসাহ হুসেন সাহ বাল্যকালে সুবুদ্ধিদেবের বাটীতে সামান্য চাকুরি করিতেন। এক সময়ে সুবুদ্ধিদেব হুসেন কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিয়াছিলেন। হুসেন সাহ যখন গৌড়ের বাদসাহ হন তখনও তিনি তাহার পূর্ব্ব মনিব সুবুদ্ধিদেবকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। কিন্তু দৈবের হাত কেহ এড়াইতে পারে না, এই কশাঘাতের পরিণাম ফল একসময় তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। নবদ্বীপের মুসলমান বিপ্লব কালে তিনি গুরুপুরোহিত, স্ত্রীপুত্র, জ্ঞাতিগণ ও বন্ধুবান্ধবসহ বন্দ্যঘটী পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ সবডিবিসনের অন্তর্গত লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের কূলে পুরুড়া নামক

দ্বীপে প্রস্থান করেন এবং সমুদ্র সন্নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস করেন। প্রবাদ, হুসেন সাহ তাঁহার স্ত্রীর প্ররোচনায় গৌড়াধিপতি সুবুদ্ধি দেবের মুখে যবনের স্পর্শ করা জল প্রদান করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধিদেব এই অপমানে বারানসী ধামে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে অতুল ধন ঐশ্বর্য্য দান করিয়া তুষানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হন এবং শেষ জীবন শ্রীবৃন্দাবন ধামে কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া অতিবাহিত করেন। বর্ত্তমান শ্রীবৃন্দাবন ধাম নির্ম্মাণে মহারাজা সুবুদ্ধি দেবের অতুল ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ যে ব্যয়িত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

টুইয়া বংশীয় গয়ালিগণ যত্নের সহিত সুবুদ্ধি খাঁর বংশাবলী রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। সেই বংশাবলীমতে দৃষ্ট হয়, শাণ্ডিল্য গোত্র শাণ্ডিল্যাসিত দেবল প্রবরস্য শ্রীমন্মহারাজ দেব শ্রীশ্রীসুবুদ্ধি খান তস্য পুত্র ইন্দ্রজীৎ খান দেবীদাস দেব, তস্য পুত্র রামকৃষ্ণ, তস্য পুত্র রামনারায়ণ, তস্য পুত্র রাধিকা প্রসাদ, তস্য পুত্র কৃষ্ণবল্লভ, তস্য পুত্র গোবিন্দ বল্লভ, তস্য পুত্র গোবিন্দরাম, তস্য পুত্র রঘুনাথবীরনারায়ণ, তস্য পুত্র হরিগোবিন্দ জয়গোবিন্দ, গঙ্গানারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ।" অন্যত্র,—"চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কর্ণ সেনাখ্যাতস্চ ক্ষত্রিয় রাজকেতু প্রবল প্রতাপ উদ্বিত প্রতাপ তপন শ্রীমন্ মহারাজ শ্রীশ্রীদনুজ মর্দ্দন দেবরায়স্য বংশ জাত শাণ্ডিল্য গোত্র শাণ্ডিল্যাসিত দেবল প্রবরস্য শ্রীমন্মহারাজদেব শ্রীশ্রীসুবুদ্ধিখান্ ইত্যাদি"।

গৌড়াধিপতি সুবুদ্ধিদেবের বংশধরগণ এখনও পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত পুরুড়াগ্রামে বাস করিতেছেন। এই পুরুড়া ভৈরব নেত্রকোনা রেললাইনে গোচিহাটা ষ্টেসনের ১ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। সুবুদ্ধি খাঁর সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে গুনরী হইতে আগত "দত্তশ্রেষ্ঠ"

কালিদাস দত্তের বংশধরগণ পুরুড়ার নিকটবর্ত্তী মাইজহাটী ও কায়স্থ পল্লী প্রভৃতি গ্রামে সসম্মানে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা বটগ্রামী দত্ত বলিয়া পরিচিত। নন্দীগণ পূর্ব্বে পুরুড়া ও চাতলে (চরতলে) বাস করিতেন। সেই সেই স্থানে তাহাদের বাস বাটী চিহ্নও আছে। এক্ষণে তদ্বংশীয়গণ গোচিহাটা ও বনগ্রামে বাস করিতেছেন। কাঞ্জীলাল বংশীয়গণ অদ্যাপি পুরুড়াতেই বাস করিতেছেন। বন্দ্যো-কুলাচার্য্যগণ পূর্ব্বে পুরুড়াতেই বাস করিতেন। তথায় তাঁহাদের বাস চিহ্ন আছে। এক্ষণে পার্শ্ববর্ত্তী গোচিহাটায় বাস করিতেছেন। ইহাঁরা দাশরথী বন্দ্যোর সন্তান। পুরুড়ার নিকটবর্ত্তী চরতল বা বর্ত্তমান চাতল গ্রামে জ্ঞাতি হরিদেবের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন।

এই মহাসম্মানী দেববংশীয়গণ, যাঁহারা উত্তররাঢ় দক্ষিণরাঢ়, বঙ্গ বরেন্দ্র সর্ব্বত্রই রাজত্ব ও গোষ্ঠিপতিত্ব করিয়া আসিয়াছেন এবং বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য ও সদাচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহাদের বংশবলী প্রদান করিয়া এই আখ্যায়িকা শেষ করিলাম।

পুরুড়ার শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কর্ণ সেনী দেববংশ।
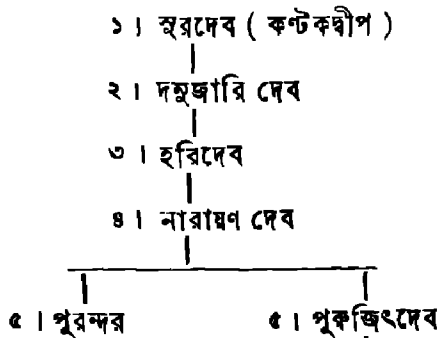
৬। অদিত্যদেব

৭। দেবেন্দ্রদেব (পাণ্ডুনগর)
৭। ক্ষিতীন্দ্রদেব (পাণ্ডুনগর) (তৎপর বন্দ্য ঘটী)

৮। মহেন্দ্রদেব (১৪১৪—১৭) (পাণ্ডুনগর)

৯। দনুজমর্দ্দনদেব (চন্দ্রদ্বীপ, রাজধানী কচুয়া)

১০। রমাবল্লভদেব

১১। কৃষ্ণবল্লভদেব

১২। হরিবল্লভদেব

১৩। জয়দেবদেব

১৪। কল্যাণী—কমলা = বলভদ্রবসু

১৫। পরমানন্দ রায়

১৬। জগদানন্দ রায়

১৭। কন্দর্পনারায়ণ রায় (বারভূঞার অন্যতম রাজধানী মাধব পাশা)

১৮। রামচন্দ্র রায় (প্রতাপাদিত্যের জামাতা)

১৯। কীর্ত্তিনারায়ণ রায়
১৯। বাসুদেব রায়

২০। প্রতাপনারায়ণ রায়

২১। প্রেমনারায়ণ রায়

২২। বিমলা = গোরীচরণ মিত্র
২৩ উদয়নারায়ণ
২৩ রাজনারায়ণ
২৪ শিবনারায়ণ = দুর্গারাণী
২৫ লক্ষ্মীনারায়ণ মৃত্যু ১৭৮০
২৫ জয়নারায়ণ
২৬ নৃসিংহনারায়ণ
২৭ বীরসিংহ নারায়ণ
২৭ দেবেন্দ্রনারায়ণ
২৮ যোগেন্দ্রনারায়ণ (জীবিত ৫০)
২৮ উপেন্দ্রনারায়ণ
(জীবিত ৪৭)
২৮ ভূপেন্দ্রনারায়ণ
(জীবিত ৪০)
৭ ক্ষিতীন্দ্রদেব (বন্দ্যঘটী, দক্ষিণরায়)
৮ শ্রীকণ্ঠদেব
৮ মাধবদেব
৮ সোমনাথদেব
৮ ক্ষিতীশদেব
৯ কালিদাসদেব
৯ পুণ্ডরীকদেব
৯ কালীনাথদেব
৯ ভৈরবদেব (পৈড়)
১০ মহীধরদেব
(চিত্রপুর)
তিনপুত্র
(মাহীনগর)
৯ কংশারিদেব (সিংহগ্রাম)
১০ দৈত্যারিদেব

১১ দামোদরদেব

১২ ভুবরাজদেব — ১২ সুররাজদেব

১৩ ধনঞ্জয়দেব

১৪ রঘুপতিদেব — ১৪ ধনপতিদেব — ১৪ নরপতিদেব

১৫ দেবেশ্বরদেব — ১৫ কেশবদেব — ১৫ রঘুদেবদেব — ১৫ শ্রীধরদেব

১৬ প্রিয়ঙ্করদেব

১৭ সুধাকরদেব

১৮ কমলাকান্তদেব

১৯ কৃষ্ণদাসদেব — ১৯ কাশীরামদাস (দেব) — ১৯ গদাধরদাস (দেব)

২ নন্দরাম দাস (দেব)

১২ চিত্রদেব

১৩ সুবুদ্ধিখান (পুরুড়া)* — ১৩ বীরপ্রসাদদেব

১৩ সুবুদ্ধিখান (পুরুড়া)
- ১৪ ইন্দ্রজিৎখান
- ১৪ দেবীদাসদেব রায়
  - ১৫ রামকৃষ্ণদেব রায়
    - ১৬ রামনারায়ণদেব রায়
      - ১৭ রাধারমণদেব রায়
        - ১৮ কালিকাপ্রসাদদেব রায়
          - ১৯ কৃষ্ণবল্লভদেব রায়
            - ২০ গোবিন্দবল্লভদেব রায়
              - ২১ গোবিন্দরামদেব রায়
          - ১৯ হরিবল্লভদেব রায়
            - ২০ রমাবল্লভদেব রায়

---

* সর্ব্ব জ্যেষ্ঠঃ সুবুদ্ধিখান্ দেবকুলস্য ভূষণঃ ।
বন্দ্যঘটীং পরিত্যজ্য জগাম লৌহিত্য পারম্ ।
বন্দ্যকুলাচার্য্যোঽমুখ্য জ্ঞাতিশ্চৈকো হরিদেবঃ ।
গঙ্গাধারা সন্নিকৌ পুরব্যামাং যাঁপেতুচ ।
তত্রত্য আগতশ্চৈকো কালিদাস দত্ত শ্রেষ্ঠঃ ।
আগতশ্চ মহাপাত্রো নন্দীবংশঃ কাশ্যপজঃ ।
দেবস্য সমাজেঽত্র সর্ব্বেতু স্থিতিকারকাঃ ।
(দেববংশম্)

২২ রঘুনাথদেব রায়
২২ বীর নারায়ণদেব রায়
২৩ হরিনারায়ণদেব রায়
২৪ হরগোবিন্দ
২৪ জয়গোবিন্দ
২৪ লক্ষ্মীনারায়ণ
২৪ গঙ্গাগোবিন্দ
২৫ কৃষ্ণগোবিন্দদেব রায়
২৫ রামলোচনদেব রায়
২৬ ঈশ্বরচন্দ্রদেব রায়
২৭ শ্রীঅতুলচন্দ্রদেব রায়
শ্রীঅনিলচন্দ্রদেব রায়
২৬ ভৈরবচন্দ্র দেব রায়
শিবচন্দ্র দেব রায়
শরচ্চন্দ্র দেব রায়
গোবিন্দচন্দ্র দেব রায়
যতীশচন্দ্র দেব রায়
ক্ষিতীশচন্দ্র দেব রায়
অমূল্য
প্রফুল্ল
হিরণ
অরুণ
পারুল
গোপাল
রাখাল
শিশির
লাবণ্য
অবনী
৭। কৃষ্ণবল্লভ দেবরায়
হরিবল্লভ
রমাবল্লভ
দুর্গাচরণ
বামদেব

ভ্রম সংশোধন।

উক্ত বংশ বিবরণের ৪৪১ পৃষ্ঠায় চতুর্দ্দশ পংক্তিতে "দেব বংশের" স স্থানে "শ" হইবে। ৪৪৩ পৃষ্ঠার দশম পংক্তিতে "আজ" স্থানে আছে হইবে। ৪৪৪ পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে মোজার স্থানে মোহরে হইবে। ৪৪৫ পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে "কর্ণ ফুলের" স্থানে কর্ণ কূলে হইবে। ৪৪৫ পৃষ্ঠা র স্থানের চতুর্দ্দশ লাইনে "উক্ত" স্থানে ভক্ত হইবে। উক্ত পৃষ্ঠার বিংশতি পংক্তিতে "জোবল খ্যা" স্থানে জাক্কালাখ্যোহি হইবে। উক্ত পৃষ্ঠার একবিংশতি পংক্তিতে জোবাল স্থান জাক্কল হইবে। ৪৪৪ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পংক্তিতে শৈড় স্থানে পৈড় হইবে। ৪৪৭ পৃষ্ঠার অষ্টাবিংশতি পংক্তিতে "কহ" স্থানে সহ হইবে।

কালিয়ার সেন বংশের বংশতালিকা।

শ্রীহর্ষসেন
|
বিমল
|
বিনায়ক
|
ধন্বন্তরি
|
গাঙ্গেয়ী
|
হিঙ্গু
|
দমন
|
রাজা রবিসেন (মহামণ্ডল)
|
শত্রুঘ্ন
|
ভগীরথ
|
সুধীরাম
|
জন্মেজয়
|
রঘুনন্দন
|
জগদানন্দ
|
দুর্গাদাস
|
নারায়ণ খড়রিয়া (মূলঘর) হইতে কলিয়া
আসিয়া নদীর পশ্চিম পারে বসত করেন
ইঁহার "কবিকর্ণপুর" উপাধি ছিল
|
গোবিন্দ
|
রামনাথ

কালিয়ার সেন বংশের বংশতালিকা।

রামনাথ

বলরাম (নদীর পূর্ব্বদিক আসিয়া বসতি করেন। সেনবংশের বর্ত্তমান বসতবাটী)

রামগঙ্গা

রাজকৃষ্ণ

রামরূপ

গঙ্গাধর — ০
শ্রীধর — ০
গিরিধর (1823-1872 A.D.)

পুত্র (মৃত) যোগেন্দ্র সৌদামিনী নগেন্দ্র (মৃত) মহেন্দ্র পলানে মৃত ঝড়ু মৃত সুরেন্দ্র

ইন্দুমতি কন্যা মৃতা নরেন্দ্র রমেন্দ্র শৈবলিনী মণীন্দ্র প্রভাবতী

কিরণ লীলাবতী মালতীগৌরী আভা আশালতা উষা লাবণ্য উর্ম্মিলা

জ্ঞানেন্দ্র হেমেন্দ্র মল্লিকা হরেন্দ্র (মৃত) বিভা চারু (মৃত) সরোজলতা

সোমেন্দ্র গোপেন্দ্র (মৃত) কমলা সুশীলা

নয়নেন্দ্র শচীন্দ্র শোভেন্দ্র নিভাননী ননীবালা অমলা পুত্র (মৃত) মহামায়া

রামরূপ
হলধর (1825–1897 A.D.)
ধরণীধর (1835 1891 A.D.)
মৃন্ময়ী
হেমাঙ্গিনী (মৃতা)
কেশব
সুব্রত (মৃত)
প্রাণকুমারী
বনমালী
কল্যাণী
শৈলেন্দ্র মৃত)
গোলাপ
পঙ্কজিনী
নির্ম্মল
মেনকা (মৃতা)
কালী তারা
টুবন
ননীন্দ্র (মৃত)
বিনয়
দীনেন্দ্র
বংশীধর(1840-1894AD
ভূপাল মৃত) (1867-1921 AD)
বিনোদিনী (মৃতা)
শরৎ (মৃত)
পুত্র মৃত)
কন্যা (মৃতা)
সত্যেন্দ্র
হীরেন্দ্র
কুন্তলিনী
দ্বিজেন্দ্র
সুভাষিণী
পুত্র মৃত
অমরেন্দ্র
আমোদিনী
অরুণ
বরুণ
শশীধর (1842-1872 A.D.)
যতীন্দ্র 1865—1905 A. D. মৃত
মতিলাল
কমলিনী
ধীরেন্দ্র
প্রভাসিনী
মালিনী
ভূপেন্দ্র
তমাঙ্গিনি
কন্যা (মৃতা)
নৃপেন্দ্র
ভবেন্দ্র (মৃত)
অনিল
প্রমোদিনী
সুনীল

কালিয়ার সেন বংশ।

জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী মহকুমা নড়াইলের অন্তর্গত কালিয়া গ্রাম আজ তত্রত্য সেন বংশের জন্য বিখ্যাত। স্যার জেমস্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাঁহার যশোহরের ইতিহাসে সেন বংশকে অগ্রগণ্য বংশ (leading family) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সেন পরিবার অতি বৃহৎ; হিন্দু যৌথ পরিবারের ইহা একটী জাজল্যমান উদাহরণ। এইরূপ যৌথ পরিবার আজকাল হিন্দু সমাজে বিরল। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ধন্বন্তরি সেন। ইহার একজন পূর্ব্বপুরুষ রাজা রবিসেন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার "রাজা" ও "মহামণ্ডল" উপাধি ছিল। তিনি অনুমান ১৪০২ খৃষ্টাব্দে বীরভূমে বসতি করিতেন। তাঁহার আদি বাসস্থান বীরভূমে ছিল, তৎপর মূলঘরে আসিয়া বসতি করেন। রাজা রবিসেন "চন্দন" উৎসব করিয়াছিলেন। তদনুসারে "চন্দনিমহল" গ্রামের নাম হয়। এই "চন্দন মহল" গ্রাম এখন খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত।

এই সেন পরিবারের আদি পুরুষের পৈতৃক নিবাস খড়রিয়ায় মূলঘরে ছিল। (পূর্ব্বে ঐ গ্রাম যশোহরের অন্তর্গত ছিল, এখন খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত) ইঁহারা ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কালিয়াতে আগমন করেন। রাজা রবিসেনের পরবর্ত্তী অষ্টম বংশধর নারায়ণ সেন অনুমান ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে "খড়রিয়া মূলঘর" হইতে আসিয়া কালিয়ার নদীর পশ্চিম পার্শ্বে (বর্ত্তমান ছোটকালিয়া রাস্তা) বসতি করেন। তিনি একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার "কবি-কর্ণ-পুর" উপাধি ছিল। কালিয়া তখন একটী নির্জ্জন জলময় স্থান ছিল। কালীগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া অবস্থিত। বর্গীর (মহারাষ্ট্রী)

অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই নারায়ণ সেন খড়রিয়া হইতে কালিয়া আসিয়া বসতি করেন।

নারায়ণ সেন হইতে তিন পুরুষ পরবর্ত্তী বংশধর বলরাম সেন কালিয়ার নদীর পশ্চিম পাড় হইতে পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়া নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে (বর্ত্তমান সেন পরিবারের বসতবাটি) আসিয়া বসতি করেন। পৈত্রিক সম্পত্তির মালেক বানিয়াবহ রাজবংশ মারচ্চার—(marriage fee) দাবী করিয়াছিলেন। উহা দিতে অস্বীকৃত হইয়া পৈত্রিক বসত বাটী ও সম্পত্তির অংশ পরিত্যাগ করিয়া নদীর পূর্ব্ব-পার্শ্বে অন্য মালেকের অধীনে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার পৌত্র রাজকৃষ্ণ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৬ বৎসর বয়সে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি বর্দ্ধমান রাজার অধীনে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন।

The origin of Kalia is thus stated by Sir James Westland in his History of Jessore :—

"I have obtained the following account of the origin of the place, and the reason why so many "Bhadralok" are collected in it. The southern tracts used to be liable to the attack of the Mughs, and the western and north western were subject to the ravages of the "Bargies" or Maharattas. A number of people who were sufficiently well off, desirous to live in peace, sought a residence in the more inaccessible parts, where neither Mugh nor Burgi would approach, and established themselves at Kalia, which then was, as shewn in Rennel's map in the midst of a marshy tract."

কালিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা।

কালিয়া এখন বাঙ্গালা দেশের মধ্যে একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই কালিয়ার স্বাস্থ্য এখন অতি সুন্দর। পূর্ব্বে প্রবাদ ছিল—

"জলে কুমীর ডাঙ্গায় জোঁক।
কেমনে বাঁচে "কেলের" লোক॥"

এখন সেই কালিয়ার স্বাস্থ্য অনেক স্বাস্থ্যকর স্থান (Sanitarium) অপেক্ষাও ভাল হইয়াছে। ছোট কালিয়ার মধ্য দিয়া যে কালীগঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল, তাহা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মরিয়া যাওয়ায় ঐ স্থান দিয়া এইক্ষণে বর্ত্তমান লোকাল বোর্ডের প্রকাণ্ড রাস্তা হইয়াছে।

খুলনা হইতে ষ্টিমার যোগে কালিয়া মাত্র দুই ঘণ্টার রাস্তা। "কালিয়া সার্ভিস্" ও "মাদারিপুর তারপাশা" সার্ভিস্ ষ্টিমারে খুলনা হইতে কালিয়া যাওয়া যায়। "নেলসনের" ভারতের মানচিত্রে কালিয়ার উল্লেখ আছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ ওয়ালেস্ কালিয়ার এই সেন বাটীতে পরিদর্শনার্থে যান এবং তিনিই এই গ্রামের নাম "নেলসনের" ভারতের মানচিত্রে সংযোজিত করিয়াছেন। কালিয়ায় একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস, একটী সবরেজেষ্ট্রারী আফিস, একটি দৈনিক বাজার, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী থানা আছে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়, তৎপরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯১৩ সালের ৫ই মাঘ তারিখে টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হয়। ১৮৬৬ খৃঃ কালিয়ার পুলিশ ষ্টেশন স্থাপিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে জানুয়ারী কালিয়ার প্রথম ষ্টিমার লাইন খোলা হয়।

কালিয়ায় প্রধানতঃ বৈদ্য বংশেরই বাস। বৈদ্যবংশ কোন হীন কার্য্য করেন না। চিকিৎসা ব্যবসায়ই তাঁহাদের জাতি-গত ব্যবসায়

অধিবাসী।

এবং এই ব্যবসা তাঁহারা অনেকে এখন পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম যে ছাত্র প্রবেশ করেন তিনি বৈদ্য। কালিয়ার বেন্দা গ্রামে "সর্ব্ববিদ্যা" ব্রাহ্মণ বংশধরগণ বাস করেন।

সেন পরিবারের বংশাবলী পৃথকভাবে এই পুস্তকে মুদ্রিত হইল।

রাজকৃষ্ণ সেনের পুত্র রামরূপ সেন ১৭৯০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি অল্প বয়সে মুর্শিদাবাদে

বংশধর

মহারাজার অধীনে কিছু সময় কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর নড়াইল জমীদারের অধীনে উচ্চ কর্ম্মচারীর পদে বিশেষ কর্ত্তৃত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী ভাষায় তিনি লিখিতে এবং পড়িতে পারিতেন।

রামরূপের সাত পুত্র হয়; তন্মধ্যে দুইটী পুত্র অল্প বয়সেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন। বাকী ৫টী নাবালক পুত্র রাখিয়া রামরূপ ১৮৪৬ খৃঃ পরলোক গমন করেন। সেই পাঁচটী পুত্রের নাম—গিরিধর, হলধর, ধরণীধর, বংশীধর ও শশীধর। যে দুইটী পুত্র মারা যান তাঁহাদের নাম গঙ্গাধর ও শ্রীধর।

গিরিধর সেন মহাশয় ১২৩০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১২৭৯ সালে বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে ৺কাশীধামে পরলোক গমন

গিরিধর সেন
জন্ম—১২৩০
মৃত্যু—১২৭৯

করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়ায় বয়স অল্প হইলেও গিরিধরকে সংসারের সমস্ত ভার আপন স্কন্ধে লইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। শৈশবাবস্থা হইতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি আপন প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা

ও অধ্যাবসায় বলে শীঘ্রই সমস্ত জেলার মধ্যে একজন গণ্যমান্য প্রতি-পত্তিশালী লোক বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি যশোহরে মোক্তারি করিতেন, পরে পাবলিক প্রসিকিউটর (Public prosecutor) হইয়াছিলেন। তিনি নড়াইল জমিদারের মোক্তার ছিলেন এবং ঐ এষ্টেটের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

সাত বৎসর বয়সে গিরিধরের সহিত সেনহাটী নিবাসী শক্তি গোত্র হিন্দুবংশীয় গৌরী প্রসাদের কন্যা ২½ বৎসর বয়স্কা রুক্মিণী গুপ্তার বিবাহ হয়। এই রুক্মিণী গুপ্তার মাতামহী ও পিতামহী উভয়েই সতী-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্বামীর সহিত এক চিতায় সহমৃতা হন। রুক্মিণী গুপ্তার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসন্নকুমার সেন হলধরের কন্যা নৃত্যময়ীকে বিবাহ করেন। শশীধর ঐ প্রসন্নকুমারের ভগিনী সুখদা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। প্রসন্নকুমার নড়াইলে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ উকীল এবং নড়াইল লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রসন্নকুমারের একমাত্র পুত্র সুরেশচন্দ্র হাইকোর্টের উকিল হইয়া খুলনায় ওকালতি করিতে-ছেন। গিরিধর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি ভ্রাতাগণকে বিশেষ ভালবাসিতেন। ধরণীধর তৃতীয়ভ্রাতা, তিনি কালিয়ার বাটীতে থাকিতেন। গিরিধর ও অপরাপর ভ্রাতারা বৎসরের মধ্যে অধিককাল চাকুরি উপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন, ছুটীর সময় তাঁহারা সকলে বাটী আসিতেন। ধরণীধর সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের পাঁচ ভাইয়ে এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ ও সৌহার্দ্দ্য ছিল যে লোকে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "পঞ্চপাণ্ডব" বলিত। স্বগ্রামের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং তাঁহারা স্বগ্রামের উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। কালিয়ার স্কুলটী তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আজ কালিয়ার যাহা কিছু উন্নতি ও সমৃদ্ধি আমরা

দেখিতেছি, তাহার মূলে এই পঞ্চ ভ্রাতারই চেষ্টা নিহিত। গিরিধর অনেক গুণে গুণী ছিলেন। তিনি দীন দুঃখীদের সাহায্যকল্পে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। আজ পর্য্যন্তও লোকে কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ তিনি এক অদ্বিতীয় অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। এখনও লোকে "গিরিসেনের কা'লে" বলিয়া থাকে। ১২৭৯ সালে পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। যে দিবস তাঁহার মৃত্যু হয় সেই দিবস বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া। তাঁহার দানের সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এস্থলে দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি—(১) এক সময় একটী ভিক্ষুক তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল। তিনি সেই ভিক্ষুকের কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন যে তিনি দুই হাতে করিয়া বাক্স হইতে যত টাকা পারেন তুলিয়া সেই ভিক্ষুককে দিয়াছিলেন। সেই টাকার পরিমাণ ৩ শত টাকা। (২) একবার দুর্গা পূজার পর গিরিধর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বংশীধরকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে যশোহরে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে দেখেন নদীর তীরে বসিয়া একজন মুচি কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলেন, লোকটির পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, শ্রাদ্ধ করিবে এমন একটী পয়সাও নাই। গিরিধর তাহা শুনিয়া বংশীধরকে বলিলেন "বাক্সে যে টাকা আছে সমস্তই উহাকে দেও"। বংশীধর জিজ্ঞাসা করিলেন "যশোহর গিয়াই ত টাকার দরকার হইবে, ২।৪ টাকা রাখিয়া দিব কি ?" গিরিধর বলিলেন "দুস্থকে যাহা আছে সবই দাও, ভগবান্ আমাদের দিবেন।"

বংশীধর সমস্ত টাকাটাই সেই লোকটিকে দিলেন। যশোহরে ফিরিয়া আসিয়াই গিরিধর দেখিলেন একজন জমিদারের কর্ম্মচারী টাকা লইয়া তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার মনিব হাজতে

গিয়াছে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার মনিবকে খালাস করিতে হইবে। গিরিধর তৎক্ষণাৎ ধুতি চাদর পরিয়াই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন মঞ্জুর করিলেন। গিরিধর ফি বাবদে ৭ শত টাকা পাইলেন। বাসায় ফিরিয়া গিরিধর তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন "পিতৃ শ্রাদ্ধের জন্য লোকটীকে যে কয়েকটী সামান্য টাকা দিয়াছিলে তৎপরিবর্ত্তে আমরা ৭ শত টাকা পাইলাম। দেখিলে ভগবানের খেলা।" (৩) একদা নৌকাযোগে সুন্দরবন দিয়া কলিকাতায় আসিবার কালীন তিনি দেখেন যে কতকগুলি স্ত্রীলোক ও শিশু স্নানার্থে কাদার ভিতর দিয়া নদীতে নামিতে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি এতদূর অভি-ভূত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি সেইখানে নৌকা ভিড়াইলেন। নদীর চারিদিকে তাকাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে কয়েকখানা নৌকায় টালি বোঝাই দিয়া লোকে লইয়া যাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নৌকার মাঝিদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত টালি ক্রয় করিলেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ অস্থায়ীভাবে সেখানে টালি দিয়া ঘাট তৈয়ারী করিয়া দিলেন।

(৪) ব্যারামের সময় তিনি কাশীধামে অবস্থানকালে তাঁহার অত্যন্ত জল পিপাসা হয়, কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে তিনি অল্প পরিমাণে জলপান করিতে পারিতেন। ইহাতে তিনি পিপাসিত ব্যক্তির অবস্থা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তদবধি বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া তিনি সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া ডাব ও সরবত খাওয়াইতেন। তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী রুক্মিণী গুপ্তা একজন দয়াবতী ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্ম কার্য্য পূজা অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় আনুরক্তি ছিল। গরীব দুঃখীমাত্রকেই তিনি অকাতরে গোপনে দান করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠা মহিলা আজকালকার যুগে বিরল। যোগ্য স্বামীর তিনি যোগ্যা স্ত্রী ছিলেন। ১৯১৩ সালে ২৪শে এপ্রেল তারিখে তিনি

৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৯১৩ সালের ২৯শে এপ্রেলের "বেঙ্গলী" পত্রে নিম্নলিখিত শোকসংবাদ প্রকাশিত হয় :—

"The death is announced at the ripe old age of 87 of a venerable old lady, the mother of Babus. N. C. Sen, M. C. Sen, S. C. Sen, vakils of Kalia in Jesssore,at their ancestral home on Thursday last. The deceased was known all over the District for her manifold virtues and was pious and charitable to all. She was the head and mistress of a large Hindu joint family consisting of 75 members who along with many people mourn the loss of a noble soul as she was. We offer our condolence to members of the bereaved family."

অর্থাৎ ৮৭ বৎসর বয়সে হাইকোর্টের উকিল বাবু এন্, সি, সেন, এম সি, সেন এস, সি, সেন প্রভৃতির মাতা যশোহর জেলায় কালিয়ায় গত বৃহস্পতিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বর্গীয়া মহিলা বদান্যতা ও নানাবিধ সদনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র জেলায় বিখ্যাত ছিলেনে। তিনি একটী বৃহৎ যৌথ পরিবারের কর্ত্রী ছিলেন। এই পরিবারে ৭৫ জন লোক ছিল। আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি।"

গিরিধর চারিটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। (১) যোগেন্দ্র (২) নগেন্দ্র (৩) মহেন্দ্র ও (৪) সুরেন্দ্র। গিরিধরের প্রথমে একটী পুত্র হয়। সেই পুত্রটী অল্প বয়সে মারা যায়। পঞ্চম ও ৭ম পুত্র "পলানে" ও "ঝড়ু" অল্পবয়সে মারা যায়। তাঁহার একমাত্র কন্যা সৌদামিনী গুপ্তার সেনহাটী নিবাসী প্রসন্নকুমার রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। প্রসন্নকুমারের মৃত্যু হইলে সৌদামিনী কালিয়ায় যাইয়া পিত্রালয়ে বাস

করিতেছেন। তাঁহার পুত্র সুধীন্দ্র বি, এস, সি পাশ হইয়া এম-এস-সি ও বি-এল পড়িতেছেন। এই পুত্রের শিক্ষার জন্যই তিনি পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন।

গিরিধরের প্রথম পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন ১২৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩১৫ সালের মাঘ মাসে পরলোক গমন করেন। তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথমে যশোহরে লোয়ার গ্রেডের (Lower grade) উকিল রূপে ওকালতি আরম্ভ করেন। তাহার পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিশেষ অনুমতি লইয়া উচ্চশ্রেণীর (Higher grade) উকিল হন। পরে তিনি আপন অসাধারণ প্রতিভা বলে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরের সরকারী উকিল পদে নিযুক্ত হন। তিনি সর্ব্বদাই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও অক্লান্ত উদ্যমশীলতার সহিত কার্য্য করিতেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই সরকারী উকিল স্বরূপে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি তদানীন্তন এডভোকেট জেনারল মিঃ এস-পি সিংহের (বর্ত্তমানে লর্ড সিংহ) সহিত একযোগে সরকারী পক্ষে মেদিনীপুর বোমার মামলায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি যশোহর জেলা বোর্ডের সভ্য ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্লিডার সিপ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে প্লিডারসিপ পরীক্ষায় পরীক্ষকরূপে মফঃস্বল হইতে আর কোন উকিলকে নিযুক্ত করা হয় নাই। তাঁহার গুণবত্তার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জেলা ও সেসন জজ (District & Sessions Judge) পদে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; কিন্তু কুটীল কালের আহ্বানে তিনি সেসন জজ হইবার পূর্ব্বেই ৫৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করেন। তিনি একেবারে সুস্থ শরীরে হঠাৎ মারা যান। যথারীতি তিনি আদালতে গিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন
জন্ম—১২৫৭
মৃত্যু—১৩১৫

আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারন্দায় আরাম কেদারায় বসিয়া থাকা কালীন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং চারি ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তারের বার্ত্তা পাইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্রচন্দ্র ডাক্তার বার্ড ও স্যার নীলরতন সরকারকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে তৎক্ষণাৎ যশোহর যাত্রা করেন; কিন্তু বনগ্রাম ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ডাক্তারগণ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

জনসাধারণ ও সরকারী কর্ম্মচারী সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি রাশভারি লোক ছিলেন। তাঁহার সুন্দর অমায়িক স্বভাব ছিল, তিনি বিশেষ দয়ালু ছিলেন এবং সকলকেই সমভাবে দেখিতেন। তাহার উদার মন, সরল ও উচ্চ অন্তঃকরণ ছিল। তাঁহার আকৃতি মহিমান্বিত ও অতি সুন্দর ছিল। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট (Lieutenant Govornor) মাননীয় স্যার ফ্রেডেরিক ডিউক তাঁহার মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন,—"He held the good opinion not only of myself but of many others with whom he came in contact" অর্থাৎ তাঁহার (যোগেন্দ্র চন্দ্রের) উপর শুধু যে আমার উচ্চ ধারণা ছিল তাহা নহে, যাঁহারাই তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। মিঃ কিংসফোর্ড (পরে পাটনা হাই-কোর্টের অন্যতম বিচারপতি) তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—"I entertained much respect for him. He was one of the older generation (now I am sorry to say fast disappearing) who was able to combine loyalty to govt. 'and friendship to Europeans.' অর্থাৎ আমি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতাম। পূর্ব্বকালীন লোক যাহারা গভর্ণ-

:মণ্টের প্রতি ভক্তি ও শ্বেতাঙ্গদিগের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

১৯০৯ সালে তিনি নানাপ্রকার যশোমানে বিভূষিত হইয়া তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র তিনটির নাম নরেন্দ্র, রমেন্দ্র ও মনীন্দ্র। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই গ্রাজুয়েট। রমেন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের চেম্বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রমেন্দ্র এখন খুলনা বারের একজন উকিল। নরেন্দ্র ও মনীন্দ্র বি-এল পড়িতেছেন।

নগেন্দ্র চন্দ্র ৯ই আষাঢ় ১২৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এ পাশ করিয়া তাহার পর ক্রমান্বয়ে পি-এল ও বি-এল পাশ করিয়া খুলনাবারে কিছুদিন ওকালতি করেন। যখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র, তখন তিনি "কালিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" শীর্ষক একটী ইংরাজী প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটী

নগেন্দ্র চন্দ্র সেন
জন্ম—১২৬৫
মৃত্যু—১৩২৯

যশোহরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ-ডি, বি, এলেন, এডিনবার্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ ওয়াগেল ও পুলিশ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লিভসে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কালিয়ায় তাঁহাদের বাটী পরিদর্শন করিতে গেলে তাঁহাদের সম্মুখে পঠিত হয়। এইখানে সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ অনুবাদ করা গেল ;—"আমাদের এই গ্রামবাসীরা কিরূপ সাদাসিদা ভাবে বাস করিতেন এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহারা কতটা অবিদিত ছিলেন তাহা আপানারা কয়েকটী দৃষ্টান্ত শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতা স্বর্গীয় গিরিধর সেন মহাশয় যশোহর হইতে পূজার সময় বাটী আসিতেছিলেন। পূজার অল্প দিন বিলম্ব থাকায় তিনি একখানি দ্রুতগামী "বাছির" নৌকায় যশোহর হইতে রওনা হন। যাহারা সেই নৌকায় দাড়ি মাঝি ছিল, তাহারা সকলেই তাঁহার

প্রজা। তখন রাত্রিকাল, নৌকায় একটী লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। আমার পিতা একজন দাড়িকে একটু তামাক সাজিতে বলেন। কিন্তু দাড়ি বলে যে আগুন নাই, কাজেই তামাক খাইবেন কিরূপে? আমার পিতা তখন দাড়িকে লণ্ঠন হইতে আগুন ধরাইয়া লইতে বলিলেন। দাড়ি ভাবিল যখন এই লণ্ঠনের কাচ দিয়া আলো আসিতে পারে তখন আগুনও আসিতে পারে। এই ভাবিয়া সে লণ্ঠনের কাচের নিকট কলিকাটি ধরিল।" আর একবার আমার পিতৃব্য স্বর্গীয় বংশীধর সেন মহাশয় সার্ট পরিয়া কালিয়ার বাটীতে বৈঠকখানার বারন্দায় বসিয়াছিলেন। একজন কৃষক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল, কেমন করিয়া তিনি এই সার্টের ভিতর দেহ ঢুকাইয়াছেন। সে অবাক হইয়া আমার পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন করিয়া তিনি এই সার্টের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোক এমনি সরল ও সাদাসিদে ছিল।"

"উচ্চ শ্রেণীর মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন এরূপ দাড়াইয়াছে যে, যে কৃষক পূর্ব্বে সার্ট কেমন করিয়া পরে তাহা জানিত না এখন সে নিজেই সার্ট পরিতেছে এবং খাজনা আইনের কূট ও জটিল তর্ক বিতর্ক নিজেই করিতে পারে।"

কয়েক বৎসর ওকালতি করিবার পর নগেন্দ্র চন্দ্র এই বৃহৎ যৌথ পরিবারের কর্ত্তা হন এবং বাড়ীতে অবস্থান করেন। যৌথ পরিবার পরিচালনের জন্য যে সমস্ত সদ্গুণের প্রয়োজন নগেন্দ্রচন্দ্রের তাহা সম্যকরূপেই ছিল। তাঁহার অন্তঃকরণ অতি কোমল এবং তাঁহার ব্যবহারও অতি অমায়িক ছিল। গরিব দুঃখী, অভাবগ্রস্তকে তিনি সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি অতি কাজের

লোক ছিলেন। ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। শুধু তাঁহারই বুদ্ধিমত্তা ও অশেষ গুণাবলীর জন্য এই বিরাট যৌথ পরিবার এখনও বজায় রহিয়াছে। তাঁহার নিকট ধনী-দরিদ্র সকলেই সমান ছিল। আতিথেয়তা তাঁহার জীবনের একটী মস্ত গুণ ছিল। কালিয়া গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কল্পে তিনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রযত্নে ১৯১৩ সালে কালিয়ায় তারের বার্ত্তার আফিস হয়। তিনি ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে যদি কালিয়ায় তারের বার্ত্তার আফিস খুলিলে ডাক বিভাগের কোন অর্থ ক্ষতি হয় তবে তিনি দশবৎসরকাল ক্ষতিপূরণ করিবেন।

গত করোনেসন্ দরবার (Coronation Durbar) সময়ে তাঁহাকে রাজভক্তি ও জনহিতকর কার্য্যের জন্য একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট (Certificate of Honor) গভর্মেণ্ট প্রদান করেন।

তাঁহার এক মাত্র পুত্র কিরণ চন্দ্র সেন যশোহরের একজন উদীয়মান উকিল। সেটেলমেণ্ট কার্য্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। কিরণচন্দ্র নড়াইল লোকাল বোর্ডের একজন সভ্য ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট।

কিরণ চন্দ্র।

নগেন্দ্রচন্দ্র ১৯২৩ সালের ২৯শে জানুয়ারী রাত্রি ১১টার সময় হঠাৎ হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া লোপ হওয়ায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি বেশ সুস্থ ও সবলকায় ছিলেন, কাজেই তিনি যে এত শীঘ্র পরলোক গমন করিবেন তাহা কেহ কল্পনায়ও আনে নাই। মৃত্যুর অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি রামায়ণ পড়া শুনিতেছিলেন। মৃত্যুর চারি মিনিট পূর্ব্বেও তিনি এক ঘর হইতে অন্য ঘরে গিয়াছিলেন। মৃত্যুর ২ মিনিট পূর্ব্বে তিনি বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া বলেন যে তাঁহার শেষ সময় আসিয়াছে, যদি তিনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন তবে

যেন তাঁহাকে সকলে ক্ষমা করেন। নগেন্দ্র চন্দ্র যশোহর খুলনার মধ্যে একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য নড়াইল, যশোহর ও খুলনার আদালত বন্ধ করা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে ধনী দরিদ্র সকলেই দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইয়াছিল। যে কোন ব্যক্তি কালিয়ায় আসিত, সে-ই তাঁহার অমায়িকতা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইত। গ্রামের কাহারও বাড়ীতে কোন প্রকার দুর্ঘটনা কি বিপদ ঘটিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিয়া যাইয়া বুক দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। পরোপকারই তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি সারা জীবন পরের উপকার করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছেন। বেশ ভূষা তাঁহার অতি সাধারণ ছিল। পরিবারের ছোট বড় সকলকেই তিনি সমভাবে দেখিতেন ও ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে অগণ্য ব্যক্তি শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের চিঠির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে তাঁহার চরিত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

খুলনার সেসন জজ, মিঃ গার্লিক (Mr. Garlick) লিখিয়াছিলেন—"He was a man who inspired every one at first meeting with a positive affection as well as respect and I have always compared him in my own mind with Sir Roger Coverly the English Knight whom Addison depicted so lovingly. I admired him so much that though I only met him twice I feel as if I have lost a personal friend." অর্থাৎ, তিনি এইরূপ একজন মনস্বী ছিলেন যে তাঁহার প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি সকলের মনেই প্রগাঢ় ভালবাসা এবং ভক্তি জাগরিত হইত এবং আমি সর্ব্বদাই মনে মনে ইংরাজ নাইট স্যার রোজার ডি-কোভারলি, যাহার চরিত্র মাধুরী এ্যাডিসন এতই হৃদয়

গ্রাহী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার মত তাঁহাকে মনে করিতাম। তাঁহাকে এত অধিক সম্ভ্রম করিতাম যে যদিও তাঁহার সহিত আমার দুইবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল তথাচ আমার অনুভব হইতেছে যে আমি আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারাইয়াছি।"

যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. C. C. V. R. Sells লেখেন :—

"The death of Nagendra Babu robs this District of one whose place no one else can ever fill. I not only esteemed him greatly for his transparent virtues but also liked him exceedingly. So I feel the loss is a personal one as well as for the District,"

অর্থাৎ নগেন্দ্র বাবুর পরলোক গমনে যশোহর জেলা হইতে এইরূপ একজনের তিরোধান হইল যে তাঁহার অভাব আর কেহই পূর্ণ করিতে পারিবে না। তাঁহার নির্ম্মল গুণাবলীর জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতাম এবং অন্তরের সহিত ঐকান্তিক ভালবাসিতাম। সুতরাং তাঁহার অভাব আমার নিজের স্বকীয় এবং সমগ্র যশোহর জেলার অভাব বলিয়া বোধ হইতেছে।"

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার মাননীয় মিঃ জে ল্যাং (Mr. Lang) লিখিয়াছেন,—"He was a true gentleman in every sense of the word."

অর্থাৎ তিনি একজন খাঁটী ভদ্রলোক ছিলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (Justice Sir Nalini Ranjan Chatterji) লেখেন "A man of his type is not to be found now-a-days." অর্থাৎ আজকাল তাঁহার মত লোক পাওয়া যায় না।"

খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ এল্-আর-ফকাস্ (Mr. L. R. Faccus) লেখেন :—

"Speaking for myself I can truly say that of the Indian gentleman I have met during a stay of ten years in this Country he impressed me as a man whose uprightness and courtesy formed an ideal standard to which we should all strive to attain with advancing years and though he has now been taken from you it must be a consolation to you to know that his life was long enough to set such a standard both to his own Countrymen and those of other Countries. I shall ever preserve in my mind the picture of your brother as of one who by his life and actions kept alive the "grand old name of gentleman."

অর্থাৎ আমি গত ১০ বৎসর কাল যাবত ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, এই দশ বৎসরের মধ্যে অনেক ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু আপনার ভ্রাতার সততা, অমায়িকতা ও আদর্শ জীবনের দ্বারা আমি যতটা অভিভূত হইয়াছি আর কেহ সেরূপ পারে নাই। আজ যদিও তিনি আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন তথাপি তিনি দেশের মধ্যে যে উচ্চাদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমার হৃদয়ে আপনার ভ্রাতার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত থাকিবে।

তাঁহার মৃত্যুর শোক সংবাদ সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৯২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী

তারিখে "অমৃত বাজার পত্রিকা" যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

" The death occurred at the age of 64 of Babu Nagendra Chandra Sen, the head of Kalia Sen family on Monday last from heart failure. He was a leading man of Jessore and Khulna District and held a unique position. He was universally loved aud admired for his manifold virtues and public services. The Khulna Court of which he was a Senior member and the Kalia School were closed as a mark of respect to the deceased.'' দেশবাসিগণ স্বর্গীয় নগেন্দ্র চন্দ্র সেন মহাশয়কে অন্তরের সহিত ভালবাসিত ও ভক্তি প্রদর্শন করিত। তাঁহার পরলোক গমনে তাঁহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত রচনা করিয়া দলে দলে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিল।

জনসাধারণের চেষ্টায় কালিয়ার স্কুল প্রাঙ্গনে যে একটী মহতী শোক সভার অধিবেশন হয় ঐ সভায় নিম্নলিখিত মন্তব্য গৃহীত হয়:—

"স্বদেশের হিত সাধন যাঁহার জীবনের একমাত্র পূণ্যব্রত ছিল, ধর্ম্মে বিশ্বাস, দেবদ্বিজে ভক্তি যাঁহার চরিত্রের অমূল্য ভূষণ ছিল; যাঁহার উজ্জল জ্ঞানপ্রভা অহঙ্কারের তমোময় ছায়াস্পর্শে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কলঙ্কিত হয় নাই, যাঁহার যশঃ কীর্ত্তি এবং সম্মান দেশময় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু অভিমান হেতু কখনও সে সম্পদ কণামাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই; যাঁহার সকল ছিল ভ্রম শূন্য, কর্ম্মছিল ক্রটীহীন সফলতাময়, অধ্যবসায় যাঁহার জীবনের একটী পবিত্র শিক্ষার বিষয়, বঙ্গের এবং বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ গৌরব—পরিবার পালনে যাঁহার আদর্শ দেশে অদ্বিতীয় এবং স্বার্থত্যাগের উজ্জলতম দৃষ্টান্ত; ভাতৃস্নেহ, মাতৃ-

ভক্তি ও সার্ব্বজনীন প্রেম যাঁহার চরিত্রে সকলের জীবনের অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয়; যিনি জীবন ব্যাপী প্রচেষ্টায় স্বীয় স্বনাধমন্য বংশের কীর্ত্তি কলাপ রক্ষা এবং বর্দ্ধিত করিয়া অতুল আত্মপ্রসাদের অধিকারী হইয়াছিলেন, আজ সেই মহাপুরুষের স্বর্গারোহণে এই সভা তাঁহার পর-লোকগত আত্মার শান্তিময় অক্ষয় স্বর্গ কামনা পূর্ব্বক ভগবৎ চরণে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য শান্তি এবং সান্ত্বনা প্রার্থনা করিতেছে।"

মহেন্দ্র চন্দ্র সেন, বিদ্যারত্ন সাহিত্য রঞ্জন।

মহেন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, তিনি খুলনায় ওকালতী করেন। ১৯১৯ সাল হইতে তিনি সরকারী উকিল ও পাব্লিক প্রসি-কিউটার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ঐ বৎসরে তিনি প্লীডারশিপ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিন বৎসরকাল প্লীডারশিপ পরীক্ষায় তিনি পরীক্ষক হইয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর ৺যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত তিনি মেদিনীপুর বোমার মামলা পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ আইনজ্ঞ উকিল। তাঁহার লোক চরিত্র অধ্যয়নের ক্ষমতা অত্যন্ত। যত বড় মোকদ্দমাই হউক না কেন তাহা তিনি অতি সংক্ষিপ্তাকারে আদা-লতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন। অতি সংক্ষেপে তিনি বড় বড় মোকদ্দমার বর্ণনা করিলেও তাঁহার কোন কিছু বলিতে বাকী থাকে না। বিচারক হইতে সমস্ত উকিল মোক্তার এবং সর্ব্ব সাধারণ তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি শান্ত, সুশীল ধীর প্রকৃতির লোক, মিষ্টভাষী, বিনয়ী অথচ স্বাধীনচেতা। তাঁহার মনের

বল ও তেজ অসাধারণ। তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা, কার্য্য ক্ষমতা ও বিচার শক্তি অসাধারণ। তাঁহার আচরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক, কর্ত্তব্য পালনে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হন না। কখনও কেহ তাঁহাকে রাগিতে দেখে নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ অতি উচ্চ ও দয়ালু। তিনি গরীব দুঃখীর প্রতি সর্ব্বদাই দয়াশীল এবং সকলকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন। কেহ কোন বিপদে পড়িলে তাঁহারই নিকট অবিলম্বে সৎপরামর্শ লইতে আইসে। তিনি বড়ই জনপ্রিয়। তাঁহার নিজের বলিয়া কিছুই নাই। তিনি বাটীর সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন। তাঁহার কোনরূপ বিলাসিতা কিম্বা বাহ্যাড়ম্বর নাই, তিনি যেরূপ সাদাসিদে ভাবে থাকেন তাহা সত্যই অনুকরণীয়। সম্প্রতি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "বিদ্যারত্ন" ও "সাহিত্যরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তিনি এইক্ষণ পরিবারের জ্যেষ্ঠ ও কর্ত্তা।

তাঁহার তিন পুত্র :—জ্ঞানেন্দ্র, হেমেন্দ্র ও সোমেন্দ্র। জ্ঞানেন্দ্র ও হেমেন্দ্র উভয়েই হিন্দুস্কুলে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জ্ঞানেন্দ্র বি, এল, পরীক্ষায় পাশ করিয়া খুলনায় ওকালতী করিতেছেন। তিনি হাইকোর্টের "চেম্বার" পরীক্ষাও পাশ করিয়াছেন। ফৌজদারী মামলায় তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পশার প্রতিপত্তি করিয়াছেন। দেখিতে শুনিতে তিনি অতি সুশ্রী এবং তাঁহার আকার অবয়ব অত্যন্ত কমনীয়।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র।

হেমেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। হাইকোর্টের ওকালতীতে তিনি অল্প সময় মধ্যেই বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাইকোর্টে উকিল হন। ১৯১৯ সালে তিনি ওকালতী করিতে করিতে অর্থ ও রাজনীতিতে

হেমেন্দ্রচন্দ্র।

এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বি, এল এর ফাইনাল পরীক্ষার একজন পরীক্ষক। তিনি প্লীডারসিপ্ পরীক্ষারও একজন পরীক্ষক হইয়াছিলেন।

সোমেন্দ্র কলেজের ছাত্র, আই, এ পড়িতেছে। তৃতীয় পুত্র হরেন্দ্র অতি বুদ্ধিমান ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বালক। তাহার সরল মধুর ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। দুঃখের বিষয় ১৯০৫ সালের ২৯শে এপ্রিল শনিবার হরেন্দ্র কলেরা রোগে মারা যায়। তখন তাহার বয়স মাত্র ১১ বৎসর ৪ মাস। তাহার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত সংসার একেবারে শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এখনও তাহার কথা মনে হইলে এই পরিবারের সকলে কাঁদিয়া আকুল হয়।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র গোপেন্দ্র ১৯০৮ সালের ২০শে নভেম্বর সোমবার জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯০৯ সালের ৩০শে নভেম্বর ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া রোগে মারা যায়।

তাঁহার তৃতীয়া কন্যা চারুবালার ১৯১৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে মৃত্যু হয়। চারুবালার সরল ও সুন্দর স্বভাব ছিল এবং সাংসারিক সকল কার্য্যেই তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তাঁহার মূলঘরে বিবাহ হইয়াছিল।

সুরেন্দ্র চন্দ্র হাইকোর্টের একজন গণ্য মান্য বিখ্যাত উকিল। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে তিনি বিশেষ পারদর্শী। প্রজাস্বত্ব বিষয়ে তাঁহার মতামত মূল্যবান বলিয়া সকলেই গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রজাস্বত্ব আইনের বহি সর্ব্বত্র আদৃত। হাইকোর্টে প্রজাস্বত্ব বিষয়ে কয়েকটি মোকদ্দমায় হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাঁহার বহিকে "valuable work" ও well known and recognised work of reference" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি

রায় সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বাহাদুর।

রাইট অনারেবল স্যার লরেন্স জেঙ্কিস্ পি-সি (Rt. Hon'ble Sir Lawrence Jenkins) এই আইন পুস্তককে "The work of a recognised authority on a difficult branch of law" বলিয়া তাঁহার পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন কমিটিতে (Bengal Tenancy Act Amendment committee) তাঁহাকে "an expert" সভ্য করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এই কমিটিতে তাঁহার অমূল্য সময় ও অর্থক্ষতি সহ্য করিয়া দেশের উপকারার্থে যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন সে জন্য দেশের লোক ও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্র চন্দ্র একজন কবি ও সাহিত্যানুশীলনে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ আছে। তাঁহার "অবসর চিন্তা", ও "আমার জীবনের কয়েকটী কথা" অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থে তিনি যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সংসার-তাপদগ্ধ ব্যক্তিকে অমোঘ সান্ত্বনা দান করে। এই পুস্তক বহু লোক-চরিত্র অধ্যয়নের ফল-প্রসূত। "অবসর চিন্তা" পুস্তক সম্বন্ধে ১৯১৭ সালের ৭ঠা মার্চ্চের বেঙ্গলী লিখিয়াছেন ;—

এই "অবসর চিন্তা" পুস্তকে মোট ১৫০ পৃষ্ঠা আছে এবং এই পুস্তকে বন্ধুত্ব, প্রেম, বদান্যতা, ত্যাগ অভিলাষ, শত্রুতা, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি নানা সম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ আছে। এই পুস্তকখানি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এবং পড়িলে স্যামুয়েল স্মাইলসের পুস্তকের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। প্রাতঃকালে যদি কোন পাঠক এই পুস্তকের পাতা উন্মোচন করেন তবে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন ; কারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজন এই পুস্তকে তাহারই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার আপনার

ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকিয়াও যে এরূপ সুচিন্তিত পুস্তক লিখিয়াছেন সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল—

"লোকলজ্জা" আমাদের সমঅবস্থা ও সমতুল্য ব্যক্তিগণের নিকট; আমাদের হইতে যাহাদের হীন অবস্থা তাহাদিগের নিকট বিশেষ কোন লজ্জার কারণ মনে করি না। জীব জন্তুর সাক্ষাতে অম্লান বদনে পাপকার্য্য করিতেছি। কোন লজ্জা নাই; মনের সাহস যে তাহাদের দ্বারা উহা কোন প্রকারে প্রকাশ হইবার সম্ভব নাই; জীবজন্তু আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, আমি অনায়াসে তাহাদের সাক্ষাতে কোন প্রকার পাপকার্য্য করিতে সঙ্কোচ করি না। তৎপ্রকার মানব জাতির মধ্যে যাহারা যত উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাহারা নীচস্তরে লোকের কোন মতামতের প্রতি লক্ষ্য করে না, এবং তাহাদিগের মতামতকে তুচ্ছ করিয়া নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকে, পশু পক্ষীর মত নীচস্তরের লোকেরা অভ্যুদয় সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে মূক অবস্থায় থাকে সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারে না।"

"যে প্রভু সে মনে করে যে তাহার সুখের জন্যই তাহার ভৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রভুর সুখ ভিন্ন তাহার নিজের কোন সুখ নাই।"

"ধনবান ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে এতদূর মনে করে যে নির্ধন ব্যক্তি কোন পুণ্য কার্য্য করিতে অশক্ত; ধনবান ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের অভ্যুদয়ে সর্ব্বদা ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া মনে করে যে পুণ্যকার্য্য ধনবান ব্যক্তিই করিতে পারে, এবং নির্ধন ব্যক্তি কোন প্রকার পুণ্য কার্য্যের অধিকারী নহে। নির্ধন ব্যক্তি যে পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও পুত্র সন্তানের প্রতি স্নেহশীল তাহা ধনবান ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।"

"অভ্যুদয় কালে সর্ব্বদাই এই বিষয়ে যত্নবান ও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে 'আমার যেন পদস্খলন না হয়'।

"যে মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং যাঁহার গর্ভে নিজ সহোদরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অভ্যুদয় কালে তাহাদেরও ভুলিয়া যাই; তাঁহাদিগকে অভ্যুদয় কালে নিম্নস্তরের মনে করি; এমন কি নিজ সহোদরকে ভৃত্যের মত ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হই না, এই প্রকার স্বভাবের লোক যে নিজ সহোদরকে ঐ প্রকার তুচ্ছ করে, সে অপর ব্যক্তির সহিত ঐ প্রকার আচরণ করিবে তাহার আর বিচিত্র কি? কেবল অন্য যে সকল অভ্যুদয় সম্পন্ন লোকের সহিত নূতন পরিচয় হয়, তাহাদিগকে সম্মান করে ও তাহাদিগের সংসর্গ কি প্রকার পাইবে তাহার চেষ্টা করে; কারণ পূর্ব্ব হইতে মনে করিয়াছে যে ঐ সকল অভ্যুদয় সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত সমভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে পরম সুখ হইবে।"

বিষয়ঃ "প্রকৃত ক্ষতি";—

"যে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার মন কলুষিত করিতে পারে, সেই আমার প্রকৃত ক্ষতি করে। যে আমার ধন সম্পত্তি অপহরণ করে সে আমার প্রকৃত ক্ষতি করে না। আমার মন পবিত্র থাকিলে ধনহীন অবস্থায়ও সুখের ব্যাঘাত হয় না, অপরের নিকট আমার সুনাম নষ্ট হইলে আমার নিজের নিকট নিজের কোন লজ্জার কারণ হয় না।"

"আমার জীবনের কয়েকটী কথা"—পনেরো পাতার একখানি কবিতা পুস্তিকা। এই পুস্তিকায় সুরেন্দ্র বাবুর নিজ পরিবারবর্গের কথা তাঁহার পিসতুত ভ্রাতা শ্রী প্রসন্নকুমার সেনের নাম দিয়া লিখিয়াছেন। এই পুস্তিকার শেষ 'পারাতে' সুরেন্দ্র বাবু নিজের আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই কবিতা পুস্তিকাখানি এমন সুন্দর, মনোরম

সুশ্রাব্য ভাষায় লেখা যে ইহা পড়িলে হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ইহার ভাব প্রবেশ করে। তাঁহার নিজের মনের পরিচয় এই কবিতায় দৃষ্ট হয়। উহা হইতে কয়েকটী লাইন নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"সুরেন্দ্র বলিছে মোরে বিনয় বচন,
করি না কখন যেন কর্ত্তব্য লঙ্ঘন ॥
ভ্রাতৃস্নেহ ভ্রাতৃ ভক্তি অচলা থাকিয়া
জীবন কাটাই যেন তাঁদের তুষিয়া।
ধনমান নাহি চাই, নাহি চাই যশ
থাকিব সন্তুষ্ট চিত্তে হয়ে আত্মবশ ॥"

সুরেন্দ্র বাবুর চরিত্র মহত্বের জন্য প্রত্যেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। পরিবারের সকলের নিকটেই তিনি প্রিয়। সকলকেই তিনি সমস্নেহের চক্ষে দেখেন। আপন পুত্রাপেক্ষা তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অধিক স্নেহের চক্ষে দেখেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অতি উচ্চ। তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, তৎ সমস্তই তিনি পরিবারবর্গ, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, অনাথ আতুরের জন্য ব্যয় করেন, কিছুই রাখেন না, তাহা স্বত্বেও তিনি কখনও অভাবে পড়েন না। তাঁহার আতিথেয়তাও সর্ব্বজন বিদিত। তিনি অতি সাদা সিদে ভাবে বাস করেন এবং সর্ব্বদা উচ্চচিন্তা করেন। তিনি নিজের স্বার্থের দিকে দৃকপাত করেন না। পরের জন্য চিন্তা করাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহার স্নেহ অসীম। সরলতায় তিনি শিশু সদৃশ।

সুরেন্দ্র বাবু স্বার্থত্যাগী। সাংসারিক বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না। তাঁহাকে 'সন্ন্যাসী' বলিলেই হয়। তাঁহার হৃদয় পশু পক্ষীর দুঃখেও অভিভূত হয়। এক দিন তিনি আদালত হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখেন যে একটী লোক খাঁচায় করিয়া কতকগুলি পাখী লইয়া যাইতেছে। পাখীগুলির

আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি সেই পক্ষী বিক্রেতার নিকট হইতে পাখীগুলি কিনিয়া লইয়া একে একে সেগুলিকে ছাড়িয়া দিলেন।

স্বরেন্দ্র বাবু এরূপ দয়াবান যে তিনি মশা কিম্বা ছারপোকাটি পর্য্যন্ত মারেন না। তাহার ন্যায় সজ্জন, নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপরায়ণ, দয়ালু ও উচ্চ অন্তঃকরণের লোক অতিশয় বিরল।

তাঁহার তিন পুত্র :—নয়নেন্দ্র, শচীন্দ্র ও শোভেন্দ্র। ইহারা তিন জনেই কলেজের ছাত্র। শোভেন্দ্র বি.এ, পাশ করিয়া এম,এ ও বি, এল পড়িতেছে। নয়নেন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এস, সি, পড়িতেছে। শচীন্দ্র আই, এ পড়িতেছে; তাঁহার আর একটী পুত্র হইয়াছিল, সেই পুত্রটী ৪ মাস বয়সে মারা যায়। তাঁহার প্রথমা কন্যা ৯ বৎসর বয়স্কা নিভাননীর ১৯১৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু হয়। তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা ৯ বৎসর বয়স্কা ননীবালার ১৯১৬ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে মৃত্যু হয়। দুইটী বালিকারই মধুর স্বভাব ছিল।

হলধর সেন মহাশয়ের অন্তঃকরণ অতি উদার ছিল। তিনি যুবকের ন্যায় উদ্যমশীল এবং পরম ধার্ম্মিক ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়াই থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনী শিবসুন্দরী গুপ্তাও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও দয়ালু মহিলা ছিলেন। গৃহ কর্ম্মে তিনি সুনিপুণা ত ছিলেনই, তাহা ছাড়া তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম ও পূজা পার্ব্বণে বিশেষ আনুরক্তি ছিল। দৈনিক পূজা পার্ব্বণে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। তিনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও দরিদ্র নারায়ণকে ভোজন করাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনি সংসারের প্রকৃত কর্ত্রী ছিলেন এবং অতি যোগ্যতার সহিত আপন কর্ত্তব্য সমাধা

হলধর সেন
জন্ম—১২৩১
মৃত্যু—১২৮০

করিতেন। সংসারের সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন ও ভাল বাসিতেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন পাঠ সমাপনান্তে এখন সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারও ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি আছে। সাংসারিক কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সমাধা করিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে এবং উপযুক্ত পাত্রেই সংসারের কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বেশ অধিকার আছে। আজ-কালকার দিনে তাঁহার মত ধার্ম্মিক লোক অতি বিরল। ইঁহারই চেষ্টায় ইঁহাদের পরিবারের এখনও ষোড়শোপচারে বার্ষিক শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক পূজার্চ্চনা ও ধর্ম্মকার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর ও অমায়িক ও মায়া মমতা পূর্ণ।

কেশব চন্দ্রের বর্ত্তমানে দুইটী পুত্র :—গোলাপ ও নির্ম্মল। গোলাপ বি, এ, পড়িতেছে। নির্ম্মল স্কুলের ছাত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলেন্দ্র অতি অল্প বয়সেই মারা যান। ইঁহার পরমা সুন্দরী ৯ বৎসর বয়স্কা তৃতীয়া কন্যা মেনকা সুন্দরীর ১৯২২ সালে ২৯শে মে তারিখে মৃত্যু হয়।

ধরণীধর সেন মহাশয় অতি কর্ত্তব্য পরায়ণ ও নিঃস্বার্থবান ছিলেন। তিনি কালিয়ার বাটীতে বাস করিতেন। তিনি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। তিনিও অতিথেয়তা, সদ্ব্যবহার, অমায়িকতা প্রভৃতি নানা সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। স্বগ্রামের উন্নতি কল্পে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৫৬ বৎসর বয়সে ১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পদ্মমণি গুপ্তার ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁহার সাংসারিক কার্য্য নিপুণতার জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ধরণীধর সেন
জন্ম—১২৪১
মৃত্যু—১২৯৭

তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বনমালী সেন বর্ত্তমানে এডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ্। বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কিছুকাল বরিশালে ওকালতী করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ, সহিষ্ণু, কার্য্যক্ষম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, পরিশ্রমী বিচারক বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি অল্পভাষী হইলেও হৃদয় তাঁহার পরদুঃখে কাতর এবং তিনি সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য পরায়ণ।

বনমালী সেন।

বনমালী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ননীন্দ্র কৃতিত্বের সহিত বি, এ পাশ করিয়া অঙ্ক-শাস্ত্রে এম, এ, পাশ করেন। তার পর বি, এল পরীক্ষায় পাশ করিয়া অল্প দিন হাইকোর্টে ওকালতী করিবার পর ১৯২২ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র সেন পরিবারের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রত্যেকেই তাঁহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হন। ৯ই অক্টোবর সন্ধ্যার সময় তাঁহার কলেরা হয় এবং ১০ই অক্টোবর দুই প্রহরের পূর্ব্বেই সব শেষ হয়। সতর বৎসরের বিধবা বালবধূ ও তিন মাসের একটী কন্যা রাখিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া যান। অতি অল্প বয়সে তিনি যে প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা দেশ যে কতদূর গৌরবান্বিত ও বংশের মর্য্যাদা সমুজ্জ্বল হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

বনমালী বাবুর দ্বিতীয় পুত্র বিনয়েন্দ্র ও কনিষ্ঠ পুত্র দীনেন্দ্র উভয়েই স্কুলের ছাত্র।

বংশীধর সেন মহাশয়—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মুনসেফী পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল মুনসেফি করিবার পর, সদর দেওয়ানি আদালতে তৎপর বর্ত্তমান হাইকার্টে ওকালতী করেন। তিনি হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। তিনি বাগ্মীতা, পাণ্ডিত্য, দয়া, বদান্যতা

বংশীধর সেন
জন্ম—১২৪৬
মৃত্যু—১৩০০

ও জনহিতৈষণা প্রভৃতি নানাগুণে ভূষিত ও সর্ব্ব পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দ্বার সকলের জন্যই সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তিনি স্বগ্রামের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কালিয়ার মধ্য দিয়া যে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ রাজ পথ প্রসারিত তাহা তাঁহারই চেষ্টার ফল। তাঁহার চেষ্টা-তেই কালিয়া স্কুলের বর্ত্তমান শ্রীবৃদ্ধি। তিনি যশোহর জেলা বোর্ডের সভা ও নড়াইল লোকাল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি নিঃস্বার্থ ও অতি পরোপকারী ছিলেন। তিনি বিশেষ অমায়িক ও সামাজিক লোক ছিলেন। সাধারণের হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালিয়া তাহার নিকট অনেক প্রকারে ঋণী। দেশবাসী তাঁহার স্মৃতি কখনই ভুলিবে না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্নদা সুন্দরী গুপ্তা অতি বুদ্ধিমতী মহিলা।

বংশী বাবুর একমাত্র পুত্র ভূপাল চন্দ্র সেন অনারের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কিছু কাল ফরিদপুরে ওকালতী করেন। তাহার পর তিনি মুন্‌সেফ পদে নিযুক্ত হন। তিনি ইংরাজী শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি অনবরত কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া যাইতেন। তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ও বিচক্ষণ বিচারক ছিলেন এবং এই জন্য সর্ব্বত্রই লোক প্রিয় ছিলেন ও সমাদৃত হইতেন। তাঁহার দয়ালু অন্তঃকরণ ছিল মাসিক ৮৫০৲ টাকা বেতনে যখন তিনি একজন সবজজ তখন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে তাঁহার ৫৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

ভূপাল চন্দ্র সেন
জন্ম—১২৭৪
মৃত্যু—১৩২৮

তাঁহার ছয় পুত্র সত্যেন্দ্র, হীরেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, অমরেন্দ্র, অরুণ ও

বরুণ। সত্যেন্দ্র ১৯১৯ সাল হইতে হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি আছে।

দ্বিতীয় পুত্র হীরেন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন কৃতী ছাত্র। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরাজীতে অনার লইয়া বি, এ পাশ করেন এবং গুণানুসারে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ পাশ করেন এবং গুণানুসারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়নানুরে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হন।

তৃতীয় পুত্র দ্বিজেন্দ্র বি, এস, সি, পড়িতেছেন এবং অন্যান্য পুত্র এখনও ছোট। তাহারা সকলে স্কুলে অধ্যয়ন করে।

শশীধর সেন দেখিতে অতি সুশ্রী ও সুন্দর সুঠাম ছিলেন। তাঁহার সহিত যে একবার আলাপ করিত সে তাঁহার অমায়িকতা ও সরলতা গুণে মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিরিধর তাঁহাকে এরূপ ভাল বাসিতেন যে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাকে কাছে কাছে রাখিতেন এবং বারাণসী ধামে যাইবার কালীন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১২৭৮ সালের পৌষ মাসে বারাণসী ধামে ৩০ বৎসর মাত্র বয়সে শশীধর মানবলীলা সম্বরণ করেন। গিরিধর তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভ্রাতার শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া অত্যল্প কাল পরেই শশীধরের ছায়ার অনুসরণ করেন।

শশীধর সেন
জন্ম— ২৪৮
মৃত্যু—১২৭৮

শশীধর তাঁহার পত্নী সুখদা সুন্দরী ও যতীন্দ্র এবং মতিলাল নামে দুইটী নাবালক পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

বি-এ, ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যতীন্দ্র চন্দ্র কিছুকাল

যশোহরে ওকালতী করেন। তাহার পর তিনি হাইকোর্টের "চেম্বার" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তদনন্তর তিনি মুন্‌সেফী গ্রহণ করেন এবং মাসিক চারি শত টাকা বেতনের মুন্‌সেফ হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকেও করাল কালের আহ্বানে মাত্র ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১৯০৫ সালে শ্রাবণ মাসে বহুমূত্র রোগে ইহলীলা ত্যাগ করিতে হয়। ১৯০৩ সালে একবার তাঁহার অবস্থা সাংঘাতিক হয়, সেবার তিনি ডাক্তার "বার্ড" ও ডাক্তার "মারের" সুচিকিৎসায় এবং সুরেন্দ্র চন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করেন, কিন্তু এই সাংঘাতিক ব্যাধির হাত হইতে তিনি একেবারে অব্যাহতি পাইলেন না। কর্ণেল লিউকিসের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ইহার দুই বৎসর পরে পরলোক গমন করেন।

যতীন্দ্র চন্দ্র সেন
জন্ম—১২৭২
মৃত্যু—১৩১২

তিনি আদর্শ চরিত্র, অতি নির্ম্মল স্বভাব ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। মৎস্যমাংসাদি তিনি কখনও স্পর্শ করিতেন না। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও সামাজিক লোক ছিলেন। বিশুদ্ধ সঙ্গীতে তাঁহার আসক্তি ছিল। লোকের সহিত আন্তরিক অমায়িক মধুর ব্যবহারে ও সুমিষ্ট কথা বলিতে তাঁহার মত লোক বস্তুতঃ অতি বিরল। তিনি অতি কর্ত্তব্য পরায়ণ, সূক্ষ্মদর্শী ও নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। তাঁহার নিকট বিচারে যে হারিয়া যাইত সেও মনে করিত ঠিক ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার হইয়াছে। বিচারক হিসাবেও তিনি অতি লোকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই বিশেষ ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। তিনি ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতেন। সেই সমস্ত কবিতা তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদীতে ১৯০৫ সালে তিনি মুন্‌সেফ ছিলেন।

তাঁহার দয়াবতী জননী সুখদা সুন্দরী গুপ্তা ১৯১৯ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে শনিবার স্বর্গারোহণ করেন।

যতীন্দ্র চন্দ্র একমাত্র পুত্র রাখিয়া মারা গিয়াছেন। পুত্রটির নাম ধীরেন্দ্র চন্দ্র। ধীরেন্দ্র বি, এ, পাশ করিয়া দর্শন শাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ইণ্টার মিডিয়েট বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এইক্ষণ ফাইনাল বি-এল পরীক্ষা দিয়াছেন। হাইকোর্টে ওকালতী করিবার জন্য তিনি আর্টিকেলড ক্লার্ক হইয়াছেন।

মতিলাল সেন মহাশয় যশোহরের উকিল। তিনি অতি অমায়িক ও সামাজিক লোক এবং তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর। কারু শিল্পে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। তাঁহার চারি পুত্র ভূপেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, অনিলেন্দ্র ও সুনীল। জ্যেষ্ঠ ভূপেন্দ্র বি,এ পাশ করিয়া এক্ষণে বি, এল পড়িতেছেন। তিনিও হাইকোর্টের উকিল হইবার জন্য আর্টিকেলড ক্লার্ক রূপে কাজ করিতেছেন। অন্যান্য পুত্রেরা সকলেই ছোট এবং স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। তাঁহার অন্যতম পুত্র ভবেন্দ্র ১৯১০ সালে মাত্র ৫ বৎসর বয়সে মারা যায়।

মতিলাল সেন

কালিয়ার সেন পরিবারের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। বস্তুতঃ এইরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বৃহৎ হিন্দু যৌথ পরিবার বঙ্গদেশে, বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে লক্ষিত হয় না।

সোঙাঞী বা সোমগ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ।

শ্রীহর্ষ হইতে লক্ষ্মীধর দ্বাবিংশতি পুরুষ, ভরদ্বাজ গোত্র। ফুলিয়া মেল নীলকণ্ঠের সন্তান।

এই বংশের রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার সোঙাঞী গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। ইনি লবণ বিভাগে (Salt deparment) এ কার্য্য করিয়া প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে দস্যু কর্ত্তৃক সমস্ত ধন-সম্পত্তি অপহৃত হওয়ায় অবস্থা খারাপ হয়।

সোঙাঞী গ্রাম সংস্কৃত চর্চ্চার পীঠস্থান বলিয়া এক সময়ে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এই গ্রামে বাইশটী টোল ছিল এই বংশের হটী বিদ্যালঙ্কার কাশীধামে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অধ্যাপকতা করেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হটী বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"হটী বিদ্যালঙ্কার" একজন বিদ্যাবতী ব্রাহ্মণ কন্যা। ইঁহার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার সোঙাঞী গ্রাম ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ও ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় বিদায় লইতেন।" (সেকাল ও একাল—পৃষ্ঠা ৫১ পাদ টীকা)।

রামপ্রসাদের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্যামাপ্রসাদ, মধ্যম অন্নদাপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ চন্দ্রশেখর।

অন্নদা বাবু বর্দ্ধমানে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন মোক্তার ছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও সদাচারী ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় সাধু ও
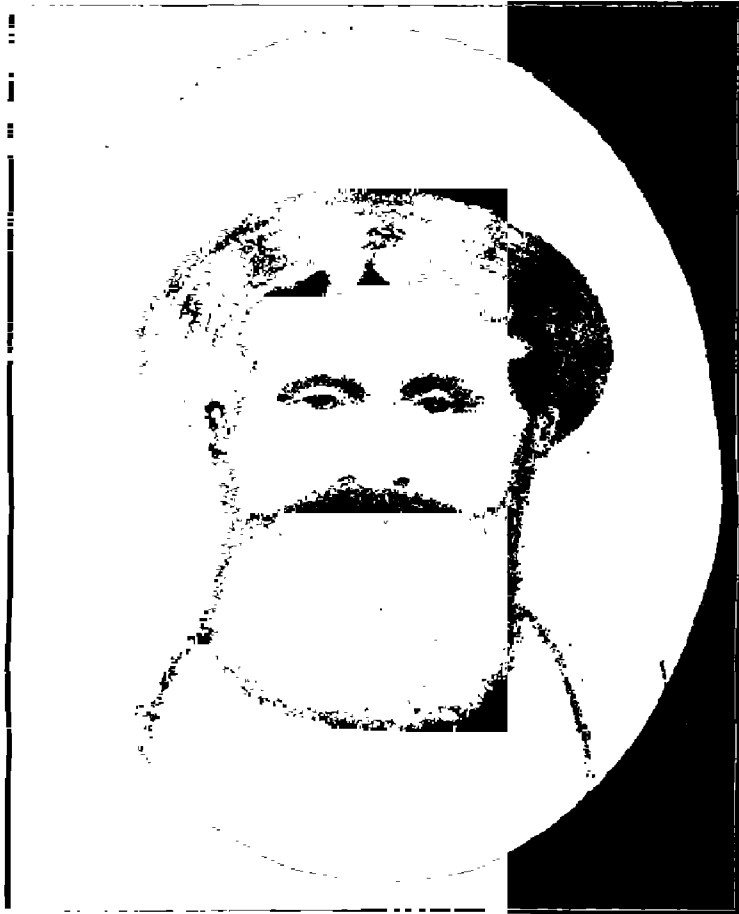
৺ সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সন্ন্যাসীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন এক মহাপুরুষ অন্নদা বাবুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি পুটুলী ও এক জোড়া কাষ্ঠ পাদুকা প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন, "তোমার ত্রিতল বাড়ীর ঈশান কোণে ইহা অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দিবে এবং ইহা তুমি কিংবা তোমার বংশধরগণ কখনও খুলিয়া দেখিবে না। যতদিন ইহা তোমাদের বাড়ীতে থাকিবে ততদিন তোমার গৃহে কখনও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে না।" মহাপুরুষের এই কথা শুনিয়া অন্নদা বাবু বলিলেন যে, প্রভু আমার বাড়ীতে সামান্য কুঁড়ে ঘর ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, আমি ত্রিতল বাড়ী কোথায় পাইব? তাহা শুনিয়া সাধু মাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঘটনার পর হইতে অন্নদা বাবুর এত অধিক আয় হইতে আরম্ভ হইল যে তিনি এক বৎসরের মধ্যে ত্রিতল পাকা-বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া সাধু-প্রদত্ত সেই জিনিষ বাড়ীর ঈশান কোণে রাখিয়া দিলেন। অদ্যাবধি ইঁহাদের বাড়ীতে সেই জিনিষ অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। অন্নদা বাবু একজন প্রতিষ্ঠপন্ন মোক্তার ছিলেন। তাঁহার পুত্র সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। সারদা বাবু উকিল হওয়ায় অন্নদা বাবু ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সাধন ভজন করিতেন ও কিছুকাল পরে সংসারত্যাগী হইয়া কাশীবাসী হন।

সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। তিনি স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক লোক ছিলেন।

সারদাপ্রসাদ।

সারদাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ-বি এল কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, তবে সাধারণতঃ ইনি বৰ্দ্ধমান আদালতে ওকালতী করেন। ইনি সপ্তম মাসে ভূমিষ্ঠ হন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ইনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

জ্ঞানদাপ্রসাদ।

হন। জ্ঞানদা বাবু ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, নির্ভীক ও সদাচারী। তিনি অধিকাংশ সময় ধর্ম্মচর্চ্চায় ও সাধু সন্ন্যাসীর সহিত সদালাপে অতিবাহিত করেন। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। শুদ্ধাচারী ও নিরামিষ ভোজী, এমন কি তাঁহার পুত্রগণও আমিষ ভোজন করেন না।

সারদাপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার মানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। তৃতীয় পুত্র প্রমদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ পুত্র কমদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চম পুত্র নীরোদপ্রসাদ একজন চিকিৎসক ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। ষষ্ঠ পুত্র ক্ষেমদাপ্রসাদ গ্রাজুয়েট।

মানদাপ্রসাদ।

প্রমদা বাবু সর্ব্বসাধারণে পি, মুখার্জ্জী নামে পরিচিত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান রাজ কলেজ হইতে তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ায় তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দিল্লীতে যাইয়া এম-এল লাইক এণ্ড ব্যানার্জ্জী কোম্পানীর অধীনে প্রধান এজেণ্ট রূপে কার্য্য করেন। তাহার পর উক্ত কোম্পানীর কারবার বন্ধ হইলে তিনি নিজেই ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সে ১৯১১ সালের কথা। তদবধি তিনি স্বাধীনভাবেই ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন। কিছুকাল প্রমদা বাবু দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মেম্বর ছিলেন। দিল্লীর প্রধান দেশীয় ক্লাব "ওরিয়েণ্টাল ক্লাবের" তিনি কিছুকাল সভ্য ছিলেন। গত দুই বৎসর যাবত তিনি পঞ্জাব চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত আছেন। দিল্লী মডার্ণ স্কুলের তিনি সভাপতি। দিল্লীতে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সভা আছে তিনি কয়েক বৎসর কাল তাহার সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি দিল্লীর নাট্যক্লাব, ও

প্রমদাপ্রসাদ।

শ্রীযুক্ত প্রমদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দিল্লীর শিল্পবিদ্যালয়ের সভাপতি। দিল্লীতে পশু ক্লেশ নিবারণ কল্পে যে সভা আছে ইনি তাহারও একজন সভ্য।

নিম্নে ইঁহাদের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল—
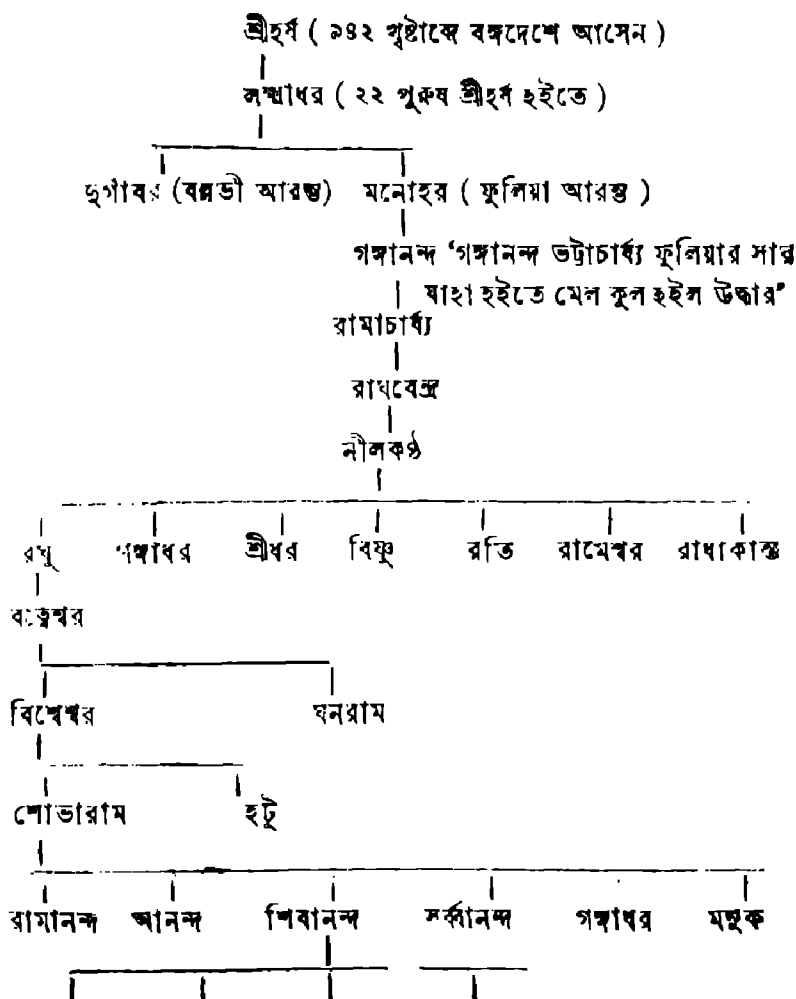
পঞ্চানন রামমোহন ব্রজমোহন রামপ্রসাদ
১মা স্ত্রী জগদম্বা ২য় স্ত্রী ভবসুন্দরী
শ্যামাপ্রসাদ
অন্নদাপ্রসাদ
চন্দ্রশেখর
রাধিকাপ্রসাদ
সারদাপ্রসাদ জন্ম সন ১২৫৪
(মৃত্যু সন ১৩১৫।১৮ই ভাদ্র)
জ্ঞানদা
মানদা
প্রমদা
কমদা
নীরদা
ক্ষেমদা
শুভদা
প্রাণদা শক্তিদা মুক্তিদা
জলদা যশোদা
শান্তিদা
প্রীতিদা
পারদা
খেমদা
রণদা
সন্ধীদা

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

। জমিদার
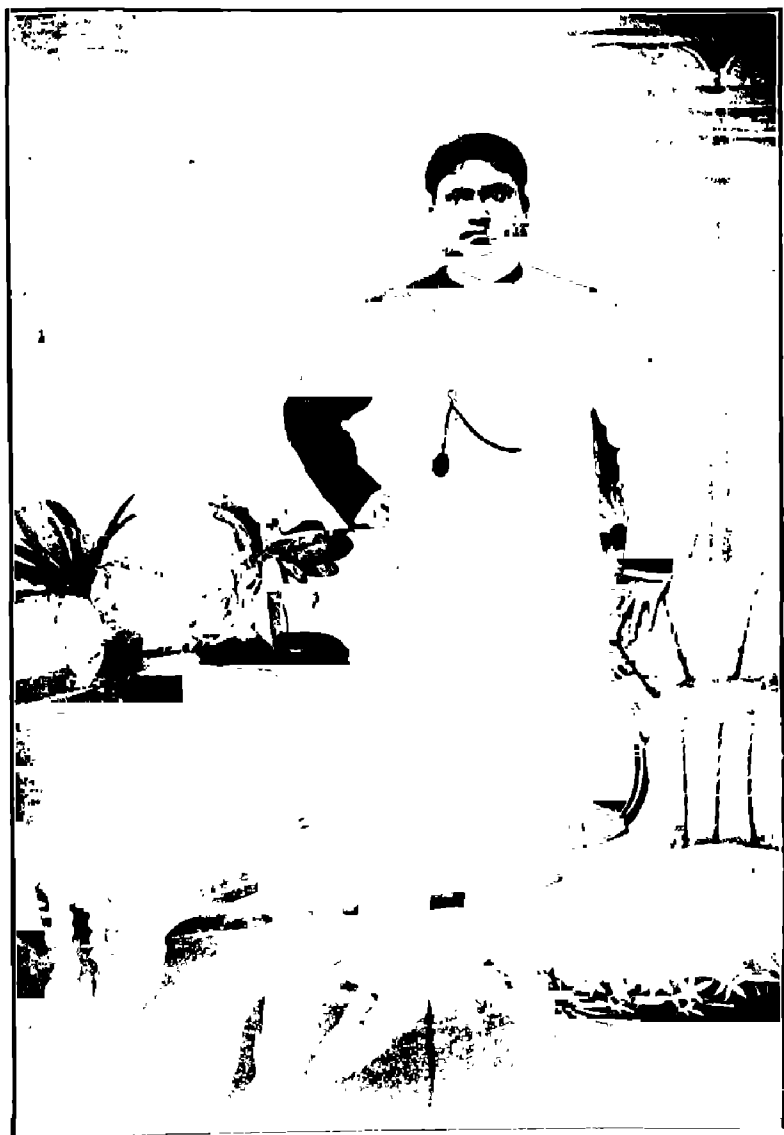
আছে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ হুগলী জেলার কামারগাছি থানার অধীন দাদপুর নামক গ্রামে প্রাচীন মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা ৺কামদেব পণ্ডিতের সন্তান; খড়দহ মেলের নৈকষ্য কুলীন। ইঁহার প্রপিতামহ ৺দীননাথ মুখোপাধ্যায় ১২৬৪ সালে মুর্শিদাবাদে আসিয়া ক্রমে বহরমপুরের গোরাবাজার সহরে গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসবাস করিতে থাকেন। তিনি তেজারতি ব্যবসা করিয়া ক্রমে বহুধন উপার্জ্জন করিয়া মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় প্রভূত ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ইঁহার খুল্ল পিতামহ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর জজ আদালতের একজন প্রধান উকিল ছিলেন। তিনিও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গত ১৩২৯ সালের ২রা অগ্রহায়ণ তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

১২৯৪ সালের কার্ত্তিক মাসের শুভ ৺রাস পূর্ণিমার দিন বেহার গয়া সহরে মাতুলালয়ে দেবেন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতামহ ৺নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় সজ্জন, ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গয়া সহরে ইনকাম ট্যাক্স এসেসরের কাজ করিতেছিলেন। দেবেন্দ্র বাবুর মাতামহ ৺নিলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় বেলঘরিয়া নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার এইচ, সি মুখোপাধ্যায় আই, এম, এস সিভিল সার্জ্জনের ভগ্নি ৺কামিনীমণি দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি ধার্ম্মিকা ও পুণ্যবতী রমণী ছিলেন এবং অতি রূপবতী ও গুণবতী মহিলা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু শৈশবে তাঁহারই নিকট গয়াতে মানুষ হইয়াছিলেন। উত্তরপাড়ার জমিদার ৺নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত এই বংশের নিকট সম্বন্ধ আছে।

দেবেন্দ্র বাবুর পিতা ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বহুদিন বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন ও অন্যান্য অনেক সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তিনি সংসারের আর্থিক উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অকালে ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন; তখন দেবেন্দ্র বাবুর বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। ইহার চারি মাস পরেই তাঁহার মাতৃদেবীও দুই পুত্র ও এক কন্যাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অতি পুণ্যবতী ও দানশীলা রমণী ছিলেন ও ধর্ম্মে মহা ভক্তিমতি ছিলেন।

দেবেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডন যান। সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস্ সি পাশ করিয়া বর্ত্তমানে চার্টার্ড একাউণ্টাণ্টসিপ পড়িতেছেন। ইঁহার একমাত্র ভগ্নীর সহিত দিনাজপুরের জমিদার সৈদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে।

দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ৺পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্রীর পৌত্রী। দেবেন্দ্র নাথও পিতার ন্যায় ভারতের বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বহু শাস্ত্র গ্রন্থও ইনি পাঠ করিয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবের সময় নিজে তন্ত্র ধারকের কার্য্য করেন। এই বংশ মুর্শিদাবাদ জেলায় আসার পর হইতে ৺দুর্গা পূজা ইঁহাদের বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিল, দেবেন্দ্র বাবুই পুনরায় ৺মায়ের পূজা ৺কাশীধামে আরম্ভ করিয়াছেন। বৃন্দাবনের রাধাবাগে গুরুর আশ্রমে ইনি ৺লক্ষ্মী নারায়ণ ও ৺কাত্যায়নী জিউর মন্দির-অভ্যন্তর বহু অর্থব্যয়ে মর্ম্মর মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। ইনি হরিদ্বার কন্খলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা আশ্রমে বার্ষিক অনেক টাকা

অনাথ আতুরদের সেবার জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। ইনি গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ও গত চারি বৎসর সদর বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্, জেলা কৃষি সমিতির সভ্য, স্থানীয় থিওসফিকাল সোসাইটীর সেক্রেটারী ও বহু জন-হিতকর কার্য্য সুখ্যাতির সহিত করিয়া আসিতেছেন।

দেবেন্দ্র বাবুর পিতামহ ৺নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় সেরেস্তাদারের কার্য্য করিতেন। তিনি দানশীল, ধার্ম্মিক ও পরোপকারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সরিকগণ ইঁহাকে পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি চ্যুত করিতে বিশেষ চেষ্টা পায়। কিন্তু হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ৺ সারদা চরণ মিত্র ও দেবেন্দ্র বাবুর শ্বশুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সরিকগণের কবল হইতে ইঁহাদের পৈতৃক বিষয় ও টাকাকড়ি উদ্ধার করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু আপন ক্ষমতা বলে পৈতৃক সম্পত্তির বিশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন ও বৈষয়িক কার্য্যে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিলেও ইনি অবসর পাইলেই স্বায়ং সন্ধ্যা, আহ্নিক, তপঃ, জপঃ ভগবদারাধনাতেই অতিবাহিত করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের হুগলীর বাটীতে যে ৺ রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা ছিল, দেবেন্দ্র বাবুই তাহা নিজবাটিতে আনয়ন করেন এবং সেই অবধি নিয়মিত ভাবে বিগ্রহের পূজা অর্চ্চন হইতেছে। সন ১৩২২ সালে হরিদ্বারের কুম্ভ মেলায় শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী কেশবানন্দ স্বামীজী তাঁহার ধর্ম্মভাব দেখিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহাকে দীক্ষা দেন। দেবেন বাবুর একটি পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রটির নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ।

৺ভবনাথ সেনের বংশধর
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন যে বংশের বর্ত্তমান অগ্রণী সেই বংশের আদিপুরুষের নাম কিঙ্কর সেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে যিনি বর্গীর হাঙ্গামা দূর করিয়াছিলেন সেই নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কিঙ্কর সেনকে চন্দননগরে একখণ্ড ভূমি জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারই উপর তিনি একটী গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই গড় যেখানে অবস্থিত ছিল সেইখানে পরে বাবু কানাইলাল খাঁ বিরাট সৌধ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। এখনও লোকে ইহাকে কিঙ্কর সেনের গড় বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কিঙ্কর সেনের পত্নী কতিপয় জলাশয় খনন করিয়া সেগুলি দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চন্দননগরের অন্তঃপাতী নেড়েরবন গ্রামে কিঙ্কর সেন কালীমন্দির তৈয়ারী করেন এবং কিছু দেবোত্তর সম্পত্তিসহ সেগুলি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করেন; কথা থাকে যে, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে দেবীর সেবা হইবে। কালক্রমে এই মন্দির বিনষ্টপ্রায় হইলে চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণর প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের পিতৃব্য বাবু ব্রজনাথ সেন এবং তাঁহার পিতা বাবু ভবনাথ সেন মহাশয়দিগকে এই মন্দিরের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য হুকুম জারী করেন। কিন্তু মন্দিরের সেবক ব্রাহ্মণ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, এই মন্দিরের মালিক আমরা; স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর সেন ইহা আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। কাজেই রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ মন্দির-সংস্কারে অভিলাষী হইলেও তাহা করিতে পারেন নাই।

রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের 'শব্দ কল্পদ্রুমে' কিঙ্কর সেনের

শ্রীযুত প্রিয়নাথ সেন, শ্রীযুত মনিলাল সেন, শ্রীযুত মন্মথনাথ সেন,
শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেন, শ্রীযুত চণ্ডিচরণ সেন, শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র সেন,
শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুত জীবন ধন সেন প্রভৃতি—

নাম প্রথম গোষ্ঠীপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালার কুলীন কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভুরিভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং ভোজনান্তে মর্য্যাদা-স্বরূপ সোণার মোহর দক্ষিণা দিয়াছিলেন। গোষ্ঠীপতি বলিলে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের প্রধান ব্যক্তিকে বুঝায়। সামাজিক সম্মিলনে বা অনুষ্ঠানাদিতে গোষ্ঠীপতি বা তাঁহার বংশধর উপস্থিত হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে সম্মানস্বরূপ মাল্যচন্দন প্রাপ্ত হন। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি বিশেষ মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন।

কিঙ্কর সেনের পৌত্রের নাম গঙ্গাচরণ সেন। ইনি চন্দননগরের গড়েই বাস করিতেন। ইঁহাকে দিল্লীর বাদশাহ—"পঞ্চ হাজারী" বা পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈনিকের অধিনায়ক হইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। ক্লাইভ ও অ্যাডমিরেল ওয়াটসন চন্দননগর অবরোধ করিবার অল্পদিন পূর্ব্বেই তিনি পঞ্চ হাজারীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সময়ে ইঁহারা চন্দননগর অবরোধ করেন সেই সময়ে গঙ্গাচরণ সেন ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ করিবার কারণ তিনি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রজা ছিলেন। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন অবস্থায় ইংরাজের গুলিতে তিনি নিহত হন। গঙ্গাচরণ সেন বিপত্নীক ছিলেন। তিনি দুইটি শিশুপুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোকুলচন্দ্র সেনের বয়স এগার বৎসর এবং কনিষ্ঠ গোপীচন্দ্রের বয়স নয় বৎসর ছিল। ইঁহাদিগের পিতৃগুরু ইঁহাদিগকে কিঙ্কর সেনের গড় হইতে গোপনে বাহির করিয়া লইয়া যান এবং চন্দননগর হইতে গঙ্গাপার হইয়া শিশুদ্বয়কে লইয়া ভাটপাড়ায় আশ্রয় লন। পুত্রদ্বয় পলায়ন করিবার পর বিজয়ী ইংরাজ সৈন্য কিঙ্কর সেনের গড় লুণ্ঠন করিয়াছিল। গুরু ভাটপাড়ায় নিজ-বাটীতে এই দুইটি বালককে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। ফরাসী ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টে সন্ধি হইবার পর জ্যেষ্ঠ গোকুল সেন

ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে নিমক মহলের দেওয়ান নিযুক্ত হন। গোকুলচন্দ্র সেন চন্দননগর হইতে কিছুদিন কোন্নগরে বাস করেন এবং তাহার পর বারাকপুরের নিকটবর্ত্তী সুখচরে বসবাস স্থাপন করেন। গোকুলচন্দ্র সেনের ছয় পুত্র। এই ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র মহেশ চন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র হরচন্দ্র সেনের ও কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্র সন্তান হইয়াছিল। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেশচন্দ্র সেনের একটি বিধবা কন্যা ছিল তাহার নাম বগলা; আর পুত্রের নাম সিদ্ধেশ্বর, উভয়েই নিঃসন্তান ছিলেন। গোকুলচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ পুত্রের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল; পুত্রের নাম লক্ষ্মণ সেন এবং কন্যার নাম শ্যামা। এই কন্যাটির বিবাহ হইয়াছিল বাগ-বাজারের প্রসিদ্ধ ধনী বসু বংশে; সেই বংশেরই বংশধর পরলোকগত রায় নন্দলাল বসু ও পশুপতি বসু। হরচন্দ্র সেনের তিন পুত্র; প্রথমা পত্নীর গর্ভে রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন; ইনিই জ্যেষ্ঠ এবং ব্রজনাথ সেন ও ভবনাথ সেন—ইঁহারা দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত।

বসু পাড়ার বর্ত্তমান সেন-পরিবার ইঁহাদেরই বংশধর। প্রসিদ্ধ এটর্ণি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এক্ষণে এই বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন; তিনিই এক্ষণে পরিবারের কর্ত্তা।

রায় তারকনাথ সেন বাহাদুরের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রায় সত্যকিঙ্কর সেন বাহাদুর বর্দ্ধমানের সরকারী উকিল ছিলেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করার সময়ে ইনি বর্দ্ধমান রাজতরফের উকিল ছিলেন। রায় সত্যকিঙ্কর সেন বাহাদুরের একটি মাত্র পুত্র ছিল, তাহার নাম কালীকিঙ্কর সেন; তিনি পিতার জীবদ্দশায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। পুত্রশোকে

কাতর হইয়া রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সেন অল্পদিন পরেই লোকান্তরিত হন।

রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সেনের ভ্রাতা আশুতোষ সেন বি-এল বর্দ্ধমান রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন; ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

এই সেন-পরিবারের সম্পর্কে দুইটি প্রাচীন আখ্যায়িকা আছে, গল্পটি কিঙ্কর সেনের সম্বন্ধে। গল্পটি এই:—কিঙ্কর সেন যখন অত্যন্ত শিশু সেই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাতার হস্তেই তাঁহার ভরণপোষণের ভার অর্পিত হয়। কিঙ্কর সেনের জন্মভূমি চন্দননগর। তাঁহাদের অবস্থা একেবারে ভাল ছিল না। অতি ক্ষুদ্র কুটিরে তাঁহারা থাকিতেন। এত দরিদ্র অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও কিঙ্করের মাতা কিঙ্করকে সেকালের হিসাবে লেখাপড়া শিখাইতে বিরত হন নাই। তিনি চুঁচুড়ার এক পাঠশালায় কিঙ্করকে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। সেখান হইতে কিঙ্কর পার্শী ও উর্দ্দু ভাষা রীতিমত শিক্ষা করেন। কিঙ্কর সেনের প্রখর বুদ্ধি ও মেধা ছিল, সেজন্য অতি অল্পদিনেই এই ভাষায় তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার জন্মিয়াছিল। কিঙ্করের মাতা চরকায় সূতা কাটি-তেন। ইহা হইতে যে সামান্য আয় হইত, তাহাতেই মাতা ও পুত্রের কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। একদিন প্রাতঃকালে এক ধীবর রমণী মৎস্য বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। মাতা পুত্রের জন্য তাহার নিকট হইতে এক পয়সার মাছ কিনিলেন। ঘরে যে একটী মাত্র পয়সা ছিল এবং সেটী যে তিনি প্রাতঃস্নান হইতে ফিরিবার পথে জনৈক ভিক্ষুককে দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না। মাছ কিনিয়া তিনি লজ্জায় পড়িলেন এবং বলিলেন—"বাছা খানিক পরে এস, আমরা পয়সা দিব।" মাছগুলি রান্না হইল। কিঙ্কর সেন স্নান করিয়া আসিয়া ভাত খাইতে বসিয়াছেন, মাছগুলিও তাঁহার পাতে দেওয়া

হইয়াছে,এমন সময় সেই ধীবর রমণী উপস্থিত হইয়া মাছের দাম চাহিল। কিঙ্করের মাতা বলিলেন,—"বাছা কাল এসে পয়সা নিয়ে যাস্"। ধীবর রমণী বলিল; "কিগো বাছা একটা পয়সা দিতে পার না? তবে মাছ কিনলে কেন?" কিঙ্করের মাতা কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিলেন—"কেন বাছা রাগ করছিস, কাল আসিস পয়সা নিয়ে যাস"। ধীবর রমণী তখন আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল—"আর আমি আসতে টাসতে পারব না, রাঁধা হোক, আরাঁধা হোক, আমার মাছ আমাকে ফিরে দাও" কিঙ্কর সেন ইহা শুনিলেন। তিনি তখনও রান্না মাছ স্পর্শ করেন নাই। তিনি তখনই উঠিয়া ধীবর রমণীর নিকট সেই রান্না মাছ লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই লও বাছা তোমার মাছ; আমার মাকে আর লজ্জা দিও না।" কিঙ্করের মাতা মাছ রাঁধিয়াছিলেন বলিয়া আর দ্বিতীয় তরকারী রান্না করেন নাই। তিনি পুত্রকে মাছ ফিরাইয়া দিতে উদ্যত দেখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ধীবর রমণী কটুভাষিণী ছিল বটে, কিন্তু একেবারে হৃদয়শূন্য ছিল না—সে মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্যাপার বুঝিতে পারিল এবং নিজেই ব্যথিত হইয়া মাছগুলি তাহাকে খাইতে অনুরোধ করিল এবং বলিল—"বাছা এই মাছগুলি তুমি খাও, এগুলি আমি তোমাকে দিয়াছি। তোমার মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'ল তাতে তুমি কাণ দাও কেন?"

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই কিঙ্কর সেন চাকুরীর চেষ্টা করিতেছিলেন। হুগলীতে বাঙ্গালার নবাবের একজন ফৌজদার থাকিতেন। তিনি ফৌজদারের দপ্তরখানায় চাকুরী পাইবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা তাঁহার মাতা জানিতে পারিয়া পুত্রকে হুগলীতে চাকরী লইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, "যদি চাকুরী করিতেই হয় তাহা হইলে বাবা এই গ্রামেই চাকরী কর, নহিলে তুমি বাটীতে বসিয়া থাক, ভাগ্যে যাহা হয় হইবে।" কিঙ্কর সেনও পরম মাতৃভক্ত

ছিলেন, মাতাকে একাকী ফেলিয়া কোথাও যাইতে মন চাহিত না। কিন্তু ধীবর রমণীর নিকট হইতে মৎস্তক্রয়ব্যাপারে মাতৃ-লাঞ্ছনায় কিঙ্কর সেন এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন করিয়াই হউক তিনি চাকরী যোগাড় করিবেন।

একদিন তিনি গোপনে বাটী হইতে পলায়ন করিলেন এবং সরাসরি হুগলীর ফৌজদারের দপ্তরখানায় উপস্থিত হইলেন। দরিদ্রের সন্তান তিনি, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁহার পরণে ছিল না, পায়ে এক জোড়া জুতা ছিল না। নগ্ন পদে মাত্র একখানি মলিন উত্তরীয় স্কন্ধে লইয়া যখন কিঙ্কর সেন ফৌজদারের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন তখন দ্বারপালেরা তাঁহার নিতান্ত দরিদ্রোচিত বেশভূষা দেখিয়া তাঁহাকে দপ্তরখানার ভিতর প্রবেশ করিতে দিল না। কিঙ্কর সেন নিরুপায় হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি পরিচ্ছদে দীন হইলে কি হইবে, তাঁহার সুগৌর কান্তি, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল নয়ন এবং ভদ্রজনোচিত আকৃতি যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতেছিল তাহা গোপন করিবার উপায় ছিল না; সকলের চক্ষুই একবার সেই ষোড়শ-বয়স্ক কিশোর কিঙ্কর সেনের উপর আকৃষ্ট হইতেছিল।

কিঙ্কর সেন অনাহারে সমস্ত দিন ফৌজদারের দপ্তরখানার দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময়ে এক বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক দপ্তরখানা হইতে বাহির হইবার কালে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ফৌজদারের প্রধান মন্ত্রী। তিনি দ্বারদেশে এক সুশ্রী তরুণ যুবককে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে, কি চাও?" কিঙ্কর উত্তর করিলেন—"আমি অতি দরিদ্র; গৃহে আমার মাতা আছেন, তাঁহার প্রতিপালনের ভার আমার উপর ন্যস্ত। কিন্তু এতই নিঃসম্বল আমি যে, নিজ মাতার প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। সেইজন্য চাকুরীর চেষ্টায় আসিয়াছি, দরিদ্র বলিয়া দ্বারবানেরা

আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। আমি উর্দ্দু ও পার্শী ভাষা জানি এবং আমার বিশ্বাস আমি সরকারের কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পারিব।" এই মুসলমান মন্ত্রী সম্পত্তিশালী কিন্তু নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি কিঙ্করের সুন্দর আকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ ও সহানুভূতি-প্রণোদিত হইলেন এবং কিঙ্করকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিলেন। প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাটীতে তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত হইল।

কিছুদিন পরে এই মুসলমান ভদ্রলোকের অনুগ্রহে ফৌজদারের দপ্তরখানায় কিঙ্কর সেনের একটী চাকুরী হইল ; তাঁহার বেতন মাসিক সাত টাকা। কিন্তু সর্ত্ত থাকিল এই যে, কিঙ্কর সেন পূর্ব্ববৎ ঐ মুসলমান ভদ্রলোকের বাটীতেই থাকিবেন এবং ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাটীতে মুসলমান ভদ্রলোকেরই ব্যয়ে আহার করিবেন। কিঙ্কর বেতনের প্রায় সমস্তই একজন লোক দিয়া তাঁহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন ; কিন্তু এই লোকটীর উপর তাহার আদেশ দেওয়া ছিল যে, সে ব্যক্তি তাঁহার মাতার নিকট কিঙ্করের ঠিকানা কিছুতেই বলিয়া দিবে না। কারণ কিঙ্কর জানিতেন মাতা তাঁহার ঠিকানা জানিতে পারিলে পাগলিনীর মত তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিবেন।

হুগলীর ফৌজদার মহাশয় কিঙ্করের কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহার মাসিক বেতন দশ টাকা করিয়া দিলেন। একটি পরগণার প্রজারা নবাব সরকারে খাজনা দিত না ; তাহারা গোঁয়ার ও দুর্দ্দান্ত ছিল। ফৌজদার মহাশয় সেই পরগণা জরীপ ও তথাকার খাজনার নূতন বন্দোবস্ত করিবার জন্য কিঙ্কর সেনকে পাঠাইয়া দিলেন। এই পরগণার রায়তেরা সিপাহী-বরকন্দাজ না যাইলে খাজনা দিত না। কিঙ্কর সেন নানা কৌশলে ইহাদিগের নিকট হইতে বর্দ্ধিত হারে খাজনা আদায় করিয়া নবাব সরকারে জমা দিলেন। ফৌজদার মহাশয়

তাঁহাকে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া এতই প্রীত হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স আঠার বৎসর মাত্র।

অতঃপর বাঙ্গালার নবাব, আলিবর্দ্দি খাঁর দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। নরোজা উপলক্ষে দিল্লীর বাদসাহের নিকট উপঢৌকন লইয়া যাইবার জন্য বাঙ্গালার নবাব বাহাদুর কিঙ্কর সেন ও তাঁহার চাকুরীদাতা ও উপকারক মুসলমান ভদ্রলোকটিকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিঙ্কর সেনের সহিত রক্ষী সৈন্য দেওয়া হইয়াছিল। তিনি নবাব-দত্ত উপঢৌকন লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে দিল্লী যাত্রা করেন। পথে মোগলসরাই নামক স্থানে কিঙ্কর সেন ও তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁবু ফেলিয়া রাত্রি যাপন করেন। রাত্রিতে নিকটবর্ত্তী আর একটি তাঁবু হইতে সুকণ্ঠ নিঃসৃত একটি সঙ্গীত কিঙ্কর সেন শুনিতে পাইলেন। নরোজার দিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণ সম্রাটের সম্মুখে গান গাইতে যাইতেন। কিঙ্কর সেন গান বুঝিতেন, এই গানটি শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইল যে, যিনি এরূপ গান গাহিতেছেন তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী। পরদিন সকালে তিনি অনুসন্ধান লইয়া জানিলেন যে, গত রাত্রিতে যিনি গান গাহিয়াছিলেন তিনি একজন বাঙ্গালী বাইজি, নরোজার আসরে গান গাহিবার জন্য দিল্লী যাইতেছেন। কিঙ্কর সেন ইহা জানিতে পারিয়া সেই বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—"আমরা বাঙ্গালা নবাবের প্রতিনিধি; তাঁহারই উপহার লইয়া দিল্লীর বাদসাহের নিকট যাইতেছি; আমাদের সহিত রক্ষা সৈন্য আছে, তুমি স্ত্রীলোক; পথঘাটে বিপদ-আপদ আছে; তুমি ইচ্ছা কর ত আমাদের সঙ্গে যাইতে পার।"

বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণ সদলবলে যথাসময়ে দিল্লীতে পৌছিলেন;

তাঁহাদের সহিত সেই বাঙ্গালী গায়িকাও তথায় পৌঁছিল। ইঁহাদের সকলকেই সসম্মানে বাঙ্গালার নিমন্ত্রিতগণের জন্য নির্দিষ্ট শিবিরে থাকিবার স্থান দেওয়া হইল।

নরোজার দিন বাঙ্গালার নবাবের উপঢৌকন নবাবের প্রতিনিধিগণ বাদসাহকে প্রদান করিলেন। তিনি উপঢৌকন দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। বাঙ্গালী গায়িকার সঙ্গীত শুনিয়া বাদসাহ এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহাকে জায়গীর প্রদান করিলেন। জায়গীর-দানপত্রে সম্রাটের পাঞ্জা মুদ্রিত ছিল।

গায়িকা সম্রাটের নিকট উৎসাহ ও পুরস্কার লাভ করিল। অতঃপর যাহার সাহায্যে সে এত সহজে নরোজার আসরে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল, সেই কিঙ্কর সেনকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত, এ কথা তাহার মনে পড়িল। জায়গীরের দানপত্রখানি পাইয়া সে কিঙ্কর সেনের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, দলিলে "দস্ত বদস্ত" অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে এই কথাটী লেখা নাই। কিঙ্কর সেন দানপত্রখানি কাঁচা মনে করিয়া অন্যমনস্কভাবে ঐ কথাটী বসাইয়া দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই এই ব্যাপার বাদসাহের কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিলেন বাঙ্গালার নবাব সরকারের একজন লোক বাদসাহের দানপত্র সংশোধন করিয়াছেন। তখনই বাদসাহের নিকট তাঁহার তলব হইল। কিঙ্কর সেন বাদসাহের দানপত্রে যে ভুল ছিল ইহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, বাদসাহ যখন গায়িকা ও তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে জায়গীর দান করিয়াছেন, তখন "পুরুষানুক্রমে" এই কথাটী দানপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকা উচিত। বাদসাহ কিঙ্কর সেনের এই সংশোধন যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন এবং তিনি যেরূপ সংশোধন করিয়াছেন তদনুসারে ভবিষ্যতে দানপত্র লিখিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর বাদসাহ কিঙ্কর সেনকে বলিলেন "আপনি দিল্লীতে থাকুন, আমার

দপ্তরখানার দলিল-দস্তাবেজের মুসাবিদার সময় আপনার পরামর্শ আবশ্যক হইবে। আমি আপনাকে চাই।" কিঙ্কর সেন সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"জাঁহাপনা! আমার মাতাঠাকুরাণী যদি দিল্লীতে আসিতে সম্মত হন, তাহা হইলে এ কর্ম্ম গ্রহণে আমার কোন বাধা থাকে না। তবে আমাকে যদি অভয় দেন তবে বলি—আমার বাঙ্গালায় থাকিতেই ভাল লাগে।"

এই সময় হুগলির ফৌজদার পরলোক গমন করিলেন; হুগলির ফৌজদারের পদ শূন্য হইল। এই খবর বাদসাহের কর্ণগোচর হইল। তিনি কিঙ্কর সেনের যোগ্যতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে হুগলির ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে যতদূর সম্ভব শীঘ্র হুগলিতে রওনা হইতে বলিলেন। তাঁহার যাইবার জন্য একটি আট দাঁড়যুক্ত নৌকা তাঁহাকে দেওয়া হইল। কিঙ্কর সেন দিল্লী হইতে বরাবর তাঁহার স্বগ্রাম চন্দননগরে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে তাঁহার মাতাকে সেই নৌকায় তুলিয়া লইয়া হুগলিতে পৌঁছিলেন।

হুগলির ফৌজদার-পদে কার্য্য করিবার পর তাঁহার আরও পদোন্নতি হইল; তিনি বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর প্রধান মন্ত্রী হইলেন। সেকালে কোন হিন্দুর ভাগ্যে এরূপ পদলাভ খুবই দুর্ল্লভ ছিল। কিঙ্কর সেন খাঁটি লোক ছিলেন, তাঁহার চরিত্রবল ও যোগ্যতা অসাধারণ ছিল, এই দুই গুণে তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে এতদূর উচ্চ অবস্থায় উঠিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব কিঙ্কর সেনকে বহু জায়গীর ও ইনাম দান করিয়াছিলেন।

হরচন্দ্র সেন তখনকার কালের শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্টর বা ঠিকাদারী কাজে তাঁহার সুনাম ছিল। এই জন্য পুরাতন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের যে অংশ কলিকাতা হইতে দিল্লী অবধি বিস্তৃত সেই অংশ সর্ব্বদা সুসংস্কৃত রাখিবার ভার সরকার হইতে তাঁহার

উপর ন্যস্ত হইল। বাঙ্গালার ত্রিকোণমিতিক জরীপ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হরচন্দ্র সেন পাইকপাড়ায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর একটি এবং উহার সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে ঐ রাস্তারই উপর আর একটি মিনার বা ত্রিকোণমিতিক জরীপ-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুই মিনার হইতেই জরীপ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল ও উহা এখনও রহিয়াছে।

রাস্তার সংস্কারকার্য্য পরিদর্শনের জন্য একবার হরচন্দ্রকে গয়ায় যাইতে হইয়াছিল। এখানে অবস্থানকালে এক সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট একখানি পত্র লইয়া আসেন। পত্রে লেখা ছিল—তিনি কাশীতে গিয়া যেন এক মুমূর্ষু সন্ন্যাসীর সহিত দেখা করেন। এই সন্ন্যাসীর নাম গোপীচরণ সেন। ইনি গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হন। তাহার পর ভারতের তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিয়া কাশীধামে আসেন। এখানে আসিয়া তাঁহার ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র সেনের অর্থে দুর্গাবাড়ীর নিকটে একটী মঠ নির্ম্মাণ করেন। এই মঠ এক্ষণে ধ্বংস হইয়াছে; লোকে এখনও ইহাকে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর মঠ বলে।

হরচন্দ্র জানিতেন না যে, তাঁহার খুল্ল পিতামহ গোপীচন্দ্র সেন জীবিত আছেন, তথাপি তিনি পত্রপাঠমাত্র গয়া হইতে কাশী যাত্রা করিলেন। পত্রবাহক সন্ন্যাসী তাঁহাকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, এক সুদীর্ঘবপু বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তাঁহার চারিদিকে কয়েকজন সন্ন্যাসী বসিয়া কেহ বা ভগবানের নাম করিতেছেন, কেহ বা গান করিতেছেন।

খুল্লতাত হরচন্দ্র তাঁহার সন্ন্যাসী খুল্লপিতামহকে কখনও চক্ষে দেখেন নাই এবং তাঁহার পিতৃব্যও তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে হরচন্দ্র তাঁহার শয্যার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হরচন্দ্রের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। সে সস্নেহ আহ্বান

শুনিয়া মনে হইল যেন তিনি হরচন্দ্রকে বাল্যাবধি জানেন। তিনি হরচন্দ্রকে ধীরে ধীরে বলিলেন—"বৎস! একটি কথা তোমায় বলিয়া যাইতেছি। তোমার প্রথমা পত্নী যিনি কোন্নগরের মিত্র বংশের দুহিতা তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র-সন্তান হইবে, কিন্তু সে পুত্র নিঃসন্তান তোমার বংশ রক্ষা করিতে পারিবে না, অতএব বংশের ধারা রক্ষা করিবার জন্য তুমি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবে। তোমার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে যে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের দ্বারা বংশের ধারা রক্ষা পাইবে।" এই বলিয়া গোপীচন্দ্র হরচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার কয় মুহূর্ত্ত পরেই সন্ন্যাসীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বংশের মায়া ভুলিতে পারেন নাই। সেইজন্য বংশরক্ষার যে ইঙ্গিত তিনি দিব্যদৃষ্টিসাহায্যে লাভ করিয়াছিলেন, সেই ইঙ্গিত হরচন্দ্রকে তিনি দিয়া গিয়াছিলেন, কেবল তাহাই নহে তিনি হরচন্দ্রকে সে ইঙ্গিত কার্য্যে পরিণত করাইবার জন্য প্রতিশ্রুতিও করাইয়া লইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী গোপীচন্দ্রের মৃত্যু হইলে হরচন্দ্র তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন; তাহার পর তিনি তাঁহার স্বগ্রাম সুখচরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি পিতৃব্যের নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিবার জন্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ইহার দ্বিতীয়া পত্নী খড়দহের বসু-বংশীয়া। খড়দহের বসুরা খড়দহেরই প্রসিদ্ধ বিশ্বাস বংশের দৌহিত্র সন্তান। রায় বাহাদুর তারকনাথ সেন হরচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এবং ব্রহ্মনাথ সেন ও ভবনাথ সেন তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রায় বাহাদুর তারকনাথ সেনের পুত্রগণের সন্তান তাঁহাদের আগে গত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বংশের কেহ নাই। এক্ষণে ব্রহ্মনাথ সেন

ও ভবনাথ সেনের পুত্র-পৌত্রাদি কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে বাস করিতেছেন। বাগবাজারের সেন বংশ বলিলেই ইদানীং ইঁহাদিগকেই বুঝায়। এই সেন বংশের আদি নিবাস বারাসাতের নিকট দে গঙ্গা গ্রামে; ইহার এক শাখা সিমলা কাঁশারীপাড়া অঞ্চলে রাজচন্দ্র সেনের লেনে বাস করিতেছেন। এই বংশের শ্রীযুক্ত অটল কুমার সেনের নাম সুপরিচিত। এই সেন বংশের জনৈক বংশধর শোভাবাজারের নিকট বাস করায় তাঁহার নামে নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট আছে। বর্ত্তমান সেন বংশের উপরিউক্ত বিবরণ হইতে সহজেই বুঝা যায়, সম্ভ্রমে, মর্য্যাদায় এবং প্রাচীনত্বে সেন-পরিবার সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ কায়স্থ সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্য ও সম্মান ইতিহাসে বিখ্যাত।

ভবনাথ সেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে অশীতিবর্ষ বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। তিনি নির্ম্মল চরিত্র ও পরোপকারী ছিলেন। কলিকাতার কায়স্থ সমাজে তাঁহার সম্ভ্রম যথেষ্টই ছিল; এমন কি তাঁহাকে কায়স্থ সমাজের অন্যতম অগ্রণী বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। মৃত্যুকালে ভবনাথ পুত্র-পৌত্রে, দুহিতা-দৌহিত্রে এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিতে প্রায় দুই শত বংশের প্রদীপ রাখিয়া যান। প্রাচীন হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ ভবনাথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মনাথ ও ভবনাথের পুত্রগণ সমাজে সুপরিচিত। কায়স্থ সমাজে তাঁহাদের প্রভূত মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি। ইঁহারা পূর্ব্বপুরুষের গৌরব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

সেন-পরিবারের বংশ-তালিকা।
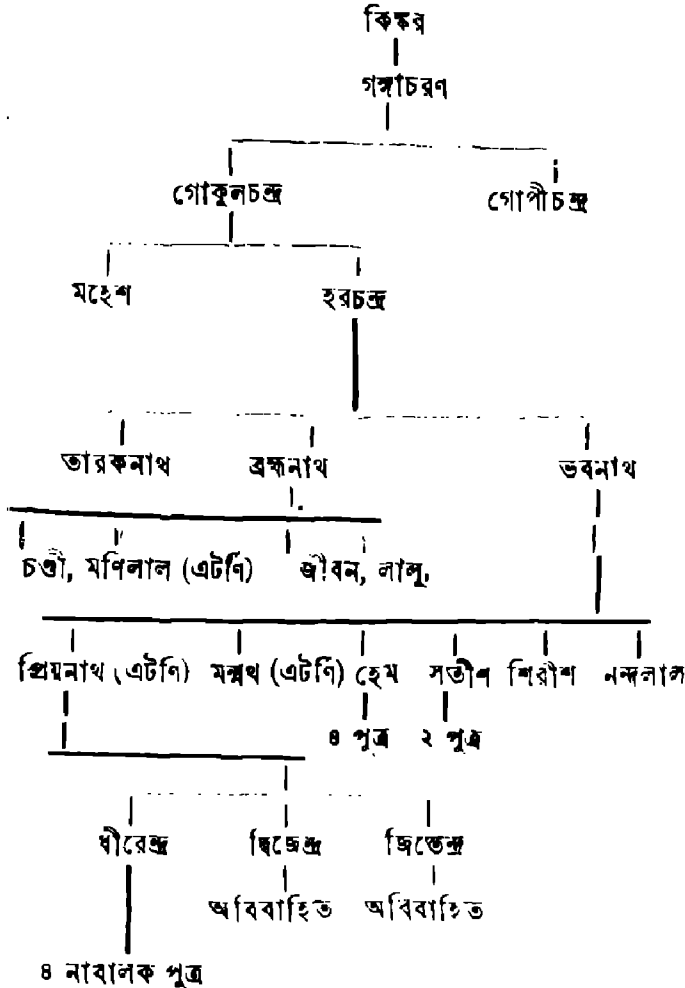
দিনাজপুর রাজবংশ।

দিনাজপুর রাজবংশ।

১৬২ বঙ্গাব্দ ১৫ই ফাল্গুন কোলাখণ্ড প্রদেশ হইতে গৌড়াধিপ জয়ন্তের (আদিশূরের) পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসেন। পাঁচজন কায়স্থও তাঁহাদের সঙ্গে আসেন। এই পঞ্চ কায়স্থের একজনের নাম সোম ঘোষ, এবং আর একজনের নাম দেব দত্ত।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দত্তবাটী গ্রামে দেবদত্ত এবং জয়জান গ্রামে সোম ঘোষ বাস করেন। সোম ঘোষ বঙ্গেশ্বর, আদিশূরের একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার অন্তর্গত ডিহি জয়জান, ডিহি পাঁচতোপী, ডিহি হস্তিনাপুর, ডিহি একচক্রি প্রভৃতি ২২৮ খানি গ্রামের উপর সোম ঘোষের আধিপত্য ছিল।

দেবদত্তের বংশোদ্ভব বিষ্ণুদত্ত বঙ্গের সুবাদার কর্ত্তৃক কানুনগো-পদে নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুরে আসিয়া বসতি করেন ও কিছু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। বিষ্ণুদত্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীমন্ত দত্ত পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি করেন। চতুরা গ্রামের সম্যক সম্পত্তি বিধান ও পরিচালন জন্য ইঁনি "চতুর্ধারীণ" বা চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্ত চৌধুরীর এক পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও এক কন্যা গৌরী। সোমেশ্বর ঘোষ হইতে দ্বাবিংশ পুরুষ হরিরাম ঘোষের সহিত গৌরীর বিবাহ হয়। শ্বশুরের আগ্রহাতিশয়ে হরিরাম দিনাজপুরে বাস করিতে থাকেন। গৌরীর গর্ভে হরিরামের ঔরসে শুকদেব ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীমন্ত চৌধুরীর মৃত্যুর পর হরিশ্চন্দ্র পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া তৎপরিচালনের ভার ভাগিনেয় শুকদেবের উপর ন্যস্ত করেন। হঠাৎ অপুত্রক অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। শুকদেব ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার রাজকোষে দেয় কর সময়মত দিতে থাকায় সুবাদার ও তাঁহার অমাত্যবর্গের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং সুবাদার সাহসুজার দত্ত মাতুলের সম্পত্তি ভোগাধিকারের ফরমান্ তিনিই পাইলেন। (১৬৪৪ খৃঃ অঃ) ২০টি পরগণা শুকদেবের শাসনাধীনে আসিয়াছিল।

"The northern and central part of the estate inherited by Sukdeb was in Akbar Sarkar the westarn in Sarkar Tajpur and Bunshihari and part of Gangarampur in Sarkar Jenotabad. Besides this much of his northern part of the District of Malda including the old city of that name belonged to the estate." (West macott's articles on Dinajpur Raj published in the Calcutta review.)

এই সময় দিনাজপুর অঞ্চলের কয়েকটি পরগণা অশাসিত হইয়া উঠায় দিল্লীশ্বর সেগুলি শুকদেবের শাসনাধীন করিয়া দেন। বিস্তীর্ণ ভূভাগ শাসনে ও পালনে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া মুসলমান শাসন কর্ত্তাগণ শুকদেবকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজা গণেশ খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালায় স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র যদু (জেলাল উদ্দীন) ও পৌত্র সামসউদ্দীন (আহম্মদ শাহ্) প্রায় ৪০ বৎসরকাল এই স্বাধীনতা ভোগ করেন। ই, বি, রেলওয়ের রায়গঞ্জ ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল উত্তরে কমলাবাড়ী নামক স্থানে ইঁহাদের রাজধানী ছিল।

তৎপর হিন্দু বংশধরগণ বাঙ্গালার সুবাদারের অধীনে দিনাজপুর অঞ্চলে সুবৃহৎ ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। শ্রীমন্ত চৌধুরীর সময় রাজা কাশী এই সম্পত্তি ভোগ করিতেন। তীব্র বৈরাগ্যপ্রযুক্ত ইনি শ্রীমন্ত চৌধুরীকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন; কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার নিকট বাস করিতে থাকেন। কাশীর সম্পত্তির মধ্যে হাবেলি পাঁজরা প্রধান ছিল, এই কারণে সমগ্র দিনাজপুররাজ বহু দিন ধরিয়া হাবেলি পাঁজরা নামে পরিচিত ছিল। রাজধানীতে এই সন্ন্যাসীর সমাধি আছে ও তাহা রীতিমত পূজিত হইয়া আসিতেছে।

বৃত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসতি প্রদান, চতুষ্পাঠী ও অন্নসত্র স্থাপন, জলাশয় খনন প্রভৃতি কার্য্যে শুকদেবের অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। রাজধানীর সন্নিকটে পূর্ব্বদিকে শুকসাগর নামে বৃহৎ দীর্ঘিকা তিনি খনন করাইয়া উৎসর্গ করেন।

শুকদেবের দুই পত্নী। প্রথমার গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে দুই পুত্র ও দ্বিতীয়ার গর্ভে প্রাণনাথ নামে এক পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেবের বাল্যকালে মৃত্যু হয়, একারণ শুকদেবের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পুত্র জয়দেব রাজা হন। প্রায় ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় জয়দেবের মৃত্যু হইলে সর্ব্ব কনিষ্ঠ প্রাণনাথ পিতৃ রাজ্যে অভিষিক্ত হন।

সরকার ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা রাঘবেন্দ্র প্রজাপীড়ক ও উশৃঙ্খল হওয়ায় বাঙ্গালার সুবাদার আজিমোশন শুকদেবকে উহা নিজ অধীনে আনিতে আদেশ করেন। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শুক-দেবের মৃত্যু হয়। তৎপর এই কার্য্যের জন্য দিল্লীশ্বরের মোহরাঙ্কিত নিদেশপত্র জয়দেব প্রাপ্ত হন। জয়দেব ঘোড়াঘাট স্ববশে আনিতে পারেন নাই, কিন্তু নিদেশপত্রের মর্ম্মানুসারে রাঘবেন্দ্রের দেয় কর

তাঁহাকে দিতে হইত। প্রাণনাথ রাজা হইয়া রাঘবেন্দ্রের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। তখন রাঘবেন্দ্র ঘোড়াঘাটের নয় আনা অংশ দিয়া প্রাণনাথের সহিত সন্ধি করেন।

এই মনোরাগে রাঘবেন্দ্র দিল্লীশ্বর আলমগীরের (ঔরঙ্গজেবের) নিকট প্রাণনাথের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সদুত্তর দিবার জন্য দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া প্রাণনাথ ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী যান। উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা অভিযোগগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় সন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহ প্রাণনাথকে "মহারাজা বাহাদুর" ও "বাদশাহের উকীল" উপাধি প্রদান করেন।

দিল্লী যাইবার পথে শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা স্নান সময়ে প্রাণনাথ প্রথমে একটি ধাতুময়ী দেবী মূর্ত্তি ও তৎপর একটি মণিময় দেব মূর্ত্তি জল মধ্যে প্রাপ্ত হন। রাজধানী ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরুক্মিণী কান্ত নামে এই যুগল মূর্ত্তি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরুক্মিণীকান্তই কান্তজি নামে সুপরিচিত। রাজধানী হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে উত্তর গোগৃহ নামে প্রসিদ্ধ স্থানে মহারাজা প্রাণনাথ শ্রীকান্তের মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। এই বিখ্যাত মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য তিনি সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। মহারাজা রামনাথ ইহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, এতদ্ব্যতীত শ্রীকালিয়াজিউর সেবা স্থাপন ও তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ; ঘোড়াঘাটে রসিকরায়জীউর মন্দির নির্ম্মাণ; শুকসাগরতীরে শুকেশ শিব স্থাপন; দিনাজপুর সহর হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ যাইবার রাজপথ পার্শ্বে প্রাণসাগর নামক দীর্ঘিকা খনন ও তদুত্তর তটে শিব স্থাপন; বহু দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর ও মহলান ভূমিদান প্রভৃতি মহারাজা প্রাণনাথের কীর্ত্তি। শুকসাগরের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া প্রাণনাথ বিমাতার দ্বারা উৎসর্গ করান। ইহার নাম মাতাসাগর।

কাটানগরের শ্রীশ্রীকান্তজীউর মন্দির
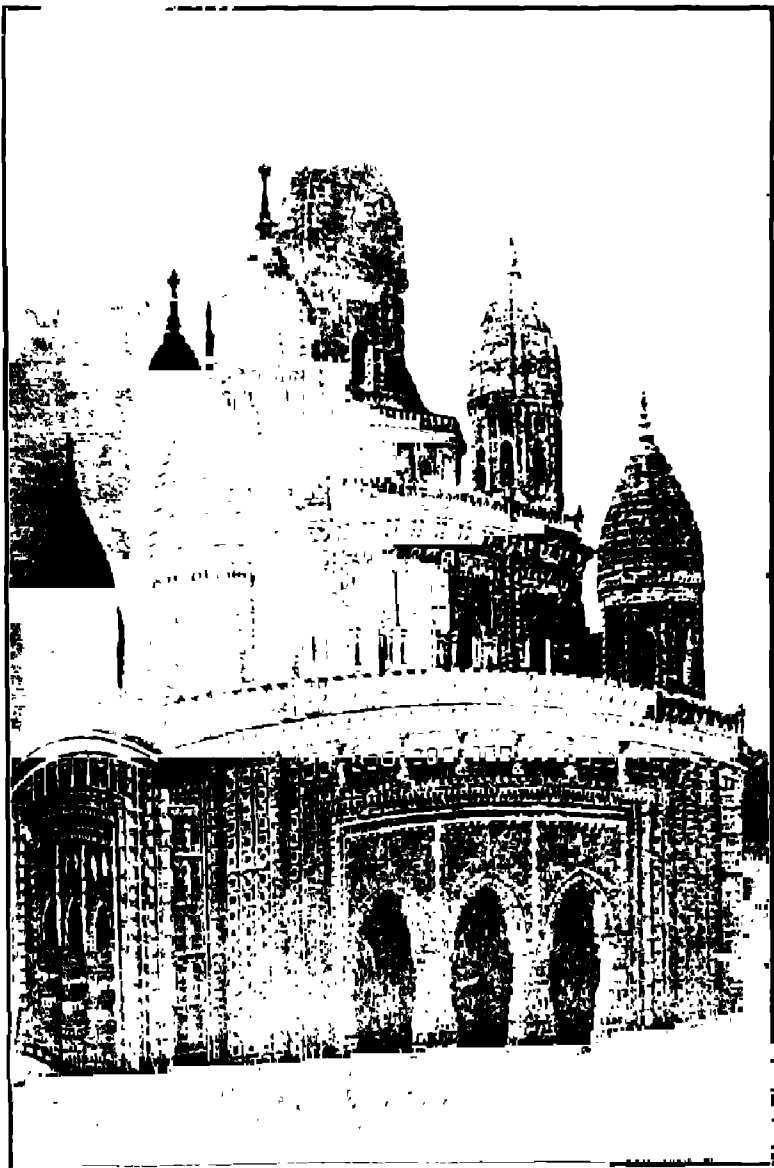
শোভা সিংএর বিদ্রোহ দমন করিতে তৎকালীন বাঙ্গালার সুবাদার আজিমোশনকে ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণনাথের মৃত্যু হয়। ১১২ পরগণা তাঁহার শাসনাধীনে ছিল।

মহারাজ প্রাণনাথের দত্তক পুত্র রামনাথ, সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁকে ৭২১৪৫০৲ টাকা নজর দিয়া রাজগদিতে আসীন হন। ইনি বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্থির, ধীর ও নীতিজ্ঞ রাজা ছিলেন এবং সৈন্য বল বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। ইনি একজন বীরপুরুষ ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে স্বয়ং সৈন্য পরিচালন করিতেন। ইঁহার ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র ও বর্ম্ম রাজধানীতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

মহারাজ রামনাথের শৌর্য্যবীর্য্য রণপাণ্ডিত্যাদিগুণে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে অনেকগুলি তোপ ও বন্দুক দিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান থানাপতিরাম, পত্নীতলা ও গঙ্গারামপুর মহলের তিনখানি ফরমান্ দ্বারা তাহার শাসনাধীন করিয়া দেন।

শালবাড়ী পরগণার শাসনকর্ত্তা প্রজাপীড়ক হইয়া উঠায় ও রাজ-কোষে দেয় কর দিতে শৈথিল্য করায় পরগণাটি নিজ শাসনাধীনে আনি-বার জন্য রামনাথ আদিষ্ট হন। উক্ত শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তিনি প্রথমবার অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু বিপুল আয়ো-জন করিয়া দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে রামনাথ তাঁহাকে পরাস্ত করেন ও শাল-বাড়ী নিজ অধিকারে লইয়া আইসেন, ২৫০টি তোপ এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই জয় লাভে সুবাদার এতদূর সন্তুষ্ট হন যে, তিনি করদহ পরগণা দিনাজপুর রাজ্যভুক্ত করিয়া দেন।

দৈবাদিষ্ট হইয়া বাণরাজের ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদ হইতে বহু সুবর্ণ-রজত মণিমুক্তাদি রামনাথ আহরণ করেন। কষ্টি পাথরের বড় বড় গেট, সুপ্রসিদ্ধ নীল গেট, প্রস্তর স্তম্ভাদি এই সঙ্গে আনীত হয়।

১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রামনাথ তীর্থযাত্রা করেন। গয়া, কাশী,

প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ করিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ মানসে তিনি দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হন। এক খাস দরবার করিয়া দিল্লীশ্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রামনাথের সহিত বঙ্গরাজ্য সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা করিয়া সদুত্তর লাভে এবং তৎকালিক রাজনীতি ক্ষেত্রে রমানাথের দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও প্রাধান্য অবগত হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে ছত্র, চামর প্রভৃতি রাজচিহ্নসহ বংশগত মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। দুর্গ রচনা করিতে ও শস্ত্রোপকরণসহ রীতিমত সৈন্য সংগ্রহ করিতেও উৎসাহ দেন। পূর্ব্ব হইতেই রামনাথ স্বাধীন ভূপতির ন্যায় অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতেছিলেন এবং বন্দীদের জন্য কারাগৃহও তাঁহার ছিল।

রামনাথ এইরূপ ভাবে রাজ্য পরিচালন করিতেছেন, এমন সময়ে রঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ সুশিক্ষিত বিপুল সৈন্যসহ দিনাজপুর আক্রমণ করিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া রামনাথ সপরিবারে দিনাজপুর হইতে ১৮ ক্রোশ উত্তরে গোবিন্দনগরে আশ্রয় লইলেন। ধনরত্ন লুটিয়া ফৌজদার চলিয়া গেলে রামনাথ অত্যাচার বৃত্তান্ত সুবাদারকে জানান ও তাঁহার আদেশ মত মুর্শিদাবাদ হইতে বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লন। সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা নিজ বাহিনীর পুষ্টিসাধন করতঃ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনপূর্ব্বক তিনি রঙ্গপুরে উপস্থিত হন। তুমুল যুদ্ধের পর ফৌজদার পরাজিত ও নিহত হইলেন। এই যুদ্ধকালে বাতাসন বড়বিল প্রভৃতি পাঁচ পরগণা দিনাজপুররাজের অধীনে আসে।

মহারাজ রামনাথ কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। কান্তজিউর মন্দির সপূর্ণ করণ ও তৎপ্রতিষ্ঠা এবং কাশীধামে শিব স্থাপন (১৭৪৫ খৃঃ) গোপালগঞ্জে মন্দির নির্ম্মাণ ও তৎপতিষ্ঠা, দিনাজপুর সহর মধ্যে কাঞ্চনীঘাটে মহিষমর্দ্দিনী মাতার মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা (১৭৪৬ খৃঃ);
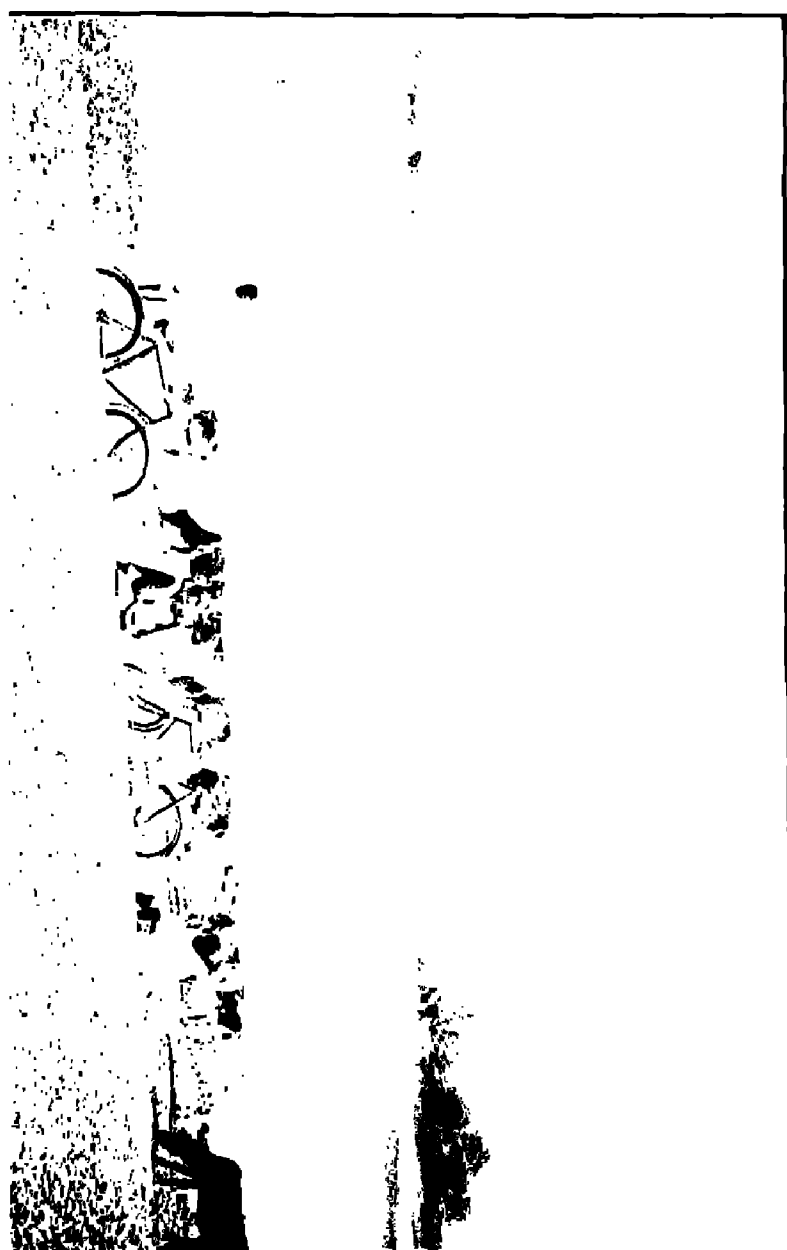
সুকেশ মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ; করদহগ্রামে গোপালজিউর মূর্ত্তি স্থাপন; মোহন বাগে রাধারমণজীউর সেবা প্রকাশ; মালদহ জেলার অন্তর্গত ভীমতৈড় গ্রামে গৌরীপতি শিব স্থাপন ও তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ; উক্ত জেলার রাজনগর গ্রামে রাধামাধবজিউর বিগ্রহ স্থাপন ও মন্দির নির্ম্মাণ; টাঙ্গান নদীর তীরবর্ত্তী গোবিন্দনগর হইতে পুনর্ভবা তীরবর্ত্তী প্রাণ নগর পর্য্যন্ত খাল খনন এবং দিনাজপুর সহরের দুই ক্রোশ দক্ষিণে রামসাগর নামক পুণ্য সলিলা সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন তাঁহার কীর্ত্তি; এই দীর্ঘিকার উত্তর তটে রামনাথ ৬ইদণ্ড কাল কল্পতরু হইয়াছিলেন। বর্গির হাঙ্গামার আশঙ্কায় তিনি নিজ রাজধানী পরিখা ও প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করেন। এই হাঙ্গামায় ভীত সর্ব্বশান্ত বহু লোককে তিনি অভয় ও আশ্রয় দেন এবং এতদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাগণের সাহায্যের জন্য দিল্লীর রাজকোষে সর্ব্ব প্রথমে প্রভূত অর্থ দান করেন, তজ্জন্য তিনি রাজধুরন্ধর উপাধি প্রাপ্ত হন।

রামনাথের ৪ পত্নী, ৪ কন্যা, ৪ পুত্র ও ৪ জামাতা ছিল। সংসারের প্রধানতঃ এই চারিরূপ বন্ধনের চতুর্গুণত্ব উপলব্ধি করিয়া রাজধানীর সকল দ্রব্য বিশেষতঃ যুদ্ধোপকরণ ও যোদ্ধৃবর্গের পরিচ্ছদে ৪ অঙ্ক অঙ্কিত হইত, তদবধি এই অঙ্কন প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে রামনাথের মৃত্যু হয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনাথ রাজ্য পান। পিতা বর্ত্তমানেই রূপনাথের মৃত্যু হইয়াছিল। ভ্রাতা বৈদ্যনাথ ও কান্তনাথকে অসূয়াপরবশ দেখিয়া কৃষ্ণনাথ দিল্লী গিয়া বাদশাহী সনন্দ আনয়ন করেন; কিন্তু আসিবার সময় করদহে জ্বর রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তদপরে বৈদ্যনাথ রাজগদিতে উপবেশন করেন।

এই সময়ে মিরকাশিম বাঙ্গালার সুবাদার। মহারাজ রামনাথের রাজকর বৃদ্ধি হইয়া, সাড়েবার লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়। মীরকাশিম সাড়ে

ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর ধার্য্য করিলেন। মহারাজ বৈদ্যনাথ এত অধিক কর দিতে অস্বীকৃত হন। মীরকাশিম এই জন্য বৈদ্যনাথকে মুঙ্গেরে আহ্বান করেন ও কেল্লায় তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। কান্তনাথ এই সুযোগে স্বয়ং রাজা হইবার চেষ্টা করেন। এদিকে মীরকাশিম বৃটিশদিগের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের নিকট গমন করিলে বৈদ্যনাথ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক দিনাজপুরে প্রত্যাগমন করেন ও খালিশা দপ্তরে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

১৭৬৯ খৃঃ অব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে মহারাজ বৈদ্যনাথ ক্ষুধিতকে মুক্ত হস্তে অন্নদান করিয়াছিলেন। মাতা সাগরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে একক্রোশ দূরে আনন্দসাগর নামে দীঘিকা খনন করিয়াই নিজ পত্নী মহারাণী আনন্দময়ীর (সরস্বতীর) দ্বারা উৎসর্গ করান। ইনি বহু ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ও পীরপাল ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষ-দত্ত ব্রহ্মোত্তরাদি অনুমোদন করিয়া নূতন সনন্দ দিয়াছিলেন।

মহারাজ বৈদ্যনাথ বাহাদুর ১৭৮০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। মহারাণী সরস্বতী ঐ বৎসর ১৭ই জুলাই তারিখে মহারাজ রাধানাথ বাহাদুরকে দত্তক গ্রহণ করেন। বাদশাহ শাহআলম মহারাজ বৈদ্যনাথের উত্তরাধিকারিত্ব ঘোষণা করিয়া এক সনন্দ দিয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সাহেব ৭৩০ স্বর্ণ মুদ্রা নজর লইয়া উক্ত সনন্দে নিজ স্বাক্ষর দিয়া উহা অনুমোদন করেন। এই সনন্দে দিনাজপুর রাজ্যের অন্তর্গত সরকার ও পরগণাগুলির উল্লেখ আছে।

মহারাজ রাধানাথের নাবালক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দেলওয়ারপুর নিবাসী রাজা দেবী সিং তৎকালীন দেয় করের উপর দুই লক্ষ টাকা বৃদ্ধি দিতে স্বীকার করায় দিনাজপুর রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। প্রজার প্রতি তাঁহার অত্যাচারের রোম-

সর্প-তোরণ দ্বার
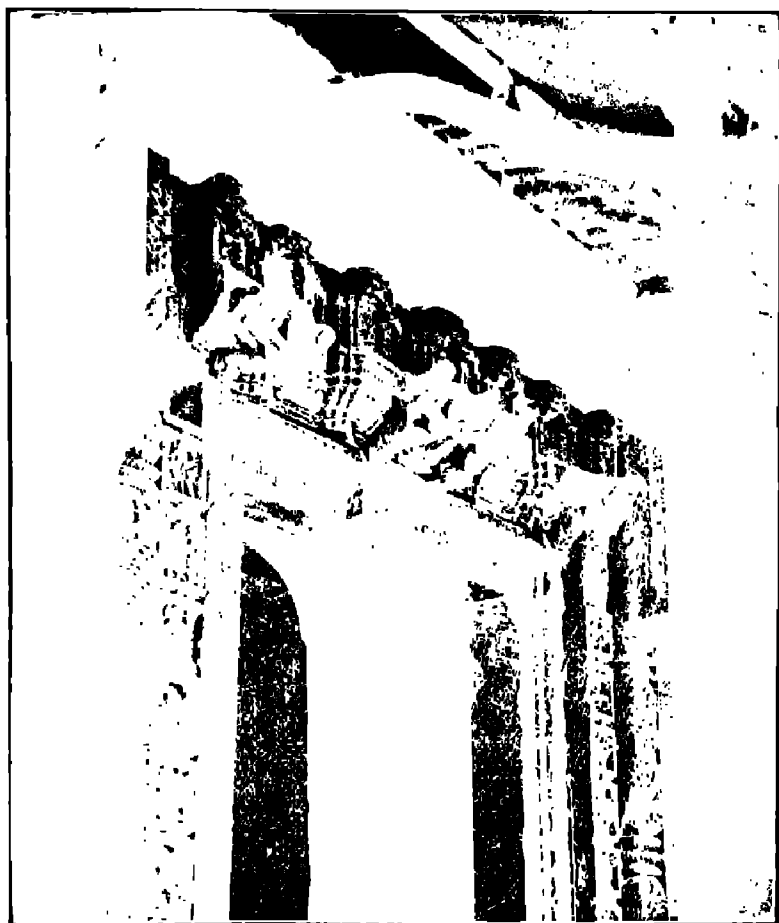
হর্ষণ কাহিনী মহামতি বার্ক সাহেব জলন্ত ভাষায় পৃথিবীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই আমলাগণ সহ দেবী সিং বন্দী হন এবং প্রায় নয় বৎসর কারাবাসের পর বৃটিশ রাজের ন্যায়-বিচারে দিনাজপুর জেলা হইতে চিরনির্ব্বাসিত হন।

অতঃপর রাজমাতুল জানকীরাম সিংহ রাজ্য পরিচালন করেন। দেবী সিংহের অমানুষিক অত্যাচারে দেশ জলিয়া গিয়াছিল। বহু প্রজা সর্ব্বস্বান্ত, বহু লোক ধন মান রক্ষার জন্য হয় মৃত, না হয় বিদেশ গত হইয়াছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এইরূপে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হওয়ায় বাধ্য হইয়া জানকীরাম বহু মহল কম খেরাজে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রাজ্যের আয় এই প্রকারে হ্রাস হইলেও সুসময়ের আশায় জানকীরাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহারাজগণের কীর্ত্তিকলাপ ও দান ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। এদিকে দেবী সিংহের অত্যাচার-পীড়িত প্রজাগণের সাহায্যে পূর্ব্ব সঞ্চিত ধন প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। কাজেই সব দিক রক্ষা করিতে গিয়া জানকীরাম বৃটিশগণকে দেয় কর সময় মত দিতে পারিলেন না এবং স্বয়ং বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। রাজ্য পরিচালন ভার হইতে অপসৃত করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল এবং ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজ আত্মীয় রামকান্ত রায় রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কি তৎ সমকাল হইতে এক একজন ইংরাজ কালেক্টর দিনাজপুরের মহারাজের রাজস্ব সচিব নিযুক্ত হইয়া অসিতেছিলেন। ইঁহাদেরই নিদেশ অনুসারে রামকান্ত রায় সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাণী সরস্বতী ইংরাজ-দিগের উপর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন। তাঁহারই প্ররোচনায় সুকুমারমতি মহারাজ ইংরাজগণের সহিত ও তাঁহাদের নিদেশানুবর্ত্তী রামকান্ত রায়ের সহিত সংস্রব রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

ওয়েষ্ট মেকট্ সাহেব বলেন ঃ—

"The Ranee's feeling of hostility against the British rule is pardonable. Her 'husband, for twenty years reigned almost as an independent prince. After his death, her brother Janokiram had mantained an equal Estate. Suddenly her brother was called upon to pay his revenue with a punctuality never known before and, in default, was sent in custody to calcutta, and she never saw him again. The collections of the Estate were entirely taken out of the hands of the family and even the expenses of repairs of the Rajbari and the monthly wages of the servants were defrayed by Government officers without reference to her wishes. The Ranee was not even allowed to take care of her adopted son, nine or ten years old ; but he was made over for education to the manager Ramkanta Roy for whom she had a strong personal aversion. At the same time the income of the zamindary was being decreased by the abolition of all the illigal taxes and cesses which the Rajas had collected as long as she could remember, and by the determination of the Government that the family charities were to be paid out of the privy purse and not out of the imperial revenue as heretofore. She was naturally in no longer to look on Mr. Hatch's reforms as benificial or to acquise in the action of Government."

মিঃ জিঃ হ্যাচ্ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর রাজের রাজস্ব সচিব নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুর আইসেন।

রাজ্যের যখন এরূপ অবস্থা তখন মহারাজ রাধানাথ বাহাদুরের উপর রাজ্য ভার ন্যস্ত হইল (১৭৯২ খৃঃ অঃ)। রাজকার্য্যে অশিক্ষিত ষোড়শ বর্ষীয় মহারাজ রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। রাজমাতুলের পোষ্যবর্গ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। রাজ অমাত্যরূপে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইহারা মহারাজের ক্ষতির কার্য্য করিতে লাগিল। বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের আদেশ অনুসারে রামকান্ত রায় পুনরায় ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। যাহা হউক, ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেঃ রাধানাথ পুনর্ব্বার রাজ্যভার পাইলেন। এই সময় ৬৯, ৬৭৭৲ টাকা রাজকর বাকী পড়ায় বোর্ডের হুকুমে তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ বিক্রীত হইল। যথা নিয়মে বিক্রয় হয় নাই বলিয়া এই বিক্রয় সিদ্ধ হইল না। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়ায় প্রজার নিকট খাজানা আদায় হইল না, রাজকর বাকী পড়িল এবং মহারাজের ভূসম্পত্তি খণ্ডে খণ্ডে নিলামে চড়াইয়া ডাক হইতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারিগণ, গভর্ণমেণ্টের আমলাগণ এবং ছোট ছোট জমিদারগণ নাম মাত্র মূল্য দিয়া ঐ সকল খরিদ করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও মহারাজ রাজ্যরক্ষা করিতে পারিলেন না; তবে মহারাজা, রাজমাতা সরস্বতী ও মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের কিয়দংশ ক্রয় করিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইতে না হইতেই দিনাজপুর রাজ্য প্রায় ধ্বংস হইয়া আসিল। মহারাজ বাহাদুর ঋণ দায়ে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাল তাঁহাকে গ্রাস করিয়া তাঁহার সকল জ্বালা নিবৃত্তি করিয়া দিল।

রাজ্য নিলাম সম্বন্ধে ওয়েষ্ট মেকট্ সাহেব বলেন :—

"When he (Radhanath) took over the management of the Estate for a second time, he could do no better than before and in January 1797, he already owed Rs 69, 677/-on account of the arear of revenue. The decree went forth from the Board to sell some of his lands. The unfortunate young man was then only twenty years of age, but neither Mr. Bird (the collector) nor the Board appear to have hesitated as to the propriety of breaking up the great Dinajpur Estate. The first sale was cancelled for informality ; but in February 1798, inspite of the collector's certifying that owing to drought the rayats had not been able to pay their rents, further sales were ordered, and yet at the end of the Bengalee year (April 1798) more than half a lakh of revenue remained unpaid. Month after month instalments became due and lot after lot was sold. The Raja was raising money on mortgage while his wife, Rani Tripura sundari, bought lands paying a revenue of nearly Rs 50,000/-and old Ranee Saraswati bought others paying Rs 21517, but little was saved out of the wreck, for by the end of 1800 everything had been sold."

"Whatever may have been the merits of the policy which broke up this large Estate, there can be

no question but that it was carried out with extreme harshness."

"Unless it was resolved that the Raja of Dinajpur was too powerful for a subject and therefore as soon as a pretext offered, his Estates were to be broken up, which nowhere appears to be the feeling of Government, it is difficult to see why a fair upset price should not have been fixed on each lot, and if no one bid up to that price, the lot sequestered and put under the management of Government officers." (Westmaccott's article on Dinajpur Raj.)

মহারাজ রামনাথের সময়ে রাজকর ১২,৫০,০০০৲টাকা পর্য্যন্ত উঠে। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে ২৬,৫০,০০০৲ টাকা হয়। ইংরাজগণ কমাইয়া ১৮,০০০০০৲ টাকা ধার্য্য করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই হারেই রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪,৬০,৪৪৪৲ ধার্য্য হয়। দেবী সিংএর আমলে ১৬,৬০,৪৪৪৲ টাকা ধার্য্য হয়। দশশালা বন্দোবস্তের প্রথম দুই বৎসর ১৪,৪৪,১০৭৲ টাকা ও তৎপর ১৪,৮৪,১০৭৲টাকা ধার্য্য হয়। সমস্ত দিনাজপুর জেলার রাজস্ব আঠার লক্ষের কম হইবে। বুকানন্, হ্যামিল্টন্ ও মার্টিন সাহেবের পুস্তক পাঠে জানা যায় যে দিনাজপুর রাজ্যের বিস্তৃতি তিন হাজার বর্গ মাইলের অধিক ছিল।

অপুত্রক অবস্থায় মহারাজ রাধানাথের মৃত্যু হইলে মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করিলেন। ইঁহার নাবালক অবস্থায় এষ্টেট্ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে বংশগত মহারাজ বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজরাও তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন।

(১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখের কালেক্টরের অর্ডার দ্রষ্টব্য ।)

১৮৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজা গোবিন্দনাথ বাহাদুর স্বর্গারোহণ করেন ।

গোবিন্দনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ পিতা জীবিত থাকিতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় কনিষ্ঠ তারকনাথ রাজা হইলেন। ২৪ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তারকনাথ বাহাদুর ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

তারকনাথের রাজত্বকালে সিপাহী বিদ্রোহ, ভুটান যুদ্ধ ও সাঁওতাল হাঙ্গামা হইয়াছিল। সাঁওতাল হাঙ্গামায় ও ভুটান যুদ্ধে রসদ সরবরাহাদি কার্য্যে মহারাজ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে যান বাহন দ্বারা যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিনাজপুর ট্রেজারী ও দিনাজপুরে যে সকল ইয়ুরোপীয়গণ ছিলেন তাঁহাদের জীবন রক্ষার জন্য মহারাজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদের বিশেষতঃ জলপাইগুড়িস্থ তাহাদের অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর একটা চা'ল চালিয়া মহারাজ তাহাদিগকে দিনাজপুরে আসিতে দেন নাই। বিদ্রোহীগণ জলপাইগুড়ি হইতে বরাবর পূর্ণিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর লর্ড লরেন্স রাজধানীর প্রাচীন ফরমান্‌গুলি দেখিতে চাহেন। সেই সকল দেখিয়া দিনাজপুর রাজবংশের বংশগত 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি অনুমোদন করা গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের উদ্দেশ্য ছিল। নৌকাযোগে ফরমানগুলি কলিকাতা লইয়া যাওয়া হইতেছিল। পথে নবদ্বীপের নিকট ঝড় উঠায় নৌকা ডুবি হইয়া সেই সকল বহু মূল্য দলিল নষ্ট হইয়া যায়। রঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ খাঁর দ্বারা রাজধানী লুণ্ঠনেও অনেক দলিল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মহারাজ তারকনাথের পত্নী মহারাণী শ্যামমোহিনী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ গিরিজানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই (১৭৮৪ শকাব্দা ১২ই শ্রাবণ) রবিবার ই, বি, রেলওয়ের চিরির বন্দর ষ্টেসনের সন্নিকট দামুর গ্রামে এই মহাত্মা ভূমিষ্ঠ হন।

রাজমাতা, রাজজামাতা ও রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহের সহকারিতায় অতি সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর সহরের ও তদসন্নিহিত এক একটি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ছয় মাইল দীর্ঘ কাচাই খাল ৭৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে খনন করান। মহারাণী শ্যামমোহিনী রোড নামে পরিচিত দিনাজপুরের রাস্তা প্রস্তুত জন্য ইনি রীতিমত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি রাজধানীতে ও রায়গঞ্জে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ইনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে রাজ্যের নানা স্থানে অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। এজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাণী উপাধি ও ৫০ জন সশস্ত্র অনুচর (armed retainers) রাখিবার অনুমতি দিয়া সম্মানিত করেন।

মহারাজ গিরিজানাথকে সুশিক্ষিত করা রাজমাতার প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। রাজধানীতে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট মহারাজ বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। গিরিজানাথ ১৮৭০ হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেনারস্ কুইন্স কলেজে অধ্যয়ন করেন। তৎপর তিনি রাজধানীতে অবস্থান করিয়া শিক্ষা পাইতে থাকেন। ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাবু যশোদানন্দন প্রামাণিক এম, এ, বি, এল ও পণ্ডিত বৃন্দাবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

উপযুক্ত শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষালাভের সুফল ফলিয়াছিল। ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে, বলিতে, কহিতে, বক্তৃতা দিতে, পাশ্চাত্য আদব কায়দা দুরস্ত রাখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদিগের

সংস্রবে আসিতে ; সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পৃথিবীর সাময়িক ঘটনাবলির সমাচার রাখিতে মহারাজের অসামান্য কৃতিত্ব ছিল। এইরূপে বর্ত্তমানের এবং পুস্তক পাঠে অতীতের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি বলে সকল বিষয় সুদৃঢ় ধারণায় আনিতেন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্তে উপনীত এবং সেই সকল সিদ্ধান্ত সম্বল করিয়া সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরতা সহকারে ব্যবহারিক জগতে বিচরণ করিতেন। তাঁহার এই আত্মনির্ভরতার সহিত হটকারিতার কিছুমাত্র যোগ ছিল না। দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া তিনি সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন এবং ঐরূপ বিবেচনাধীন থাকিয়া প্রতিপদে অগ্রসর হইতেন। মহারাজ গোপনে দান করিয়া পরোপকার সাধন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বিনয়ের আধার ছিলেন। দানের সময় তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় নম্রতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত ও অর্থিগণকে আপ্যায়িত করিতেন।

মহারাজ একজন সুশিক্ষিত কুস্তিগির ও অশ্বারোহী ছিলেন। অশ্ব পরিচালনায় তাঁহার নৈপুণ্য বড় কম ছিল না। বন্দুক চালাইতে তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে কিঞ্চিদধিক তিন শত শেলা বাঘ এবং বহুতর ডুমুরা বাঘ ও বন্য শূকর নিহত হইয়াছিল। মহারাজ অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার তুল্য সঙ্গীতবোদ্ধা বঙ্গদেশে অতি কম ছিল।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কৃতবিদ্য ও বহুদর্শী ব্যক্তিগণের মন্ত্রণায় তিনি রাজ্য পরিচালন করিতেন। প্রাচীন রীতিনীতি ও কার্য্যপ্রণালী অক্ষুন্ন রাখিয়া রাজ্য পরিচালন করা তাঁহার রাজনীতির মূল সূত্র ছিল। তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়
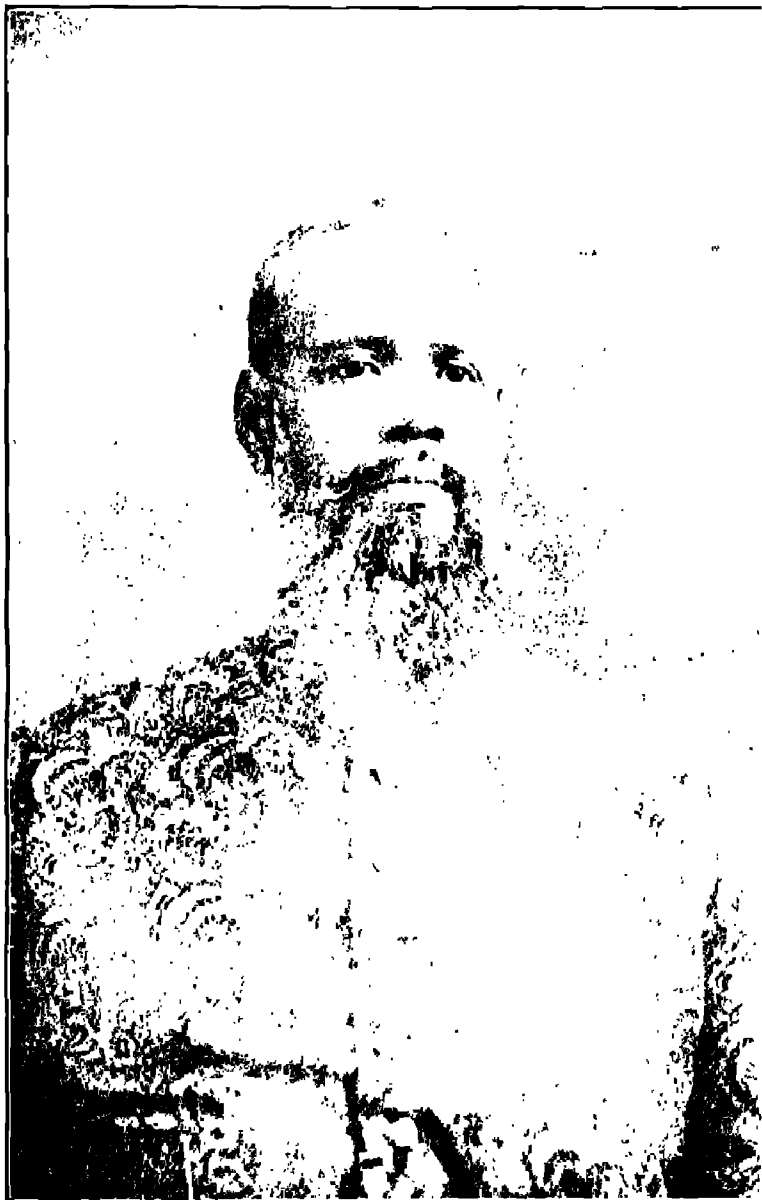
স্বর্গীয় মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে-সি-আই-ই

নূতন প্রথা যে প্রবর্ত্তন না করিতেন, এমন নহে ; কিন্তু নূতনের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া নূতন প্রাচীনের অনুগত হইয়া স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেন। একারণ রাজ্য পরিচালনের প্রতি কার্য্যেই এমন একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হইত, যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই অতীতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া এই সুপ্রাচীন রাজ বংশের বিগত গৌরব মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন এবং বর্ত্তমান ও অতীতের আলোকে মণ্ডিত হইয়া তাঁহাদের নিকট অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিত। ধর্ম্মনীতির সম্পর্ক বিহীন নিছক্ রাজনীতি মহারাজের নিকট আদর পাইত না।

গণিত জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক এই তিন শাস্ত্রের প্রতি মহারাজের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এজন্য তিনি জীবনের শেষ ভাগে ১৫।১৬ বৎসর ব্যাপিয়া সুপণ্ডিতগণের সাহায্যে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ গিরিজানাথ একজন প্রেমিক বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ইহাঁর নিত্য পাঠ্য ছিল। সকল বৈষ্ণবাচার ইনি বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালন করিতেন। ইহাঁর ধর্ম্ম বিশ্বাস সার্ব্বভৌম ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসা হৃদয়ে পত্তন ছিল। অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের প্রকট লীলা সমূহে ইহাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং সর্ব্বদা ভগবদ্‌লীলাস্ফূর্ত্তি জন্য ভক্ত সঙ্গে তদনুকূল কথা শ্রবণ ও আলোচনাদি করিতে পরম প্রীতি অনুভব করিতেন।

সাধারণের হিতকর কার্য্যে মহারাজ গিরিজানাথের অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। তিনি বহুদিন ধরিয়া ডিঃ বোর্ডের মেম্বর ও দিনাজপুর সদর বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি নয় বৎসর দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ ছিলেন। যতদিন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম লেজিস্ লেটিভ্ কাউন্সিল ছিল ততদিন তিনি তাহার মেম্বর ছিলেন। সকল কার্য্যেই তিনি অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফণ্ডে ২৫০০০৲ টাকা ও কিংএডওয়ার্ড ফণ্ডে ১০,০০০৲ টাকা এইরূপে বহু দান তিনি করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ গিরিজানাথ বাহাদুরের স্বজাতিপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। দুই বৎসর তিনি এই সভার সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠাতাগণ মধ্যে তিনি একজন প্রধান। ১৩০৮ বঙ্গাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন ও তদন্তর্গত শিক্ষা সমিতির ধনরক্ষক ছিলেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মেলন হয় তিনি তাহার Reception Committeeর Chairman ছিলেন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব তিনি অতি দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

দিনাজপুর সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মহারাজ বহু ব্যয়ে Thomson Canal এবং Ghagra Canal খনন করান। তিনি Diamond Jubilee উপলক্ষে দিনাজপুরে Jubilee School স্থাপন করেন। তিনি রাজধানীতে একটি বয়ন বিদ্যালয় এবং সংস্কৃত টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের Maharaja Girija Nath High School— নামে উচ্চ ইংরাজী স্কুল ও হিন্দু মুসলমান ছাত্রনিবাস নিজ নিজ অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহারই নিকট ঋণী। রায়গঞ্জ ও রাজধানীতে দুইটি charitable dispensaryর সম্পূর্ণ ব্যয় ভার তিনি বহন করিয়া গিয়াছেন।

গত তিব্বত অভিযানে হিমালয়ের দুরারোহ পর্ব্বত সমূহের মধ্য দিয়া রসদাদি বহন জন্য শকট সংগ্রহ করিতে মহারাজ যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় মহাসমরের সময় ভারতের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পার্ব্বতীয় সৈন্যাদি যখন সমর ক্ষেত্রে প্রেরিত হইতেছিল

তখন মহারাজ নিজ রাজ্য মধ্যে তাহাদের রসদ সরবরাহের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজমাতা মহারাণী শ্যাম মোহিনীর কাশী প্রাপ্তি হইলে মহারাজ বাহাদুর কিঞ্চিদধিক আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজধানীতে মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মহারাজ বাহাদুরকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বাহাদুর উপাধিতে অভিহিত করেন। শেষোক্ত সনন্দ দান কালে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"By your unswerving loyalty, high character, readiness to give your time and labour to promote all useful public objects, you have gained the high esteem of your countrymen and the grateful recognition of the Government. It is very gratifying to me to be able to express by the ceremony of today, the satisfaction with which the Government has viewed your career."

গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের জন্ম দিনে মহারাজ গিরিজানাথ বাহাদুরকে K.C.I.E. উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার প্রজাবর্গের ও সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

গত ১৩২৬ সালের ৫ই পৌষ মহারাজ ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তি নিকেতনে চলিয়া গিয়াছেন।

ঔরস পুত্র হয় নাই বলিয়া তিনি মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহাদুরকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনি এক্ষণে দিনাজপুর রাজগদীতে আসীন আছেন। পিতার ন্যায় ইনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। পিতৃ দেবার্চ্চনে ইহাঁর প্রগাঢ় ভক্তি এবং রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন

মঙ্গলের প্রতি ইঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। ইনি ন্যায়পরায়ণ ও কোমল হৃদয়। ইঁহার পিতৃ দেবের বহু কর্ম্মচারী ও আমাত্যগণকে বার্দ্ধক্যাদি প্রযুক্ত কার্য্যে অসমর্থ দেখিয়াও ইনি প্রতিপালন করিতেছেন। ইংরাজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় মহারাজ শিক্ষিত। মহারাজ বাহাদুর গিরিজানাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গবর্ণমেণ্ট ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জগদীশনাথকে "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। গিরিজা-নাথ হাইস্কুলের বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যয়ভার অর্দ্ধেকের উপর মহারাজ গিরিজানাথ ও মহারাজ জগদীশনাথ বহন করেন। ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসে মহারাজ জগদীশনাথের শুভ পরিণয় হয়। তাঁহার দুইটি কন্যা সন্তান। ইনি দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর ও দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। ইহা ছাড়া ইনি British Indian Association, Bengal Landholders' Association, East Bengal Landholders' Association, North Bengal Land-holders' Association, Calcutta club এর মেম্বার এবং Dinajpur Landholders' Associationএর যাবজ্জীবন সভাপতি।

দেবদ্বিজ আশীর্ব্বাদে মহারাজ চিরজীবি হইয়া রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দেশের ও দশের উপকার করিতে থাকুন ভগবানের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

মহারাজা জগদীশনাথ রায়
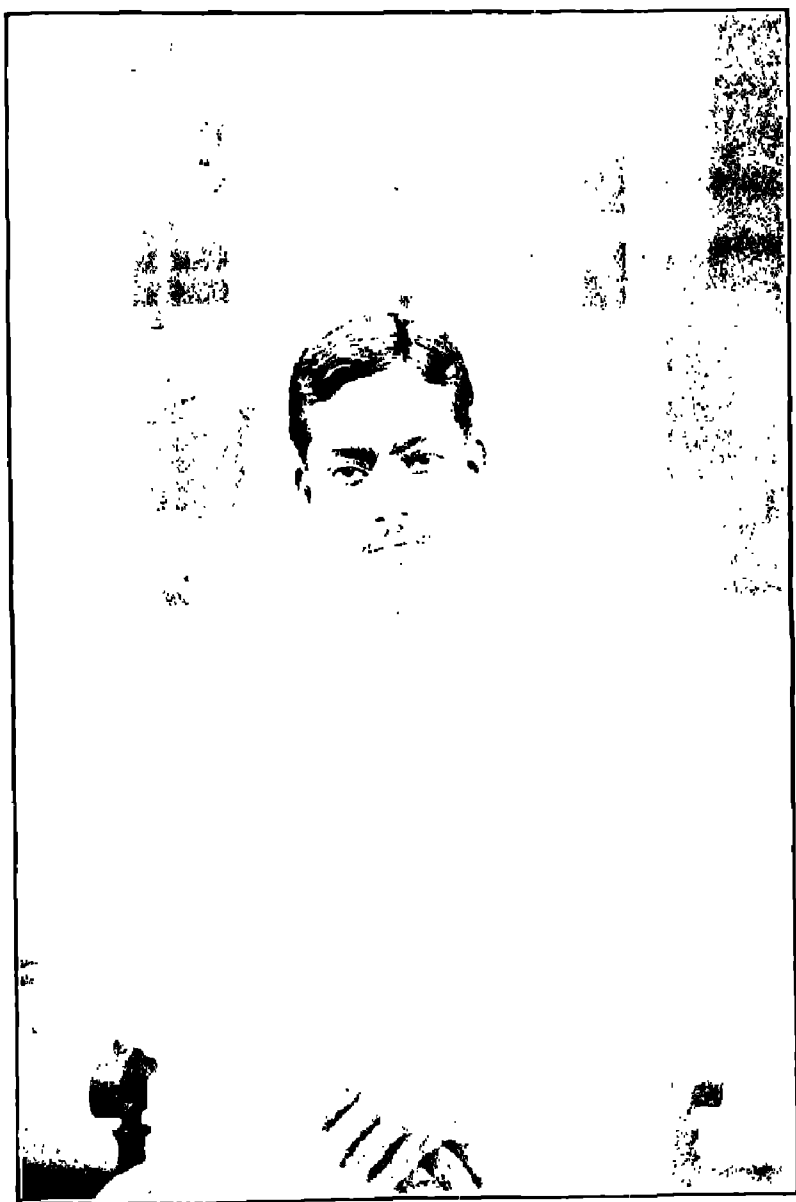
সন্তোষ রাজবংশ।

বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দুনরপতি যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য এবং রাজা বসন্ত রায় যে বঙ্গজ কায়স্থকুল সম্ভূত, সন্তোষের জমীদারগণও সেই বংশ সম্ভূত। সেই বংশীয় ত্রিলোচন গুহ নামক একজন যশোহর হইতে সন্তোষের অনতিদূরবর্ত্তী অলোয়া নামক গ্রামের মধ্যগত রায়-পাড়া গ্রামে আগমন করতঃ বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কিছুকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া ক্রমে ইঁহার বংশ বৃদ্ধি হইলে পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ আপন কৃতিত্বে নবাব সরকারে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। ক্রমে নবাব সরকার হইতে কেহ "রায়" ও কেহ "নিয়োগী" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা ঐ রায়পাড়া পরিত্যাগ করতঃ কাকমারী প্রদেশান্তর্গত দান্যা, লাউজানা, বেরাবুচনা ও বাফলা গ্রামে বাস করেন ও তাঁহারা বাফলার রায়, দান্যার রায় এবং লাউজানা ও বেরাবুচনার নিয়োগী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। পূর্ব্বোক্ত বাফলানিবাসী যাদবেন্দ্র গুহ রায় হইতেই কাকমারী পরগণাতে এই বংশের আধিপত্য স্থাপিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রিলোচন গুহের অধঃস্তন তৃতীয় পুরুষ হরিনারায়ণ রায়ের পুত্র রমানাথ রায়ের পৌত্র কাকমারির প্রথম জমিদার যাদবেন্দ্র গুহ রায়। যাদবেন্দ্র গুহ রায়ের জমিদারী প্রাপ্তির পূর্ব্বে ঐ কাকমারী পরগণা পীরসাহজমান নামে একজন ধার্ম্মিক মুসলমান দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যাদবেন্দ্র কাকমারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। ইঁহার পূর্ব্বে এই কাকমারী পরগণা কাহার অধিকারে ছিল তাহা জানিবার বিশেষ কোনও উপায় নাই। বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যৎকালে মুসলমানগণ বঙ্গদেশের পূর্ব্বাংশ অধিকার করেন তৎকালে এদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজা ছিলেন। সম্রাট আকবরের সময়ে বঙ্গদেশে বার

জন রাজা "ভূঞা" নামে অর্থাৎ বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও ভাগিরথী নদীর পূর্ব্ব ও উত্তর দিকস্থ সমুদয় স্থান তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে এই কাকমারী পরগণাও পূর্ব্বে এই দ্বাদশ ভৌমিকের কোন একজনের রাজ্যভুক্ত ছিল। কালে ঐ সকল ভৌমিকগণের অবনতি হওয়ায় তাহাদের অধিকৃত স্থান সমূহ অন্যের অধিকৃত হয়। প্রবাদ এইরূপ যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া পীর সাহজমান কাকমারীতে আগমন করেন। পীর সাহজমান যেমন সাধু তেমন আরবী ও পারসিক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাফলা নিবাসী হরিরাম রায় আপন পুত্র যাদবেন্দ্রকে অধ্যয়নার্থ পীরসাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। পীরসাহজমান যাদবেন্দ্রের শারীরিক সুলক্ষণাদি ও সুশীলতা দেখিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। পীর সাহজমানের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া যাদবেন্দ্র সর্ব্বদা তাহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া যাদবেন্দ্র আপন প্রতিভা বলে পারসিক ভাষায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিলেন। যাদবেন্দ্রের সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া পীর সাহজমান তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। যাদবেন্দ্রও পীর সাহেবকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ায় পরস্পরের স্নেহ ও ভক্তি দৃঢ় হইয়া উঠিল। পীর সাহজমান অত্যন্ত ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন; গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কিছুই অনুরাগ ছিলনা এবং তিনি অবিবাহিত ছিলেন। যাদবেন্দ্র তাঁহার প্রিয় শিষ্য বলিয়া তাঁহাকে আপন পুত্রের ন্যায় মনে করিতেন। কালে তিনি যাদবেন্দ্র রায়কে রাজ্যের অধিকার প্রদানপূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তায় জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং বাদসাহের অনুমতি লইয়া যাদবেন্দ্র রায়কে কাকমারী পরগণার অধিকার প্রদানপূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

এইরূপে পীর সাহজমানের কৃপাতে যাদবেন্দ্র রায় কাকমারী পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পীর সাহজমানের জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল পরে পীর সাহজমানের পরলোক প্রাপ্তি হইল। পীর সাহজমানের অন্তিমকালে মুসলমান ধর্ম্মমতে যে যে কার্য্য করিতে হইয়াছিল তাহা যাদবেন্দ্র করাইয়াছিলেন পরে পীরসাহেবের মৃত দেহ কাকমারী বন্দরের দক্ষিণে সমাহিত করাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ পীর সাহজমানের নাম চিরস্মরণীয় রাখার উদ্দেশ্যে ঐ কবরের উপর এক দরগা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ঐ দরগাতে মুসলমান সেবাইত নিযুক্ত রাখিয়া মুসলমান ধর্ম্মানুসারে তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। যাদবেন্দ্র রায়ের নির্ব্বাচিত নিয়মানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তীগণ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঐ দরগার সমস্ত কার্য্য যথানিয়মে সম্পাদন করাইতেছেন। পীর সাহজমানের পুরাতন সমাধি কাকমারী বন্দরের পূর্ব্বাস্থিত বর্ত্তমান লৌহজঙ্গ নদীতে অদৃশ্য হওয়াতে ১২৭৫ সনে উক্ত দরগা পূর্ব্বস্থানের কিছু পশ্চিমে সরাইয়া স্থাপিত করা হইয়াছে।

যাদবেন্দ্র অনেক দিন জমিদারী উপভোগ করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতস্পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায় যাদবেন্দ্রের পুত্রগণকে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজে অধিকার করিলেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই ইনি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন এবং বাদসাহের প্রাপ্য রাজস্ব বন্ধ করিয়া স্বাধীনভাব অবলম্বন করিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে উপযুক্ত সৈন্য পাঠাইয়া ইন্দ্রনারায়ণকে মুর্শিদাবাদে ধরিয়া লইয়া গেলেন। ইন্দ্রনারায়ণ নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে আদেশ করিলেন তুমি বাকী রাজস্ব পরিশোধ কর, নতুবা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, অন্যথা তোমাকে হাব্‌সী থানায় কয়েদ থাকিতে হইবে। ইন্দ্রনারায়ণ বাকী রাজস্ব প্রদানে

অক্ষম, কয়েদ থাকিতেও অনিচ্ছুক, সুতরাং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাকী রাজস্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করা শ্রেয়ঃজ্ঞান করিলেন। নবাব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাকী রাজস্বের দায় হইতে তাঁহাকে মুক্তকরতঃ পুনর্ব্বার কাকমারী পরগণার অধিকার প্রদান করিলেন। এইভাবে ইন্দ্রনারায়ণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইনায়্উল্লা চৌধুরী নামে খ্যাত হইলেন। মুর্শিদাবাদ নবাবের অন্তঃপুরচারিণী কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করতঃ কাকমারী প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি মুসলমান পত্নীসহ দেশে আসিয়া যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, ঐস্থানের নাম ইনায়তপুর রাখা হইল। আজও ঐ গ্রাম ঐ নামে খ্যাত আছে এবং ঐ স্থানে ইনাতুল্লা চৌধুরীর বাটীর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ইন্দ্রনারায়ণ রায় নিজে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল না। ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতিও তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ধর্ম্মনাশ আশঙ্কায় সর্ব্বদা পিতৃব্যের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। বহুদিন জমিদারী উপভোগ করিবার পর ইন্দ্রনারায়ণের মনে বৈরাগ্যভাবের উদয় হইল। চরম সময়ের পূর্ব্বে তিনি মক্কাগমন করা স্থির করিলেন। তিনি মক্কা গমনের পূর্ব্বে মোগল বংশীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সন্ততিকে জমিদারী দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলেন না। কারণ তাহাদিগকে সম্পত্তির অধিকার প্রদান করিলে পিতৃবংশের গৌরব সমূলে বিনষ্ট হইবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বনাথ রায়কে জমিদারীর অধিকার প্রদান করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী সন্তোষ গ্রামে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার উত্তর পাড়ে বিশ্বনাথের জন্য বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তদবধি বিশ্বনাথ রায় বাকলা পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষে বাস করিতে লাগিলেন। ইনাতুল্লা চৌধুরীর খনিত দীঘি সন্তোষ জমীদার বাটীর সম্মুখে এখনও বর্ত্তমান আছে।

ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বনাথকে কাকমারীর জমিদারীর অধিকার প্রদান পূর্ব্বক ইনাতুল্লা চৌধুরী মক্কা গমন করেন। মক্কাগমনের পূর্ব্বে তাঁহার মোগলপত্নী ও তদগর্ভজাত সন্তানদিগকে প্রতিপালন করার ভার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া যান। ইনাতুল্লা চৌধুরীর মক্কা গমনের অব্যবহিত পরে বিশ্বনাথ তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ঐ মুসলমান স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে বিনষ্ট করিয়া দিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কাকমারী পরগণার যে অংশ হাউলি ও পলশিয়া অঞ্চল বলিয়া খ্যাত আছে, বিশ্বনাথ রায়ের অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাউলি ও পলশিয়াই কাকমারী পরগণার সীমানা ছিল। সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত যে বিস্তৃত স্থান কাকমারী পরগণা ভুক্ত আছে ঐ স্থান পূর্ব্বে স্বতন্ত্র পরগণা বলিয়া খ্যাত ছিল। বিশ্বনাথ রায় ঐ স্থান কাকমারী পরগণা ভুক্ত করিয়া পরগণার সীমানা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিশ্বনাথ রায় যে সময় কাকমারী জমিদারীর শাসন করিতেছিলেন সেই সময় বসন্ত রায় নামে জনৈক কায়স্থ নবাবের প্রাচীন কার্য্যকারক ছিলেন। পেকুয়া চাকলা তাঁহার অধিকারে ছিল, তিনি কোন কারণে নবাবের অসন্তুষ্টি ভাজন হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। সেই বিবাদ সময়ে বসন্ত রায়ের জননী ও পত্নীকে বিশ্বনাথ রায় অতিশয় সম্ভ্রম ও যত্নের সহিত রক্ষা করাতে বসন্ত রায় বিশেষ উপকৃত হন। কিয়ৎকাল পরে বসন্ত রায় নবাবের অনুগ্রহ ভাজন হইলে তিনি বিশ্বনাথ রায়ের কোন উপকার করা কর্ত্তব্য বোধে বিশ্বনাথ কি প্রার্থনা করে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বনাথ রায় সেই সময় বসন্ত রায়ের অধিকার ভুক্ত পেকুয়া চাকলা কাকমারী পরগণার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়ার প্রার্থনা করেন। বসন্ত রা... প্রার্থনা অনুযায়ী পেকুয়া চাকলা কাকমারীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। পেকুয়া চাকলা মধ্যে বসন্ত রায়ের বহু কীর্ত্তি বর্ত্তমান ছিল। ঐ চাকলা অন্তর্গত ক্ষুদ্র যমুনা নদীতে ধর্ম্মপুত নদের প্রবল জলবেগ পতিত হইয়া

সমস্ত কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে ; বর্ত্তমানে সে সমস্ত ভূমি চরভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বনাথ রায়ের তিন পুত্র হইতে কাকমারী পরগণা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ রায় ।৵৹ আনা, অপর দুই পুত্র রামেশ্বর ও রামচন্দ্র রায় প্রত্যেকে ।/৹ আনা করিয়া ॥৵৹ আনা পান। মধ্যম পুত্র রামেশ্বর রায় পুত্রহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার একমাত্র কন্যা শিবানী পিতৃত্যক্ত ।/৹ আনির জমিদারী প্রাপ্ত হন এবং সন্তোষের নিকটবর্ত্তী অলোপ গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করতঃ পুত্রগণসহ বাস করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ রামচন্দ্র রায় ।/৹ আনির বর্ত্তমান ভূমিধ্যকারী সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ। বিশ্বনাথের তৃতীয় পুত্র রাম চন্দ্র রায় চৌধুরীর দুই পুত্র ; রমনাথ ও কাশীনাথ।

কাশীনাথ নিঃসন্তান ছিলেন ; সেই জন্য শিবনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে শিবনাথের মৃত্যু হয় ; সেই কারণে তিনি পুনরায় ভৈরব নাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ভৈরবনাথের পুত্র উমানাথ রায় চৌধুরী। ইনি অবিবাহিত অবস্থায় লোকান্তরিত হন, সেই জন্য ভৈরবনাথের পত্নী গৌরমণি দ্বারকা নাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী সে কালের হিসাবে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি পরিশ্রমী, সদালাপী ও সামাজিক পুরুষ ছিলেন। পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তিনি স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। এই জন্য তাঁহার আমলে সন্তোষের জমিদারীর আয় বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি জন-হিতৈষী ছিলেন এবং সাধারণ সকল হিতকর অনুষ্ঠানেই মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। দেব-দ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি ইংরাজী ভাষা জানিতেন না ; কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি

সন্তোষে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী। দ্বারকানাথের পত্নীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী। ইনি বাখরগঞ্জ জেলার গাভা গ্রাম নিবাসী ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা। ইঁহার বয়স যখন সাত বৎসর সেই সময়ে দ্বারকানাথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর ইনি সন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

গবর্ণমেণ্ট বিন্ধ্যবাসিনীকে জমিদারী পরিচালন ভার অর্পণ করেন; ইনি অতি বুদ্ধিমতী মহিলা; ইঁহার আমলে জমিদারীর প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। ইনি কীর্ত্তিমতী মহিলা; নানাবিধ জন-হিতকর কার্য্য করিয়া ইনি অশেষ কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি টাঙ্গাইলের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বামীর প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইলের হাঁসপাতালের বাড়ী ইনি পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। সন্তোষের ঠাকুর বাড়ীতে ইনি একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। সন্তোষে একটী বাটী ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে দ্বারকানাথ এবং বিন্ধ্যবাসিনী বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি শিক্ষানুরাগিনী ছিলেন; বহু দরিদ্র ছাত্রকে মাসিক অর্থ সাহায্য করিয়া ইনি তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

দেশ বিশ্রুত নাট্যকার, কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ১২৭৯ সনে ময়মনসিংহের অন্তর্গত সন্তোষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রমথনাথ শুধু একজন সাহিত্যরথী নহেন, তিনি একজন বৃহৎ ভূস্বামী। কিন্তু জমিদার প্রমথনাথ অপেক্ষা নাট্যকার কবি প্রমথনাথ আজ জনমতের বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। অভিজাত্য প্রতিভার নিকট দাঁড়াইতে পারে কি? বালক প্রমথনাথ বড়ই লাজুক ও মুনো ছিলেন, এমন কি সকলে তাঁহাকে একজন স্থূল বুদ্ধি ভাল মানুষ ঠাওরাইতেও ত্রুটি করে নাই। তাঁহার চিন্তাশীল অন্যমনস্ক ভাব আত্মীয়গণকে তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিত। সেদিন তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যাঁহারা নিরাশ হইতেছিলেন, তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই যে, এই সদাসশঙ্ক সঙ্কুচিত বালক একদিন অনন্যসাধারণ মনীষার পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে। যাঁহাদের প্রতিভা ধধুপের ন্যায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, প্রমথনাথের প্রতিভা সে শ্রেণীর নহে। উহা অল্পে অল্পে বিকাশ লাভ করিয়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

বাল্যেই প্রমথনাথ পিতৃহীন হন। প্রমথনাথ প্রধানতঃ মাতার হস্তেই গড়িয়া উঠেন। এই অসামান্যা রমণী কিরূপ তেজস্বিনী ও হৃদয়বতী এবং মাতার নিকট পুত্র তাঁহার সাহিত্য সাধনা ও সিদ্ধির জন্য কতটা ঋণী, প্রমথনাথ রচিত "বিন্ধ্যবাসিনীর জীবন কথা" নামক পুস্তিকায় আমরা তাহার আভাষ পাই। "বঙ্গ ভাষার লেখক" গ্রন্থে প্রমথনাথের আত্মচরিতের একস্থানে উল্লেখ আছে, একদিন প্রমথনাথ স্কুল পলাইয়া মাতার নিকট চিরদিনের জন্য সংশোধিত হইবার শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, প্রমথনাথের জীবনে তাঁহার মাতার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। প্রমথনাথের গ্রন্থাবলীর সম্পাদকীয় নিবেদনে শ্রীযুক্ত জলধর সেন লিখিয়াছেন "প্রমথনাথ হাড়ে হাড়ে Democrat, এই Democratic ভাব তিনি মাতার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রমথনাথের জীবন গঠনে তাঁহার গৃহ শিক্ষকগণও

কম দায়ী নহেন। "বঙ্গভাষার লেখক" নামক গ্রন্থে তিনি তাঁহার "ঘড়ির কাঁটার মত" কর্ত্তব্য পরায়ণ পণ্ডিতের কথা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমথনাথের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ ঘোষ একজন প্রধান ঔপন্যাসিক। প্রমথনাথ বলেন, ভবানী বাবুর সাহিত্যানুরাগ প্রমথনাথের প্রথম সাহিত্যোৎসাহের অজ্ঞাত আকর্ষণী ছিল। প্রমথনাথ সুকুমার বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া কবিতা লিখিতেন, ধরা পড়িলে ভ্রাতা কি ভগিনীদের হাতে কাগজ দিয়া নিজে সরিয়া পড়িতেন। পড়িতে গেলে তাঁহার গলা কাঁপিত, চোখে খামাখা জল আসিত। একদিন তাঁহার কবিতা গৃহশিক্ষক ভবানী বাবুর হাতে পড়ে। প্রমথনাথ ইহা দেখিয়াই সেখান হইতে ছুটিয়া পালান। হরিষে বিষাদে অন্তরাল হইতে শিক্ষকের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। শিক্ষক যখন উপহাসের হাসি হাসিলেন না, তখন তাঁহার একটু সাহস হইল, প্রমথনাথ দেখা দিলেন। সে নীরব সাক্ষাতের অর্থ কেমন হইয়াছে? শিক্ষক বুঝিয়া বলিলেন, "মন্দ হয় নাই।" কিন্তু তিনি প্রমথনাথকে কবিতা লিখিবার জন্য তখন কোন উৎসাহ দেন নাই, পাছে তাঁহার পাঠে বিঘ্ন ঘটে। পাঠে অন্যমনস্ক প্রমথনাথের লুকাইয়া লুকাইয়া কবিতা লেখা যখন তাঁহার মাতার কর্ণে উঠিল, মাতা হাস্য করিয়া বলিলেন, "লিখুক না, লিখাও ত বিদ্যাচর্চ্চা।" প্রমথনাথ উৎসাহ পাইয়া অনেক কাগজ ও কালিকলম নষ্ট করিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রমথনাথকে কৃপা করেন নাই। কেন? স্বয়ং কবিবর "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে তাহার আভাস দিয়াছেন। তিনি (প্রমথনাথ) যতই সাহিত্য-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন, গণিতের দেবী ততই তাঁহার প্রতি বিমুখ হইতেছিলেন। এ রুষ্ট দেবী কোন মতে তুষ্ট হইলেন না। প্রমথনাথ তাহারও উত্তর দিয়াছেন। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া

গণিতের ঘণ্টায় বঙ্কিম পড়িতেন। বিশ্ববিদ্যালয় একরূপ নিরাশ হইয়া যেন প্রমথনাথকে মুক্তি দিল। কবিবর তাঁহার চিরাদৃত সাহিত্যের দিকে তাহার সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিলেন। এমন সময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহার ডাক পড়িল। জমাট ভাঙ্গিয়া গেল। বিশাল জমিদারীর ভার তাঁহার স্কন্ধে। যাহা হইক, সেই অপরিণত বয়সেই তিনি অতি অল্প দিনে জমিদারী পরিচালনে এমনই অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন যে, সকলে অবাক্ হইয়া গেল। তাঁহার নিয়মাবলী, কার্য্যপটুতা, সুবিচার ও সততা দেখিয়া সে অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁহাকে একজন আদর্শ জমিদার বলিয়া অভিনন্দন করিল। এই খ্যাতি তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। তিনি পাশ কাটাইয়া তাঁহার চিরাদৃত সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। প্রতিভা যে পথে যায়, সেই পথে তাহার পদচিহ্ন আঁকিয়া যায়। প্রমথনাথ শিল্প বাণিজ্য-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কৃতীত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী" দেশাত্মবোধের চরম বিকাশ। বর্ত্তমানে ইহা কিরূপ বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাবানের কারখানায় পরিণত হইয়াছে তাহার সন্ধান করিতে গেলে প্রমথনাথের অসামান্য গঠন-শক্তি ও কার্য্যকরী ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি পূর্ণরূপে ধরা দেন নাই। সাহিত্যই তাঁহার জীবন, তাঁহার জীবন সাহিত্যময়। তাই তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে গেলে তাঁহার সাহিত্যসেবার কথাই সমস্ত কথার উপরে আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রমথনাথ জমিদারীর আব-হওয়া হইতে সাহিত্যের মুক্তাকাশে পলাইয়া আসিলেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের অকৃপা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, এবার সে ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অধ্যাপক, সুকবি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের নিকট তিনি বহুদিন ধরিয়া ইংরেজী কাব্য অধ্যয়ন করেন। তৎপরে স্বনামখ্যাত অধ্যাপক হুইলার সাহেবের নিকটও বহুদিন

ইংরেজী নাটক ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সময়াভাবে হুইলার সাহেব এক সময়ে প্রমথনাথের বাড়ীতে আসিয়া অধ্যাপনা করিতে অপারগ হন। প্রথমনাথ হুইলারের অধ্যাপন কুশলতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। প্রমথনাথকে আহারান্তে স্কুলের ছাত্রের ন্যায় পুস্তকের রাশি লইয়া প্রত্যহ অধ্যাপকের বাড়ী যাইতে দেখা যাইত। ইতিপূর্ব্বেই প্রমথনাথের লাজুক প্রতিভা অল্প অল্প জড়তা ভাঙ্গিতেছিল। শেষে যখন একদিন তাঁহার "পদ্মা" কাব্য ছাপার হরফে সাধারণের নিকট উপস্থিত হইল, তখন বঙ্গের কাব্যামোদী পাঠক তাঁহাকে উদীয়মান কবি বলিয়া অভিনন্দন করিতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু চির-প্রথা মত নবীন কবিকেও সমালোচকের হস্তে মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত হইতে হইত। অবশেষে প্রমথনাথের প্রতিভার জয় হইল। বিরোধ বিদ্বেষের কুজ্ঝটিকা সবলে সরাইয়া পর পর অনেকগুলি উজ্জ্বল রত্ন প্রমথনাথ বঙ্গকাব্য সাহিত্য ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। জলধর বাবু সত্যই বলিয়াছেন, উহা "চিরদিন বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কার হইয়া থাকিবে।" কিন্তু তখনও তিনি নাট্যকার বলিয়া পরিচিত নন। তাঁহার নাট্যপ্রতিভা উন্মেষের ইতিহাস জলধর বাবু যেরূপ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"সন্তোষে তাঁহার (প্রমথনাথের) কর্ম্মচারীবর্গ এক সখের থিয়েটার খুলিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার সমস্ত ভার প্রমথনাথকে গছাইলেন। অমনি ক্ষুদ্র পাড়াগেঁয়ে থিয়েটারে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। প্রতিভার দস্তুরই এই। প্রমথনাথ যখন নাট্যসেনাপতিরূপে অবতীর্ণ হইলেন, কোথা হইতে সুযোগ্য অভিনেতাগণ আসিয়া তাঁহার পতাকার নীচে সমবেত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে এমন একটি নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিলেন, যাহাদের অভিনয় সহরের রসজ্ঞ দর্শকবৃন্দকেও তাক্ লাগাইয়া দিল। তিনি আমাকে তাঁহার Lieutenant করিয়া

লইলেন। বহু দূর দেশ হইতে দলে দলে দর্শক আসিয়া একবাক্যে বলিয়া যাইতেন, 'সহরের পেশাদারী থিয়েটারেও বুঝি এমন সুন্দর অভিনয় হয় না।' আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রায় সমস্ত অভিনেতাই স্থানীয়। এ বড় সহজ ওস্তাদির কথা নয়। নাট্য সাধনায় এই সময় কবি একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কখনও গান বাঁধিতেছেন, কখনও তাহাতে সুর দিতেছেন, কখনও সুর শিখাইতেছেন, কখনও অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। প্রথমতঃ বঙ্কিমের দুইখানি উপন্যাস তিনি নাটকে পরিণত করেন। তিন চারি দিনে এক এক খানি পুস্তক dramatised করিতেন; অথচ তাহা এতই সুন্দর হইত যে, তৎকালের দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে উহা গাঁথা হইয়া আছে। নাটকে তাঁহার হাত খুলিয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক যখন সন্তোষে অভিনীত হইল, সকলে সবিস্ময়ে জানিল, প্রমথনাথ শুধু একজন বড় কবি নহেন, নাটকেও তাঁহার বেশ দখল।"

প্রমথনাথের প্রথম নাটক ভাগ্যচক্র যদিও বহু সমজদারের নিকট একখানি অপূর্ব্ব রচনা বলিয়া সমাদৃত, তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে উহা অভিনয়ে রঙ্গালয় যাত্রির ঘন ঘন করতালি আকর্ষণ করিতে তেমন সমর্থ হয় নাই। এজন্য নাট্যকার কবি, রঙ্গালয় যাত্রিগণ না অভিনেতৃগণ দায়ী সে বিচার এখানে অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তাঁহার পরবর্ত্তী নাট্য রচনা সর্ব্বজনপ্রিয় 'চিতোরোদ্ধার' (ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক) ও সুপ্রসিদ্ধ 'জয় পরাজয়' (সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)। কি সাহিত্যের দিক দিয়া, কি অভিনয় হিসাবে এক এক খানি অভিনব শ্রেষ্ঠতম নাটক। হাস্যরসেও প্রমথনাথ ওস্তাদ। তাঁহার নাট্যোল্লিখিত হাস্যরসের চরিত্র গুলি ও 'আক্কেল সেলামী' নামক প্রহসন তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রমথনাথের কাব্য গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে জলধরবাবু বলিয়াছেন,

রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধরী
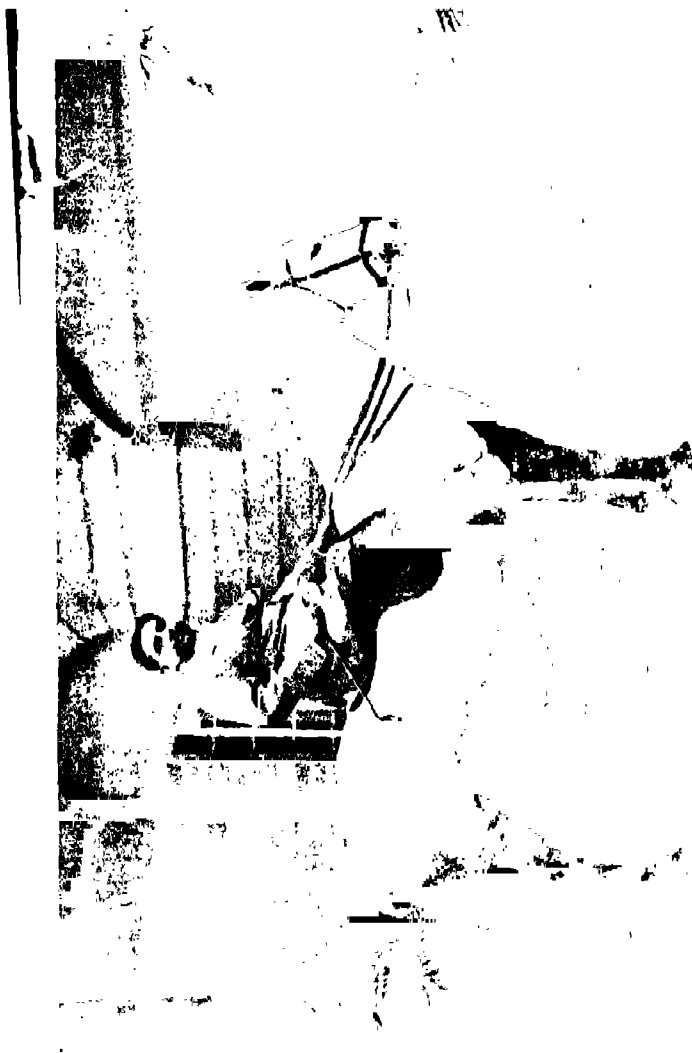
কবিরাজের হাতে নাড়ী; পুরুষ ও শিশু চরিত্র সমান ভাবেই ফুটে। প্রমথনাথের নাটকগুলি সম্বন্ধেও এই বিশেষত্বের কথা সমান খাটে। প্রমথনাথের নাটকে শিশুচরিত্রগুলি একেবারে নূতন; উহা প্রকৃতই অতুলনীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের শিল্প বাণিজ্য বিস্তারে প্রমথ নাথ একজন একনিষ্ঠ প্রবর্ত্তক। তিনি কথায় নন, কার্য্যে একজন সমাজ সংস্কারক। অনেক জনহিতকর সদনুষ্ঠানের তিনি একজন অকৃত্রিম উৎসাহী। কিন্তু তথাপি প্রমথনাথের বুদ্ধি, প্রমথনাথের সিদ্ধি শুধু সাহিত্যে; সাহিত্যেই তিনি অমর হইয়া থাকিবেন।

রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী।

রাজা মন্মথনাথ সেণ্ট জেভিয়ার স্কুল, হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। অতি অল্প বয়স হইতেই ইঁহার সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ইঁহার রচিত "The royal visit to Calcutta." নামক গ্রন্থ ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ইঁহার রচিত কয়েকটী প্রবন্ধ ও ইঁহার প্রদত্ত কয়েকটী বক্তৃতা "Essays and speeches" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। লর্ড রিপণ, স্যর চার্লস ইলিয়ট, এবং স্যর ওয়াল্টার লরেন্স এই গ্রন্থের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি সুলেখক এবং অল্পবয়স হইতেই ইনি সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহার সমতুল্য বাগ্মী বিরল। যাঁহারা মন্মথনাথের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন তাঁহার বক্তৃতা কিরূপ চিত্তাকর্ষক। যুক্তি, তর্কে এবং ভাবে ও ভাষায় মন্মথনাথের বক্তৃতা যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনই হৃদয়গ্রাহী।

মন্মথনাথের পাঠস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল, ইঁহার গৃহে একটী উৎকৃষ্ট

পাঠাগার আছে। ইনি অধিকাংশ সময় সেই পাঠাগারে থাকিয়া অধ্যয়ন করেন। ইনি শিক্ষানুরাগী এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। টাঙ্গাইলবাসীকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য ইহারা উভয় ভ্রাতাতে মিলিয়া "প্রমথমন্মথ কলেজ" নামে একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই কলেজে বহু ছাত্র বিনা বেতনে, অর্দ্ধ বেতনে শিক্ষালাভ করিয়াছে। এক্ষণে সেই কলেজটী ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ যাহাতে উচ্চাঙ্গের শিল্প শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের দারিদ্র্য মোচনে প্রবৃত্ত হইতে পারে, সে পক্ষেও তাঁহার চেষ্টা, উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ইনি সর্ব্বপ্রথম এক যুবককে নিজব্যয়ে জাপানে শিল্প শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই যুবকের নাম শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার। ইনি এক্ষণে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অবস্থান করিয়া উন্নততর শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। বাঙ্গালার যুবকগণ যাহাতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভ করে সেদিকেও তাঁহার দৃষ্টি আছে ; কেবল দৃষ্টি নয়, কার্য্যেও ইনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। জগন্নাথ কলেজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার (Laboratory) ইহাঁরই টাকায় স্থাপিত হইয়াছে ; কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এই জন্য এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের নাম রাখিয়াছেন "মন্মথ লেবরেটরী"। এই কলেজের অধ্যক্ষের অবস্থানের জন্য যে আবাস বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নামকরণ মন্মথনাথের নামেই হইয়াছে।

মন্মথনাথ দরিদ্রের দুঃখমোচনে এবং দেশের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। গত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় ইনি ইহাঁর জমিদারীর অনশনক্লিষ্ট রায়তগণের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য খাজানা রেহাই এবং অগ্রিম ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিগণের কষ্ট দূর করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে

"রিলিফ ফণ্ড" খুলিয়াছিলেন ইনি তাহাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া স্মৃতি ভাণ্ডারে ইনি ৫০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আলিপুরে পশুশালায় পক্ষিগণের সুবিধার জন্য যে পানীয় জলের কৃত্রিম ফোয়ারা তৈয়ারী হইয়াছে, তাহাতে ইনি মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। এই সকল সৎকীর্ত্তির জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রথমশ্রেণীর সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছিলেন। রাজপুরুষগণও ইহাঁকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন, লর্ড মিণ্টো এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ইহাঁকে সাক্ষাৎকার দান করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে গমন করিবার সময় ইহাঁকে তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত একটি ফটো উপহার দিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে মন্মথনাথ উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচক সমিতিতে মাদক দ্রব্য নিবারণসূচক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সমিতি প্রথমে প্রস্তাবটী রাজনীতিক নয় বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত হন; পরে কিন্তু ইহাঁর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে প্রস্তাবটী কংগ্রেসে পেশ করিতে সম্মত হন। মন্মথনাথ স্বয়ং এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, এই প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রোতৃগণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের সদস্য স্যামুয়েল স্মিথ এবং কেন্ ইহাঁর এই বক্তৃতার জন্য প্রশংসাবাদ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রচিত পুস্তক ইহাঁকে উপহার দিয়াছিলেন। ইনি বহু জনসাধারণ সভার সভাপতি হইয়াছেন ও বক্তৃতা করিয়াছেন। কলিকাতা টাউন হলে লর্ড কার্জ্জন, স্যর এনড্রু ফ্রেজার প্রভৃতির সভাপতিত্বে যে সকল মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল সেই সকল সভায় ইনি বক্তারূপে আহূত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি হাইকোর্টের পেপার বুক সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ কল্পে কলিকাতা টাউন হলে বহু রাজা, মহারাজা, জমিদার ও শিক্ষিতগণের অনুরোধে সেরিফ কর্ত্তৃক যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল রাজা মন্মথনাথ তাহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। লাট বাড়ীতে ও লাট দরবারে ইঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। লর্ড কার্জ্জন হইতে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড পর্য্যন্ত সমুদয় বড়লাট এবং স্যর এনড্রু ফ্রেজার হইতে স্যর উইলিয়ম ডিউক পর্য্যন্ত সমুদয় ছোট লাট, বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল এবং বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রোণাল্ডসে রাজা মন্মথনাথকে স্বহস্তে স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ উপহার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

ইনি বয় স্কাউট্‌ আন্দোলনের পক্ষপাতী এবং অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সম্প্রতি বয়স্কাউটের পরিচালক সঙ্ঘের ইনি অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

লর্ড রোণাল্ডসে আমন্ত্রিত হইয়া রাজা মন্মথনাথের কলিকাতাস্থিত প্রাসাদে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, গবর্ণমেণ্টের নিকট ইঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি ও সম্মান।

অনেকে মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন, কিন্তু শরীরের দিকে কোন লক্ষ্যই রাখেন না। মন্মথনাথ এই শ্রেণীর লোক নহেন, ইনি অশ্বারোহণে, ক্রিকেট, হকী, ফুটবল প্রভৃতি ব্যায়ামকর ক্রীড়াসমূহে ও মোটর শকট স্বহস্তে পরিচালনে অভ্যস্ত ; অথচ অপরদিকে গীতবাদ্যও জানেন। ইনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ের মধ্যে যে গুলি উত্তম তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

সমাজ হইতে বরপণ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য ইনি চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইনি "প্রজাপতি সমিতির"

স্বর্গীয়া রাণী দীনমণি চৌধুরাণী।

প্রথম সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট।

১৯০৫—৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী (এক্ষণে ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী) ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সময়ে কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাঙ্গালার অভিজাত শ্রেষ্ঠগণের সহিত তিনি অভ্যর্থনা ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি বঙ্কিম-চন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" নামক যে গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থের একখণ্ড যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবরাজের ভারত পরিদর্শন উপলক্ষে ইনি "Memoir of the Royal visit to Calcutta নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

ঢাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতালের উন্নতিকল্পে ইনি অর্থদান করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এই হাঁসপাতালের একটী "ওয়ার্ড' বা চিকিৎসা কক্ষ ইহাঁর নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইনি ময়মনসিংহ সহরে পশু-চিকিৎসার জন্য একটি হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থদান করিয়াছেন এবং উহার জন্য একটী ইমারত নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে মন্মথনাথ প্রায়ই আলোচনা করেন। শিক্ষা সমস্যার সমাধান করিতে তিনি প্রয়াস পান। এই জন্য ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের সহিত শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার পত্র ব্যবহার হইত। লর্ড কার্জ্জন শিক্ষা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিতেন। তিনি বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েসনের এডুকেসন্যাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তিনি দেশের বর্ত্তমান

শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করিবার পক্ষপাতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর উপর কোন আস্থা ছিল না বলিয়া তিনি আর বেশীদূর পড়া শুনা করেন নাই।

ভারতের শাসন সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে লর্ড সাউথবরো এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে রাজা মন্মথনাথ লর্ড সাউথবরোর নিকট যে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছিলেন তাহা জমিদার সম্প্রদায়ের এতদূর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে ঢাকার জমিদার সভা এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিল।

ইনি টাঙ্গাইল ও জামালপুরের হিন্দু অধিবাসিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ নূতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী সদস্যগণ যাহাতে প্রকৃত কর্ম্মী বা সেবকরূপে দেশের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন, সেইজন্য তাঁহার এবং কতিপয় বে-সরকারী সদস্যের উদ্যোগে একটী নূতন সমিতি গঠিত হইয়াছিল; উহার নাম ইন্‌ডিপেনডেণ্ট লিবারেল ইউনিয়ন হইয়াছিল। রাজা মন্মথনাথ এই সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মন্মথনাথ উন্নতচরিত্র, মেধাবী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচি; ইনি বহুগুণের আধার। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে গুণের পুরস্কার স্বরূপ "রাজা" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। রাজা উপাধিলাভের পূর্ব্বেও ইনি প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন এবং সেইজন্য গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে অস্ত্রআইনের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ রায় ইনি বর্ত্তমান ।৵০ আনি জমিদারীর পূর্ব্বপুরুষ। রঘুনাথের পুত্র জয়নাথ রায় ও তৎপুত্র হরিনাথ রায়, তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ রায়। কৃষ্ণনাথ পুত্র হীন থাকায় কালীনাথ রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

কালীনাথ অকৃতদার অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে রাজনাথ রায়কে পুনঃরায় দত্তক গ্রহণ করেন। রাজনাথ রায়ের পুত্র গোলক নাথ রায়। (ইনি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন) ইঁহারই পত্নী স্বনামধন্যা স্বর্গীয়া জাহ্নবী চৌধুরাণী। ইনি ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ক্রম সময়ে বিধবা হইয়া জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ইনি নিজবুদ্ধি বলে ।৵০ আনির জমিদারীর প্রভূত উন্নতি সাধন করতঃ সাধারণের হিতার্থে বহু সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যে সময় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলাতে একমাত্র জিলার স্কুল ব্যতিত কোনও বিদ্যালয় ছিল না, সেই সময় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি সন্তোষ গ্রামে নিজনামে জাহ্নবী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সন্তোষ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোক সকল অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে দেখিয়া নিজ স্বামীর নামে গোলকনাথ দাতব্য চিকিৎসালয় নামে ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। অতিথিগণের সৎকার মানসে আপন বাটীতে তিনি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৩০৬ সনের ১৩ই ফাল্গুন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পোষ্য পুত্র বৈকুণ্ঠনাথের স্ত্রী রাণী দিনমণি চৌধুরাণী ।৵০ আনির জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হন। ইনি অতি উদার হৃদয়া ও পরদুঃখমোচনে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। ইনি আপন শ্বশ্রুর কীর্ত্তিগুলি স্থায়ী করিবার জন্য ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ট্রাষ্টীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। দার্জ্জিলিং শৈলবাসে স্বামীর নামে বৈকুণ্ঠনাথ থাইসিস ওয়ার্ড নামে একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এই কার্য্যে কিঞ্চিদধিক ২০০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। চট্টগ্রাম অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক স্থানে তীর্থ যাত্রীগণের উপকারার্থে প্রায় ১৫০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া চিলছত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা নগরে বৈকুণ্ঠনাথ অনাথ আশ্রম নামক একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ৭০০০০৲ টাকা গভমেণ্ট হস্তে প্রদান

করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা মিডফোর্ড Hospital, Lanclet Hare Ward নামক মহিলাগণের জন্য একটী ওয়ার্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার নির্ব্বাহার্থ গভর্ণমেণ্টের হস্তে ২৫০০০৲ টাকা দিয়াছেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ রাণীর দানে পরিপুষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রথমোক্ত কলেজে ৫০০০৲ ও শেষোক্ত কলেজে ২২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কাকমারীতে মৃতদেহ সৎকারের জন্য নদীতীরে দাতব্য কাষ্ঠভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ট্রাষ্ট হইতে উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। বর্ত্তমান সম্রাটের রাজ্যাভিষেক সময়ে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রাণী" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। সৎকার্য্যে রাণী মহোদয়া সর্ব্বদা মুক্তহস্তা ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি টাঙ্গাইলে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল ঘটনায় তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। ১৩২১ সনের ১৮ই শ্রাবণ তারিখে স্বীয় পতির আজ্ঞা রক্ষার্থে সন্তোষের অদূরবর্ত্তী ভাণ্ডার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ এম এ বি এল মহাশয়ের চতুর্থ পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন। দত্তক গ্রহণ সময়ে ১০০০০৲ টাকার অধিক ব্যয় দরিদ্র নারায়ণকে বিবিধ উপায়ে খাদ্য সামগ্রি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া প্রত্যেককে ২৲ ও একটাকা হিসাবে দান করিয়াছিলেন। ১৩২৫ সনের ২০শে ভাদ্র সোমবার তাঁহার মৃত্যু হয়, দত্তক পুত্রের অল্প বয়স নিবন্ধন ষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডের পরিচালনাধীনে আছে। রাণীর দত্তক পুত্র শ্রীযুত হেমেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী কলিকাতা অবস্থান করতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি Matriculation পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম ও আই এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনিও ইঁহার মাতা ও পিতামহীর ন্যায় সৎকার্য্যানুরাগী। ময়মনসিংহের নব প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে নিজ জননীর নামে একটী ওয়ার্ড স্থাপন জন্য ২৫০০০৲ ব্যয়

করিয়াছেন। তদনুযায়ী এই হাসপাতালে রাণী দিনমণি নামক একটী ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা Medical College অন্তর্গত Tropical school of Medicine সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে নিজ জননীর নামে একটী Bed প্রতিষ্ঠার জন্য ১৫০০০৲ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

ইনি এই অল্প বয়সে যেরূপ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যত্ন ও দানশীলতার পরিচয় দিতেছেন তাহাতে ভরসা হয় যে ভাবী জীবনে দেশ তাঁহার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ দানশীলতার পরিচয় দিয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

বংশতালিকা।
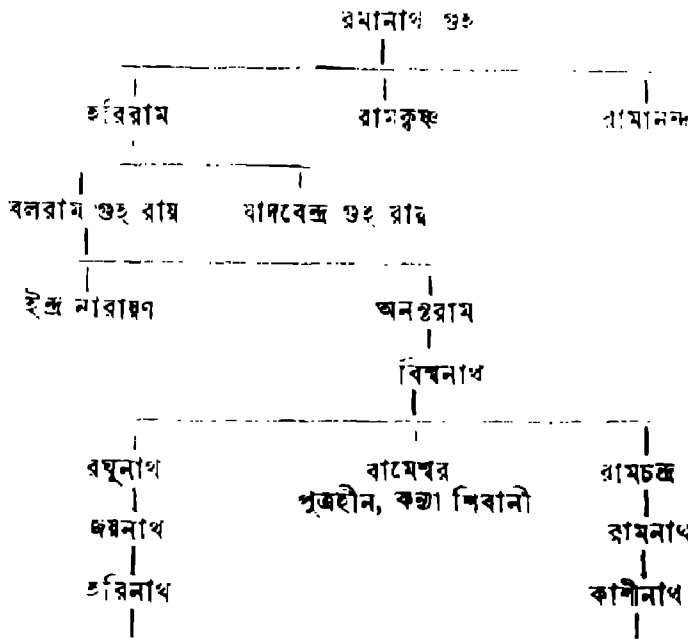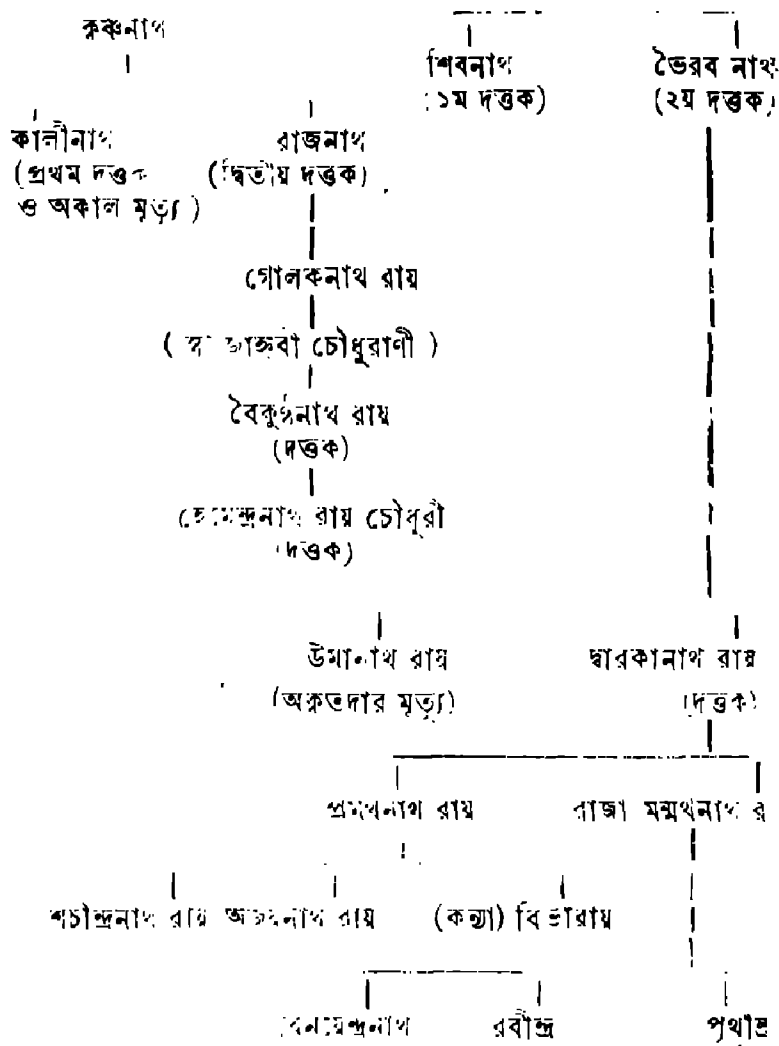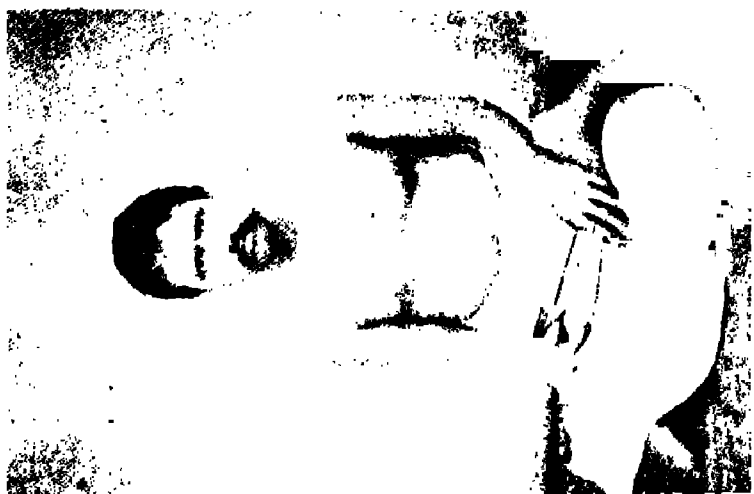
কৃষ্ণনাথ

শিবনাথ
(১ম দত্তক)

ভৈরব নাথ
(২য় দত্তক)

কালীনাথ
(প্রথম দত্তক
ও অকাল মৃত্যু)

রাজনাথ
(দ্বিতীয় দত্তক)

গোলকনাথ রায়

(স্ত্রী জাহ্নবী চৌধুরাণী)

বৈকুণ্ঠনাথ রায়
(দত্তক)

হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
(দত্তক)

উমানাথ রায়
(অকৃতদার মৃত্যু)

দ্বারকানাথ রায়
(দত্তক)

প্রমথনাথ রায়

রাজা মন্মথনাথ রা

শচীন্দ্রনাথ রায় অজয়নাথ রায় (কন্যা) বিভা রায়

দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র

পৃথ্বীন্দ্র

৩

৪

৫

সাঁকরাইলের সেনবংশ।

সাঁকরাইলের সেনবংশের আদি বাসস্থান ফরিদপুর জিলার পাঁচথুপী গ্রামে। ইঁহারা বৈদ্যকুলোদ্ভব পাঁচথুপীর মাধব বংশীয়। বর্ত্তমান কেদার নাথ সেন হইতে উর্দ্ধতন ষষ্ঠ এবং কৃষ্ণনাথ ও যদুনাথ সেন হইতে উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ রাধাকান্ত সেন টাঙ্গাইল মিউনিসিপাল টাউনের অন্তর্ভুক্ত সাঁকরাইল গ্রামে মণ্ডোল বংশে বিবাহ করেন এবং তদীয় পুত্র মহাদেব মাতুলালয় সূত্রে সাঁকরাইল গ্রামেই বাস করেন। গুরুপাট ইঁহাদের যশোহরের অন্তর্গত বনগ্রাম নামক গ্রামে। ইঁহারা ফরিদপুর ত্যাগ করিলেও ফরিদপুর ও যশোহরের সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ভাবে চলিতেছে। মহাদেবের পৌত্র গদাধর ফরিদপুরের অন্তর্গত বালিয়াখোড়া বিবাহ করেন, ইহা ছাড়া ইঁহাদের অনেক আদান প্রদানই ফরিদপুর ও যশোহরের সহিত চলিতেছে। টাঙ্গাইল অঞ্চলে বাস ইঁহাদের কম দিন নয়, কিন্তু কুটুম্বিতার বন্ধন টাঙ্গাইল অঞ্চলে একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ফরিদপুর ও যশোহরের দুর্গম প্রান্তেও পূর্ব্ব আকর্ষণে একাল পর্য্যন্তও আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

গদাধর হইতেই ইঁহাদের বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে মহাদেবও তৎপুত্র রামকৃষ্ণ কি ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার কোন বিশেষ বিবরণ এখন আর পাইবার উপায় নাই; তবে বর্ত্তমান বিস্তৃত ভদ্রাসন বাড়ীরই একাংশে যে তাঁহাদেরও আবাস স্থান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন হেতু নাই, কিন্তু জমির পরিমাণ কি ছিল তাহা সংগ্রহ করা সুসাধ্য নহে। মহাদেবের অন্যতম পুত্র রামকৃষ্ণ নামে রামচরণ শর্ম্মার দত্তা ভদ্রাসন বাড়ীর ১১৯৫ সনের

একখানি পাট্টা পাওয়া গিয়াছে মাত্র। মহাদেব ও মহাদেবের তিন পুত্র রামকৃষ্ণ, দুলাল কৃষ্ণ, ও শ্রীকৃষ্ণ মধ্যে কে কখন জন্মগ্রহণ করেন ও কে পূর্ব্বে কে পরে পরলোক গমন করেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া এখন স্থির করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। দুলাল কৃষ্ণ নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার পিতা কি স্ত্রী জীবিত ছিলেন কি না জানা যায় না। অবশিষ্ট দুইপুত্র রামকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ পিতার মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দুইপুত্র মধ্যে পঞ্চানন পুলিসে দারোগা ছিলেন। পঞ্চানন ও তৎসহোদর ব্রজনাথ গদাধরের সহিত এক বাড়ীতেই, কিন্তু পৃথক প্রকোষ্ঠে কতদিন পৃথকান্নে বাস করিয়াছিলেন তাহা বলা দুরূহ। পঞ্চাননের পৌত্র ৺অঘোরনাথ ১৩০৭ সনের ৭ঠা শ্রাবণ গদাধরের বংশধর স্বর্গগত আনন্দনাথ তদনুজ কেদারনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণনাথ বরাবর একখানি স্বত্ব ত্যাগ পত্র সম্পাদন করিয়া দিয়া ১৩০৮ সনের ২৫শে বৈশাখ তারিখে স্বতন্ত্র বাড়ীতে উঠিয়া যান।

রামকৃষ্ণের গদাধর, গঙ্গাধর ও কৃষ্ণপ্রসাদ নামে তিন পুত্র জন্মে। ইহারা তিন ভ্রাতায় বহুকাল একান্নে বসবাস করিয়াছিলেন। শেষে যখন পরিবারের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এক বাড়ীতে বসবাস অসম্ভব হইয়া উঠিল তখনই কৃষ্ণ প্রসাদের পুত্র জয়নাথ ১২২৬ সনের ৫ই কার্ত্তিক কৃষ্ণ মঙ্গল দাসের নিকট খোস কবালায় জমি খরিদ করিয়া গ্রামের পশ্চিমাংশে বেলতা ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে (যাহা এখন সাঁকরাইল নামেই খ্যাত) বসতবাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এসময়ে গদাধর পরলোক গমন করিয়াছেন। বিষয় আসয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য গদাধরের সুদক্ষা পত্নী রামপ্রিয়া দেবীর সহযোগে জয়নাথকেই করিতে হইত।

গদাধর কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঠিকরূপে বলিবার কোন নিদর্শন নাই। শৈশবাবস্থার কথাও কিছু জানা যায় না।

তৎপুত্র ভৈরব নাথের যেরূপ নিয়মিত ভাবে দৈনন্দিন লিপি (Diary) রাখিবার অভ্যাস ছিল তাহাও যদি দিনাজপুরস্থ বাসাবাড়ীর সঙ্গে পুড়িয়া না যাইত তবে বোধ হয় এ পরিবারের ইতিহাস লোক সমাজে একটী উচ্চদরের বিবরণ বলিয়া গৃহীত হইত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ইঁহাদের দিনপাত সুখ স্বচ্ছন্দে হইত মনে করা যাইতে পারে না। সেকালে জানি না কেমনে জনশ্রুতিমূলে ইঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন পূর্ণিয়াতে একটি সুশিক্ষিত মৌলবীর মক্তব আছে। ইনি এবং ইঁহার স্বগ্রামবাসী অকৃত্রিম সুহৃদ স্বর্গগত চন্দ্রনারায়ণ মুন্সী মহাশয় পারসীক ভাষায় বিদ্যার্জ্জন জন্য সেই মক্তবের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই আর্থিক অবস্থা বলাই নিষ্প্রয়োজন। পদযুগলের উপরই নির্ভর করিয়া ইঁহাদিগকে এ সমুদয় পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। ইঁহাদের অধ্যয়ন শেষ হইলে উভয়েই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দিনাজপুরে উপস্থিত হইয়া কালীতলাস্থ পর-লোকগত উকীল কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় উঠেন। সেন মহাশয়ের বাসায় এক সময়ে চন্দ্রনারায়ণের আবাস ছিল এবং ইহার পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কার করিয়া মহারাজার এলাকায় গদাধর আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। গদাধরের বাসারই আয়তন বৃদ্ধি করিয়া তাহাতে তাঁহার বংশধরগণ এখনও বসবাস করিতেছেন।

পূর্ণিয়া হইতে দিনাজপুর পৌছিয়া বন্ধুদ্বয়ের ভাগ্য পরীক্ষার কথা মনে হইল। চন্দ্রনারায়ণ প্রভিন্সিয়াল কোর্টে প্রবেশ লাভ করিলেন। গদাধরের উদরান্নের সংস্থান হইল, পরে ফৌজদারী মহাফেজের পদ শূন্য হইলে চন্দ্রনারায়ণ গদাধরকে লালাবাবুর চিঠি সহ আসিতে বলেন; তদনুসারে গদাধর আসিয়া মহাফেজের পদে নিযুক্ত হন। East India Company যখন মহারাজার হাত হইতে ফৌজদারী আদালতের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, সেই সময় মহারাজার অনুরোধ ক্রমে কোম্পানীর

কর্ম্মচারীরা গদাধরকে ঐ আফিসে রাখেন। কতদিন তিনি এ কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। শোনা গিয়াছে মহাফেজ পদে থাকা কালেই অসুস্থাবস্থায় বাড়ী আসিয়া এক রামনবমী তিথিতে তিনি পরলোক গমন করেন। খুব সম্ভবতঃ ১২১৯ সনে তাঁহার ইহলীলা সাঙ্গ হয়। কারণ ১২২০ হইতেই কাগজ পত্রে তাঁহার পরিবর্ত্তে তাহার পত্নী রামপ্রিয়া চৌধুরাণীর নাম দৃষ্ট হয়। গদাধরের পুত্র ভৈরবনাথ ১২১৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃবিয়োগ চারি বৎসর বয়সে হয়। ইহা হইতেও ঐরূপ সময়েই গদাধরের পরলোক ঘটিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি ২৫।৩০ বৎসরের ন্যূন বয়সে পূর্ণিয়াতে পাঠ শেষ করিয়া দিনাজপুর চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন মনে হয় না; সুতরাং সেই সময় হইতে ইং ১৮১২ সনে তাঁহার মৃত্যু কালে কত বয়স হইয়াছিল এবং তাহা হইতে তাঁহার জন্মের সময়ও কতকটা সূক্ষ্মরূপে না হউক মোটামুটি বুঝা যাইতে পারে। বিবাহটা এ পরিবারে অনেকেরই একাধিক; ইহারও দুইটী বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তবে এক পরিবার থাকিতে কেহ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতেন না। প্রথম পক্ষে তিনি মাণিকগঞ্জের অধীন মৌহালী গ্রামে ৺লক্ষ্মীকান্ত দাস মহাশয়ের ভগ্নীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই পত্নী পরলোক গমন করিলে ফরিদপুর মধ্যে বালিয়াখোড়া গ্রামে রামপ্রিয়া দেবীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইনি স্বামীর মতই তেজস্বিনী ছিলেন। এ বিবাহের ফলে দুইটী কন্যা এবং ভৈরবনাথ নামে একটী পুত্র জন্মে। গদাধর ও চন্দ্রনারায়ণ বাস ভূমি সাঁকরাইলের উন্নতি আনয়নের ভগীরথ ছিলেন। ইঁহাদেরই দৃষ্টান্তে গদাধরের কুলপুরোহিত বালক গৌরমোহন শ্রাদ্ধের চাল কলা সহ রাস্তার পিচ্ছিলে পড়িয়া যাইয়া সেদিনের অন্ন সংস্থান ফেলিয়া দিয়া বাড়ী গিয়া এই ক্ষতি জন্য প্রহৃত হন। যে বাবসায়ে

সামান্য চাল ও কলা দৈবে পড়িয়া গেলেও আহারের অসংস্থানে ভোজন বন্ধ হওয়া হেতু প্রস্তুত হইতে হয় তেমন ব্যবসা ত্যাগ করিতেই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া তিনি গদাধরের নৌকার পাটাতনের নিম্নে পলাইয়া দিনাজপুর আসেন। ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ও এই সময় দিনাজপুর আসেন। দিনাজপুরে গৌরমোহন ফৌজদারীর পেস্কার ও ভুবনমোহন জজের সেরেস্তাদার নিযুক্ত হইয়া উভয়েই সুন্দর সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তৎকালে চাকরীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এমন বিজাতীয় ঘৃণা ছিল যে গৌরমোহনের অর্জ্জিত অর্থ তাঁহার পিতা স্পর্শও করেন নাই।

এই সময় তৎকালীন মহারাজার ষ্টেটে বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে দেবী সিংহের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত প্রজাকুল একেবারে মরিয়া হইয়াছিল; এখন কি সূত্র ধরিয়া একবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজষ্টেটের খাজনা আদায় জন্য রাজসরকারের দেয় অনেক রাজস্বও বাকী পড়িতে লাগিল এবং রাজস্ব দায়ে অনেকগুলি মহালও নীলাম হইয়া গেল শুনা যায়। রাজসরকারে উচ্চ পদস্থ কার্য্যকারকদের মধ্যেও অনেকে নিমকের সর্ত্তে পদাঘাত করিয়া নিলামী সম্পত্তি ক্রয়ে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গদাধর এই সময় নদীয়া জেলান্তর্গত লাথুরিয়া গ্রাম নিবাসী তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রনারায়ণ সেনের সঙ্গে দিনাজপুরে থাকিতেন। কোন সম্পত্তি নীলামে খরিদ করিতে গদাধরের প্রবৃত্তি ছিল না। তৎকালীন কালেক্টার সাহেব তাঁহাকে সম্পত্তি অর্জ্জনের মাহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ ত্যাগ না করিতে যথোচিত উপদেশ দিলেন, কিন্তু গদাধরের কিছু দিন রাজসরকারের অন্নেই গ্রাসচ্ছাদনের সংস্থান হইয়াছিল এবং রাজষ্টেটই তাঁহার দুরবস্থার প্রথম আশ্রয়দাতা; তাই মহারাজার সম্পত্তিতে লোলুপদৃষ্টি দিলে ধর্ম্মে সহিবে না ভয়ে তিনি সাহেবের কথা কাণে তুলিলেন না। তাঁহার মনোগত ভাব জজ সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে রাজবাড়ী যাইয়া অনুমতি

প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে তিনি নিঃশঙ্কিত চিত্তে রাজবাড়ী যাইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাঁহার অভাবনীয় সততা ও আনুগত্যের প্রতিদানস্বরূপ রাজকর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে রাজসম্পত্তি টিকিবে এমত বোধ হয় না ; তবে তুমি নিলে এ দুঃখের মধ্যেও তাঁহাদের চিত্তে একটুকু সুখের রেখাপাত হইবে। এখন উপস্থিত দ্বিতীয় অন্তরায় অর্থাভাব, অবস্থার অস্বচ্ছলতা বশতঃ কোন মহালই সমগ্র খরিদ করা ত পরের কথা নিজের যেটুকু কিনিবার ইচ্ছা তাহার মূল্যও ঘর হইতে দিবার শক্তি নাই। তাই ফরিদপুর নিবাসী ধর্ম্মনারায়ণ সাহা চৌধুরীর দিনাজপুরস্থ কুঠীর সহিত বন্দোবস্ত হইল, তাঁহার খরিদ অংশের মূল্যের টাকা কুঠী হইতে সরবরাহ হইবে, সম্পত্তির মুনাফা হইতে সুদ ও আসলে টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই গ্রহণ করিবেন না। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহার প্রত্যেক খরিদে ৻১০ অর্দ্ধ আনা হিস্যা কওলা দ্বারা ধর্ম্ম নারায়ণ সাহাকে দিবেন। এইরূপে প্রথম মহাল পরগণে শালবাড়ী তৎকালীন বিভাগানুযায়ী জেলা রাণীগঞ্জ ১১½ মৌজা ২০৩ নং লাট কলানগর ১৭৯৮ সনের ২৬শে এপ্রিল মোতাবেক ১২০৫ সনের ১৬ই বৈশাখ শিক্কা ৫০৫০৲ কোম্পানী ৭৯৫৩৵১০ পণে কোম্পানী ৮৪৮৩।৴১০॥ রেভিনিউ যুক্ত মতে ১২০৪ সনের বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম খরিদ হইল। এই মহালে গদাধর সেন ।৴০ ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতার রাজা ৺শ্যামাশঙ্কর রায় মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ পিতামহ ৺পঞ্চানন দাস ৵০, গদাধরের ভাগিনেয় চন্দ্রনারায়ণ সেন ৵১০ এবং মধুসূদন সাহা চৌধুরীদের জন্য ৻১০ অংশ হইল। এই সম্পত্তির বর্ত্তমান বার্ষিক আদায় বোধ হয় ৩০০০০৲ টাকার কম নয়। তেওতার রাজাদেরও দিনাজপুরে এই প্রথম সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আবির্ভাবের সূচনা। এইরূপে গদাধর চন্দ্রনারায়ণ ও পঞ্চানন দাসের সম্পত্তি খরিদ একত্রে হইতে চলিল।

গদাধর সম্পত্তি খরিদ করিয়া তাঁহার নিজাংশ ।৶০ হইতে ।/০ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নাথকে ১২১৯ সনের ২১শে ফাল্গুন দান পত্র দ্বারা দিয়াছিলেন। বাকী ৵০ আনা অংশ নিজ ভার্য্যা রামপ্রিয়া দেবীকে দিলেন। ১২১৯ সনের পরে গদাধরের আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কোন কাগজ পত্রেও নাম দেখা যায় না; শুনাও যায় ১২১৯ সনে পূজার সময় বাড়ী আসিয়া নাকি তিনি আর দিনাজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। এই সব হইতেই মনে হয় গদাধর ১২১৯ সনেই মানবলীলা সংবরণ করেন। গদাধর পরলোক গমন করিবার সময় তাঁহার পত্নী রামপ্রিয়া, একমাত্র পুত্র ভৈরবনাথ ও কন্যা ব্রহ্মময়ীকে রাখিয়া যান।

গদাধরের পত্নী রাম প্রিয়া ও গদাধরের মতই উদ্যমশীলা ও তেজস্বিনী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে বিষয় সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণ এবং পঞ্চম বর্ষীয় নাবালক পুত্রের শিক্ষা দীক্ষার ভার নিজেই পরিচালনা করিয়াছেন। ভৈরবনাথের অলৌকিক দেব চরিত্র, ধৈর্য্য, অসাধারণ সততা এবং অপার্থিব সন্ন্যাস জ্ঞান সমুদয়ই মাতৃদত্ত সৎ শিক্ষার ফল।

গদাধরের মৃত্যুর পর যাবতীয় স্বজন সকলেই শঙ্কিত হইয়াছিলেন নাবালকের ঘরে শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় বাহুল্য সঙ্গত হইবে কি না। পতি-শোকাতুরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা রামপ্রিয়া দাঢ্য সহকারে বলিলেন, বিষয় সম্পত্তি সমুদয়ই তাঁহার কৃত, তাঁহার পারলৌকিক হিতার্থে তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির এক বৎসরের মুনাফা ব্যয় করিতে হইবে, একথার উপর তাঁহার অন্তরের দিকে চাহিয়া আর কাহারও কথা বলিবার স্পৃহা থাকিল না। দেশ বিদেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া যথাযোগ্য সৎকৃত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; দীন দুঃখী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্য ও বিদায় পাইল, ভট্ট রাঘবদিগের কবিতার লহর ও রামাত সন্ন্যাসীদিগের শঙ্খধ্বনি মাসাধিক কালেও নিবৃত্তি হইল না।

শ্রাদ্ধ ত হইয়া গেল ইহার পরে গদাধর পত্নীর খেয়াল, হইল পতির স্বর্গ কামনায় এবং প্রজাকুলের জলকষ্ট নিবারণ কল্পে পতির অর্জ্জিত সম্পত্তি মধ্যে পুকুর খনন করাইয়া সপুত্র নিজে যাইয়া তাহা উৎসর্গ করিবেন। তাহাও কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। ঠাকুর গাঁ এলাকায় বর্ত্তমান গড়েয়া কাছারীর সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে সুদীর্ঘ একটী পুকুর খনন হইল; সংসারের ও নিজ জীবনের একমাত্র সম্বল বালক পুত্রটীকে সঙ্গে নিয়া সাত সমুদ্র তের নদী হেলায় অতিক্রম করিয়া রামপ্রিয়া যথাসময়ে গড়েয়া কাছারীতে পৌছিলেন। এমন স্বধর্ম্ম পরায়ণা নারীর আগমনে গড়েয়ার ভূমি পবিত্র হইল, প্রজাকুল আনন্দে সোৎসাহে যোগদানপূর্ব্বক কার্য্যের সৌষ্ঠব ও গৌরব বৃদ্ধি করিল।

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অতিথি সেবা ইহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। প্রতিদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাদা ভর্ত্তি ক্ষীর ও চিড়া মুড়ি মজুত থাকিত; রামপ্রিয়া নিজে বসিয়া থাকিতেন। অতিথি, অভ্যাগতের ভোজনাদি যথেষ্টরূপে সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া তবে নিদ্রার জন্য উপাধানে মস্তক দিতেন।

এই প্রসঙ্গে একটি লোকের কথা উল্লেখ না করিলে বোধ হয় এ ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভৈরবনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বিষয় সম্পত্তি মাতার নামেই চলিতে লাগিল। পুত্র ভৈরবনাথ যথারীতি শাসন সংরক্ষণ করিতে থাকিলেন। মাতা রামপ্রিয়া বাড়ী থাকিতেন। এই সময় দেবসেবা, অতিথি সেবা-মুখরিত এবং আত্মীয়স্বজন পূর্ণ বাড়াখানর তত্ত্বাবধানের ভার যে মহাপুরুষের উপর ছিল তাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সেন। তাঁহার সহিত ইহাদের জ্ঞাতিত্ব বা কুটুম্বিতা কিছু ছিল না। তিনি সুখে দুঃখে সর্ব্ব কার্য্যে ভৈরবনাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ভৈরবনাথও তাঁহাকে কনিষ্ঠের অধিক স্নেহ ও বাৎসল্য করিতেন। ভৈরবনাথের পুত্রগণ তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন, পায়ে পড়িয়া প্রণাম

করিতেন, কথার পৃষ্ঠে কথা কহিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। বাড়ীর কর্ত্তার ন্যায় বধূদের নিকট তাঁহার কর্ত্তা আখ্যা ছিল। ইনি সর্ব্ব কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। ইঁহার হাতে বরাদ্দ ধরা না হইলে গ্রামের কোন বাড়ীর কোন কার্য্য হইত না এবং সমস্ত কার্য্যে ইনি চারচক্ষু ছিলেন। তিনি যেরূপ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন তিনি যদি এ পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্ত্তে গ্রামের উদ্যোগী পুরুষদের ন্যায় সেকালে গৃহের বাহির হইয়া পড়িতেন, তবে তিনিও নিশ্চয় অন্যান্যের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু ভগবানের বিধান ভিন্ন, জানি না কেন তিনি বাহির হন নাই।

এক দিন তাঁহার কেমন সন্দেহ হইল লোকজনের কার্য্য শিথিলতায় অতিথিসেবা সুচারুরূপে চলিতেছে না। পরীক্ষার জন্য তিনি শ্রীহট্ট প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ সাজিলেন এবং মৈথিলী ভাষায় কথা বলিতে বলিতে লাঠি ঠক ঠক শব্দে অন্ধকারে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অতিথের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; ভৃত্য উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিল দেবতার কি আহার হবে? ব্রাহ্মণবেশী অতিথি দাতের ব্যথায় ক্লিষ্ট ভাব দেখাইয়া মৈথিলী ভাষায় বলিলেন, বড় দন্তের পীড়া কিছু খাইতে পারি না, দুধ দৈ হইলে একরূপ হয়। বাড়ীর ভিতর সংবাদ পৌঁছিল, দুধ দৈ আম কাঁঠাল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হইল, অতিথি প্রবর সকল জিনিষেরই যথোচিত সৎকার করিয়া আচমনান্তে নিজ ভাষায় "ভোলাদা পাণ আনত" বলাতেই, ভোলা ভাণ্ডারীর চৈতন্য হইল। তাহাকে পরীক্ষা করিতেই সেন মহাশয়ের আজ এ সাজ; সে জোরে গোল করিতে লাগিল। অতিথি প্রস্থান করিলেন, ক্রমে কথা অন্দরে পৌঁছিল, রাম প্রিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার নারীহৃদয়ে স্নেহের উৎস বহিল। পরদিন আবার সেন মহাশয়কে আহ্বান করিয়া স্বহস্তে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইলেন।

ভৃত্য ও ভৃত্যবর্গকে এ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যতীত আর কাহাকেও নাম করিয়া ডাকিতে শুনা যায় নাই। সকলকে দাদা, খুড়া, জেঠা বলিয়া অভিহিত হইতে হইত এবং অন্দরে বাহিরে সেইরূপ সম্মান পাইতে দেখিয়াছি—সে যত কেন অন্ত্যজ জাতি হোক না।

ইনি ১২৩৩ সনের ১২ই অগ্রহায়ণ একমাত্র পুত্র ভৈরবনাথের জীবন সঙ্গিনী যশোহরের অধীন দক্ষিণ কালীয়া নিবাসী মৌদ্গল্য অরবিন্দ বংশীয় স্বর্গগত রাজকিশোর দাশ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা হরসুন্দরীকে নির্ব্বাচনপূর্ব্বক গৃহে আনিয়া পুত্র বধূ মুখ দর্শনে জীবনের প্রধান একটী কার্য্যে তৃপ্তিলাভ করেন। ১২৭৭ সনে ভৈরবনাথের ঘরে প্রথম সন্তান স্বর্গগতা শিবমোহিনীর জন্ম হয়। দ্বিতীয় সন্তান দুর্গানাথ। ইহার মনের বলের পরিচয় সর্ব্ব কার্য্যে সম্যক প্রতিভাত হইত। ১২৪৫ কি এইরূপ কোন সময়ে শারদীয়া পূজার তিথির মান বড় কম ছিল, প্রতি মাসে সাতটী মূর্ত্তির ষোড়শোপচারে পূজা অসম্ভব বলিয়া শুধু গন্ধে পুষ্পে অর্চ্চনা হইবে অথচ কাঠামে লোক দেখান পুতুল সাজাইতে হইবে একথা কোনরূপ তাঁহার মনে থাপ খাইল না। তিনি এরূপ প্রতিমা সাজাইতে রাজী হইলেন না। পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া তাঁহাদের ব্যবস্থানুযায়ী চারটী মূর্ত্তি কমাইয়াছিলেন। শুধু দেবী ও অসুর, সিংহ এই ত্রিমূর্ত্তি রহিয়া গেল, সেই হইতে এ পর্য্যন্ত গদাধরের বংশধরদের আলয়ে দুর্গোৎসব ও বাসন্তীতে এই ত্রিমূর্ত্তিরই অর্চ্চনা হইয়া আসিতেছে। একালের দুর্ব্বল চিত্ত লোক হইলে বংশের বা কোন হানি হয় এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। একাল কেন তখনও বাঙ্গালা দেশে আর কোথাও কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

দুর্গানাথের শৈশবে পরলোক গমনের পর হইতেই ভৈরবনাথের ঘরে একটী পুত্র সন্তান দেখিয়া চক্ষু বুজিতে রামপ্রিয়ার প্রাণের প্রবল

আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল। ১২৪৯ সনে ভগবানের চরণে তাঁহার নিবেদন পৌঁছিল। এই সময়ে তাঁহার বংশের তিলক, পরহিতব্রত দ্বিতীয় পৌত্র গোবিন্দনাথের জন্ম হইল। গোবিন্দনাথের জন্মে রামপ্রিয়ার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে দিনাজপুরে পুনরায় কিছু জমিদারী সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে; রামপ্রিয়া প্রাণে সাড়া পাইলেন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার গৃহে সমভাবেই আছে। আত্মীয়স্বজন যাঁহারা প্রতিমা ত্রিমূর্ত্তি করাতে অন্ধ সংস্কারের বশে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সে আতঙ্কের ভিত্তি টলিয়া গেল। গোবিন্দনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শিবমোহিনী মাণিকগঞ্জ মহকুমান্তর্গত মোহালী নিবাসী হরচন্দ্র দাশ গুপ্তের সঙ্গে পরিণীতা হইয়া অল্পকাল মধ্যে বৈধব্যাবস্থায় পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসেন। তদবধি আমরণ পিতৃগৃহে কর্ত্তৃত্ব করিয়া ১২৯৮ সনের ৯ই বৈশাখ লোকান্তরিতা হন। গোবিন্দনাথের জন্মের কিয়ৎকাল পরে গদাধরের পত্নী বিধবা পৌত্রী শিব মোহিনীকে সঙ্গে নিয়া জগন্নাথ দর্শনে পুরী যাত্রা করেন। ধর্ম্মের নামে তখন প্রাণে আকুল আহ্বান আসিতে চিত্ত বিকল হইয়া উঠিত, তাহাতেই দুর্গম রাস্তার দুঃখ ক্লেশ মনে উদয় হইবার অবসর আর হইত না। যে পথে একদিন ভাবে বিভোর গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বনে শুধু অনন্য দেবতাধ্যান হইয়া চলিয়াছিলেন, রামপ্রিয়াও সেই ভাবে নিজকে অনুপ্রাণিত করিয়া সেই পথে চলিয়াছেন ইহা এ বংশের পক্ষেও কম গৌরবের কথা নহে। সে কালে ইহা হইতে ধর্ম্মপ্রাণতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? পুরী হইতে ফিরিয়া আর অধিকদিন রামপ্রিয়া জীবিতা ছিলেন না। ১২৫১ সনের ১০ই পৌষ পুত্র ভৈরবনাথ ও পৌত্র গোবিন্দনাথকে রাখিয়া যশের রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া রামপ্রিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। ইহার পর বৎসরাধিককাল গোলযোগে কাটিয়া গেল। ১২৫৩ সনে বিষয় সম্পত্তিতে ভৈরবনাথের নিজ নাম জারী হইল।

ন্যায়নিষ্ঠ, পূতচরিত্র ভৈরবনাথ কর্ত্তব্য সমাধান জীবনের মহাব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সম্পন্ন গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐশী শক্তি প্রভাবে তদুপযুক্ত গুণাবলীতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। "অমানিত্বং অদাম্ভিকম হিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম, আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাতম বিনিগ্রহঃ" ইত্যাদি সমস্ত গুণই পৃথকভাবে তাঁহাতে সমাবিষ্ট দেখা যাইত। নিজ জমীদারী কাছারীতে তিনি ফরাসের সম্মুখে মাদুরে উপবেশন করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিতেন। আমলাবর্গ ফরাসে বসিয়া লেখাপড়া করিতেন। দ্বিপ্রহরে বিশ্রামান্তে তামাকের জন্য ভৃত্যবর্গকে ডাকিলে যদি তাহাদের কষ্ট হয়, তাই নিজে কলিকাটি হস্তে লইয়া ভৃত্যদের ঘরে চলিয়া যাইতেন। সেখানে অহোরাত্র কুণ্ডে কাঠের গুড়ি জলিত; তাহা হইতে আগুন সংগ্রহ করিয়া ঘরে আসিয়া ধূম পানে অবসাদ দূর করতঃ হস্ত মুখ ধুইয়া গৃহ কার্য্যাদি কিঞ্চিৎ পর্য্যবেক্ষণান্তর বন্ধু সমাগমে বা সুধী সমাজে ধর্ম্মালোচনায় বৈকালটুকু অতিবাহিত করিতেন এবং সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহ্নিক সমাধা করিয়া জপে বসিতেন। রাত্রি দেড় প্রহরের সময়ে ভোজনের জন্য বাড়ীর ভিতর হইতে আহ্বান আসিত। তখন ভোজন সমাধা করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার জপে বসিতেন। রাত্রি ২।২½ টা পর্য্যন্ত জপে কাটিত, তৎপর শয়ন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতরুত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যাদি ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাধা পূর্ব্বক কাছারীতে কাজ কর্ম্ম যাহা থাকিত সমাধা করিয়া স্নানাহ্নিক সম্পন্ন করতঃ বেলা বারটার সময়ে আত্মীয়পরিজনসহ মাধ্যাহ্নিক আহার করিয়া পুনরায় বিশ্রাম করিতেন। এইরূপ দিনের পর দিন তাঁহার কার্য্য ঘড়ির কাটার মত চলিয়া যাইত। পৈত্রিক আমলের শাল বনাত-গুলি আলমারীতে পোকায় কাটিত, নিজে তৎকালীন মারকিনের চাদর দোপাটা করিয়া শীতবস্ত্র স্বরূপে ব্যবহার করিতেন, অথচ অর্থরক্ষায়

একটুও মন ছিল না, সমস্তই দেব সেবা, ব্রাহ্মণ সেবা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও তীর্থ ভ্রমণ পুরাণ পাঠাদিতে ব্যয়িত হইত। তিনি বাহ্যিক জাঁকজমক একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার গুরুদেব ও পুরোহিতবর্গের সম্পত্তি বিশেষ ছিল না। ইনিই তাঁহাদিগকে সম্পত্তি প্রদান করেন। কেহ ইঁহাকে কখনও দিনাজপুরের মত শ্রেষ্ঠ চাউলের স্থানে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে বাস করা সত্ত্বেও দাদখানী বা কাটারী-ভোগ চাউল মুখে তুলিতে দেখে নাই। কথাচ্ছলে এই কথা একবার উঠিলে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়াছিলেন, বাবা চাকুরে লোকের সন্তান, তিনি মোটা সোটাই ভালবাসেন, আমরা জমিদারের সন্তান আমরা ওসব বাজে জিনিষ খাইতে যাইব কেন? প্রতিবেশী রোগীদের প্রথম পথ্যের চাউল ইঁহার বাড়ী হইতে জাতি ধর্ম ও ছোট বড় নির্বিশেষে অকাতরে বিতরিত হইত। মধু ও পুরাতন ঘৃত ইঁহার বাড়ীতে বিতরণ জন্য বার মাস মজুত থাকিত। দুস্থ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে মৃতদেহ সৎকারের কাষ্ঠ বর্ষায় প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া সম্বৎসর বিতরিত হইত। স্বজাতি মধ্যে কাহারও মৃত্যু সংবাদ কর্ণে পঁহুছিলে আহ্বানের প্রতীক্ষা না করিয়া দিবারাত্রি শীত গ্রীষ্ম মনে না করিয়া গামোছাখানি ঘাড়ে নিয়া বিপদগ্রস্তদের বাড়ী উপস্থিত হইতেন; লোকে দেখিয়া অবাক হইত। এ দৃষ্টান্তে অনেকেরই তখন প্রতিবাদ বা আপত্তি করিতে আর ভরসা হইত না। কেহ প্রার্থী হইয়া ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কম হৌক বেশী হৌক কাহাকেও রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইত না। যত অসময়ে বা যত গুরু ভোজন করুন না কেন ইঁহার কখনও হজমী ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না। আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহার বদহজমের কথা কেহ শুনে নাই। কাঁঠাল ও দধি চিড়া ইঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। যাঁহারা ইহাতে প্রীতি দেখাইতেন, তাঁহাদের উপর ইনি বড় সন্তুষ্ট হইতেন।

আর কেহ নিতে সঙ্কুচিত হইলে বলিতেন, ওসব বাবুদের দিও না আমাকে দাও।

ইঁহার স্থৈর্য্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। একদা ইঁহার এক জ্ঞাতি-কন্যার বিবাহে ইঁহার বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ সকলে সে বাড়ীতে উপস্থিত। সন্ধ্যা হইয়াছে, সকলেই বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের আহার সমাধা হইয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দনাথও আহারান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। আনন্দময় বিবাহ-ভবনে হাসি, ঠাট্টা, গল্প, গুজব পুরাদমে চলিতেছে। এমন সময় বর আসার বাদ্যোদম শুনা যাইতে লাগিল। কেহ প্রত্যুদ্গমন করিতেছে বা প্রসেসন দেখিতে বাহিরে আসিলেন, হঠাৎ গোবিন্দ নাথ বলিয়া উঠিলেন তাঁহার শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না এবং তাঁহার বন্ধু তৎকালীন সাঁকরাইল স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের হাটু আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাই উপাধান করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আর সে চক্ষু উন্মীলিত হইল না, নিমিষে বিনা যন্ত্রনায় সব ফুরাইল। উৎসবের বাড়ী একি দুর্ঘটনা! কাণা ঘুষা চলিতে লাগিল, কেহ ডাক্তার আনিতে ছুটিলেন। কথাটা ভৈরবনাথের কাণে একরূপ পৌছিল! তিনি এরূপ গুরুতর আঘাতে সাময়িক যেন একবারে ভুলিয়া গেলেন। জ্ঞাতির জাত কুল রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং বর বাড়ী পৌছিবামাত্র বরকে বাড়ীর ভিতর নিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাটীকে পাত্রস্থা করিয়া দুর্গা দুর্গা শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগৃহে আসিয়া শয্যা-গ্রহণ করিলেন। ১২৬৬ সনের ১৪ই কার্ত্তিক ভৈরবনাথ সপ্তদশ বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দনাথের ধন্বন্তরী বৈদ্যবল্লভ বংশীয় ৺ভুবনমোহন সেন গুপ্তের সপ্তম বর্ষীয়া একমাত্র কন্যা দ্রবময়ীর সহিত বিবাহ দেন। হঠাৎ অজানিতভাবে ভগবান তাহাকে ভোগ সুখের আশ্রয় হইতে সন্ন্যাসিনী সাজাইলেন। কেনই বা এই স্বর্গভ্রষ্ট দেবোপম স্বামীকে পূজা

করিতে অধিকারিণী করিয়া এই অল্প সময়ে আবার সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন, পূর্ব্বজন্মের কি পাপের ফলে তাঁহার আজ এ দশা হইল তাহা একমাত্র সেই বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন। জানি না সংসারের লোক চক্ষুতে বিষদৃশ অহঃরহ সংঘটিত এইরূপ সহস্র কার্য্যে ভগবানের কি মহদুদ্দেশ্য নিহিত আছে! মানব তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে অসীম অনন্ত পুরুষের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিতে যাইয়া পদে পদে নিজ অক্ষমতারই পরিচয় প্রদান করে। ভৈরব নাথ গৃহে জলন্ত শ্মশানোপম বিধবা পুত্রবধূর দুঃখে মুহ্যমান হইলেন। ভৈরব নাথ এ আঘাতের পরে তাঁহার জীবনের শেষ দিনের আর বড় বাকী নাই বুঝিতে পারিয়া ১২৮৩ সনের ২৮শে ভাদ্র একখানি চরম পত্র সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাতে তাঁহার পুত্রদ্বয় আনন্দ নাথ ও কেদারনাথ এবং পৌত্র কৃষ্ণনাথকে ত্যজ্য সম্পত্তিতে অধিকারী করিয়া তাঁহাদের উপর কন্যা ও অন্যান্য আশ্রিত ও আশ্রিতা আত্মীয় স্বজনের মাসহরা বহনের এবং দেবসেবার গুরুভার অর্পণ করেন। এ সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত প্রবলভাবেই বহিতেছিল, পাণ দোষও সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতেছিল, তাই এ চরম পত্রে পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্য দিয়াছেন যে বংশধরদের মধ্যে কেহ স্বধর্ম্মত্যাগী বা মদ্যপায়ী হইলে সে তাহার ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে ভোগাধিকার চ্যুত হইবে। সে সময়ে অনেকেই চাকরী ব্যপদেশে বারমাস পুত্র পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশে বাস করিত। তখন বৎসরে মাত্র ৪ বার নয় বার বার গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব দাখিল করিতে হইত; সুতরাং ভৈরব নাথকে ফাল্গুন হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত আট মাসই দিনাজপুরে একক বাস করিতে হইত, মাত্র চার মাস গৃহে পুত্র পরিবার সঙ্গে থাকিতে পারিতেন। ইহাতে একদিনের তরেও ভৈরবনাথের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের রেখাপাত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভৈরবনাথ অধিক

রাত্রি জপে কাটাইতেন। এই অবসরে একদিন তাঁহার এক রসিক বৈবাহিক তাঁহার বিছানায় একটি বারাঙ্গনা আনিয়া রাখিয়া দেন— উদ্দেশ্য বৈবাহিকের সহিত রহস্য ও চিত্তের শক্তি পরীক্ষা। দীর্ঘ রাত্রে জপ শেষ হইলে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীকে নিজ শয্যায় শায়িত দেখিয়া ভৈরবনাথ চমকিয়া উঠিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন মা তুমি কে? সে ইঁহার মাতৃ সম্বোধনে সম্পূর্ণ অপ্রেমিকের ভাব লক্ষ্য করিয়া একবারে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার মত ভৈরবনাথের চরণতলে পতিতা হইয়া কৃপাভিক্ষা করিয়া বলিল যে তাঁহারই বৈবাহিক——বাবু এ লাঞ্ছনার হেতু। ভৈরবনাথ দুয়ার খুলিয়া তাহাকে রাস্তা দিলেন এবং ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তিনি নিদ্রা গেলেন। ভৈরবনাথের সর্ব্বকার্য্যেই স্বাধীনতা ছিল, কিছুতেই তিনি দাসত্ব স্বীকার করিতেন না। হৃদয়ে ও মনে সমান শক্তি ছিল। দিনাজপুর হইতে যাতায়াতে সাহেবগঞ্জে (বর্ত্তমান কাউগা ষ্টেশনের সন্নিকট) আত্রাই নদীতে নৌকায় উঠিতে এ দু'ক্রোশ পথ অতিক্রমে দুর্ব্বল চিত্ত ক্ষীণজীবি লোকের ন্যায় তাঁহাকে যান বাহনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত না। আমরণ পর্য্যন্ত ভৈরবনাথ একখানি ত্রিভঙ্গ যষ্টি আশ্রয়ে বিনা ক্লান্তিতেই এ পথ অতিক্রম করিতেন। তীর্থ ভ্রমণ কালে ভৃত্যবর্গ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও /৫ সের জলপূর্ণ একটী গাড়ু অবলীলাক্রমে নিজে বহন করিয়া গাড়ীতে উঠানামা করিতেন। ইনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। ইনি দোল দুর্গোৎসব বাসন্তী এবং অমাবস্যাতে কালিকা ইত্যাদি দেব দেবীর অর্চ্চনা যাহা তাঁহার পৈত্রিক আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল তাহা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বৎসরে কত শ্রাদ্ধ ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন যে নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। তন্মধ্যে রামনবমী দিবসে পিতৃশ্রাদ্ধ

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শ্রাদ্ধ কালে ভৈরবনাথ দিনাজপুর সহরস্থ বাসা বাটীতে অবস্থান করিতেন। টাউনস্থ সকল ভদ্রলোকই ইঁহার গৃহে আমন্ত্রিত হইতেন। সকলে এ বার্ষিক নিমন্ত্রণ তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেন। পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণ দ্বারা সকলে নিমন্ত্রিত হইতেন, অপরাহ্নে ভৈরবনাথ নিজে বাহির হইয়া আবার তাহারা যাচাই করিতেন ও ভুল ভ্রান্তি হইলে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। অতিথিকে প্রাণের আকিঞ্চনেই দেবতা জ্ঞানে সেবা ভৈরবনাথের লক্ষ্য ছিল।

ভৈরবনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দনাথের নিকটে শেষ অনুজ্ঞা তিনটী প্রকাশ করিলেন ১। আমার পৈত্রিক ক্রিয়া কর্ম্ম বহাল রাখিও ২। ব্রহ্মস্ব হরণ করিও না ৩। কাহারও জামীন হইও না। এই মূল্যবান বাক্যত্রয় মাত্র প্রকাশ করিয়া মুখ বন্ধ করিলেন।

ভৈরবনাথ ১২৯০ সনের ২৮শে কার্ত্তিক রামচতুর্দ্দশীর উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নালোকে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন।

ভৈরবনাথের ১২৩৩ সনে বিবাহিতা প্রথমা পত্নী হরসুন্দরী দেবী তৃতীয় পুত্র আনন্দনাথের ভূমিষ্ট হইবার পর হইতেই সুতিকা রোগে অত্যন্ত অসুস্থ হন এবং অল্পকাল মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করেন। ইনি অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভৈরব নাথের এই পত্নী শিবমোহিনী, মাতঙ্গী ও পদ্মমণি নামে তিনটী কন্যা এবং গোবিন্দনাথ, আনন্দ নাথ নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ভৈরব নাথের এখন সংসার অচল হইল। অপগণ্ড শিশু ছেলে পেলে, সংসারে নিরাশ্রয় আত্মীয় স্বজনের সংখ্যাও কম ছিল না। ১২৫৪ সনের ফাল্গুন মাসে কাশিহাতী নিবাসী মৌদ্গল্য বংশীয় ৺কৃষ্ণগোবিন্দ দাশ গুপ্ত মুন্সী মহাশয়ের কন্যা সারদা সুন্দরীকে ভৈরবনাথ বিবাহ করেন।

এই বিবাহে ভৈরবনাথের গৃহে অপ্রাপ্ত বয়সে পরলোকগত কেশবনাথ ও কেদারনাথ নামে দুইটী পুত্র এবং শরৎকুমারী, মুক্তকেশী

ও সৌদামিনী নামে তিনটী কন্যা জন্মে। শেষোক্ত কন্যা দুইটি অবিবাহিতাবস্থায় পরলোক গমন করেন। শরৎকুমারী সিরাজগঞ্জের অধীন বাগবাটী নিবাসী দিনাজপুর ম্যাজিষ্ট্রেট আফিসের ভূতপূর্ব্ব হেড ক্লার্ক বাবু যোগেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে ১২৭৯ সনের ফাল্গুন মাসে পরিণীতা হন।

গোবিন্দনাথ ও আনন্দনাথ উভয়েই বাল্যকাল হইতে ঢাকা থাকিয়া পড়া শুনা করিতেন বাড়ীর বিশ্বস্ত ভৃত্য কমল সিকদার অভিভাবক স্বরূপে বার মাস তাহাদের সঙ্গে থাকিত। গোবিন্দনাথের স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ ছিল না। এক একবার হঠাৎ এমন অসুস্থ হইয়া পড়িতেন যে জীবন মরণের সন্ধিস্থল হইতে তাঁহাকে ফিরিতে হইয়াছে। ইনি ঢাকা পোগজ স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাস করেন। এই সময়ে Mesmerisem এ medium হইবার ইহার প্রবল আগ্রহ ছিল, হঠাৎ একবার এমন হইল আর সংজ্ঞা হয় না; অনেক চেষ্টায় যদি বা সংজ্ঞা হইল কিন্তু এই স্বকৃত ব্যাধির ফলে শেষে তিনি মারা যান।

গোবিন্দনাথ চরিত্রে দেবতা তুল্য ছিলেন। তাঁহার মত ন্যায় নিষ্ঠ জন হিতৈষী লোক জগতে বড় জন্মে না। তাঁহার প্রবল ধর্ম্ম পিপাসায় তিনি তৎকালে নমস্য ছিলেন। তিনি কুটিলতাময় সংসারের কোন ধারই ধরিতেন না। কথা প্রসঙ্গে জমিদারী দেখা শুনার কথা উঠিলে নির্ব্বিকার চিত্তে কনিষ্ঠ আনন্দনাথ ও সোদরোপম শ্রদ্ধেয় গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম করিয়া বলিতেন ইহারাই দেখিবে। কাহারও হিত বই অহিত চিন্তা মনের ধারেও ঘেসিতে পারিত না। দেশে কি বিদেশে কি ভদ্র কি অপর সাধারণ এখনও এক বাক্যে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা কথা উঠিলেই তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও মাধুর্য্যের বর্ণনা যেন সহস্র মুখে করিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। তিনি ভগবানে অত্যধিক ভক্তি নিবন্ধনই বোধ হয় জগতে এত সর্ব্বজনপ্রিয় হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি পাপকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু

পাপী তাঁহার করুণার পাত্র ছিল। তিনি তাহাদিগকে আদর যত্ন অকৃত্রিম ভালবাসার ফলে সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে সর্ব্বদাই প্রয়াস পাইতেন। গোবিন্দ নাথ নানা প্রকারে অসৎ পথে গমনের গতিরোধ পূর্ব্বক হিতোপদেশ দ্বারা মতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে কৃতকার্য্যও হইতেন। ইনি নিজ বিশ্বাসানুসারে পরম ব্রহ্মের ভজনাই জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশের প্রভূত কল্যাণবর্ষী ইহাদের স্বগ্রামের সেকালের হিত সাধিনী সভা এবং গ্রামের পোষ্টাফিস যাহা এখন Combined offiicএ পরিণত হইয়াছে তাহা ইহাঁর এবং ইহাঁর দু-চারজন সহকর্ম্মীর অক্লান্ত চেষ্টার অমৃত ফল। দুস্থের সাহায্য এবং জনহিতকর সর্ব্ব কার্য্যই এই হিতসাধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল, এখন তাহার কঙ্কাল অবশিষ্ট সেই পূত নাম মাত্র রহিয়াছে।

তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, A good wife, a good library and a good garden can make a man happy। সৌভাগ্য ক্রমে এ তিনের সমাবেশই তাঁহার জীবনে হইয়াছিল, সংসারে রোগ যন্ত্রণা বাদ দিলে তিনি পরম সুখী ছিলেন।

সন্ধ্যা বেলায় তাঁহার গৃহের দক্ষিণের বারেন্দা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কলধ্বণিতে নিত্য মুখরিত হইত।

তিনি লোক খাওয়াইয়া অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতেন। দিনাজ-পুর জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। আমের সময় ঝাঁকা ভর্ত্তি আম বাড়ীর উঠানে রক্ষিত হইত; আর থাকিত একটী জলের গামলা ও কয়েকখানি ছুরি। বালক বৃদ্ধ স্কুল ছুটির পর আসিয়া এক এক জনে এক একখানা নিয়া গামলার চারিধারে বসিয়া যাইত এবং গামলাতে আমটী ধৌত করিয়া ছুরিকা দ্বারা ছাড়াইয়া ত্বরিত গতিতে কে কতটী গলাধঃকরণ করিতে পারে তাহারই কৌতুক দর্শনে বিপুল আনন্দ উপভোগ

করিতেন। সারদাসুন্দরী ইহার প্রতি সম্পূর্ণ মাতৃস্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন; গোবিন্দনাথও শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় ইহাকে পাইয়া ইহাকেই মাতৃত্বের পরিপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাতৃহীনত্বের অভাব ভুলিয়া যান। ১২৮২ সনের ২২ মাঘ ইনি পরলোক বৃদ্ধ পিতা ভৈরবনাথ, ও অন্তঃস্বত্বাবস্থায় পত্নী দ্রবময়ী এবং ১২৭৮ সনের ১০ই শ্রাবন জাত একমাত্র পুত্র কৃষ্ণনাথ ও ১২৮১ সনে জাত কমলা নামে একটী কন্যা রাখিয়া যান। প্রথমা কন্যা কমল কামিনী মাণিক গঞ্জের অধীন মোহালী নিবাসী ময়মনসিংহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বাবু বিজয়চন্দ্র দাশের সঙ্গে পরিণীতা হন। বিমলা নাম্নী দ্বিতীয় কন্যা উক্ত গ্রামেই পুলিসের এডিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব কুমুদ মোহন দাশ গুপ্তের সঙ্গে পরিণীতা হন। প্রথমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র এখন ময়মনসিংহের উকীল। দ্বিতীয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সরসীমোহন এখন সবডিপুটী কালেকটার।

গোবিন্দ নাথের কনিষ্ঠ আনন্দনাথ ভূমিষ্ট হইবার পর তিন মাস মধ্যেই মাতৃ বিয়োগ ঘটে। শিশু আনন্দনাথ শৈশব হইতেই একটুক দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতির রহিয়া গেলেন, কাহারও সহিত বালজন সুলভ প্রাণ খোলা আত্মীয়তা করা, ক্রিয়া কৌতুক করা বা সুপেয় সুখাদ্য আহার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ সবই তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। যে বৎসর আনন্দনাথের এণ্ট্রেন্স দিবার কথা সেই বৎসর ১২৭০ সনের ২০ শে কার্ত্তিক ইহাকে স্বগ্রামস্থ ৺ জগমোহন নিয়োগী মহাশয়ের কন্যা মনমোহিনী দেবীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহাতে অনেক সময় নষ্ট হয়। সেবারে আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। এই ঘটনার জন্য বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুতাপ করিতে শুনিয়াছি।

অল্পবয়সে দারপরিগ্রহ করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে মহা অনিষ্ট ঘটে ইহা তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। পরবৎসরও পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। আনন্দ

নাথের জ্যেষ্ঠ গোবিন্দনাথ রক্তপিত্ত ব্যাধিতে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের সঙ্গে মস্তগ্রামে চিকিৎসার্থ থাকিতে বাধ্য হইলেন। বিশেষ জ্যেষ্ঠের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থাকায় জ্যেষ্ঠের বিপদাশঙ্কায় তাঁহাকে একবারে মুহ্যমান করিল। ভগবানানুগ্রহে ব্যাধির প্রকোপ কম হইল, সকলে তাঁহাকে নিয়া গৃহে ফিরিলেন। মস্তে যাইবার পূর্ব্বেই আনন্দ নাথ প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাসে শিব পূজাদিতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সময় শ্রদ্ধেয় বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সঙ্গে হৃদয়ের অকৃত্রিম মিলন ঘটে। গোপী বাবু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। এই মিলনের ফলে আনন্দনাথ বাড়ী ফিরিয়া শিব পূজা ত্যাগ করিলেন। সেই হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে পূর্ণ একঘণ্টা করিয়া গৃহে অর্গল বন্ধ করিয়া ভগবৎ ধ্যান ধারণায় তিনি কাটাইয়া দিতেন। আনন্দ নাথের জীবন গভীর ধর্ম্ম জীবন ছিল। ক্রমে দুই বৎসর নানা বাধা বিঘ্নে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হইয়া আনন্দনাথ বড়ই ক্লিষ্টবোধ করিতেছিলেন। তৃতীয় বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া তিনি ঢাকা কলেজে প্রবেশ করিলেন। এ সময় পাঠ্যাবস্থায় যাঁহারা একত্র বাস করিতেন তাঁহাদের পর্য্যায় ক্রমে রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইত। দুই বৎসর ঢাকায় থাকায় আনন্দনাথ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন ও বিএ ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; কিন্তু মানুষ ভাবে এক ভগবানের বিধানে ঘটিয়া উঠে ভিন্নরূপ। এই সময়ে জেষ্ঠ গোবিন্দ নাথ পরলোক গমন করেন। আনন্দ নাথের জীবনে এই দ্বিতীয় শোক, শৈশবে নিজ অনেক সন্তান সন্ততিদের মৃত্যুজনিত শোকে ইহার কিছুই করিতে পারেন নাই। ইতি পূর্ব্বে পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতায় কনিষ্ঠ কেশবনাথ দুরারোগ্য ব্যাধিতে দৈবাৎ স্বর্গারোহণ করিলে নানা শুশ্রূষায় ভ্রাতার

জীবন রক্ষা করিতে না পারিয়া শোকে দুঃখে গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ পিতা ও বর্ষীয়সী মাতাকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিয়া নিজেও শোকে একবারে মূহ্যমান হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনার পর কতিপয় বৎসর যাইতে না যাইতে পিতাও অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ একটুকু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ভৈরব নাথের যথোপযুক্ত পারলৌকিক ক্রিয়া, ভৈরব নাথের চরমপত্রে প্রবেট নেওয়া ও সাংসারিক নানা কার্য্যে কিছু ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। এই সময়ে দিনাজপুরের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুঠি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়; এই কুঠীতেও ইহাদের জীবনের সম্বল অনেকগুলি টাকা ডিপজিট ছিল। ঋণ জাল ও তদুপরি এই ক্ষতিতে যে কোন লোকের বিব্রত হওয়াই স্বাভাবিক। এজন্য ২।৪ বৎসর বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হইয়াছে। এই সব দুশ্চিন্তায় তাঁহার বায়ু রোগের সৃষ্টি হইয়া অনিদ্রা, অক্ষুধা ইত্যাদি উপসর্গ ব্যাধি উপশমের পরও সঙ্গের সাথীর মত রহিয়া গেল। তিনি কনিষ্ঠ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের শিক্ষা দায়ীত্ব যে ভাবে অনুভব করিতেন তাহা জগতে বিরল। তাঁহার চিরপোষিত ইচ্ছা ফলবতী হইয়াছে। ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে উপযুক্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক করিয়া সংসারের ভার বহনোপযোগী করিয়া তিনি শান্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিয়াছিলেন।

ভোগবাসনায় অনাসক্তি তাঁহার চিরদিন সমান ছিল। কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাঁহার মত নিরভিমানী লোক এ জগতে বিরল। বিপদে পড়িয়া কেহ উপদেশ বা সাহায্য প্রার্থনা করিলে সে তাহা প্রচুর পরিমাণে পাইত। তাঁহার সহিত কাহারও মতানৈক্য ঘটিলে ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া যাহা সৎ তাহাই গ্রহণ করিতেন, বালক বৃদ্ধ জ্ঞান করিতেন না। জীবে দয়া ও প্রেম তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আমরা শীতবস্ত্র ব্যবহার করিব আর প্রতিবাসী দরিদ্র নরনারী খণ্ড আতুর কষ্ট পাইবে এই ধারণা তাঁহাকে

বড় কষ্ট দিত। যতদূর সাধ্য শক্তিতে কুলায় তদনুরূপ কতকগুলি মার্কিনের থান খরিদ করিয়া প্রতিবৎসর গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। আনন্দনাথ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক অর্থে বড় আছেন, কিন্তু এরূপ সদাশয় পরদুঃখ কাতর জগতে কয়জন আছেন জানি না! তাঁহার দান ও অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিশেষত্ব এই ছিল যে আপন জনেও তাহা জানিতে না পারে। তাঁহার কার্য্য-কারকবর্গ ও প্রজাবর্গকে তিনি আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। এখন কার্য্যকারকদের সহিত ব্যবহারের কথা একটুকু বলিব। তাঁহার পরলোক গমন করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসার জন্য তিনি কিছুদিন কলি-কাতায় ছিলেন। বাড়ীর কার্য্যকারকও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজকার্য্যে বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি বাড়ী আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন আনন্দনাথের পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তি ছিল না। তিনি রওনা হওয়ার প্রাক্কালে উপরে দেখা করিতে গেলে আনন্দনাথ যুক্তকরে বলিলেন, মহাশয়, আপনি অনেক দিন আমার বাড়ী আছেন এই দীর্ঘ সময় মধ্যে যদি কখনও কোন কারণে আপনার অন্তরে কষ্ট দিয়া থাকি আপনি অদ্য আমাকে সরলচিত্তে ক্ষমা করিয়া যান। এই কথা বলিতে বলিতেই আনন্দনাথের পাণ্ডুবর্ণ গণ্ড বহিয়া সরল হৃদয়ের অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল, মনের আবেগে ভৌমিক মহাশয়েরও কণ্ঠরোধ হইতেছিল। ক্ষণকাল পরে অনেক কষ্টে বলিলেন আপনার ন্যায় আশ্রয়দাতা জীবনে আর পাইব না, মনে হয় না আপনার নিকট কখনও অপ্রিয়বাক্য কিছু শুনিয়াছি; যদি কিছু বলিয়াও থাকেন সে আমার উপকারের জন্য। আপনি কিছু মনে করিবেন না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভৌমিক মহাশয় নীচে নামিয়া গেলেন।

তিনি নিজে তাঁহার বিশ্বাসমতে পরম ব্রহ্মের আরাধনা করিতেন বটে, কিন্তু কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাসে তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল না। তাহার

পৈত্রিক দেব ক্রিয়া ইত্যাদিতে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই। গুরু পুরোহিতদিগের প্রাপ্য সম্বন্ধে সমস্তই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাঁহার বিপুল পরিবারে সকলেই নিজ নিজ বিশ্বাস মত ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত হয় ইহাই তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ব্যাভিচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, চরিত্রহীন ব্যক্তি তাঁহার চক্ষুশূল ছিল।

আধুনিক হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে আনন্দনাথের মতামত তাঁহার নিজস্ব ছিল। তিনি বলিতেন, বিবাহ বাঙ্গালীর প্রধান রোগ, এ রোগের উপশম না হইলে দারিদ্র্য ঘুচিবে না। বিবাহে পণ গ্রহণ তিনি সমাজের পাপ ও কলঙ্ক মনে করিতেন। পণগ্রাহীদের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি বর বেচা ব্যাপারকে যেরূপ ঘৃণা করিতেন সেইরূপ অসদুপায়ে উপার্জ্জনকারীদের জন্যও দুঃখ করিতেন। তিনি বলিতেন, অসদুপায়ে উপার্জ্জন আর দস্যুবৃত্তিতে অধিক ব্যবধান নাই।

আনন্দনাথের জ্ঞান স্পৃহা জ্যেষ্ঠের ন্যায়ই বলবতী ছিল। বৎসরে যে সব বই ক্রয় করিয়া পড়িতে হইবে ডাইরীর প্রথমে তাহার তালিকা হইত। এণ্ট্রান্স পাস্ করিবার পূর্ব্বে Gibbon's decline and fall of Roman Empire চন্দ্রালোকে বসিয়া পাঠ করিতেন। মৃত্যুর বৎসরও নয় খণ্ড Miller's History of India পাঠ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক বহু কাগজ পাঠ করিতেন। রাজনীতি প্রসঙ্গেও তিনি খুব সজাগ ছিলেন।

ঢাকার East যখন Lord Curzonকে অযথা স্তুতিবাদে পরিতুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, তখন তাঁহার প্রশংসাবাদ আনন্দনাথের গায় সহিল না, তিনি তাহার বন্ধু East এর সম্পাদক বঙ্গবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন আমার বাৎসরিক চাঁদা আপনাদের নববিধান সমাজের সাহায্যার্থ গ্রহণ করিবেন, আমি আর East রাখিব না।

সেবার মৃত্যুর পূর্ব্বে পূজার সময় তিনি জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলেও দেশকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি বাড়ীতে আদেশ পাঠাইলেন তাঁহার বাড়ীতে পূজায় যেন বিদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ ব্যবহার না হয়।

তিনি ১৩১২ সালের ১৬ই আশ্বিন জীবনের কার্য্যের অবসানে বালক পুত্র যদুনাথ, বিধবা পত্নী মনোমোহিণী দেবী ও কন্যা ভব-তারিণীকে রাখিয়া অমর ধামে চলিয়া যান।

যদুনাথ এক্ষণে কলিকাতায় কবিরাজী করিতেছেন। ইঁহার পরলোক গমন করিবার পর দিনাজপুর ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পরলোকগত শ্রদ্ধাভাজন ভুবনমোহন কর ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণনাথ সেন মহাশয়কে যে চিঠিখানি লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এই বংশ বিবরণ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। এই চিঠিখানি হইতেই আনন্দনাথের চরিত্রের মহিমা অবগত হইতে পারা যাইবে।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম
দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ
১৯০৫ সন ১১ অক্টোবর।

শ্রদ্ধাভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ সেন

মহাশয় শ্রদ্ধাভাজনেষু

শ্রদ্ধেয় মহাশয়!

সেদিন শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র সেন মহাশয়ের শ্রমুখাৎ আপনার পিতৃব্য এবং আমাদের একজন পরম শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধু আনন্দ নাথ সেন মহাশয়ের অকাল পরলোক গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দিনাজপুর ব্রাহ্ম সমাজ গভীর শোক নিমগ্ন প্রাণে সকল সন্তাপহারী পরম দেবের এই মহাপুরুষের পরলোক প্রস্থিত আত্মার কল্যাণ এবং ইঁহার অভাব জনিত

গভীর শোককাতর আপনাদের পরিবার বর্গের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান জন্ত বিশেষভাবে ভিক্ষা ও প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাবা, যদিও আমরা ইহা বিশেষ ভাবেই জানি ও বিশ্বাস করি যে ইনি একজন স্বয়ং সিদ্ধ মহাপুরুষ, তখন আর ইহার আত্মার কল্যাণ কামনায় অপরের প্রার্থনা করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, তথাপি ইহার প্রতি আমাদের যে প্রাণে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তাহারই তাড়নায় বা প্রবর্ত্তনায় আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনায় বিশ্বজননীর করে প্রাণের প্রার্থনা না জানাইয়া আর কোন মতেই বিরত থাকিতে পারি নাই বা পারিলাম না। বাবা, আপনার এই পিতৃব্যদেবের নিকটে আমরা অশেষ কারণে ঋণী, ইহার নিষ্কলঙ্ক সুনির্ম্মল চরিত্র আমাদের চরিত্র গঠনের বিশেষভাবে সুশিক্ষা দিয়াছে। ইহার জলন্ত অগ্নিময় উদ্দীপ্ত বাক্য অনেক সময় আমাদের প্রাণে যথেষ্ট সৎ সাহসের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে এবং ইহার প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে প্রতিনিয়তই আমাদের অর্থের অভাব সকল বিমোচন করিয়া আমাদিগকে যার পর নাই আপ্যায়িত ও অনুগৃহীত করিয়াছে। বাস্তবিক এমন হৃদয়ঙ্গম সুহৃজ্জনের ঈদৃশ অসাময়িক অভাবে কাহার প্রাণ না ব্যথিত ও কাতর হয়? তবে অপ্রতিবিধেয় ঘটনায় শোক মোহের বশীভূত হওয়া কোন মতেই সঙ্গত ও বিধেয় নহে বলিয়াই মহাপুরুষের শোকে কাতর না হইয়া আমাদের সকলেরই সর্ব্বপ্রথমে ইহাই কর্ত্তব্য যে যাহাতে এই মহাপুরুষের সেই পরলোক প্রস্থিত আত্মার কল্যাণ ও শান্তি বিহিত হইতে পারে। বাবা! এইটী বাস্তবিকই মহাজন গৃহীত অতীব সত্য কথা যে তাঁহার সেই স্বর্গের সান্ত্বনা ব্যতীত মানুষ আর কিছুতেই বন্ধুজনের বিয়োগ ব্যথা ভুলিতে বা বিস্মৃত হইতে পারে না। ভগবান আপনাদের প্রাণকে সুশীতল করুন ইহাই তাঁহার চরণতলে আমাদের একমাত্র বিনীত ভিক্ষা। কিমধিকম্।

শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু।

গোয়াবাগানের বসু বংশ।

কলিকাতা গোয়াবাগানের বসু বংশ অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। গড় গোবিন্দপুর ইহাঁদের আদি বাসস্থান ছিল। কলিকাতার গড়ের মাঠ ও ফোর্ট উইলিয়ম যে স্থানে অবস্থিত ঐ স্থানকেই পূর্ব্বে গড়-গোবিন্দপুর বলা হইত। গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থানের সমস্ত বসতি উঠাইয়া দেওয়ায় এই বসু বংশের চক্রপাণি বসু ২৪ পরগণা জিলার বারাশত মহকুমার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে গমন করতঃ তথায় বাস করিতে থাকেন এবং এই বসু বংশ অদ্যাপি উক্ত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। চক্রপাণি বসুর অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ ত্রৈলোক্য নাথ বসু।

ত্রৈলোক্যনাথ।

ত্রৈলোক্যনাথ বসুর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামরতন, মধ্যম অভয়চরণ ও কনিষ্ঠ জয়গোপাল। রামরতনের কোন বংশধর নাই এবং কনিষ্ঠ জয়গোপাল শৈশবেই মারা যায়। মধ্যম অভয় চরণ ১৩০৪ সনে ২৩শে চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করেন। মধ্যম অভয়চরণের তিন পুত্র, অমরনাথ, হরনাথ ও পরেশ নাথ। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে অমর জন্মগ্রহণ করেন। অমরনাথ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তৎপর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ও তথা হইতে যোগ্যতার সহিত এফ্‌ এ, ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জেনারেল এসেম্ব্রীতে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে

বি, এল পড়িতে থাকেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৎসরেরই মার্চ্চ মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি দিন দিন উন্নতি করিয়া বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন হন এবং গোয়াবাগানের বর্ত্তমান বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। অমরনাথ বারাশত লোকাল বোর্ডের বহুদিন যাবত চেয়ারম্যানী করিয়াছেন। তিনি আলিপুর জেলাবোর্ডের ও সভ্য। এই উভয় কার্য্যে তিনি অনেক লোক হিতকর কার্য্য-করিয়া জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সহানুভূতির ভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যে পরম প্রীত হইয়া ইঁহাকে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট (Certificate of honour) প্রদান করেন। বর্ত্তমানে অমরনাথের বয়স ৮২ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সুস্থ দেহে যুবকের মত শক্তি, উৎসাহ ও অধ্যবসায় সম্পন্ন। এখনও তিনি হাই-কোর্টে যাইয়া থাকেন। অমরনাথ অতি মাত্রায় মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের আদেশ ব্যতীত তিনি কখনও কোন কার্য্য করিতেন না। মাকে তিনি সাক্ষাত দেবীর মত ভক্তি করিতেন। তিনি কুমার-টুলার হরিহর মিত্রের কন্যা মাণিকমণিকে বিবাহ করেন। মাণিকমণি পাতিব্রত্যে গৃহস্থালীর কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে সাক্ষাত লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায় ও আচরণে, দাস-দাসী, পরিচারক-পরিচারিকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাক্ষাত মায়ের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। অতিথি সেবায় তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমরনাথের এই গুণশালিনী সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হয়।

অমরনাথের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রমেশচন্দ্র, মধ্যম সুরেশচন্দ্র ও কনিষ্ঠ ভবেশচন্দ্র। রমেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের একজন দক্ষ-

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু।

রমেশচন্দ্র।

প্রতি এটর্ণী। তিনি ১৮৬৩ সনের ৯ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এল পাশ করেন, পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের হাইকোর্টে এটর্ণী হন ও এটর্ণী গিরি আরম্ভ করেন। ইনি ভাগলপুরের হেরম্বচন্দ্র ঘোষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রমেশচন্দ্রের সাত পুত্র। (১) ভূপেন্দ্র (২) ফণীন্দ্র (৩) সুধীন্দ্র (৪) শচীন্দ্র (৫) ধীরেন্দ্র (৬) রবীন্দ্র (৭) যতীন্দ্র। রমেশচন্দ্রের ৪ কন্যা। প্রথমা সুহাষিণী, দ্বিতীয়া উষা, তৃতীয়া সুকুমারী ও কনিষ্ঠা বীণা।

ভূপেন্দ্র ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এফ এ অবধি অধ্যয়ণ করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রের চারিটী কন্যা ও

ভূপেন্দ্র।

দুইটি পুত্র। পুত্র দুইটির নাম শৈলেন্দ্র ও রথীন্দ্র।

ফণীন্দ্র ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি-এল পাশ করিয়া পরে এটর্ণী হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে

ফণীন্দ্র।

যোগ্যতার সহিত এটর্ণীগিরি করিতেছেন। শ্যামবাজার নিবাসী ৺ডাক্তার আর জি করের ভ্রাতুষ্পুত্রী ৺রাধারমণ করের ৪র্থ কন্যা শ্রীমতি শৈলজাবালার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। গত ১৯২২ সনের ২রা নভেম্বর ফণীন্দ্র বাবুর স্ত্রী পরলোক গমন করেন। ফণীন্দ্রের তিন কন্যা ও একপুত্র। পুত্রটীর নাম সুশীল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সুধীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি-এ-বি-এল। হাইকোর্টে ওকালতী করিতে করিতে ইনি ব্যারিষ্টারী

সুধীন্দ্র।

পাশ করিয়া আসিয়াছেন ও কলিকাতা হাই-কোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার একটী কন্যা।

শচীন্দ্র ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

শচীন্দ্র। শচীন্দ্রের এক পুত্র অজিত।

ধীরেন্দ্র। ধীরেন্দ্র ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এখন বি-এস্-সি পড়িতেছেন।

রবীন্দ্র ও যতীন্দ্র। রবীন্দ্র ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও যতীন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই এখন স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

অমরনাথের দ্বিতীয় পুত্র সুরেশচন্দ্র ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এল্ এম্ এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেছেন। সুরেশচন্দ্রের দুই পুত্র ও দুই কন্যা (১) সন্তোষ ও (২) সুবোধ। সন্তোষ এম্ বি পাশ করিয়া কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেছেন। সন্তোষ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সন্তোষের একটি পুত্র—নাম সত্যেন্দ্র। সুবোধ ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুবোধ বি-এ-বি-এল পাশ করিয়া এটর্নীগিরি পড়িতেছেন। সুবোধের একটি কন্যা।

সুরেশচন্দ্র।

ভবেশচন্দ্র। অমরনাথের তৃতীয় পুত্র ভবেশচন্দ্র। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভবেশচন্দ্র কয়লার ব্যবসায় করিতেছেন। ভবেশচন্দ্রের দুই পুত্র ও চার কন্যা (১) বীরেন্দ্র ও (২) হীরেন্দ্রনাথ।

অভয়চরণের দ্বিতীয় পুত্র হরনাথ।

এই বংশের ইতিহাস পড়িলে লক্ষ্মী সরস্বতীর একত্র সমাবেশ দেখিয়া বাস্তবিকই শরীর আনন্দে আপ্লুত হয়। এত বড় বিরাট পরিবার বঙ্গে অতি কমই দৃষ্ট হয়। সমস্ত ভ্রাতায় ভ্রাতায়—ভ্রাতুষ্পুত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রে যেন এক আত্মা, এক প্রাণ। অমরনাথ অতি ভাগ্যবান

করিতে অধিকারিণী করিয়া এই অল্প সময়ে আবার সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন, পূর্ব্বজন্মের কি পাপের ফলে তাঁহার আজ এ দশা হইল তাহা একমাত্র সেই বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন। জানি না সংসারের লোক চক্ষুতে বিষদৃশ অহঃরহ সংঘটিত এইরূপ সহস্র কার্য্যে ভগবানের কি মহদুদ্দেশ্য নিহিত আছে! মানব তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে অসীম অনন্ত পুরুষের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিতে যাইয়া পদে পদে নিজ অক্ষমতারই পরিচয় প্রদান করে। ভৈরব নাথ গৃহে জলন্ত শ্মশানোপম বিধবা পুত্রবধূর দুঃখে মুহ্যমান হইলেন। ভৈরব নাথ এ আঘাতের পরে তাঁহার জীবনের শেষ দিনের আর বড় বাকী নাই বুঝিতে পারিয়া ১২৮৩ সনের ২৮শে ভাদ্র একখানি চরম পত্র সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাতে তাঁহার পুত্রদ্বয় আনন্দ নাথ ও কেদারনাথ এবং পৌত্র কৃষ্ণনাথকে ত্যজ্য সম্পত্তিতে অধিকারী করিয়া তাঁহাদের উপর কন্যা ও অন্যান্য আশ্রিত ও আশ্রিতা আত্মীয় স্বজনের মাসহরা বহনের এবং দেবসেবার গুরুভার অর্পণ করেন। এ সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত প্রবলভাবেই বহিতেছিল, পান দোষও সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতেছিল, তাই এ চরম পত্রে পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্য দিয়াছেন যে বংশধরদের মধ্যে কেহ স্বধর্ম্মত্যাগী বা মদ্যপায়ী হইলে সে তাহার ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে ভোগাধিকার চ্যুত হইবে। সে সময়ে অনেকেই চাকরী ব্যপদেশে বারমাস পুত্র পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশে বাস করিত। তখন বৎসরে মাত্র ৪ বার নয় বার বার গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব দাখিল করিতে হইত; সুতরাং ভৈরব নাথকে ফাল্গুন হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত আট মাসই দিনাজপুরে একক বাস করিতে হইত, মাত্র চার মাস গৃহে পুত্র পরিবার সঙ্গে থাকিতে পারিতেন। ইহাতে একদিনের তরেও ভৈরবনাথের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের রেখাপাত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভৈরবনাথ অধিক

রাত্রি জপে কাটাইতেন। এই অবসরে একদিন তাঁহার এক রসিক বৈবাহিক তাঁহার বিছানায় একটি বারাঙ্গনা আনিয়া রাখিয়া দেন— উদ্দেশ্য বৈবাহিকের সহিত রহস্য ও চিত্তের শক্তি পরীক্ষা। দীর্ঘ রাত্রে জপ শেষ হইলে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীকে নিজ শয্যায় শায়িত দেখিয়া ভৈরবনাথ চমকিয়া উঠিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন মা তুমি কে? সে ইঁহার মাতৃ সম্বোধনে সম্পূর্ণ অপ্রেমিকের ভাব লক্ষ্য করিয়া একবারে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার মত ভৈরবনাথের চরণতলে পতিতা হইয়া কৃপাভিক্ষা করিয়া বলিল যে তাঁহারই বৈবাহিক——বাবু এ লাঞ্ছনার হেতু। ভৈরবনাথ দুয়ার খুলিয়া তাহাকে রাস্তা দিলেন এবং ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তিনি নিদ্রা গেলেন। ভৈরবনাথের সর্ব্বকার্য্যেই স্বাধীনতা ছিল, কিছুতেই তিনি দাসত্ব স্বীকার করিতেন না। হৃদয়ে ও মনে সমান শক্তি ছিল। দিনাজপুর হইতে যাতায়াতে সাহেবগঞ্জে (বর্ত্তমান কাউগা ষ্টেশনের সন্নিকট) আত্রাই নদীতে নৌকায় উঠিতে এ দু'ক্রোশ পথ অতিক্রমে দুর্ব্বল চিত্ত ক্ষীণজীবি লোকেব ন্যায় তাঁহাকে যান বাহনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত না। আমরণ পর্য্যন্ত ভৈরবনাথ একখানি ত্রিভঙ্গ যষ্টি আশ্রয়ে বিনা ক্লান্তিতেই এ পথ অতিক্রম করিতেন। তীর্থ ভ্রমণ কালে ভৃত্যবর্গ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও /৫ সের জলপূর্ণ একটী গাড়ু অবলীলাক্রমে নিজে বহন করিয়া গাড়ীতে উঠানামা করিতেন। ইনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। ইনি দোল দুর্গোৎসব বাসন্তী এবং অমাবস্যাতে কালিকা ইত্যাদি দেব দেবীর অর্চ্চনা যাহা তাঁহার পৈত্রিক আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল তাহা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বৎসরে কত শ্রাদ্ধ ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন যে নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। তন্মধ্যে রামনবমী দিবসে পিতৃশ্রাদ্ধ

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শ্রাদ্ধ কালে ভৈরবনাথ দিনাজপুর সহরস্থ বাসা বাটীতে অবস্থান করিতেন। টাউনস্থ সকল ভদ্রলোকই ইহার গৃহে আমন্ত্রিত হইতেন। সকলে এ বার্ষিক নিমন্ত্রণ তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেন। পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণ দ্বারা সকলে নিমন্ত্রিত হইতেন, অপরাহ্নে ভৈরবনাথ নিজে বাহির হইয়া আবার তাহারা যাচাই করিতেন ও ভুল ভ্রান্তি হইলে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। অতিথিকে প্রাণের আকিঞ্চনেই দেবতা জ্ঞানে সেবা ভৈরবনাথের লক্ষ্য ছিল।

ভৈরবনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দনাথের নিকটে শেষ অনুজ্ঞা তিনটী প্রকাশ করিলেন ১। আমার পৈত্রিক ক্রিয়া কর্ম্ম বহাল রাখিও ২। ব্রহ্মস্ব হরণ করিও না ৩। কাহারও জামীন হইও না। এই মূল্যবান বাক্যত্রয় মাত্র প্রকাশ করিয়া মুখ বন্ধ করিলেন।

ভৈরবনাথ ১২৯০ সনের ২৮শে কার্ত্তিক রামচতুর্দ্দশীর উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নালোকে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন।

ভৈরবনাথের ১২৩৩ সনে বিবাহিতা প্রথমা পত্নী হরসুন্দরী দেবী তৃতীয় পুত্র আনন্দনাথের ভূমিষ্ট হইবার পর হইতেই সূতিকা রোগে অত্যন্ত অসুস্থ হন এবং অল্পকাল মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করেন। ইনি অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভৈরব নাথের এই পত্নী শিবমোহিনী, মাতঙ্গী ও পদ্মমণি নামে তিনটী কন্যা এবং গোবিন্দনাথ, আনন্দ নাথ নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ভৈরব নাথের এখন সংসার অচল হইল। অপগণ্ড শিশু ছেলে পেলে, সংসারে নিরাশ্রয় আত্মীয় স্বজনের সংখ্যাও কম ছিল না। ১২৫৪ সনের ফাল্গুন মাসে কাশিহাতী নিবাসী মৌদ্গল্য বংশীয় ৺কৃষ্ণগোবিন্দ দাশ গুপ্ত মুন্সী মহাশয়ের কন্যা সারদা সুন্দরীকে ভৈরবনাথ বিবাহ করেন।

এই বিবাহে ভৈরবনাথের গৃহে অপ্রাপ্ত বয়সে পরলোকগত কেশবনাথ ও কেদারনাথ নামে দুইটী পুত্র এবং শরৎকুমারী, মুক্তকেশী

ও সৌদামিনী নামে তিনটী কন্যা জন্মে। শেষোক্ত কন্যা দুইটি অবিবাহিতাবস্থায় পরলোক গমন করেন। শরৎকুমারী সিরাজগঞ্জের অধীন বাগবাটী নিবাসী দিনাজপুর ম্যাজিষ্ট্রেট আফিসের ভূতপূর্ব্ব হেডক্লার্ক বাবু যোগেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে ১২৭৯ সনের ফাল্গুন মাসে পরিণীতা হন।

গোবিন্দনাথ ও আনন্দনাথ উভয়েই বাল্যকাল হইতে ঢাকা থাকিয়া পড়া শুনা করিতেন বাড়ীর বিশ্বস্ত ভৃত্য কমল সিকদার অভিভাবক স্বরূপে বার মাস তাহাদের সঙ্গে থাকিত। গোবিন্দনাথের স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ ছিল না। এক একবার হঠাৎ এমন অসুস্থ হইয়া পড়িতেন যে জীবন মরণের সন্ধিস্থল হইতে তাঁহাকে ফিরিতে হইয়াছে। ইনি ঢাকা পোগজ স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাস করেন। এই সময়ে Mesmerisem এ medium হইবার ইহার প্রবল আগ্রহ ছিল, হঠাৎ একবার এমন হইল আর সংজ্ঞা হয় না; অনেক চেষ্টায় যদি বা সংজ্ঞা হইল কিন্তু এই স্বকৃত ব্যাধির ফলে শেষে তিনি মারা যান।

গোবিন্দনাথ চরিত্রে দেবতা তুল্য ছিলেন। তাঁহার মত ন্যায় নিষ্ঠ জন হিতৈষী লোক জগতে বড় জন্মে না। তাঁহার প্রবল ধর্ম্ম পিপাসায় তিনি তৎকালে নমস্য ছিলেন। তিনি কুটিলতাময় সংসারের কোন ধারই ধরিতেন না। কথা প্রসঙ্গে জমিদারী দেখা শুনার কথা উঠিলে নির্ব্বিকার চিত্তে কনিষ্ঠ আনন্দনাথ ও সোদরোপম শ্রদ্ধেয় গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম করিয়া বলিতেন ইহারাই দেখিবে। কাহারও হিত বই অহিত চিন্তা মনের ধারেও ঘেষিতে পারিত না। দেশে কি বিদেশে কি ভদ্র কি অপর সাধারণ এখনও এক বাক্যে যাহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা যথঃ উঠি লই তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও মাধুর্য্যের বর্ণনা যেন সহস্র মুখে ক[illegible]য়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। তিনি ভগবানে অত্যধিক ভক্ত নিবন্ধন বোধ হয় জগতে এত সর্ব্বজনপ্রিয় হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি পাপকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু

পাপী তাঁহার করুণার পাত্র ছিল। তিনি তাহাদিগকে আদর যত্ন অকৃত্রিম ভালবাসার ফলে সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে সর্ব্বদাই প্রয়াস পাইতেন। গোবিন্দ নাথ নানা প্রকারে অসৎ পথে গমনের গতিরোধ পূর্ব্বক হিতোপদেশ দ্বারা মতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে কৃতকার্য্যও হইতেন। ইনি নিজ বিশ্বাসানুসারে পরম ব্রহ্মের ভজনাই জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশের প্রভূত কল্যাণবর্ষী ইহাদের স্বগ্রামের সেকালের হিত সাধিনী সভা এবং গ্রামের পোষ্টাফিস যাহা এখন Combined officeএ পরিণত হইয়াছে তাহা ইঁহার এবং ইঁহার দু-চারজন সহকর্ম্মীর অক্লান্ত চেষ্টার অমৃত ফল। দুস্থের সাহায্য এবং জনহিতকর সর্ব্ব কার্য্যই এই হিতসাধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল, এখন তাহার কঙ্কাল অবশিষ্ট সেই পূত নাম মাত্র রহিয়াছে।

তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, A good wife, a good library and a good garden can make a man happy। সৌভাগ্য ক্রমে এ তিনের সমাবেশই তাঁহার জীবনে হইয়াছিল, সংসারে রোগ যন্ত্রণা বাদ দিলে তিনি পরম সুখী ছিলেন।

সন্ধ্যা বেলায় তাঁহার গৃহের দক্ষিণের বারেন্দা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কলধ্বনিতে নিত্য মুখরিত হইত।

তিনি লোক খাওয়াইয়া অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতেন। দিনাজপুর জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। আমের সময় ঝাঁকা ভর্ত্তি আম বাড়ীর উঠানে রক্ষিত হইত; আর থাকিত একটী জলের গামলা ও কয়েকখানি ছুরি। বালক বৃদ্ধ স্কুল ছুটির পর আসিয়া এক এক জনে এক একখানা নিয়া গামলার চারিধারে বসিয়া যাইত এবং গামলাতে আমটী ধৌত করিয়া ছুরিকা দ্বারা ছাড়াইয়া ত্বরিত গতিতে কে কতটী গলাধঃকরণ করিতে পারে তাহারই কৌতুক দর্শনে বিপুল আনন্দ উপভোগ

করিতেন। সারদাসুন্দরী ইহার প্রতি সম্পূর্ণ মাতৃস্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন; গোবিন্দনাথও শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় ইহাকে পাইয়া ইহাকেই মাতৃত্বের পরিপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাতৃহীনত্বের অভাব ভুলিয়া যান। ১২৮২ সনের ২২ মাঘ ইনি পরলোক বৃদ্ধ পিতা ভৈরবনাথ, ও অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থায় পত্নী দ্রবময়ী এবং ১২৭৮ সনের ১৮ই শ্রাবন জাত একমাত্র পুত্র কৃষ্ণনাথ ও ১২৮১ সনে জাত কমলা নামে একটী কন্যা রাখিয়া যান। প্রথমা কন্যা কমল কামিনী মাণিক গঞ্জের অধীন গোহালী নিবাসী ময়মনসিংহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বাবু বিজয়চন্দ্র দাশের সঙ্গে পরিণীতা হন। বিমলা নাম্নী দ্বিতীয় কন্যা উক্ত গ্রামেই পুলিসের এডিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব কুমুদ মোহন দাশ গুপ্তের সঙ্গে পরিণীতা হন। প্রথমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র এখন ময়মনসিংহের উকীল। দ্বিতীয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সরসীমোহন এখন সবডিপুটী কালেকটার।

গোবিন্দ নাথের কনিষ্ঠ আনন্দনাথ ভূমিষ্ট হইবার পর তিন মাস মধ্যেই মাতৃ বিয়োগ ঘটে। শিশু আনন্দনাথ শৈশব হইতেই একটুক দুর্জ্জেয় প্রকৃতির রহিয়া গেলেন, কাহারও সহিত বালজন সুলভ প্রাণ খোলা আত্মীয়তা করা, ক্রিয়া কৌতুক করা বা সুপেয় সুখাদ্য আহার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ সবই তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। যে বৎসর আনন্দনাথের এণ্ট্রেন্স দিবার কথা সেই বৎসর ১২৭০ সনের ২০ শে কার্ত্তিক ইঁহাকে স্বগ্রামস্থ ৺ জগমোহন নিয়োগী মহাশয়ের কন্যা মনমোহিনী দেবীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহাতে অনেক সময় নষ্ট হয়। সেবারে আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। এই ঘটনার জন্য বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুতাপ করিতে শুনিয়াছি।

অল্পবয়সে দারপরিগ্রহ করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে মহা অনিষ্ট ঘটে ইহা তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। পরবৎসরও পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। আনন্দ

নাথের জ্যেষ্ঠ গোবিন্দনাথ রক্তপিত্ত ব্যাধিতে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের সঙ্গে মত্তগ্রামে চিকিৎসার্থ থাকিতে বাধ্য হইলেন। বিশেষ জ্যেষ্ঠের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থাকায় জ্যেষ্ঠের বিপদাশঙ্কায় তাঁহাকে একবারে মুহ্যমান করিল। ভগবানানুগ্রহে ব্যাধির প্রকোপ কম হইল, সকলে তাঁহাকে নিয়া গৃহে ফিরিলেন। মত্তে যাইবার পূর্ব্বেই আনন্দ নাথ প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাসে শিব পূজাদিতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সময় শ্রদ্ধেয় বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সঙ্গে হৃদয়ের অকৃত্রিম মিলন ঘটে। গোপী বাবু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। এই মিলনের ফলে আনন্দনাথ বাড়ী ফিরিয়া শিব পূজা ত্যাগ করিলেন। সেই হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে পূর্ণ একঘণ্টা করিয়া গৃহে অর্গল বন্ধ করিয়া ভগবৎ ধ্যান ধারণায় তিনি কাটাইয়া দিতেন। আনন্দ নাথের জীবন গভীর ধর্ম্ম জীবন ছিল। ক্রমে দুই বৎসর নানা বাধা বিঘ্নে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হইয়া আনন্দনাথ বড়ই ক্লিষ্টবোধ করিতেছিলেন। তৃতীয় বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া তিনি ঢাকা কলেজে প্রবেশ করিলেন। এ সময় পাঠ্যাবস্থায় যাঁহারা একত্র বাস করিতেন তাঁহাদের পর্য্যায় ক্রমে রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইত। দুই বৎসর ঢাকায় থাকায় আনন্দনাথ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন ও বিএ ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; কিন্তু মানুষ ভাবে এক ভগবানের বিধানে ঘটিয়া উঠে ভিন্নরূপ। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ নাথ পরলোক গমন করেন। আনন্দ নাথের জীবনে এই দ্বিতীয় শোক, শৈশবে নিজ অনেক সন্তান সন্ততিদের মৃত্যুজনিত শোকে ইহার কিছুই করিতে পারেন নাই। ইতি পূর্ব্বে পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতায় কনিষ্ঠ কেশবনাথ দুরারোগ্য ব্যাধিতে দৈবাৎ স্বর্গারোহণ করিলে নানা শুশ্রূষায় ভ্রাতার

জীবন রক্ষা করিতে না পারিয়া শোকে দুঃখে গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ পিতা ও বর্ষীয়সী মাতাকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিয়া নিজেও শোকে একবারে মূহ্যমান হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনার পর কতিপয় বৎসর যাইতে না যাইতে পিতাও অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ একটুকু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ভৈরব নাথের যথোপযুক্ত পারলৌকিক ক্রিয়া, ভৈরব নাথের চরমপত্রে প্রবেট নেওয়া ও সাংসারিক নানা কার্য্যে কিছু ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। এই সময়ে দিনাজপুরের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুঠি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়; এই কুঠীতেও ইহাদের জীবনের সম্বল অনেকগুলি টাকা ডিপজিট ছিল। ঋণ জাল ও তদুপরি এই ক্ষতিতে যে কোন লোকের বিব্রত হওয়াই স্বাভাবিক। এজন্য ২।৪ বৎসর বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হইয়াছে। এই সব দুশ্চিন্তায় তাঁহার বায়ু রোগের সৃষ্টি হইয়া অনিদ্রা, অক্ষুধা ইত্যাদি উপসর্গ ব্যাধি উপশমের পরও সঙ্গের সাথীর মত রহিয়া গেল। তিনি কনিষ্ঠ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের শিক্ষা দায়ীত্ব যে ভাবে অনুভব করিতেন তাহা জগতে বিরল। তাঁহার চিরপোষিত ইচ্ছা ফলবতী হইয়াছে। ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে উপযুক্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক করিয়া সংসারের ভার বহনোপযোগী করিয়া তিনি শান্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিয়াছিলেন।

ভোগবাসনায় অনাসক্তি তাঁহার চিরদিন সমান ছিল। কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাঁহার মত নিরভিমানী লোক এ জগতে বিরল। বিপদে পড়িয়া কেহ উপদেশ বা সাহায্য প্রার্থনা করিলে সে তাহা প্রচুর পরিমাণে পাইত। তাঁহার সহিত কাহারও মতানৈক্য ঘটিলে ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া যাহা সৎ তাহাই গ্রহণ করিতেন, বালক বৃদ্ধ জ্ঞান করিতেন না। জীবে দয়া ও প্রেম তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আমরা শীতবস্ত্র ব্যবহার করিব আর প্রতিবাসী দরিদ্র নরনারী শীত আতুর কষ্ট পাইবে এই ধারণা তাঁহাকে

বড় কষ্ট দিত। যতদূর সাধ্য শক্তিতে কুলায় তদস্বরূপ কতকগুলি মার্কিনের থান খরিদ করিয়া প্রতিবৎসর গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। আনন্দনাথ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক অর্থে বড় আছেন, কিন্তু এরূপ সদাশয় পরদুঃখ কাতর জগতে কয়জন আছেন জানি না! তাঁহার দান ও অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিশেষত্ব এই ছিল যে আপন জনেও তাহা জানিতে না পারে। তাঁহার কার্য্য-কারকবর্গ ও প্রজাবর্গকে তিনি আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। এখন কার্য্যকারকদের সহিত ব্যবহারের কথা একটুকু বলিব। তাঁহার পরলোক গমন করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসার জন্য তিনি কিছুদিন কলি-কাতায় ছিলেন। বাড়ীর কার্য্যকারকও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজকার্য্যে বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি বাড়ী আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন আনন্দনাথের পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তি ছিল না। তিনি রওনা হওয়ার প্রাক্কালে উপরে দেখা করিতে গেলে আনন্দনাথ যুক্তকরে বলিলেন, মহাশয়, আপনি অনেক দিন আমার বাড়ী আছেন এই দীর্ঘ সময় মধ্যে যদি কখনও কোন কারণে আপনার অন্তরে কষ্ট দিয়া থাকি আপনি অদ্য আমাকে সরলচিত্তে ক্ষমা করিয়া যান। এই কথা বলিতে বলিতেই আনন্দনাথের পাণ্ডুবর্ণ গণ্ড বহিয়া সরল হৃদয়ের অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল, মনের আবেগে ভৌমিক মহাশয়েরও কণ্ঠরোধ হইতেছিল। ক্ষণকাল পরে অনেক কষ্টে বলিলেন আপনার ন্যায় আশ্রয়দাতা জীবনে আর পাইব না, মনে হয় না আপনার নিকট কখনও অপ্রিয়বাক্য কিছু শুনিয়াছি; যদি কিছু বলিয়াও থাকেন সে আমার উপকারের জন্য। আপনি কিছু মনে করিবেন না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভৌমিক মহাশয় নীচে নামিয়া গেলেন।

তিনি নিজে তাঁহার বিশ্বাসমতে পরম ব্রহ্মের আরাধনা করিতেন বটে, কিন্তু কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাসে তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল না। তাহার

পৈত্রিক দেব ক্রিয়া ইত্যাদিতে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই। গুরু পুরোহিতদিগের প্রাপ্য সম্বন্ধে সমস্তই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাঁহার বিপুল পরিবারে সকলেই নিজ নিজ বিশ্বাস মত ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত হয় ইহাই তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ব্যাভিচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, চরিত্রহীন ব্যক্তি তাঁহার চক্ষুশূল ছিল।

আধুনিক হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে আনন্দনাথের মতামত তাঁহার নিজস্ব ছিল। তিনি বলিতেন, বিবাহ বাঙ্গালীর প্রধান রোগ, এ রোগের উপশম না হইলে দারিদ্র্য ঘুচিবে না। বিবাহে পণ গ্রহণ তিনি সমাজের পাপ ও কলঙ্ক মনে করিতেন। পণগ্রাহীদের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি বর বেচা ব্যাপারকে যেরূপ ঘৃণা করিতেন সেইরূপ অসদুপায়ে উপার্জ্জনকারীদের জন্যও দুঃখ করিতেন। তিনি বলিতেন, অসদুপায়ে উপার্জ্জন আর দস্যুবৃত্তিতে অধিক ব্যবধান নাই।

আনন্দনাথের জ্ঞান স্পৃহা জ্যেষ্ঠের ন্যায়ই বলবতী ছিল। বৎসরে যে সব বই ক্রয় করিয়া পড়িতে হইবে ডাইরীর প্রথমে তাহার তালিকা হইত। এণ্ট্রাস পাস্ করিবার পূর্ব্বে Gibbon's decline and fall of Roman Empire চন্দ্রালোকে বসিয়া পাঠ করিতেন। মৃত্যুর বৎসরও নয় খণ্ড Miller's History of India পাঠ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক বহু কাগজ পাঠ করিতেন। রাজনীতি প্রসঙ্গেও তিনি খুব সজাগ ছিলেন।

ঢাকার East যখন Lord Curzonকে অযথা স্তুতিবাদে পরিতুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, তখন তাঁহার প্রশংসাবাদ আনন্দনাথের গায় সহিল না, তিনি তাহার বন্ধু East এর সম্পাদক বঙ্গবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন আমার বাৎসরিক চাঁদা আপনাদের নববিধান সমাজের সাহায্যার্থ গ্রহণ করিবেন, আমি আর East রাখিব না।

সেবার মৃত্যুর পূর্ব্বে পূজার সময় তিনি জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলেও দেশকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি বাড়ীতে আদেশ পাঠাইলেন তাঁহার বাড়ীতে পূজায় যেন বিদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ ব্যবহার না হয়।

তিনি ১৩১২ সালের ১৬ই আশ্বিন জীবনের কার্য্যের অবসানে বালক পুত্র যদুনাথ, বিধবা পত্নী মনোমোহিনী দেবী ও কন্যা ভবতারিণীকে রাখিয়া অমর ধামে চলিয়া যান।

যদুনাথ এক্ষণে কলিকাতায় কবিরাজী করিতেছেন। ইঁহার পরলোক গমন করিবার পর দিনাজপুর ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পরলোকগত শ্রদ্ধাভাজন ভুবনমোহন কর ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণনাথ সেন মহাশয়কে যে চিঠিখানি লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এই বংশ বিবরণ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। এই চিঠিখানি হইতেই আনন্দনাথের চরিত্রের মহিমা অবগত হইতে পারা যাইবে।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম
দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ
১৯০৫ সন ১১ অক্টোবর।

শ্রদ্ধাভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ সেন

মহাশয় শ্রদ্ধাভাজনেষু

শ্রদ্ধেয় মহাশয়!

সেদিন শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রমুখাৎ আপনার পিতৃব্য এবং আমাদের একজন পরম শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধু আনন্দ নাথ সেন মহাশয়ের অকাল পরলোক গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দিনাজপুর ব্রাহ্ম সমাজ গভীর শোক নিমগ্ন প্রাণে সকল সন্তাপহারী পরম দেবের এই মহাপুরুষের পরলোক প্রস্থিত আত্মার কল্যাণ এবং ইঁহার অভাব জনিত

গভীর শোককাতর অপনাদের পরিবার বর্গের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান জন্য বিশেষভাবে ভিক্ষা ও প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাবা, যদিও আমরা ইহা বিশেষ ভাবেই জানি ও বিশ্বাস করি যে ইনি একজন স্বয়ং সিদ্ধ মহাপুরুষ, তখন আর ইঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় অপরের প্রার্থনা করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, তথাপি ইঁহার প্রতি আমাদের যে প্রাণে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তাহারই তাড়নায় বা প্রবর্ত্তনায় আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনায় বিশ্বজননীর করে প্রাণের প্রার্থনা না জানাইয়া আর কোন মতেই বিরত থাকিতে পারি নাই বা পারিলাম না। বাবা, আপনার এই পিতৃব্যদেবের নিকটে আমরা অশেষ কারণে ঋণী, ইঁহার নিষ্কলঙ্ক সুনির্ম্মল চরিত্র আমাদের চরিত্র গঠনের বিশেষভাবে সুশিক্ষা দিয়াছে। ইঁহার জ্বলন্ত অগ্নিময় উদ্দীপ্ত বাক্য অনেক সময় আমাদের প্রাণে যথেষ্ট সৎ সাহসের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে এবং ইঁহার প্রদত্ত অর্থ সাহায্য প্রতিনিয়তই আমাদের অর্থের অভাব সকল বিমোচন করিয়া আমাদিগকে যার পর নাই আপ্যায়িত ও অনুগৃহীত করিয়াছে। বাস্তবিক এমন হৃদয়ঙ্গম সুহৃজ্জনের ঈদৃশ অসাময়িক অভাবে কাহার প্রাণ না ব্যথিত ও কাতর হয়? তবে অপ্রতিবিধেয় ঘটনায় শোক মোহের বশীভূত হওয়া কোন মতেই সঙ্গত ও বিধেয় নহে বলিয়াই মহাপুরুষের শোকে কাতর না হইয়া আমাদের সকলেরই সর্ব্বপ্রথমে ইহাই কর্ত্তব্য যে যাহাতে এই মহাপুরুষের সেই পরলোক প্রস্থিত আত্মার কল্যাণ ও শান্তি বিহিত হইতে পারে। বাবা! এইটী বাস্তবিকই মহাজন গৃহীত অতীব সত্য কথা যে তাঁহার সেই স্বর্গের সান্ত্বনা ব্যতীত মানুষ আর কিছুতেই বন্ধুজনের বিয়োগ ব্যথা ভুলিতে বা বিস্মৃত হইতে পারে না। ভগবান আপনাদের প্রাণকে সুশীতল করুন ইহাই তাঁহার চরণতলে আমাদের একমাত্র বিনীত ভিক্ষা। কিমধিকম্।

শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু

গোয়াবাগানের বসু বংশ।

কলিকাতা গোয়াবাগানের বসু বংশ অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। গড় গোবিন্দপুর ইহাঁদের আদি বাসস্থান ছিল। কলিকাতার গড়ের মাঠ ও ফোর্ট উইলিয়ম যে স্থানে অবস্থিত ঐ স্থানকেই পূর্ব্বে গড়-গোবিন্দপুর বলা হইত। গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থানের সমস্ত বসতি উঠাইয়া দেওয়ায় এই বসু বংশের চক্রপাণি বসু ২৪ পরগণা জিলার বারাশত মহকুমার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে গমন করতঃ তথায় বাস করিতে থাকেন এবং এই বসু বংশ অদ্যাপি উক্ত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। চক্রপাণি বসুর অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ ত্রৈলোক্য নাথ বসু।

ত্রৈলোক্যনাথ বসুর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামরতন, মধ্যম অভয়চরণ ও কনিষ্ঠ জয়গোপাল। রামরতনের কোন বংশধর নাই এবং কনিষ্ঠ জয়গোপাল শৈশবেই মারা যায়। মধ্যম অভয় চরণ ১৩০৪ সনে ২৩শে চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করেন। মধ্যম অভয়চরণের তিন পুত্র, অমরনাথ, হরনাথ ও পরেশ নাথ। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে অমর জন্মগ্রহণ করেন। অমরনাথ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তৎপর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ও তথা হইতে যোগ্যতার সহিত এফ্‌ এ, ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জেনারেল এসেম্ব্রীতে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে

ত্রৈলোক্যনাথ।

বি, এল পড়িতে থাকেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৎসরেরই মার্চ্চ মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি দিন দিন উন্নতি করিয়া বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন হন এবং গোয়াবাগানের বর্ত্তমান বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। অমরনাথ বারাশত লোকাল বোর্ডের বহুদিন যাবত চেয়ারম্যানী করিয়াছেন। তিনি আলিপুর জেলাবোর্ডের ও সভ্য। এই উভয় কার্য্যে তিনি অনেক লোক হিতকর কার্য্য করিয়া জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সহানুভূতির ভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যে পরম প্রীত হইয়া ইঁহাকে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট (Certificate of honour) প্রদান করেন। বর্ত্তমানে অমরনাথের বয়স ৮২ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সুস্থ দেহে যুবকের মত শক্তি, উৎসাহ ও অধ্যবসায় সম্পন্ন। এখনও তিনি হাই-কোর্টে যাইয়া থাকেন। অমরনাথ অতি মাত্রায় মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের আদেশ ব্যতীত তিনি কখনও কোন কার্য্য করিতেন না। মাকে তিনি সাক্ষাত দেবীর মত ভক্তি করিতেন। তিনি কুমার-টুলীর হরিহর মিত্রের কন্যা মাণিকমণিকে বিবাহ করেন। মাণিকমণি পাতিব্রত্যে গৃহস্থালীর কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে সাক্ষাত লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায় ও আচরণে, দাস-দাসী, পরিচারক-পরিচারিকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাক্ষাত মায়ের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। অতিথি সেবায় তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমরনাথের এই গুণশালিনী সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হয়।

অমরনাথের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রমেশচন্দ্র, মধ্যম সুরেশচন্দ্র ও কনিষ্ঠ ভবেশচন্দ্র। রমেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধ-

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু।

রমেশচন্দ্র। প্রতি এটর্ণী। তিনি ১৮৬৩ সনের ৯ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এল পাশ করেন, পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের হাইকোর্টে এটর্ণী হন ও এটর্ণী গিরি আরম্ভ করেন। ইনি ভাগলপুরের হেরম্বচন্দ্র ঘোষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রমেশচন্দ্রের সাত পুত্র। (১) ভূপেন্দ্র (২) ফণীন্দ্র (৩) সুধীন্দ্র (৪) শচীন্দ্র (৫) ধীরেন্দ্র (৬) রবীন্দ্র (৭) যতীন্দ্র। রমেশচন্দ্রের ৪ কন্যা। প্রথমা সুহাষিণী, দ্বিতীয়া উষা, তৃতীয়া সুকুমারী ও কনিষ্ঠা বীণা।

ভূপেন্দ্র ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এফ এ অবধি অধ্যয়ণ করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রের চারিটী কন্যা ও দুইটি পুত্র। পুত্র দুইটির নাম শৈলেন্দ্র ও রথীন্দ্র।

ভূপেন্দ্র।

ফণীন্দ্র ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি-এল পাশ করিয়া পরে এটর্ণী হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ্যতার সহিত এটর্ণীগিরি করিতেছেন। শ্যামবাজার নিবাসী ৺ডাক্তার আর জি করের ভ্রাতুষ্পুত্রী ৺রাধারমণ করের ৪র্থ কন্যা শ্রীমতি শৈলজাবালার সহিত ইহার বিবাহ হয়। গত ১৯২২ সনের ২রা নভেম্বর ফণীন্দ্র বাবুর স্ত্রী পরলোক গমন করেন। ফণীন্দ্রের তিন কন্যা ও একপুত্র। পুত্রটীর নাম সুশীল।

ফণীন্দ্র।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সুধীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি-এ-বি-এল। হাইকোর্টে ওকালতী করিতে করিতে ইনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়াছেন ও কলিকাতা হাই-কোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার একটী কন্যা।

সুধীন্দ্র।

শচীন্দ্র ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

শচীন্দ্র। শচীন্দ্রের এক পুত্র অজিত।

ধীরেন্দ্র। ধীরেন্দ্র ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এখন বি-এস্-সি পড়িতেছেন।

রবীন্দ্র ও যতীন্দ্র। রবীন্দ্র ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও যতীন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই এখন স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

সুরেশচন্দ্র। অমরনাথের দ্বিতীয় পুত্র সুরেশচন্দ্র ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এল্ এম্ এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেছেন। সুরেশচন্দ্রের দুই পুত্র ও দুই কন্যা (১) সন্তোষ ও (২) সুবোধ সন্তোষ এম্ বি পাশ করিয়া কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেছেন। সন্তোষ ১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সন্তোষের একটি পুত্র—নাম সত্যেন্দ্র। সুবোধ ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুবোধ বি-এ-বি-এল পাশ করিয়া এটর্ণীগিরি পড়িতেছেন। সুবোধের একটি কন্যা।

ভবেশচন্দ্র। অমরনাথের তৃতীয় পুত্র ভবেশচন্দ্র। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভবেশচন্দ্র কয়লার ব্যবসায় করিতেছেন। ভবেশচন্দ্রের দুই পুত্র ও চার কন্যা (১) বীরেন্দ্র ও (২) হীরেন্দ্রনাথ।

অভয়চরণের দ্বিতীয় পুত্র হরনাথ।

এই বংশের ইতিহাস পড়িলে লক্ষ্মী সরস্বতীর একত্র সমাবেশ দেখিয়া বাস্তবিকই শরীর আনন্দে আপ্লুত হয়। এত বড় বিরাট পরিবার বঙ্গে অতি কমই দৃষ্ট হয়। সমস্ত ভ্রাতায় ভ্রাতায়—ভ্রাতুষ্পুত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রে যেন এক আত্মা, এক প্রাণ। অমরনাথ অতি ভাগ্যবান

তারাপদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাইকোর্টের উকীল। তিনি মহাকালী পাঠশালার কার্য্যকরী কমিটির একজন সদস্য। খিদিরপুর একাডেমী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর সভ্য। হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর বিল্ডিং নির্ম্মাণে ইনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইনি উক্ত লাইব্রেরীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। আনন্দময়ী দরিদ্র ভাণ্ডারের একজন পৃষ্ঠপোষক। তিনি ডফ কলেজে পড়িয়া তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরাজীতে অনার লইয়া বি এ পাশ করেন। তৎপর বি-এল পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, মাছ মাংস ভক্ষণ করেন না। তিনি নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা বিবিধ সৎকর্ম্মের উৎসাহ ও সাহায্যদাতা।

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ্র সিংহ রায়।

ত্রিপুরা জেলার গোবিন্দপুরের জমিদার সিংহ রায় পরিবারের উদ্যানে একটী কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র বঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিভাগে স্বীয় সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিস্তার করিয়াছিলেন। তত্রত্য অসংখ্য লোক তদ্দারা আমোদিত ও পরিপুষ্ট হইতেছেন সত্য, কিন্তু অনেকেই সে সৌন্দর্য্য সৌরভের মূল উৎস সে কুসুম ও কুসুমপাদপের পরিচয় অবগত নহেন। এ আঁধার দেশের আলোকস্তম্ভ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দচন্দ্র সিংহ রায়ই সে কুসুম। আমরা আজ তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ঠাকুর চতুর সিংহ নামে চৌহান বংশীয় জনৈক রাজপুত ক্ষত্রিয় আজমীরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জাতিধর্ম্ম যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে সৈন্য বিভাগে কার্য্যগ্রহণ করতঃ কার্য্যোপলক্ষে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার স্বখসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণান্তে বাংলা দেশে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। স্বর্গীয় ঠাকুর তিলক সিংহ তাঁহার পুত্র। তিনি মৃত্যুকালে ত্রিপুরা জেলার হোমনাবাদ, চৌদ্দগ্রাম, টোরা, নরসিংহপুর ইত্যাদি পরগনায় বিস্তৃত জমিদারী করিয়া যান। তিলক সিংহের তিন পুত্র জন্মে—জ্যেষ্ঠ রামদুলাল সিংহ রায়, মধ্যম গোপাল-কৃষ্ণ সিংহ রায় ও কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র সিংহ রায়। মধ্যম ও কনিষ্ঠ অপুত্রক ছিলেন। মধ্যম দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া নানা প্রকার লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি দীঘি পুষ্করিণী খনন

স্বর্গীয় রায় আনন্দচন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর

করাইয়া দেশের জলকষ্ট নিবারণের বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান মেহার কালীবাড়ীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথি নিবাস তাঁহার জীবনের অন্যতম কীর্ত্তি। জ্যেষ্ঠ স্বর্গীয় রামদুলাল সিংহ রায় বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা নগরী অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ হইলে অসংখ্য নরনারী গৃহ, অন্ন ও বস্ত্রাদি শূন্য হইয়া পড়ে। তৎকালে তিনি মুক্তহস্তে বিপন্ন লোকদিগকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য (For his services as a Magistrate, his loyalty, liberality and good conduct as a citizen) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্ঞী' পদবী গ্রহণ করার সময় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। তিনি অনেক দিবস অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপাল কমিশনার এবং বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র জন্মে :—আনন্দচন্দ্র সিংহ রায়, অনুকূলচন্দ্র সিংহ রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ রায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ রায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সিংহ রায় ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ রায়। তন্মধ্যে মহাত্মা আনন্দচন্দ্র সিংহ রায়ের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গোবিন্দপুরের সিংহ রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার পিতা এদেশের একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মোৎসব অতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। তারপর উপযুক্ত বয়স হইলে তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাংলা দেশের রাজধানী, শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, কলিকাতা নগরীতে প্রেরিত হন। তথায় তিনি কোন স্কুল কলেজে প্রবেশ না করিয়া উপযুক্ত গৃহ শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংসারে প্রবেশ করেন।

সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রথম বৎসরেই তিনি কুমিল্লা নগরীতে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহাতে তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও দেশহিতৈষণার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। অল্পকাল মধ্যেই এই বিদ্যালয়ের আশানুরূপ প্রসার ও সফলতা দর্শনে প্রীত হইয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের অন্যতম অক্ষয় কীর্ত্তি। এদেশে তদপেক্ষা আঢ্যতর বহু লোক আছেন সত্য, কিন্তু হৃদয় সম্পদে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন, তাই অন্য কেহই দেশের এই মহৎ অভাব দূরীকরণে অগ্রসর হন নাই। তিনি দেশের বালক ও যুবকদের সৎশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া দেশকে যে ঋণে ঋণী করিয়াছেন, দেশের সে ঋণ চিরকাল অপরিশোধিত থাকিবে। কলেজের জন্য যে তিনি কত সহস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র সিংহ রায় তাঁহার পিতার চরিত্রের সদ্গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। শিষ্টাচারে সিংহ মহাশয় রায় পরিবারের সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। বদান্যতা, অমায়িকতা, বন্ধু বাৎসল্য ও আশ্রিত প্রতিপালকতায় তিনি তৎকালে এতদঞ্চলে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি কণ্ট্রাক্টরী ব্যবসায় দ্বারা তাঁহার জীবনে, বিশেষতঃ আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে নির্ম্মাণকালে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তৎসমুদয়ই তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় ভিক্টোরিয়া স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজের পোষণে এবং বন্ধুবান্ধব ও আশ্রিতবর্গের প্রতিপালনে অকাতরে ব্যয় করিয়া জীবন লীলা সাঙ্গ করেন।

সৎকার্য্যের প্রথম ও প্রধান পুরস্কার আত্মপ্রসাদ। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভিক্টোরিয়া কলেজের সফলতা ও শ্রীসম্পদ দেখিলে তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে যে প্রীতিছবি ফুটিয়া উঠিত তাহাতেই দর্শকের কাছে তাঁহার আত্মপ্রসাদের পূর্ণতা সপ্রমাণ করিয়া দিত। সৎ-

কার্য্যের দ্বিতীয় পুরস্কার গভর্ণমেণ্টের এবং দেশের ও দশের, বিশেষতঃ উপকৃতদের দেশহিতৈষী উপকারীজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান। সে হিসাবে তিনি দেশবাসীর পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ের অর্ঘ্য ও ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতেও তাঁহার পুরস্কার হইয়াছে। দিল্লীর দরবারে তাঁহার আমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমন্ত্রিত হইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সিংহ রায়ের সহিত দিল্লীর দরবারে যোগদান করেন। তদুপলক্ষে তাঁহারা উভয় ভ্রাতা তাঁহাদের দেশহিতকর নানাবিধ সৎ-কার্য্যের জন্য অনার সার্টিফিকেট ও দরবার পদক প্রাপ্ত হন। তৎপর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কৃত উপকারের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব আরও উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন।

রায় বাহাদুর অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা। তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র সিংহ রায়ও একজন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জীবিতকালে সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠের সৎকার্য্যাবলীর প্রতিপোষকতা করিতেন। তৃতীয় সহোদর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সিংহ রায়। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ কুমিল্লাতে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মিউনিসিপাল কমিসনারের কাজ করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে নয় বৎসর মিউনিসিপালিটির কর্ণধাররূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি নানা ভাবে সহরের নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার প্রতিনিধি-স্বরূপ Govt. Industrial Conferenceএর সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল কুমিল্লা জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক ছিলেন। তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুল এবং কলেজের সম্পাদক। কৃষি বিষয়ক গবেষণায় তাঁহার খুব উৎসাহ। তিনি বঙ্গীয় কৃষি বোর্ডে চট্টগ্রাম বিভাগের একমাত্র বে-সরকারী সদস্য। চতুর্থ সহোদর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সিংহ

রায় অতি অমায়িক ব্যক্তি। তিনি নাট্যাভিনয়ে সিদ্ধহস্ত। সহজ ভাবে তিনি যে অভিনয় করেন তাহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্রও থাকে না। কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সিংহ রায়, তদীয় খুল্লতাত স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ সিংহ রায়ের পোষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন এবং তিনিই এক্ষণ জমিদারীর অর্দ্ধাংশের মালিক। অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় তিনিও অমায়িক, পরোপকারী এবং প্রজাহিতৈষী।

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুপ্ত বি-এ, বি-এল

চট্টগ্রাম চক্রশালার শ্রীমহিমচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মণ বি এ, বি এল।

পবিত্র সূর্য্যবংশে অযোধ্যাপতি শ্রীশ্রীরামচন্দ্রাত্মজ কুশের উত্তর পুরুষ বল্লাভিপুরাধিপতি মহারাজ কনক সেনের পুত্র মহারাজ শিলাদিত্যের রাজত্ব সময়ে হুন এবং পারদগণ কর্ত্তৃক বল্লাভিপুর আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। মহাবলশালী শিলাদিত্য আপনার সেনাদল সমভিব্যাহারে ভীমকায় শত্রুগণের সম্মুখীন হইয়া প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করতঃ শত্রুবিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সম্মুখ সমরে নিপতিত হইয়াছিলেন। সেই মহাসমর সময় মহারাজ শিলাদিত্যের পত্নী রাণী পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন এবং পুত্র কামনা করিয়া তদানীন্তন প্রমার রাজধানী চন্দ্রাবতী নগরে আপন পিতৃ-গৃহে ভবানীর মানসপূজা দিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। পূজা বিধিপূর্ব্বক সমাধান করিয়া পতিগৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে সর্ব্বনাশকর সমর সংবাদ শুনিতে পাইলেন। পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া তম্মুহূর্ত্তে চিতানলে প্রবেশ করিলেন না কিংবা পিতৃভবনেও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। যথাকালে তাঁহার একটি পুত্র প্রসূত হইল। তিনি একজন ব্রাহ্মণীর হস্তে আপন শিশু সন্তান সমর্পণ করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলেন "দেবী আমার হৃদয়ের ধন প্রাণকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম এখন আপনিই ইহার মাতা; আপনার পুত্র বলিয়া ইহাকে লালন-পালন করিবেন, ইহাকে ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়া যথাকালে এক রাজকন্যার সহিত বিবাহ দিবেন।" তারপর তিনি প্রজ্জলিত চিতানলে তনুত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিলেন। গুহার মধ্যে

শিশুর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ঐ শিশুপুত্রের নাম "গোহ" রাখা হয় কালক্রমে "গোহ" "গ্রহাদিত্য" নাম গ্রহণপূর্ব্বক ইদর রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। মহারাজা গ্রহাদিত্যের অষ্টম পুরুষ মহারাজ নাগাদিত্যের পুত্র সূর্য্যবংশ কুলতিলক গোহ "বাপ্পারাও" আপন মাতুলালয় "চিতোরে" উপস্থিত হন। সমস্ত সামন্ত রাজপুরুষগণ তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে চিতোর রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই তিনি "হিন্দুসূর্য্য" "রাজগুরু" "সার্ব্বভৌম" এই তিনটী গৌরবজনক উপাধি লাভ করেন। ইতিহাসে তিনি "বাপ্পারাওল" নামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনিই গোহ বা গিহাট বংশতরু চিতোরে রোপণ করেন। বাপ্পার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি আপনাদিগের পিতৃ পুরুষ-দিগের প্রাচীন রাজ্য সৌরাষ্ট্রে ফিরিয়া যান। কালে ইহাদের এক শাখা হইতে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজধানীতে ইহারা বসতি বিস্তার ও বংশ তরু রোপণ করিয়াছিলেন। চিতোর নগরে মহারাজ অমরসিংহ, হামির, প্রতাপ প্রভৃতি ভারতপূজ্য বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া পবিত্র গোহ বংশ আলোকিত করিয়া গিয়াছেন। চিতোরাধিপতি মহারাজ সমরসিংহ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ভগ্নী "পৃথার" পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পাণিপথ ক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের সাহায্যার্থ উপস্থিত ছিলেন। এই বংশের এক শাখা কনৌজ ও কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথা হইতে মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞ রক্ষার্থে এবং ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত গোহ কুল-তিলক বিরাট গোহ শিবিকায় আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। আদিশূরের সভায় পরিচয় দিবার সময়ে বিরাট গোহের সহযাত্রী পুরুষোত্তম দত্ত আদিশূর ও ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এতেষাং রক্ষনার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে।"

বিরাট গোহ বঙ্গদেশে গোহ বংশতরু রোপণ করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূরের নিকট ঐ ব্রাহ্মণগণের একজন এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

"অয়মগ্নি কুলোদ্ভবো গোহবংশাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্য পুঞ্জান্বিতঃ।
বিরাট পুরুষ সমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্
সুতাপস মহাবপুঃ কাশ্যপগোত্রসম্ভূতকঃ॥
শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ
বিত্তৎসু বিপ্রেষু সদানুরক্তঃ।
সদাচার যুক্তঃ সুহৃদাং শরেণ্যঃ
দ্বিজাতি পালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ॥

বঙ্গদেশে সেই সময়ে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন। নবাগত ক্ষত্রিয়গণ তন্নিমিত্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া মহারাজ বল্লাল সেনের রাজত্বে গৃহীত হইয়াছিল। সময়ে রাজপুত্র বিরাট গোহের সন্তানের সহিত মহারাজের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় রাজপুত্র গোহ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় শ্রেষ্ঠ কুলিন শ্রেণীতে সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইঁহার অনেক পুরুষ পর এই বংশের যাঁহারা পশ্চিম বঙ্গবাসী তাঁহারা তথায় মৌলিক এবং যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে বাস করেন তাঁহারা এইখানে শ্রেষ্ঠ কুলিন বলিয়া পরিচিত হন।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার পর এই গোহ বংশের এক শাখা বর্ত্তমান হুগলি জিলার অন্তর্গত (পূর্ব্ব নাম জাহানাবা)দ হরিপাল গ্রামে বাস করিত। গৌড়রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় পর গোহকুল তিলক রাজপুত্র গোবিন্দরাম গোহ আপন কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামা-

নন্দ গোহ এবং কৃষ্ণপ্রসাদ গোহকে লইয়া ছয়জন ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, বাৎস্য গোত্র আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, গুরুহরি চক্রবর্ত্তী, ধুপি ইন্দ্র এবং নাপিত রামজয় সহ চট্টগামে উপস্থিত হইয়া চক্রশালা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তথা হইতে রামানন্দ গোহ এবং কৃষ্ণপ্রসাদ গোহ ঢাকা বজ্র-যোগিনী গ্রামে চলিয়া যান। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন এবং তাঁহাদের অনেক কৃতী সন্তান গোহবংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষা এবং উচ্চারণের পার্থক্য হেতু গোহ উপাধি ক্রমে "গুহ" বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন দলিলাদিতে পূর্ব্ব পুরুষগণের উপাধি "গোহ" বলিয়াই লিপিবদ্ধ আছে। বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন জিলায় অনেক শব্দের সংযুক্ত "ও" কার উচ্চারণ করিতে "উ"কার উচ্চারিত হয় এবং লিখিতেও "উকার" ও "ওকার" অনেক সময়ে বিনিময় হইয়া থাকে।

চট্টগ্রাম এক সময়ে ব্রহ্মরাজ বৌদ্ধ মগরাজার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তহেতু চট্টগ্রামে এখনও "মঘি" সংবৎসর প্রচলিত আছে। চট্টগ্রামের বর্ত্তমান মগিগণ ১২৮৫ সনে মগি হয়। গোহ-কুল-তিলক গোবিন্দরামের পৌত্র পুণ্যশ্লোক অমরনাথ গুহ চট্টগ্রামে ব্রহ্মরাজের প্রতিনিধি দেওয়ান ছিলেন এবং "আদমছায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি অমর আদমছায় নামেই পরিচিত। পটীয়া থানান্তর্গত চক্রশালা গ্রামে তাঁহার পিতৃপুরুষের ভদ্রাসন বাড়ীর সম্মুখে পূর্ব্বদিকে "অমর আদামছায়ের" দীঘি এখনও তাঁহার অমর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। শুনা যায় এই দীঘির জলপানে অনেক দুরারোগ্য রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে এবং ইহার জল লইবার নিমিত্ত অনেক দূরস্থানের লোক আসিয়া থাকে। মহাত্মা অমর আদমছায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার সন্তানগণ পিতৃগৌরব এবং সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অধঃস্তন পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত সম্মানসূচক চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ষষ্ঠ পুরুষে ইংরেজ রাজার সময়ে

ইহারা কমলার কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন এবং চৌধুরী উপাধি ত্যাগ করেন। ঈশানচন্দ্র গুহ চক্রশালা ত্যাগ করিয়া রাজধানী কলিকাতায় যাইয়া আলিপুর জজ কোর্টের পেস্কার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে তৎকনিষ্ঠ সহোদর অভয়াচরণ গুহ ৩০ বৎসর বয়সে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎসহধর্ম্মিণী পূজ্যাস্পদা আনন্দময়ী দেবীসহ মহামারী রোগাক্রান্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করেন। ঐ মহামারীতে গ্রাম উৎসন্ন প্রায় হইয়াছিল। তাঁহার খুল্লতাত ছত্রনারায়ণ গুহের বিধবা কন্যা দেবী বিপুলা অতুল সাহসে ছয় মাস বয়স্ক শিশু শম্ভুচন্দ্রকে অতি কষ্টে রক্ষা করিয়াছিলেন। অভয়াচরণ গুহ কোন কারণে পূর্ব্বপুরুষের গুরু ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু হইতে দীক্ষা লইয়াছিলেন; ঐ দীক্ষা লওয়ার তিন মাসের মধ্যেই তাঁহার এবং তদীয় স্ত্রীর ঐ প্রকার শোচনীয় মৃত্যু হয় এবং গুরুও অন্ধ হইয়া সরকারি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, পূর্ব্ব গুরু আরাধনা করিয়া ঈশানচন্দ্র গুহ ভ্রাতুষ্পুত্র শরৎচন্দ্রকে ব্রহ্ম-কোপাগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজে উক্ত রামহরি ভট্টা-চার্য্যকে কলিকাতায় আনিয়া তথায় তাঁহা হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এ দিকে ৺অভয়াচরণ গুহের গুরু মহাশয় নিরাশ্রয় শিশু শরচ্চন্দ্রের গৃহ হইতে যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যান। নিঃসহায় বিধবা বিপুলা দেবী তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন না। শিশু শরচ্চন্দ্রের মাতুল মহাত্মা চণ্ডীচরণ চৌধুরী পরে ইহা শুনিতে পাইয়া আপন ভাগিনেয়কে তাঁহার নিজ বাড়ীতে নিয়া প্রতিপালন করিতে অত্যন্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিপুলা দেবী কিছুতেই পিতৃপুরুষ-গণের ভদ্রাসন শূন্য করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাতুলালয়ে নিয়া যাইতে দিয়া-ছিলেন না। যাহা হউক ঐ লুটের পর কপর্দ্দকহীন নিঃস্ব শিশু ঐ মাতুল মহাত্মার কৃপাতে এবং সাহায্যে সেই সময়ে জীবন ধারণ করিতে পারিয়া-ছিলেন। দেবী প্রকৃতই স্বর্গের দেবী ছিলেন। কলিকাতা হইতে

ঈশানচন্দ্রকে দেশে আনিবার নিমিত্ত, অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি দেশে ফিরিলেন না। সহায়হীন দরিদ্র বিধবা শিশুকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ং কলিকাতা যাইয়া ভ্রাতাকে ফিরাইয়া আনিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেই সময়ে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার এবং বিষম ভয়ের কারণ ছিল। ষ্টীমার তখনও হয় নাই, রেল ত দূরের কথা। চট্টগ্রাম হইতে নৌকা করিয়া বঙ্গোপসাগর, সন্দ্বীপসাগর এবং মেঘনা নদী বাহিয়া, ডাকাত, দস্যু, ব্যাঘ্র, সর্প, ভল্লুক পরিপূর্ণ সুন্দর বনের ভিতর দিয়া অনেক মাসে কলিকাতার কালীঘাটে পৌঁছা যাইত। জল পথে নরঘাতক ভীষণ ডাকাতগণ অহোরাত্র নৌকা লুটপাট করিত এবং অর্থের নিমিত্ত বা সামান্য কারণে নৌকা ডুবাইয়া দিত ও তরবারি দ্বারা লোকের প্রাণনাশ করিত। সেই সময়ে কলিকাতা এবং তীর্থোপলক্ষে পশ্চিম যাত্রীগণ দেশ হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বে আপন সম্পত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন এবং আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবগণ হইতে চিরতরে বিদায় লইয়া যাইতেন। এই সময়ে নিঃসহায়া বিধবা বিপুলা দেবী একমাত্র আপন পিতৃ পুরুষগণের ভদ্রাসনের ছায়া রাখিবার মহান উদ্দেশ্যে সঙ্গে একমাত্র গোলাম মদন দে নামক চাকরকে লইয়া শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে বক্ষে ধারণ করতঃ সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া কলিকাতা যাওয়ার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এদিকে মাতুল চণ্ডীচরণ চৌধুরী এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন এবং শিশু ভাগিনেয়কে কিছুতেই এই মৃত্যু সঙ্কুল পথে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন। চক্রশালা হইতে চট্টগ্রাম সহরে আসিতে হইলে পটীয়া সুচক্রদণ্ডি গ্রামে বর্ত্তমান ইন্দুরি পোনের নিকট অথবা কৃষ্ণখালি খালের ঘাটে, অথবা হাঁটিয়া আসিলে কর্ণফুলীর ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিতে হইত। চণ্ডীচরণ ঐ প্রত্যেক ঘাটে এক একজন করিয়া পাহারা দিলেন। কিন্তু দেবীর সুমহৎ উদ্দেশ্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং স্বর্গীয় তেজে প্রদীপ্ত অসীম সাহস তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল

করিয়া দিল। দেবী বিপুলা বিশ্বস্ত ভৃত্যের সাহায্যে রাত্রি যোগে বাড়ী ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য রাস্তা পরিহারপূর্ব্বক মাঠের ভিতর দিয়া শিশু পুত্রকে বক্ষে করিয়া ক্রমাগত হাটিয়া বাকালয়া গ্রামের নিকট খেয়া নৌকায় কর্ণফুলী পার হইলেন এবং ক্রমশঃ হাটিয়া উপসাগর সন্দীপের নিকট যাইয়া কলিকাতার নৌকায় উঠিয়াছিলেন। অসহায়ের সহায় ভগবান তাঁহার সহায় ছিলেন। তিনি বিনা বাধাবিঘ্নে কলিকাতায় কালিঘাটে পৌছিয়া ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র গুহের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্র প্রাণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও একমাত্র বংশধর শিশুকে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই সেই আনন্দ কতক দিনের নিমিত্ত নিরানন্দে পরিণত হইয়াছিল। ঈশানচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে কলিকাতা রাখিয়া মানুষ করিবেন এবং বিদ্যা শিক্ষা দিবেন বলিয়া প্রকাশ করায় বিপুলা দেবী প্রথমতঃ তাঁহাকে দেশে ফিরিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে ঈশানচন্দ্র সম্মত হইলেন না। দেবী প্রতিমা হিন্দুললনা পিতৃ পুরুষের ভিটাতে আলো দিবার মানসে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসিয়াছিলেন। বংশের দ্বিতীয় কেহ নাই। এ অবস্থায় ভ্রাতার নিদারুণ বাক্যে মণিহারা ফণিনীর ন্যায় বিপুলা দেবী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। দুঃখে, ততোধিক ক্রোধে কম্পিতকলেবরা হইয়া ভীষণ গর্জ্জনে শপথ করিয়া বলিলেন, তিনি ঈশানচন্দ্রের অন্ন জল গ্রহণ করিবেন না। নয় মাস বয়স্ক শিশু শরচ্চন্দ্রকেও তাঁহার অন্নজল গ্রহণ করাইলেন না। হয় ঈশানচন্দ্র গঙ্গাজলে নামিয়া দেশে ফিরিবার শপথ করিবেন, না হয় তিনি শিশুকে বক্ষে লইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবেন এবং কাশীধামে গমন করিবেন। ভ্রাতা ভগ্নীর এই বিরোধ ক্রমাগত তিন দিন চলিল। বিপুলা দেবী এই তিন দিন বিন্দুমাত্র জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না। তিনি শিশু শরচ্চন্দ্রের নিমিত্ত বাজার হইতে

"খই" আনিয়া গঙ্গা জল দ্বারা তাহাই খাওয়াইতেন, ঈশানচন্দ্রের অন্ন জল শিশুকেও দিলেন না। তৃতীয় রাত্রিতে ভগবানের লীলা প্রকাশ পাইল, ঈশানচন্দ্র বাড়ীতে বসিয়া আফিসের কাজ করিবার নিমিত্ত কয়েকটি নথি বাড়ীতে আনিয়াছিলেন এবং ঐ নথি তাঁহার সুদৃঢ় কাঠের হাত বাক্সে ছিল। রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে বাড়ীতে চুরি হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাক্স এবং সরকারী নথি পত্র চুরি যায়। পরদিন ইহা লইয়া গুরুতর গোল উঠে,পুলিসের তদন্তে অনতিবিলম্বে গঙ্গাগর্ভে জলের উপরিভাগে ঐ ভগ্ন বাক্স পাওয়া যায়। বাক্সে সমুদয় নথি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কেবল বাক্স হইতে ঈশানচন্দ্রের অনেক মূল্যবান জিনিষাদি এবং টাকা অপহৃত হইয়াছিল। আদালতের নথি পাওয়া যাওয়াতে ঈশানচন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইল বটে, কিন্তু রাজপুরুষেরা তাঁহার অমনোযোগীতা এবং অসাবধানতার অপরাধ সাব্যস্থ করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। চাকরি হারাইয়া ঈশানচন্দ্র বুঝিলেন, দেশে ফিরিয়া যাওয়া ৺নারায়ণের ইচ্ছা এবং আদেশ। তিনি সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভগ্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া গঙ্গায় নামিয়া দেশে ফিরিবেন বলিয়া শপথ করিলেন। তদনন্তর কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত গুটাইয়া লইয়া ঈশানচন্দ্র গুহ মহাশয় শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভগ্নী বিপুলা দেবী সহ দেশে ফিরিলেন এবং যথা সময়ে চক্রশালার পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ঈশানচন্দ্র গুহ মহাশয় দেশে আসিয়া যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন সেই সময় কেবল মাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শরচ্চন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষা কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন এবং শত্রুগণের হাত হইতে পৈত্রিক সম্পত্তি কতক উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সময় স্কুল কলেজ কি পাঠশালা ছিল না। ঈশানচন্দ্র গুহ শিক্ষক রাখিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাঙ্গালা এবং পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়াছিলেন। চক্রশালা নিবাসী পেন্সন প্রাপ্ত পুলিশ সবইন্‌স্পেক্টার

বাবু নিমাইচরণ বিশ্বাস শরচ্চন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পিতার মৃত্যুর পর শরচ্চন্দ্র সংসারে প্রবেশ করেন এবং মঙ্গলময়ী পুণ্যশ্লোকা সেই বিপুলা দেবীর আশ্রয়ে এবং যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া উঠেন। তিনি চট্টগ্রাম দেওয়ানি আদালতে চাকরি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ অতি সম্মানের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া সকলের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আকর্ষণ করেন। তিনি ধলঘাটনিবাসী রামনারায়ণ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বরদাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পুণ্যভূমি চক্রশালা গ্রামের ভদ্রাসন বাড়ীতে ১২২৪ সালের ২৪ই কার্ত্তিক তারিখ ইংরাজী ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে মাতা শ্রীমতী বরদা দেবীর গর্ভ হইতে শ্রীমান মহিমচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুত্রের মুখ দর্শনে পিতা মাতার আনন্দের সীমা ছিল না, কিন্তু এই আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল না। মহিমচন্দ্রের ১১ মাস বয়সের সময় মাতা শ্রীমতী বরদা দেবী শিশুপুত্রকে গুহ বংশের রক্ষাকর্ত্রী সেই বিপুলাদেবীর হস্তে দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। এইখান হইতে মহিমচন্দ্রের দুঃখময় জীবনের সূত্রপাত হইল।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা মহাশয় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মাতৃহীন শিশু মহিমচন্দ্র বৃদ্ধা বিপুলাদেবীর যত্নে লালিত-পালিত হন এবং পিতার যত্নে ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পান। মহিমচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ হওয়ার কয়েক মাস পরে ১৮৮২ সালের ২রা জুন তারিখে পিতা শরচ্চন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা মহিমচন্দ্রকে অকুলসাগরে ভাসাইয়া ইহ সংসার এবং নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া যান। এ সংসারে মহিমচন্দ্রের আর কোন ভাই, বন্ধু, খুড়া, জ্যোঠা, বান্ধব, কি নিকটস্থ কুটুম্ব ছিল না। কেহ মহিমচন্দ্রকে সান্ত্বনা কি সাহস দিতে অগ্রসর হন নাই। সংসারের একমাত্র ভরসা শিবতুল্য গুরু পুত্র

সেই পরম শিব পিতৃগুরু রামহরি ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীমান উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। গুরুপুত্র অর্থে অতি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহৎ হৃদয় সর্ব্বগুণে ধনী ছিল। তাঁহার ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ মহিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। পিতার মৃত্যুর পর মহিমচন্দ্র হতাশ হইয়া প্রায় পড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের অনন্তকৃপা সেই সময় হইতে মহিমচন্দ্রের প্রতি পতিত হয়। চট্টগ্রাম কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় মহিমচন্দ্রের অবস্থা শুনিতে পাইলেন এবং মহিমচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া পড়া না ছাড়িয়া বরঞ্চ সমধিক যত্নের সহিত পাঠে মনোযোগ দেওয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত আদরের সহিত অনুরোধ করেন। মহিমচন্দ্র চন্দ্রমোহন মজুম-দারের আদরে মুগ্ধ এবং উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কলেজে পড়িতে থাকেন। বাবু সাতকড়ি হালদার এম, এ সেই সময়ে চট্টগ্রাম কলেজের গণিত এবং ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। তিনিও চন্দ্রমোহন বাবুর ন্যায় মহিমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের যত্নে মহিমচন্দ্র ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এফ, এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। চন্দ্রমোহন বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু উপেন্দ্রলাল মজুমদার সেই বৎসর চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাশ হন। ইহার অল্পকাল পরেই চন্দ্রমোহন বাবু প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হইয়া কলি-কাতায় চলিয়া যান এবং বাবু সাতকড়ি হালদার চট্টগ্রাম জজ আদালতে উকীল হন। তিনি শেষে মুন্সেফ হইয়া চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সময়ে সব জজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বাবু উপেন্দ্রলাল মজুমদার মহাশয় শেষে ব্রিটিস বর্ম্মার একাউন্টেণ্ট জেনারেল হইয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় ডিসেম্বর মাস হইতে এপ্রিল মাসে পরিবর্ত্তন হয়। মহিমচন্দ্র এফ এ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নব উৎসাহে বি, এ পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ পূর্ব্বদিকে চন্দ্রনাথে রেল প্রচলন হয় নাই ; গ্রাম বন্দর হইতে ষ্টীমার করিয়া বঙ্গোপসাগরের শোভা পরিদর্শন করিতে করিতে মহিমচন্দ্র সঙ্গে বাবু সতীশ্চন্দ্র সেন (বর্ত্তমান গর্ভমেণ্ট প্লিডার রায় সতীশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর) এবং বাবু সারদাচরণ খাস্তগীর (তিনি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি পটীয়া মুন্সেফি করিতেছেন। ইঁহার পুত্র শ্রীমান করুণাময় খাস্তগীর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক) সহ তৃতীয় দিবসে কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মেছুয়াবাজার ৯৫নং বাড়ীতে চট্টগ্রামের কলিকাতাপ্রবাসী ছাত্রগণের মেস্ বা ছাত্রনিবাস ছিল। মহিমচন্দ্র এবং তাঁহার উক্ত সাথিগণও ঐ মেসে গিয়া উপস্থিত হন। বাবু সতীশ্চন্দ্র সেন সেই বৎসর এলাহাবাদ মিউর সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সহপাঠী বর্ত্তমান ভারতপূজ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও সেই সঙ্গে উক্ত কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। বাবু সতীশ্চন্দ্র ২।৪ দিনের মধ্যেই এলাহাবাদ চলিয়া যান। মহিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য কোন সময়েই ভাল ছিল না। এলাহাবাদ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া সতীশ বাবু মুখে শুনিয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাহা হিন্দুদিগের প্রাচীন গৌরব স্থান প্রয়াগ মহাতীর্থ। সেই সময়ে এলাহাবাদে চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারাচরণ মুখোপাধ্যায়ও বাস করিতেন এবং তথায় খ্যাতনামা কবিরাজ হইয়াছিলেন। মহিমচন্দ্রও এলাহাবাদে যাইয়া পাঠ করিবেন মনস্থ করিলেন এবং তাঁহার ঐ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বাবু ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগীর মহাশয়ও তাঁহার সহিত এলাহাবাদ যাইয়া বি, এ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বাবু ধীরেন্দ্রলাল চট্টগ্রামের কীর্ত্তিসন্তান শ্যামা মায়ের সাধক, সঙ্গীত-

বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বাবু শ্যামাচরণ খাস্তগীরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং আশৈশব মহিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং অকৃত্রিম বন্ধু। পটিয়াসুচক্রদণ্ডি গ্রামের বাবু রামচন্দ্র খাস্তগীরের তিন পুত্র ছিল। বাবু উমাচরণ খাস্তগীর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি সবজজ হইয়া বহু বৎসর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া পরে অনেক বৎসর পেন্সন ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র খ্যাতনামা ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়; ইনি স্বনামধন্য পুরুষ, বঙ্গদেশ বিশেষতঃ চট্টগ্রাম তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী আছে। তৃতীয় পুত্র বাবু শ্যামাচরণ খাস্তগীর। ইঁহারই পুত্র বাবু ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগীর মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল। ইঁহাদের জন্য চট্টগ্রাম গৌরবান্বিত হইয়াছে।

মহিমচন্দ্র যথাসময়ে বাবু ধীরেন্দ্রলাল সহ এলাহাবাদ রওনা হইলেন এবং ২য় দিবস সায়ংকালে এলাহাবাদ পৌঁছিয়া কবিরাজ তারাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ২।৪ দিন বাস করার পর মহিমচন্দ্র সহাধ্যায়ী বাবু ধীরেন্দ্র লাল সহ বাবু সতীশচন্দ্র সেনের সাহায্যে মিওর সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং কর্ণেলগঞ্জ কলেজ বোর্ডে সতীশ বাবু সহ বাসা লইলেন। সতীশ বাবু কয়েকমাস পর এবং তাহার কিছুকাল পর ধীরেন্দ্রলাল এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া যান। কলেজ বোর্ডিংএ বাঙ্গালার সন্তান শুধু মহিমচন্দ্র রহিলেন। হিন্দুস্থান নিবাসী অন্যান্য ছাত্রগণ মহিমচন্দ্রকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক ধীমান ছাত্র ছিল। আজ ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কি ভাবে কে কোথায় আছেন জানিতে পারা যায় না। বাবু গোকুলপ্রসাদ নামক এক ছাত্র মহিমচন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের তদানীন্তন উকিল বাবু হনুমান প্রসাদের পুত্র ছিলেন। বাবু গোকুল প্রসাদ নামক একজন এখন এলাহাবাদ হাইকোর্টে অধীয়তি করিতেছেন। মহিমচন্দ্র আশা করেন ইনিই

তাঁহার সেই বাল্যবন্ধু গোকুলচন্দ্র হইবেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রুর্কি নিবাসী বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ মিওর সেন্ট্রাল কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে বিএ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার সহিত মহিমচন্দ্রের পরিচয় এবং আত্মীয়তা হয়। বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মের বন্ধের সময় মহিম বাবুকে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন রুর্কীতে নিমন্ত্রন করিয়া লইয়া যান। এলাহাবাদ হইতে ট্রেনে করিয়া মহিমচন্দ্র বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামাচরণ ঘোষ সহ পরদিন প্রাতঃকালে টুণ্ডলা ষ্টেসনে পৌছিয়াছিলেন। বাবু শ্যামাচরণ মহিমচন্দ্রকে ভারত-সম্রাট আকবরের রাজধানী আগরা এবং বাদসাহ সাহাজানের নির্ম্মিত মম্‌তাজমহল প্রভৃতি দেখাইবার নিমিত্ত আগরায় তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে লইয়া যান এবং তথায় মহিমচন্দ্র অতি সাদরে গৃহীত হন। মহিমচন্দ্র আগরায় ৩ দিন থাকিয়া বন্ধু শ্যামবাবুর সহিত আগরা সহর এবং মমতাজমহল পরিদর্শন করেন। তদনন্তর পুনরায় ট্রেনে চড়িয়া সাহাজানপুরে উপনীত হন এবং তথায় শ্যামবাবুর এক কুটুম্বের বাড়ীতে রাত্রিতে আহারাদির পরই উষ্ট্র শকটে রুর্কি রওনা হন। সেই সময়ে সাহারাণপুর হইতে রুর্কি পর্য্যন্ত রেল পথ প্রস্তুত হইয়াছিল না। পরদিন বেলা প্রায় ৯টার সময় উষ্ট্রশকট রুর্কিতে পৌছায়। শ্যামবাবুর পিতা পরমশ্রদ্ধাস্পদ বাবু উমাচরণ ঘোষ মহাশয় মহিমচন্দ্রকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ এবং আদর করিয়া নিজ বাড়ীতে গ্রহণ করেন। মহিমচন্দ্র প্রায় দেড় মাসকাল রুর্কিতে তাঁহার বাড়ীতে বাস করিয়াছেন। মাতৃস্বরূপা শ্যামবাবুর মাতা মহিমচন্দ্রকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া আপন পুত্র শ্যামাচরণ বামাচরণের সঙ্গে খাওয়াইতেন। ইহাঁদের যত্ন এবং আদর মহিমচন্দ্রের জীবনের এক সুখের স্বপ্ন হইয়াছিল। মহিমচন্দ্র ঐ বাড়ীতে অবস্থানকালে হিমালয় হইতে এক সাধু সন্ন্যাসী যোগী পুরুষ ঐ বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন এবং অনেকদিন

পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহিমচন্দ্র ইঁহার সমভিব্যাহারে গঙ্গার খাল বাহিয়া হরিদ্বার গমন করেন এবং তথায় বাস করিয়া কন্‌খলে গঙ্গাস্নান এবং শিব দর্শন করেন। হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহিমচন্দ্র শ্যাম বাবুর সহিত লেণ্ডোর রাজবাড়ী এবং দুর্গ পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং গঙ্গা খালের জলপ্রবাহের দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন। বাবু উমাচরণ ঘোষ রুর্কিতে গবর্ণমেন্ট মিলিটরি বিভাগে একাউন্টেন্ট ছিলেন এবং রুর্কিতে রাজসম্মানে বাস করিতেন। রুর্কির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং কারখানাতে ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। মহিমচন্দ্র শ্যামবাবুর সহিত ঐ কলেজ এবং লৌহ ফেক্টরির কার্য্য দর্শন করেন। গ্রীষ্মাবকাশ অবস্থানে মহিমচন্দ্র শ্যাম বাবু এবং তদ্‌ভ্রাতা সহ এলাহাবাদে ফিরিলেন। পথে কানপুর ষ্টেসনে নামিয়া শ্যামবাবুর মাতুল-ভবনে নীত হইয়াছিলেন এবং কানপুর দুই দিন থাকিয়া তথাকার সিপাহীদিগের ভীষণ হত্যাস্থান মেমোরিয়েল গার্ডেন এবং কানপুর কেনেল প্রভৃতি সহ কানপুর সহর পরিদর্শন করেন। তদনন্তর এলাহাবাদ ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কলেজে পড়িতে থাকেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের বন্ধের সময় মহিমচন্দ্র স্বদেশে রওনা হন এবং মোগলসরাই ষ্টেশনে নামিয়া পুণ্যতীর্থ কাশীধামে গমন করেন। তথায় তিন দিন থাকিয়া গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথদর্শন করেন এবং কাশীর অন্যান্য দেবমন্দির, কলেজ এবং প্রসিদ্ধ স্থানও দর্শন করেন। ভারতবিখ্যাত মহাযোগী পুরুষ ত্রৈলঙ্গ-স্বামী সেই সময়ে কাশীতে ছিলেন; মহিমচন্দ্র ধ্যানমগ্ন সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া পবিত্র হন।

চট্টগ্রাম চক্রশালা ফিরিয়া আসিয়া তিনি পীড়িত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। সেই সময়ে মাতুল বাবু হরচরণ চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধ এবং নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মহিমচন্দ্র বিবাহ করিতে

সম্মত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত জীবন দুঃখময় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে মাতুল মহাশয়ের কোন দোষ ছিল না। তিনি অমায়িক শান্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের সদর মুন্সেফী আদালতের প্রতিভাবান উকিল ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র— নবীনচন্দ্র চৌধুরী, শিক্ষক মিউনিসিপাল স্কুল। শ্রীমান বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি, এ, হেডমাষ্টার, নলিনবিহারী চৌধুরী ও পুলীন বিহারি চৌধুরী কবিরাজ। পুলিনবিহারী চৌধুরী দেব বর্ত্তমান আছেন।

মিওর সেন্ট্রাল কলেজে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করার সময় মহিমচন্দ্র বোর্ডিংএ থাকিয়া বাবু দুর্গাদাস দে মহাশয়ের কর্ণেলগঞ্জ দোতালা বাড়ীতে বাস করিবার নিমিত্ত স্থান পাইয়াছিলেন এবং উক্ত বন্ধুবরের যত্নে অতিসুখে তথায় একবৎসর বাস করিয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নূতন মিওর সেন্ট্রাল কলেজ ভবনে বি এ পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার অল্প সময় পূর্ব্বে ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনেরেল লর্ড ডাফরিন বাহাদুর উক্ত কলেজের নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। মহিমচন্দ্র বাবু দুর্গাদাস দে মহাশয়ের বাড়ীতে বাস করার সময় সেক্রেটরিএট আফিসের ক্লার্ক বাবু বিপিন বিহারি বসু নামক এক ভদ্রলোকও উক্ত দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীতে বাস করিতেন। কাশিমবাজারের ভাবি মহারাজা বাবু মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই সময় তাঁহার বন্ধু উক্ত বাবু বিপিন বিহারি বসুর সহিত ঐ বাড়ীতে আসিয়া ইঁহাদের সহিত তিন দিন বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মাতুলানী মহারাণী স্বর্ণময়ী জীবিতা ছিলেন। মনীন্দ্রচন্দ্রের উদার প্রকৃতি, অমায়িক স্বভাব এবং নিরহঙ্কার তাঁহার ভাবি সৌভাগ্য সূচনা করিতেছিল।

মহিমচন্দ্র বি এ পরীক্ষা দিয়া অল্পদিন পরেই এলাহাবাদ ছাড়িয়া আসিলেন। আসিবার সময় অকৃত্রিম বন্ধু দুর্গাদাস দে এবং বাবু

বিপিনবিহারী বসু মহাশয়গণের সহিত সেই চিরবিদায়ের মর্মান্তিক স্মৃতি আজিও যেন ভাসিয়া উঠিতেছে। মহিমচন্দ্রের রেলগাড়ী ফরাসী কোন্নগর ষ্টেশনে পৌছিলে বন্ধু বাবু মুরারীমোহন মিত্র মহিমচন্দ্রকে কোন্নগর তাঁহার মাতুল স্বনামধন্য কাশীর ডাক্তার বাবু গোপালচন্দ্র দে মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। মহিমচন্দ্র সেই বাড়ীতে ৪।৫ দিন পরমসুখে বাস করিয়াছিলেন। মহিমচন্দ্র কোন্নগর হইতে মুরারী বাবু সহ কলিকাতা আসেন এবং পরদিনই ষ্টীমারে চট্টগ্রাম রওনা হন। ষ্টীমারে ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর, বাবু ধীরেন্দ্র লাল এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর, ডাক্তার খাস্তগীরের কন্যা বিনোদিনী খাস্তগীর (ইনি পরে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন,) এবং খাস্তগীর মহাশয়ের পরিবারস্থ অন্যান্য লোক সহ ষ্টীমারে মিলিত হন। ষ্টীমার বঙ্গোপসাগরে আসিলে প্রবল বাতাস এবং বৃষ্টি হয়, তাহাতে সমুদ্রে ভয়ানক ঢেউ হইয়া ষ্টীমার গড়াইতে থাকে এবং যাত্রীগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তৃতীয় দিবসে ষ্টীমার চট্টগ্রাম পৌছিলে মহিমচন্দ্র চক্রশালা নিজ বাড়ীতে গমন করেন এবং তথায় বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তত্ত্ব পান।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে মহিমচন্দ্র অতিকষ্টে পৈত্রিক জমি বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পড়িবার নিমিত্ত পুনরায় কলিকাতা গমন করেন। কোন ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে মহিমচন্দ্রের বি-এ প্রভৃতি পড়িবার খরচ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা রাখেন নাই। মহিমচন্দ্র পিতার যাবতীয় জমি বিক্রয় করিয়া এমন কি ভদ্রাসন বাড়ী পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া পড়িবার খরচ চালাইয়াছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকের কুচক্রে মহিমচন্দ্রের দুঃখময় জীবনের দুঃখ এখন হইতে আরও গভীর হইয়া উঠে। যাহা হউক নিরাশ্রয়ের আশ্রয়

ভগবানের কৃপায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহিমচন্দ্র কলিকাতা রিপণ কলেজ হইতে বি এল পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই সহিত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মহিমচন্দ্র কলিকাতা অবস্থানকালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল বাবু অখিলচন্দ্র সেন এম-এ বি-এল এবং ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়েরা মহিমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং সর্ব্বসময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। ডাক্তার খাস্তগীর সেই সময়ে, সপরিবারে তাঁহার ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বাস করিতেন। মহিমচন্দ্র তাঁহার সন্নিকটে অক্রূরদত্তের লেনে দত্ত বাবুদের বাটীর পূর্ব্ব দিগে ডাক্তার কানাইলাল দে মহাশয়ের বাড়ীতে বাস করিতেন। সেই সময় হইতে মহিমচন্দ্রের সহিত ডাক্তার খাস্তগীরের পুত্রগণ চট্টগ্রামের কৃতিসন্তান বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল, বাবু হেমেন্দ্রলাল খাস্তগীরের সহিত আলাপ পরিচয় হয় এবং তাহা ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বাবু হেমেন্দ্রনাথ এখন পাটনায় বোর্ড অব রেভেনিউর সেক্রেটারী। ডাক্তার খাস্তগীরের কনিষ্ঠ-পুত্র বাবু সুরেন্দ্রলাল তখনও শিশু ছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রলাল খাস্তগীর মহাশয় পরে ইংলণ্ড যাইয়া বারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন এবং এখন চট্টগ্রাম আদালতে অতি সুখ্যাতির সহিত ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। তিনি মহিমচন্দ্রের অকৃত্রিম বন্ধু এবং পরমোপকারী। তিনি চরিত্রে, সাধুতায় এবং সৌজন্যে চট্টগ্রামবাসী ও তাঁহার পরিচিত সমস্ত লোকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং পিতৃগৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

মহিমচন্দ্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ সালের ২ রা আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম জিলা আদালত সমূহে ওকালতি আরম্ভ করেন। ভগবানের কৃপায় দিন দিন তাঁহার সুখ্যাতি এবং ব্যবসায়ে উন্নতি আরম্ভ হয়। তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনার এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান মনোনীত হন এবং

সেই হইতে ১২ বৎসর ক্রমান্বয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর কমিসনার ছিলেন। তিনি হাটহাজারী, আনোয়ারা, সাতকানিয়া, পটীয়া, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে অস্থায়ী মুনসেফ হইয়া অতি সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। কিন্তু মহিমচন্দ্রের স্বাধীনচিত্ত চাকরিতে সুখ অনুভব না করায় তিনি অবিলম্বে তাহা ত্যাগ করিয়া ওকালতিতে মনোযোগ দিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফৌজদারি কার্য্য বিধি পরিবর্ত্তন হওয়ায় বাবু মহিমচন্দ্র অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করেন।

ওকালতিতে বাবু মহিমচন্দ্রের ক্রমোন্নতি, নির্ভীক চিত্ততা এবং তেজস্বীতা অনেক সহব্যবসায়ী উকিলের এবং বাবু মহিমচন্দ্রের কোন কোন কুটুম্বের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা প্রাণপনে মহিমবাবুর অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মহিমবাবু এক নিরাশ্রয় বালককে নিজ গৃহে স্থান দিয়া সাত বৎসর তাহার অন্ন বস্ত্র ভরণ পোষণ যোগাইয়াছিলেন। সেই দুর্বৃত্ত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ মহিম বাবুর জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে কাহারও সহায় হইয়াছিল এবং নানাপ্রকারে বিপন্ন করিয়া মহিম বাবুর আশী হাজার টাকা খরচা ও শারীরিক এবং মানসিক যে কষ্ট দিয়াছিল তাহার সীমাই ছিল না। যাহা হউক ঈশ্বরের অনন্ত কৃপায় মহিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রকার বিপদ এবং শত্রুগণের হিংসানল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ধর্ম্ম কখনও মহিমচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছিল না, ধর্ম্মই মহিমচন্দ্রের একমাত্র আশ্রয় এবং ভরসা; ধর্ম্মই মহিমচন্দ্রকে অনন্ত বিপদ হইতে বারম্বার রক্ষা করিয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল বাবু রামদয়াল দে মহাশয় মহিম বাবুর অতি প্রিয় বন্ধু ও সুখে দুঃখে বন্ধু এবং সাহায্যকারী। সমস্ত ঈর্ষা এবং হিংসার ভিতর দিয়াও

মহিমচন্দ্রের অদম্য তেজ, উৎসাহ এবং ধর্ম্মে একপ্রাণতা এবং পরম করুণাময় ভগবানে একমাত্র নিষ্ঠা এবং ভক্তি বাবু মহিমচন্দ্রকে ক্রমে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছে। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হইয়া নিজ ব্যবসায়ে যশস্বী হইয়াছেন। বাবু মহিমচন্দ্রের অনেক শত্রুগণ তাহাদের হিংসানলে নিজে নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। মহিমবাবু আজীবন দেব-দ্বিজ-ভক্ত এবং শরণাগত প্রতিপালক। ভীষণ শত্রুও যদি কাতর হইয়া শরণ লয় মহিম বাবু তাহাকে সমাদরে আশ্রয় দেন, ইহার নিমিত্ত প্রতারকের প্রতারণায় অনেক সময় বিপন্ন হইলেও তিনি নিজ কর্ত্তব্যে বিমুখ হন না। বাবু মহিমচন্দ্র সনাতন হিন্দুধর্ম্মে একান্ত বিশ্বাসী, কিন্তু তিনি অন্য কোন ধর্ম্মের নিন্দা করেন না এবং তাঁহার সম্মুখে কেহ কোন ধর্ম্ম নিন্দা করিলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিমিত্ত ঈশ্বর পৃথক নাই। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় এবং অক্ষয় এবং এক ঈশ্বরই সকল ধর্ম্মের আদি। মহিমচন্দ্র কালিমাতার সন্তান হইতে বাসনা করেন এবং শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী নারায়ণের সেবক। মহর্ষি অঙ্গিরা শিষ্য পরম যোগী শ্রীমন পূর্ণানন্দ স্বামী ইহাঁর গুরু। মাতৃভক্ত মায়ের প্রিয় সন্তান সাধুর ভক্ত মহিমচন্দ্র ভগবানের একমাত্র কৃপা-ভিখারী। অকালে বাবু মহিমচন্দ্র মাতৃ-পিতৃ-হীন দুঃখময় জীবন হইতে ভগবানের অনন্ত কৃপায় আজ চট্টগ্রামে উকিল শ্রেণীতে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামের কায়স্থ সভার সভাপতি। তিনি বার্ষিক অম্লান পঞ্চাশ হাজার টাকা মুনাফার সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম সহরে তাঁহার পাকা দোতালা বাড়ী এবং বাগান এবং চক্রশালাগ্রামে তাঁহার ভদ্রাসন বাড়ী, দীঘি, পুষ্করিণী প্রভৃতি সাধুসজ্জনের প্রীতি এবং আশীর্ব্বাদ আকর্ষণ করিতেছে। বাবু মহিমচন্দ্র এই সম্পত্তি ভগবানের দান বলিয়া মনে করেন এবং তিনি তাহা ভগবান উদ্দেশ্যে

প্রতিদান করিবার ইচ্ছা করিয়া উইল করিয়াছেন এবং আপন পুত্রগণকে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ ভগবানের সেবাইত এবং সেবক নিযুক্ত করিয়াছেন। বাবু মহিমচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা উপবীত ক্ষত্রিয় কায়স্থ। তাঁহার পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান আছে—জ্যেষ্ঠ শ্রীমান মনীন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্মা, I A পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে বি এ অধ্যয়ন করিতেছে। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুখেন্দু বিকাশ গুহ দেববর্ম্মা মেট্রি-কুলেসন ক্লাসে পড়িতেছে। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান মধুসূদন গুহ দেব বর্ম্মা শিশু ক্লাসে পড়িতেছে; চতুর্থ এবং পঞ্চম পুত্র শ্রীমান লক্ষ্মীনারায়ণ গুহ দেববর্ম্মা ও শ্রীমান হরিনারায়ণ গুহ দেব বর্ম্মা শিশু।

কায়স্থ ক্ষত্রিয় চট্টগ্রামের গোহ বা গুহবংশ

শ্রীমহিমচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা
(১২) ৺প্রমোদকিশোরী
কিরণশশী
শ্রীমণীন্দ্রলাল
হিরন্ময়ী
শ্রীসুখেন্দুবিকাশ
শ্রীমধুসূদন
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
শ্রীহরিনারায়ণ গুহ দেববর্ম্মা
(৫) গুহ রমাই সরকার বা শ্রীরামকানাই সরকার নিবাস চক্রশালা।
(৬) রঘুরাম গুহ
ভৃগুরাম গুহ
(৭) বলরাম
কৃষ্ণরাম
সীতারাম গুহ
(৮) তিতারাম
রামকিশোরগুহ
বৃন্দাবন গুহ
(৯) এহিরাম গুহ
(১০) কৈলাসচন্দ্র
নিত্যানন্দ
রামচন্দ্র
নবীনচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা
ব্রজহরি
(১১) দীনবন্ধু
জগবন্ধু গুহ দেববর্ম্মা
(১২; শ্রীপ্রাণহরি
(৬) কালিকাপ্রসাদ গুহ
চক্রশালা হইতে)
কানুনগোর পাড়া)
(৭) মুক্তারাম
কীর্ত্তিচাঁদ
রাজারাম (৭)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ ও তাঁহার পরিবারবর্গ

বৃন্দাবন (৮)
চূড়ামণি (৯)
(৮) ছত্রনারায়ণ
বৈদ্যনাথ
বনমালী
(৯) অভয়গুহ
মুন্সিকৃষ্ণমোহন
চণ্ডিচরণ
হরচন্দ্র (৯)
গোলক (৯)
নবগুহ
বংশিবদন
শরত
(১১) কাশীমোহন
দুর্গামোহন
মথুর
নবীনচন্দ্র (১০)
মানদা
(১১) সুরেন্দ্রলাল
ধীরেন্দ্রলাল
বীরেন্দ্র
খগেন্দ্র
নৃপেন্দ্রলাল (১১)
কানুনগোরপাড়া
(৯) গোলকচন্দ্র গুহ
(১০) নবচন্দ্র
(১১) বিপিন
রমেশ
মহেন্দ্রবিজয়
দেবেন্দ্রবিজয়
(১২) শচীন্দ্র বিজয়
জ্যোতিন্দ্রবিজয়
(৭) মুক্তারাম গুহ (কানুনগোরপাড়া)
(৮) রামপ্রসাদ
রামশরণ
দেবীচরণ (৮)

রামপ্রসাদ
রামশরণ
রাহিরাম
(৯) দুর্গাচরণ
তারিণী চরণ
(১০) অখিল
তাপত
গগন
(১১) অতুল
রাতুল
রেবতী
(১২) নৃত্যলাল
(১১) নিকুঞ্জ
বেণী
যামিনী
কামিনি
নলিনী
রজনী
মোহিনি (১১)
(৪) গুহ গুণ বিশ্বাস বা বল্লভ বিশ্বাস
(৫) গুহ শ্রীযুক্ত রায়
(৬) যুগিরাম
বাঞ্ছারাম
সীতারাম
(৭) রামশঙ্কর
বৈদ্যনাথ
(৮) বৃন্দাবন
মুরারাধর
গোলক
ঈশান
রামকানু
ব্রজমোহন
রসিক

(৪) গুহ প্রাণসরকার (দক্ষিণভূর্ষী)
(৫) গুহ বিনদ রায়
গুহ কন্দর্প রায় (৫)
(৬) রামচরণ
লক্ষ্মণ (নয়াপাড়া) (৬)
(৭) মুকুন্দরাম
কৃষ্ণরাম
নয়ন
কৃপারাম
মায়ারাম
গোবিন্দ (৭)
(৮) নন্দরাম
বিজয়রাম (৮)
(৯) শান্তিরাম
বাঞ্ছারাম
সীতারাম
পরাণ (৮)
(১০) রামজয়
রামলোচন
কালী
দেবীচরণ
তহুরাম
রণুরাম বা রক্ষিতরাম
কেবলরাম
দুর্গাচরণ
হরিদাস
চৈতন্য
গুরুদাস (১০)
শরত (১১)
কৈলাস (নিবাস সাররাত লি
প্রফুল্ল (১২)
(১১) নবচন্দ্র
রাজচন্দ্র
রমেশ
কামিনী
চন্দ্র
(১২) বেণী
নিকুঞ্জ
(৭) কৃপারাম (নয়াপাড়া)
(৮) রাজারাম
ঘণেশ্যাম (৮)
(৯) গোকুল
অভয়াচরণ (৯)
রামদাস
বৃন্দাবন (৯)

গোকুল
অভয়চরণ
রামদাস
অখিলচন্দ্র গুহ (১০)
মহেশ
হরচন্দ্র(১০)
(১০)রত্ন নিলমণি নিত্যানন্দ
রমেশ
(১১) অতুল
অর্পণা
অন্নদা
দক্ষিণা (১১)
(১২) প্রভাত
(১১)শ্রীযুক্ত বিপিন
রতিকান্ত
মহেন্দ্র
যোগেন্দ্র
মণীন্দ্র(১১)
উকিল জজ আদালত
এবং চট্টগ্রাম লাইব্রেরীর
স্থাপয়িতা
(১২) প্রিয়নাথ
সুধীর (১২)
Professor and Head of Depa-
rtment of science Hantington
College, formelry Professor
of chemistry st. viator S.
College Kankakee.
(১২) নিহার
গোপাল
মাধুরী (১২)
(৮) বিজয়রাম (নয়াপাড়া)
(৯) গৌরীচরণ গুহ (নিবাস কুয়েপাড়া)
শম্ভুরাম
মনোহর
রামজয়
(১০) কৃষ্ণগুহ
কালী
নিত্যানন্দ
গুরুদাস
(১১) চন্দ্র
শ্রীযুক্ত নন্দলাল গুহ (১১)
উকিল জজ আদালত
*(৮) পরাণ গুহ (নয়াপাড়া)
(৯) শম্ভুরাম
মনোহর গুহ
(৯) রক্ষিতরাম
জয়নারায়ণ
শ্যামসুন্দর

শম্ভুনাথ
রঞ্জিতরাম
রামসুন্দর
(১০) রাধারাম
কৃষ্ণ (দারোগা)*
(১১) মাখন
গঙ্গাদাস
মহেশ
রামকানাই (১১)
দ্বারিকা
নগেন্দ্র
উপেন্দ্র
মহেন্দ্র
সুরেন্দ্র (১২)
রেবতী (১৩)
(১২)প্যারীমোহন গুহ
যাত্রামোহন
সেরেস্তাদার কালেক্টরি
জিলা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি
(১৩) পরেশ
মোহিনী
নলিনী
(৯) মনোহর গুহ (নয়াপাড়া)
(১০) রামসুন্দর
দাতারাম
মুনসি রামতনু গুহ
(১১)অখিল
নিশি
অন্নদা
শ্যামা
ত্রিপুরাচরণ
(১২)বিপিন
বিধু
খ্যাতনামা উকিল হাট
উকিল
হাজারি মুনসেফ আদালত
মুনসেফী আদালত
উমেশচন্দ্র গুহ
এম এ, বি-এল
উকিল জজ আদালত
চট্টগ্রাম
(১১)কৈলাস
গোলক
রসিক
জগত গুহ (১১)

কৈলাস
গোলক
রসিক
জগতগুহ হেডকেরাণী পুলিশ অফিস
(১২)ভূপতি
(পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টর)
তারক
রজনী
সুরেন্দ্র
দেবেন্দ্র
(৫) গুহ কন্দর্প রায় (দক্ষিণ ভূর্ষী)
(৬) গঙ্গারাম গুহ
গুহ হরিচরণ কানুনগোর (৬)।
(৭)নন্দরাম
গোবিন্দ
কানুরাম
রঘুরাম
শিশুরাম
সীতারাম
শান্তিরাম
বিজয়-রাম
(৯) রামলোচন
রামদুলাল
লক্ষ্মীনারায়ণ
(১০) ত্রাহিরাম
নূতন গুহ (১১)
মধুস্দন (১২)
(৮)দীননাথ
যোগারাম
মুক্তারাম
বাঞ্ছারাম
বলরাম
জিতারাম
ভবাণীচরণ
গোপীচরণ
(১০) বিশ্বম্ভর
পীতাম্বর (১০)
(১১) যাত্রা
প্রাণকৃষ্ণ
শশী
রমেশ গুহ
চট্টগ্রামের অতি
প্রসিদ্ধ কবিরাজ

রমেশগুহ
গুরুপ্রসাদ (১২)
(৮) যোগীরাম (দক্ষিণ ভূর্ষী)
(৯) রামমোহন
ফকিরচাঁদ
জীতরাম
ঘণশ্যাম
কৃষ্ণরাম
রামসুন্দর
রামকিঙ্কু (কিঙ্কর)(১০)
হরদাস
পূর্ণচন্দ্র
প্রাণহরি
গোবিন্দ
হরেন্দ্র
দীনবন্ধু
(১২) রমণী
রেবতী(১২)
(১০) রামদাস
অভয়াচরণ
ভৈরব
চাণ্ডচরণ
মহেশ
(১১) রত্নমণি
বেণীমাধব
কামিনী
সুধাংশু (১২)
(৭) গোবিন্দরাম গুহ (দক্ষিণভূর্ষী)
(৮) রাজারাম
যাদুরাম
কমল (৮)
মধুরাম
(৯) রামশরণ
ভোলানাথ
শ্যামসুন্দর (৯)
কৃষ্ণরাম
কালাচরণ
(১০)শিবচরণ
মুরারী
ভবানা চরণ
(১০)গৌরীচরণ
তিলক
পার্ব্বতি (১০)
(১১) ভৈরব

ভৈরব
ভোলানাথ
গৌরীচরণ
অখিল
শরত (১১)
(১২) বঙ্গ
সারদা
নলিনী
অনঙ্গ
রমণী
নীলকমল
রজনী
বরদা (১২)
জগমোহন (দারোগা)
(১১) মহেশচন্দ্র গুহ ওভারসিয়ার
কৈলাশ গুহ উকিল
গিরিশ
রসিক
আশুতোষ
(১৩) হারাণ
রমেশ গুহ
যতীন্দ্র
মনীন্দ্র (১৩)
(৮) কমল গুহ (দক্ষিণভূর্যী)
রামদুলাল
ত্রাহিরাম
বৈষ্ণব
রামকিঙ্কর
গিরিশ
বিশ্বম্ভর
প্যারীমোহন
হরি
যাত্রা
গোলক
ঈশ্বর
(৭) কানুরাম গুহ (দক্ষিণভূর্যী)
(৮) মুকুন্দরাম
রামপ্রসাদ
জয়নারায়ণ
রামগোপাল (৮)

রামপ্রসাদ — (৯) রাধাকৃষ্ণ — (১০) রামসুন্দর — (১১) গিরিশ, কৈলাস, গোলক, দুর্গাদাস, তারিণী

জয়নারায়ণ — ভোলানাথ, কালীচরণ, সুবল

রামগোপাল — ফকিরচাঁদ, পার্ব্বতি (৯)

পার্ব্বতি (৯) — আহিরাম — ঈশান (১০) (কেলিসহর)

রঘুরাম গুহ (দক্ষিণভূর্ষি)

- (৮) পরাণ
- কাশী — (৯) বৃন্দাবন (পাটনিকোটা)
- সাহিরাম (হাবিলাইসন্দ্বীপ) — রণুগুহ — (১০) রামসুন্দর, রামলোচন, রামকানু, ধনঞ্জয় (১০)
  - (১০) রামসুন্দর — (১১) চণ্ডিচরণ (হাবিলাইদ্বীপ)

(৭) শিশুরাম গুহ (দক্ষিণভূর্ষী) — (৮) শম্ভুরাম গুহ

- (৯) শিবচরণ
- মুরারীধর
- বৈষ্ণবচরণ — (১০) গুরুদাস, ভৈরব, মৃত্যুঞ্জয়
- দেবীচরণ (৯) — সেবক (১০) — (১১) গোকুল, তিলক, নীলমণি, রামচন্দ্র (১১)

নীলমণি
(১২) দিগম্বর
ব্রজমোহন
(১৩) কালিকৃপা
(৭) সীতারাম গুহ
(৮) মণিরাম
উৎসবরাম
(৯) রামশরণ বা রামসেবক *
ইনি ছনহরা দত্ত বংশের এককন্যা
বিবাহ করিয়া গৃহ জামাতা হইয়া
সুলতানপুর যান।
(৭) শক্তিরাম গুহ
(৮) শ্যামসুন্দর
রামদয়াল (৮)
গোপীনাথ
হরিদাস
(৭) বিজয়রাম গুহ
(৮) জিতরাম
মণিরাম
সদারাম
* (৬) গুহ হরিচরণ কানুনগোর (দক্ষিণভূর্ষী)
(৭) চাঁদরায়
(৮) ব্রজলাল
দর্পনারায়ণ
শ্যামসুন্দর
রামভদ্র (৮)
(৯) রামজয়
রামলোচন
তারিণীচরণ
গোকুল
মৃত্যুঞ্জয়
(তলাপাড়া)
কৃষ্ণমঙ্গল
(১০) ঈশানচন্দ্র গুহ

ঈশানচন্দ্রগুহ রামলোচন মৃত্যুঞ্জয় কৃষ্ণমঙ্গল

পেন্সার কালেক্টরি

রসিক স্বরূপ নিশি নিত্যানন্দ(১০)

(১১)যামিনী কামিনী নগেন্দ্র রমেশ গিরিশ(১১)

(১২) নিকুঞ্জবিহারি (১২)মধুসূদন

পীতাম্বর রামসুন্দর হরদাস

নগেন্দ্র যোগেন্দ্র উপেন্দ্র

রামসেবক

মাগনদাস গোপীমোহন নবকিশোর নিত্যানন্দ মহেশচন্দ্র

খগেন্দ্র

শশীকুমার শিরিশ প্রসন্ন কুমার নগেন্দ্র সতীশ চন্দ্র

হেমাঙ্গ শশাঙ্ক

শ্রীযুতযোগেন্দ্র চন্দ্র গুহ

জজ আদালতের উকিল এবং

মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান

(৭) বাণেশ্বর গুহ

(৮) গঙ্গারাম রামদুলাল শম্ভুরাম কালীচরণ (৮)

(৯) বৃন্দাবন গোকুল রামসুন্দর

(১০)কৈলাস ঈশান পীতাম্বর শশী (১০) *

কৈলাস
ঈশান
পীতাম্বর
শশী
(১১) কৃষ্ণ
ভুবন
বিশ্বম্ভর
চৈতন্যচরণ
মহেন্দ্র
যোগেন্দ্র
নলিনী (১১)
সুরেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
বীরেন্দ্র
অমরেন্দ্র
১২ বিপিন
দুর্গাদাস
সারদা
যোগেশ
জ্ঞানদা
(৩) মাধবরাম গুহ (ভাটিখাইন)
(৪) নিধিরাম গুহ
ভবানিচরণ
প্রকরসিংহ গুহ (৪)
(৫) শিবধন গুহ
(৬) শিবরাম গুহ (ভাটিখাইন)
বলরামগুহ (হারলা)
করুণারামগুহ
(হারলা) * (৬)
(৭) মুক্তারাম
বাণেশ্বরগুহ (ছনহরা) (৭)
(৮) কালীচরণ
রামদুলাল
গঙ্গারাম
রামদুলাল
শম্ভুরাম
কালীচরণ (৮)
(৯) বৃন্দাবন
গোকুল
রামসুন্দর (৯)
রামসুন্দর
রামচন্দ্র
(১০) কৈলাস
ঈশান
পীতাম্বর
শশী (১০)
ব্রজমোহন
(১১) কৃষ্ণ
ভুবন
বিশ্বম্ভর
চৈতন্যচরণ

কালীচরণ
কৃষ্ণ
শশী
(৯) গোলক মহেশ সাহিরাম
সুরেন্দ্র ধীরেন্দ্র বীরেন্দ্র অমরেন্দ্র(১১)
(১০) রসিক অন্নদাগুহ
(১১) সতীশ
(১২) যতীন্দ্রমোহন
(১৩) বিপিন দুর্গাদাস সারদা যোগেশ জ্ঞানদা
* (১০) পীতাম্বর গুহ
(১১) মহেন্দ্র যোগেন্দ্র নলিনী
* (৬) কাশুরাম গুহ (হারলা)
(৭) শিবচরণ সাহিরাম (৭)
(৮) রামকৃষ্ণ দেবীদাস সাং সুচিয়া (৮)
(৯) রামদয়াল রামরত্ন (৯) নিত্যানন্দ ঈশান
(১০) চৈতন্য হাবলা
রমেশ (১০)
শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণগুহ মোক্তার ফৌজদারী আদালত
সারদা
শ্যামাচরণ
শ্রীশচীন্দ্রলাল
মণীন্দ্রলাল সুচিয়া
হরেন্দ্রলাল

(১০) মুনশি রামতনুগুহ

(১০) অন্নদাগুহ   শ্যামাচরণ   শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ গুহ (১১)
খ্যাতনামা উকিল, হাটহাজারী
মুনসেফী আদালত

শ্রীমান উমেশচন্দ্র গুহ এম এ বি এল
উকিল জজ আদালত, চট্টগ্রাম।

স্বর্গীয় হরিমোহন ঠাকুর।

স্বর্গীয় হরিমোহন ঠাকুর বঙ্গের স্বনামধন্য, বিশ্রুতকীর্ত্তি, মহানুভব ঠাকুর বংশের সমুজ্জ্বল কুল প্রদীপ। তিনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র। সমসাময়িক নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিনি একজন সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন। Bishop Journal লিখিতেছেন যে "His family is Brahminical and of singular purity of descent"। কার্য্যতঃ সর্ব্ববিষয়ে নীতি এবং সত্যের পরাকাষ্ঠায় তিনি একজন দেশের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথাকেই লোকে ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিত এবং শ্রদ্ধার সহিত সকল কথা মানিয়া লইত। ১৮২৪।২৫ খৃঃ অব্দের একখানি গ্রন্থে হরিমোহন সম্বন্ধে রাইট অনারেবল Charles W. Wynn সাহেবের নিকট সেই সময়ের লর্ড বিশপ সাহেবের একপত্রে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র পাওয়া যায়—"Being, however, one of the prlucipal landholders in Bengal, and of a family so ancient they still enjoy to a great degree the veneration of the common people"। বাস্তবিক চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, সাধুতায়, ন্যায়পরায়ণতায়, জিতেন্দ্রিয় হরিমোহনের এতদূর প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছিল যে এক সময়ে দুইটী বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে হাইকোর্টে জটিল মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় হাইকোর্ট একমাত্র হরিমোহনের সাক্ষ্যের উপর বিচারের সমস্ত ফলাফল ন্যস্ত করেন এবং তাঁহারই মতানুযায়ী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। নৌকোপরি ভাগীরথী বক্ষে থাকিয়া তিনি প্রত্যহ প্রভাতে লক্ষ হরিনাম জপ না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। প্রত্য[illegible]রবারিক মন্দির ৺রাধাকান্তের বাটীতে যাওয়ার ত্রুটী কখন[illegible]হার হয় নাই। এইরূপে তাঁহার বহুমূল্য জীবনের অধিকাংশ

সময় ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত হইত; অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারেও তিনি তাঁহার সমকালীন বন্ধু ও বিদ্বান্‌বর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে অবহেলা করেন নাই। তিনি সাধারণের হিতকারী বহু সভা সমিতির সম্প্রদায়শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। Heber's Journal page 183 লিখিতেছেন, "Since I can hardly reconcile in any other manner his philosophical studies and immitation of many European habits, with the daily and austere devotion which he is said to practice towards the Ganges,(in which he bathes three times every twenty four hours,) and his veneration for all the other duties of his ancestors।"এতদ্ভিন্ন তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা ও প্রতিভা নানাদিকে নানাভাবে সর্ব্বদাই পরিব্যাপ্ত ও প্রবাহিত হইত। ইংরাজী ভাষায় হরিমোহনের বিশেষ দখল ছিল। তিনি যেমন একদিকে দেশপ্রিয়, স্বজন বৎসল, দীন-দরিদ্রের প্রাণস্বরূপ, ভালবাসার পাত্র ছিলেন, আবার তদনুরূপ গভর্ণ-মেণ্টেরও বিশ্বস্ত বন্ধু ও সৌজন্য সমাদরের পাত্র হইয়া অম্লান যশঃ ও অকপট প্রীতি একসঙ্গেই লাভ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ের অনেক পুস্তকে এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। Narrative of the Journey পুস্তকেসেই সাময়িক কলিকাতার লর্ড বিশপ যাহালিখিয়াছেন তাহাউদ্ধৃত করা হইল (page 59)"We had afterwards a great dinner and evening party at which were present the Governor-General and Lady Amherst, and nearly all our acquaintances in Calcutta. To the latter I also asked several of the wealthy natives............"Huree mohan Thakur observering "what an increased interest the presence of females gave to our parties." I reminded him that the

introduction of women into society was an ancient Hindu custom, and only discontinued in consequence of the Mussalman conquest. He assented with a laugh, adding, however "It is too late for us to go back to the old custom now" হরি মোহন সম্বন্ধে Heber's journal page 229 এ পাওয়া যায়—"He is a fine old man who speaks English well, is well-informed on most topics of general discussion, and talks with the appearance of much familiarity on Franklin, chemistry, natural philosophy, &c.····এক স্থলে লিখিয়াছেন Nor the style of his conversation of a character less decidedly European" উক্ত পুস্তকের ২৩০ পৃষ্ঠায় লর্ডবিশপ সাহেব হরিমোহন সম্বন্ধে লিখিতেছেন "I have been greatly interested with the family both now and during our previous interviews. We have several other eastern acquaintance, but none of equal talent, though several learned Mollahs and one persian doctor, of considerable reputed sanctity, have called on me."

ধর্মালোচনায় ও পূজার্চ্চনায় তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। এতদূর তাঁহার ভক্তি প্রাবল্য ছিল যে, কথিত আছে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ৺রাধাকান্তজীউর বাটীতে একদিন তিনি তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক দর্শনাদি শেষ করিয়া উঠিয়া আসিতেছেন, এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ ভোগের থালা লইয়া যাইতেছিল, দৈবাৎ থালা হইতে একটী প্রসাদী অন্ন প্রাঙ্গনস্থিত নর্দ্দমায় পড়িয়া যায়, সেই সময়ে মেথর নর্দ্দমা পরিষ্কার করিতেছিল। হরিমোহনের প্রগাঢ় ভক্তি, সুগভীর ঈশ্বরানুরাগ তাঁহাকে জাতিভেদ, উচ্চ নীচ ভুলাইয়াছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ অস্পৃশ্য

মেথরের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নর্দ্দমায় ঝাঁট দিতে নিষেধ করিলেন এবং নর্দ্দমা হইতে মহাপ্রসাদ উঠাইয়া দ্বিধাহীন মনে অমৃতজ্ঞানে তাহা খাইলেন। এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ হরিপ্রেমে তাঁহার জীবনে সত্য, শিব ও সুন্দরের উদ্বোধন হইয়াছিল। তাই পরের জন্য দুই হস্তে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিতে পারিয়াছিলেন। হরিমোহনের বিস্তৃত জমিদারী ব্যতীত কলিকাতায় সম্পত্তি ও নীলকুঠী আদিও ছিল। হরিমোহনের একমাত্র পুত্র উমানন্দনঠাকুর ওরফে নন্দলাল ঠাকুর। নন্দলাল অতুল সুখৈশ্বর্য্যের কোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে সর্ব্বদাই বিমণ্ডিত থাকিতেন।

Heber's Journal page 57এ পাওয়া যায় যে,তাঁহার দান কেবল বাংলার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এমন নহে, করোমণ্ডল কোষ্টের দুর্ভিক্ষের সময়ে উমানন্দঠাকুর ঐ ফণ্ডের একজন অগ্রগণ্য দাতা ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল মনের উপর ক্ষুদ্র স্বার্থপরতারূপ কালিমার ছায়া কখনও পড়ে নাই। নন্দলালের মাতৃভক্তি চিরস্মরণীয়। সে সময়ে বাংলার সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের মধ্যে মহিলাদের রেলপথে যাতায়াতের নিয়ম ছিল না, অথচ বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রার অভিলাষ নন্দলালের মাতার অন্তঃকরণে বিশেষরূপে জাগরিত হওয়ায় তাঁহার জননীর জন্য নন্দলাল প্রচুর ধন ব্যয় করিয়া দমদমাতে যে দ্বিতীয় বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য জনসাধারণ ও সুহৃদ্বর্গের নিকট আজও তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। "গুপ্তবৃন্দাবন" নামেই উহা বিখ্যাত ছিল, "সাতপুকুর" উহার আর একটী প্রচলিত নাম। "গুপ্তবৃন্দাবনে" মনোরম্য উদ্যানাবলীর নির্ম্মাণ কৌশল, মনোমুগ্ধকর শিল্পচাতুর্য্য, মহার্ঘ্য ধনরত্নরাজি ও পশুশালার দুষ্প্রাপ্য পশুসমূহ সমসাময়িক জগতে চমকপ্রদ ও অপূর্ব্ব বস্তু ছিল। Heber's Journal (Page 229) ঐ উদ্যান সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে "This is more like an Italian villa, than

what one should have expected as the residence of Hurree mohan Thakoor. The house is surrounded by an extensive garden, laid out in formal parterres of roses, intersected by straight walks, with some fine trees, and a chain of tanks, fountains, and summer houses, not ill adopted to a climate where air, water, and sweet smells, are almost the only natural objects which can be relished during the greater part of the year. The whole is little less Italian than the facade of his house, but on my mentioning this similarity, he observed that the taste for such things was brought into India by the Mussalmans. There are also swings, whirligigs, and other amusements for the females of his family, but the strangest was a sort of "Montague Russe" of masonry, very steep, and covered with plaster, down which, he said, the ladies used to slide." রামবাগানের দত্ত পরিবারের স্বভাবকবি তরু দত্তের কাব্যেও ঐ বাগান ও পশুশালা সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিছুদিন হইল, ঐ স্থান কোন সাধারণ কার্য্যব্যপদেশে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। নন্দলালের মাতৃভক্তিরূপ ক্ষীরসিন্ধু হইতেই এই নন্দন-সুষমাপূর্ণ "দ্বিতীয় বৃন্দাবনের" সৃষ্টি। মাতৃভক্তির এমন উদাহরণ যেন আমরা ঘরে ঘরে দেখিতে পাই। নন্দলাল অতিশয় সৌখীন ব্যক্তি ছিলেন। অতি সূক্ষ্ম ও দুগ্ধ-ফেণনিভ শুভ্র পরিচ্ছদাদি ভিন্ন তাঁহার সুকোমল সুশ্রী অঙ্গে স্থান পাইত না। এইরূপে মখমল, মসলিন ও মণিরত্নভূষণে সর্ব্বদা ভূষিত থাকিলেও পরচিকীর্ষা ও দানশীলতার অভাবও তাঁহাতে ছিল না। বিশুদ্ধ

সঙ্গীতালাপের পরিচয় পাইবার জন্য তাঁহার গৃহে গীতাভিজ্ঞের সমাগম হইত। তিনি নিজেও সেতার বাজাইতে পারিতেন ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন।

নন্দলালের পুত্র ললিতমোহন কেবলমাত্র এক উদ্দেশ্যেই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্য সঙ্গীত শাস্ত্রের উৎকর্ষ ও উন্নতিসাধন। তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞান বিশেষরূপে অনুশীলন ও অর্চ্চনা করিয়া সুরের সূক্ষ্ম রূপাদি নানাভাবে ও আকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সুন্দর রঙ্গিন চিত্র তিনি নিজে আঁকিয়া সঙ্গীতের রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। তিনি বেহালা যন্ত্রে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ঐ বেহালা তাঁহার প্রিয় যন্ত্র ছিল এবং তাঁহার বেহালার যশঃ দেশদেশান্তর ব্যাপ্ত ছিল। শুনা যায়, ইউরোপের কোন ধনী ঐ বেহালা পাওয়ার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা স্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পান নাই। ঐ যন্ত্র তাঁহারই বংশের এক পরিবারের নিকট আছে। এইরূপ সুর সাধনায়, ছন্দলালিত্যে, ললিতমোহনের জীবন সুর চিরদিনের মত বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদুনন্দন ও রঘুনন্দন নামে দুই পুত্র ও চারি কন্যা ললিতমোহন রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদুনন্দন বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসীর মত উদাসীনভাবে জীবন কাটাইয়া যৌবনের প্রারম্ভেই এক পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। রঘুনন্দন নীরবে কর্ত্তব্যপালন ও তাঁহার পিতামহ নন্দলালের অতি দান ও অতি ব্যয়শীলতার অবশ্যম্ভাবী ফলের জন্য যে তাঁহাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যের আয়তন নষ্ট হইয়াছিল, তাহারই উন্নতিসাধনকল্পে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। তাঁহার অন্যতম গুণ ছিল, স্বজনবর্গের দুঃখে দারিদ্র্যে সহানুভূতি ও সহায়তা করা। অল্প বয়সে বিষয় সম্পত্তি বিভাগ লইয়া তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; তজ্জন্য তাঁহার জীবনের সকল্পই ছিল,

বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কাহারও পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে মধ্যস্থ থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া। ইহার পুরস্কার ও প্রতিদান স্বরূপ তিনি আর কিছু না পাইলেও প্রিয়জনের অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধার সুনির্ম্মল অর্ঘ্য হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না।

পরিমিত সদ্ব্যয় ও সুনিয়মিত শৃঙ্খলে কার্য্য করিয়া রঘুনন্দন তাঁহার ষ্টেটকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

তিনি দেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহার জমিদারীর মধ্যে যত প্রকার শিল্পকার ছিল, তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া প্রথমে সামান্য রূপ এক প্রদর্শনী আরম্ভ করেন, পরে তাঁহার নিজের ঐকান্তিক দৃঢ় যত্ন ও চেষ্টায় উহা একটি বাৎসরিক প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। কিয়ৎকাল পরে ঐ চেষ্টা ও বহু অর্থ ব্যয়ের ফলে উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তিনি ঐ প্রদর্শনীকে স্থায়ীভাবে মেলার আকার ধারণ করাইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি অনেক লুপ্ত প্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ মেলা তিনি "হরিঠাকুরের মেলা" বা "পতিরাম ঠাকুর মেলা" নামে অভিহিত করেন। ঐ মেলা অদ্যাবধি হইয়া থাকে। ঐ প্রদর্শনী ১২৭৮ সালে প্রথম আরম্ভ হয়। তিনি যে বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া কত শত শিল্পজীবির ও ব্যবসায়ীর আশ্রয় স্থান হইয়াছে। ঐ মেলার সময় গরু, মহিষ, হস্তী, ঘোড়া, উট ইত্যাদি পশু ও নানা দেশীয় রেমশী পশমী বস্ত্র, নানাবিধ বাসন, সোনা, রূপার গহনা ইত্যাদি আমদানি হইয়া ব্যবসার বৃহৎ কেন্দ্রস্থল হইয়া থাকে। শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মেডেলাদিও পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।

রঘুনন্দন অযোধ্যাপ্রদেশের তালুকদার রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র দুহিতা শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীর পাণিগ্রহণ

করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে একটী পুত্র ও চারিটী কন্যা রাখিয়া রঘুনন্দন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি ও ইঁহার পিতা ললিতমোহনের নিকট হইতে সঙ্গীতানুরাগের অধিকারী হইয়াছিলেন। গীতানুশীলনে ও উহার পরিপোষণে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রেষ্ঠ গায়ক ও গুণীবৃন্দের সমাবেশে তাঁহার সান্ধ্যসভাদি প্রায়ই মনোরঞ্জন ও আনন্দদায়ক হইত। তদ্ব্যতীত ব্যায়াম চর্চ্চাতেও রঘুনন্দন অনুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার পুরুষোচিত দৈর্ঘ্য, প্রশস্ত বক্ষ, পীবরবাহু,সুদৃঢ় চরণক্ষেপ ও বলশালী আকার প্রকারেই অনুমান হইত।

তাঁহার একমাত্র পুত্র রণেন্দ্রমোহন। সুবিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের মধ্যম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী হ্লাদিনী দেবীর সহিত রণেন্দ্রমোহনের বিবাহ হয়।

রণেন্দ্রমোহনের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী লীলা দেবীর সহিত ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত আর্য্য-কুমার চৌধুরীর বিবাহ হয়। শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী বিলাতের শিক্ষিত একজন আরকিটেক্ট (architect); তিনি চিত্রাঙ্কনে ও আলোকচিত্রণে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র কেবল ভারতীয় প্রদর্শনীতে নয়, ইউরোপীয় প্রদর্শনীতেও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া পদক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কলা-বিদ্যায় তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী লীলা দেবী তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার অনুগমনে কলা-ক্ষেত্রে যে সকল নব-ভাব-ব্যঞ্জক চিত্র আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সকল শ্রেণীর শিল্পীই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সাহিত্য-জগতেও শ্রীমতী লীলা দেবীর নাম নিতান্ত অপরিচিত নহে। জাতীয় ভাষার ও জাতীয় ধর্ম্মের উপর তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল ও আছে তাহা কিছু উল্লেখযোগ্য। আশৈশব বিদ্যানুশীলনে

আশ্চর্য্যরূপ উৎসাহ থাকা সত্বেও এবং পুতুল ও খেলনার পরিবর্ত্তে কাগজ কলম বই (অনেক সময়ে তাঁহার ছেঁড়া টুকরা কাগজই জুটিত) তাঁহার তৈজস পত্র বা সামগ্রী হইয়া থাকিলেও এবং কালিদাস, ভব-ভূতির কাব্য-পুস্তক তাঁহার জপ তপ হইলেও, ঐ সকল প্রাচ্য শিক্ষার সময় তিনি যেরূপ বাধাবিঘ্ন পাইয়াছিলেন, বিজাতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য ও ভাব অনুকরণে তাঁহার তেমনি অযাচিত সুবিধা হইয়া জাতীয় শিক্ষার পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিল। দেশীভাব বিদূরিত করার জন্য বাল্য-কালে ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর তাড়না হইতে ও দেশী বিলাত বা নকল বিলাতে বাস ও শেষ আসল ইংলণ্ড বাস অবধিও তাঁহার ভাগ্যে হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দেশের উপর অনুরাগ বা দেশীয় সাহিত্যের সহিত আন্তরিক সম্বন্ধ নষ্ট করিতে পারে নাই। নব্যযুগের শিক্ষিতা স্ত্রী, চমকপ্রদ সালঙ্কারা সংসার লক্ষ্মীর সহিত মিলিয়া নিজস্ব হারাইয়া থাকেন, তাহার পরিবর্ত্তে শুভ্র-বসনা সাহিত্য দেবীর আশ্রয় লইতে যে ত্যাগ স্বীকার তাহা সামান্য নহে। প্রত্যেক সাধনার সাধারণ কণ্টকাদি সওয়ায় নিক্ষিপ্ত কণ্টকাদি সকল অতিক্রম করিয়া শ্রীমতী লীলা দেবী আরাধ্য মন্দিরের সন্নিধান হইয়াছেন। ভাগ্যসুন্দরী বহুদূর হইতে পারে, কিন্তু তাড়না নীরবে সহ্য করার ফল অবশ্যম্ভাবী। ইতিমধ্যেই তাঁহার লেখনী হইতে অনেকগুলি রচনা বাহির হইয়াছে, সেগুলি সমস্ত পুস্তকাকারে প্রস্তুত হইলে অনেকগুলি পুস্তক হইত। উপরোক্ত কারণে ঐ সকল প্রকাশ করিবারও এতদিন অবসর দেয় নাই। দুই খানি পুস্তক উপস্থিত যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশ হইবে। তাঁহার কিশলয় নামক পুস্তকের কবিতা পাঠ করিয়া অনারেবল ডাক্তার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যেরূপ শিক্ষাপ্রদ তেমনি মনোরম। তাহা উদ্ধৃত না করিয়া পারা গেল না।

বাঙ্গালার নূতন মহিলা কবি লীলাদেবী।

আধুনিক বাঙ্গলা কাব্যসহিত্যে মহিলা কবিগণের মধ্যে গিরিন্দ্র-মোহিনী, মানকুমারী ও কামিনীরায় প্রভৃতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ, এ যুগের কাব্যসাহিত্যে তাঁহাদের নাম স্মরণীয়। শ্রীমতী লীলা দেবীর প্রতিভা যে কালে ইঁহাদিগেরই ন্যায় উচ্চ স্থান অধিকার করিবে, বর্ত্তমান কবিতা গুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

আজকাল সাধারণতঃ যে সকল কবিতা প্রকাশ হইতেছে, তাহার অধিকাংশ শব্দচাতুর্য্যের সমষ্টি অথবা বিলাস-লালসার উত্তেজক,—প্রাণে শান্তিপ্রদ মধুর ভাবের অবতারণা হইবার বড় অবকাশ দেয় না। কতকগুলি কবিতা এমনি ভাব-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন যে তাহা প্রহে-লিকার নামান্তর মাত্র। আনন্দের বিষয় এই যে শ্রীমতী লীলা দেবীর কবিতাগুলিতে সেরূপ অস্পষ্টতা ও ভাবের "আবছায়া" পরিলক্ষিত হয় না, সর্ব্বত্রই প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণীর ন্যায় কমনীয় লীলাভঙ্গীর সহিত ইঁহার কবিতা সুমধুর কলনাদে প্রবাহিত হইয়া শ্যামল শস্যে ও পুষ্পে ফলে দুই কূল স্নিগ্ধ ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভাষা ও ভাবের মনি-কাঞ্চন সংযোগে তাঁহার কবিতার মধ্যে যে মাধুর্য্য স্বতঃই ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কবির বিশেষত্ব বেশ উপলব্ধি করা যায়; বর্ত্তমান যুগে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। বিশ্ব-প্রেমে কবির হৃদয় কিরূপ পূর্ণ তাহা তাঁহার "আত্মানুভব" কবিতায় সহজেই উপভোগ্য, যথা—

"আমার যা কিছু হারায়ে গিয়েছে
ফুরায়ে গিয়াছে দায়ে
ছড়ায়ে গিয়াছে নিখিল ভুবনে
হাজার হাজার প্রাণে।
আমার যা কিছু বিলায়ে দিয়েছি
ভিক্ষা কাতর করে
সুবাসের মত উবিয়া গিয়াছে
মমবেদনার ঝড়ে।
তাই আজ আমি কাঙ্গাল হে স্বামী
শূন্য আমার সব
সবার মাঝারে আমার প্রাণের
পাই আজ অনুভব।"

অতি সুন্দর। "সবার মাঝারে আমার প্রাণের পাই আজ অনুভব" এই এক ছত্রে আমরা তাঁহার সাধনার সিদ্ধি-সূচনা দেখিতে পাই ;এবং তিনি যে স্বভাব-কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। "শ্রীমণী," "সাকার ও নিরাকার." "নিরদয়," "দৌরাত্ম্য," "সুখ," "বিভ্রম." "তীর্থসঙ্গম" ও "স্বর্গ" প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার শক্তি বিশেষ-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি পৌরাণিক বিষয় লইয়া কবি নূতন ছাঁচে যে আলোকচিত্র দিয়াছেন তাহাও বড়ই মনোরম; "ঊর্ম্মিলা" "পুরুরবা" প্রভৃতি এই শ্রেণীর। দেশ-মাতৃকার সুন্দর ছবি ও বহুস্থানে মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

তাঁহার রচনায় ধর্ম্মপ্রবণতা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবহমানা; তাঁহার তুলিকায় কবিজনোচিত প্রাকৃতিক ইন্দ্রজাল ও মায়াচিত্রের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় রেখায় রেখায় ঝলমল করিতেছে।

রমণী স্বভাব-কবি ;—বিশেষ বাঙ্গালার রমণী। সকল সময় শ্রীমতী কামিনী সেন, শ্রীমতী মানকুমারী, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিণীর আবির্ভাব সকল ক্ষেত্রে সম্ভব না হইলেও বঙ্গনারীর কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। অন্তঃপুর নিবদ্ধ শিক্ষার সাহায্যে এ কবিত্বের স্ফুরণ সাধারণ শ্লাঘার বিষয় নহে। বাঙ্গালার রমণী সমাজে "নীরব কবির" প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট; সেখানে দার্শনিকেরও অভাব নাই। তাঁহাদিগকে ব্যবহারতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি ও সমাজনীতির জটিল সমস্যা অসম্ভব ক্ষিপ্রতা ও কুশলতার সহিত সমাধান করিতে দেখিয়া অনেকে অনেক সময়ে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্য হইয়াছেন। লগুড় হস্ত বা সম্মার্জ্জনী হস্ত না হইয়াও দণ্ডনীতি কুটিলতায় বাঙ্গালী রমণী অনেক সময়ে অদ্বিতীয়; সাম, দান, ভেদ দণ্ড সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহাদের সমান কৃতিত্ব। কখন যদি ব্যবস্থাপক সভায়, ধর্ম্মাধিকরণে অথবা জুরি বকসে বাঙ্গালী রমণীর সম্পূর্ণ স্থান হয় তাঁহারাও তথাকথিত "শিক্ষার অসম্পূর্ণতা" সত্ত্বেও কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ অথবা অকৃতী হইবে না ইহা অসঙ্কোচে আশা করা যায়।

যদি দুরূহ ও জটিল বিষয়ের পারদর্শিতা অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে সুকুমার কলা ক্ষেত্রে বঙ্গরমণীর কৃতিত্বের অভাব ঘটিবার কারণ নাই। ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা শুনিতে শুনিতে, খিড়কী ঘাটে বাসন মাজিতে মাজিতে, অথবা দেবার্চ্চনার উদ্যোগ অবসরে, গৃহস্থ রমণীর প্রতিপদে মানসিক বৃত্তির বিকাশ ও কল্পনা স্ফুরণের যথেষ্ট অবকাশ মিলে। বাহিরের জগতের সংঘর্ষণে তাহাদের সুকুমার বৃত্তিগুলির কাঠিন্য দলিত হয় না, অসংযত ভাব ভাষা বা ইতর ইঙ্গিত সাহায্যে তাহাদের রচনা স্বাভাবিক শীলতার সহিত বিরোধ করে না। পিতৃ, মাতৃ, স্বামী, শ্বশুর, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নি, আত্মীয়, অতিথি, আতুর সেবায় যাহারা নিশিদিন আত্মহারা হইয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে

শিখিয়াছে, "ত্যাগেন মোক্ষ" একথা যাহাদের "মুখেই" সীমাবদ্ধ নহে—পরম নির্য্যাতন সহিয়াও আততায়ীভাব যাহাদের মনে স্থান পাইবার কখন অবকাশ পায় না, শত্রুকে বাৎসল্যে বশ করা যাহাদের জীবনের মূলতন্ত্র—উপেক্ষা, অপমান, লাঞ্ছনায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া যাহারা নর-নারায়ণের সেবায় প্রাণ মন ঢালিয়া নিশিদিন কায়মনোবাক্যে আত্মদান করিতে শিখিয়াছে তাহাদের নিত্য চিন্তা ও নিত্য ভাব সরল, স্বাভাবিক ও অলঙ্কারবর্জ্জিত ভাষায় প্রচলিত হইলেই শ্রেষ্ঠ কবিত্বের সৃষ্টি হয়—সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া যায়—একথা কে অস্বীকার করিবে? পুরাণ ইতিহাস ধর্ম্মকথা যেখানে মজ্জাগত, সেখানে আধুনিক শিক্ষার গ্লানিতে কখনও কখনও মালিন্য আনয়ন করিলেও অধিকাংশ সময়েই "কাঁচা সোণার" ঔজ্জ্বল্য ও গৌরব বৃদ্ধি করে।

উদারপ্রাণ মুক্তহস্ত প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মোহন? ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা ও ব্যবহারবিশারদ দেশনায়ক স্যার আশুতোষ চৌধুরীর পুত্রবধূ শ্রীমতী লীলাদেবী স্বভাব কবিত্বে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত, একথা পাঠক, কষ্ট ও ধৈর্য্য স্বীকার করিয়া তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিলেই অকপট চিত্তে স্বীকার করিবেন। বড়মানুষের মেয়ে, বড়লোকের বউ অর্থব্যয় করিয়া বই ছাপাইয়াছেন, আর সহানুভূতি বায়ুগ্রস্ত আত্মীয় বন্ধুগণ উপহার পাইয়া কষ্ট সৃষ্ট প্রশংসার মুষ্টি বিতরণ করিয়া লেখিকাকে ধন্য করিবেন এ দুরাশা এ কবিতাগুলি প্রকাশের কারণ নহে। লেখিকার ন্যায় নিভৃত শান্তি অন্বেষী বিদুষী মহিলা ধনী সংসারে অল্পই দেখা যায়। তাঁহার মর্ম্মস্থানে দারুণ আঘাতে অপূর্ব্ব অমৃতের উৎস সৃষ্ট হইয়াছে; আঘাত ঘর্ষণ দহন এ অদ্ভুত সৃষ্টির বড় উপযোগী।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

যেষামমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ

অন্তর জ্বালায় পরম ঔষধ জ্ঞানে শ্রীভগবানের রাতুল চরণে কায়-মনোবাক্যে শরণ লওয়াই শ্রেষ্ঠ অথচ "শ্রেয়ঃ" ব্যবস্থা বুঝিয়াছেন। এ কবিতাগুলি সে সমর্পণের ফল। পাঠক তদ্গতচিত্তে পরম সুখানুভূতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

প্রচলিত শ্রেণার আবর্জ্জনা এ কবিতাবলীর মধ্যে স্থান পায় নাই। সাহিত্যানুশীলনের নামে শীলতার উপর যে নিত্য পদাঘাতের আয়োজন হইতেছে, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। ভাষা ভাঙ্গিয়া গুড়াইয়া যাদুকরীর ব্যবস্থা হয় নাই, ঘন "সবুজ" ছায়ার সান্নিধ্যেও এ প্রলোভন ত্যাগ বড় সহজ সংযমের চিহ্ন নহে।

সংযম, সারল্য ও স্বাভাবিকতা এ কবিতাগুলির মূলমন্ত্র। ইহাই কবিতাগুলির বিশেষত্ব। চর্ব্বিত চর্ব্বনের চেষ্টামাত্র নাই, গতানুগতিক ভাবের সম্পূর্ণ বর্জ্জন হইয়াছে। যাহা মনে আসিয়াছে তাহা লিখিয়াছেন; তাহা বলিয়া যথেচ্ছ লিখেন নাই। উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আজ গদ্যে, পদ্যে, গদ্যে-পদ্যে ও পদ্যে-গদ্যে বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্য ও সমাজের যে সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে তাহার কণামাত্রও এ কবিতাগুলিতে স্থান পায় নাই। ভাবের খাতিরে ভাষার বলিদান হয় নাই, ভাষার অনুরোধে ভাব জগদ্দল "পাথরে চাপা পড়িয়া" পঙ্গু নহে। অথচ সকল কবিতাগুলিই সরল, সহজ, সরস—স্থানে স্থানে "আঁতের কথা টানিয়া" আনিয়াছে, স্থানে স্থানে মধুবৃষ্টি করিয়াছে, কবি আপনাকে আপনি চিনিয়াছেন এবং পরকেও "আত্মানুভূতির" সাহায্য করিয়াছেন। মানুষকে মানুষ হইবার পথ দেখাইয়াছেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া বঙ্গরমণীর পক্ষে ইহা সহজ শ্লাঘা ও কম কৃতিত্ব নহে।

শ্রীভগবান তাঁহার এই সাধু উদ্যমের প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন এবং তাঁহার চেষ্টা বহুতর কৃতিত্ব মণ্ডিত করুন, তাঁহাকে উত্তরোত্তর সুনৈপুণ্য দান করুন। ভবিষ্যৎ এই মহিলা— কবির অক্ষয় যশঃ অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

(স্বাক্ষর) শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।